একক ১ ❑ পেশা হিসাবে সমাজ কর্মের অগ্রগতি, করুণামূলক ও সেবামূলক কাজের ধারণা, করুণামূলক পথ থেকে সমাজ উন্নয়নমূলক পথে পরিবর্তন

গঠন

১.১ পেশা হিসাবে সমাজ কর্মের বিকাশ

১.২ করুণামূলক এবং সেবামূলক কাজের ধারনা

১.৩ করুণামলক কাজের পথ থেকে সামাজিক উন্নয়নের পথে পরিবর্তন

১.৪ অনুশীলনী

১.১ পেশা হিসাবে সমাজ কর্মের বিকাশ

প্রাচীন ভারতের সুদীর্ঘ ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, পূর্বে সামাজিক কাজকর্ম ছিল মূলতঃ সেবামূলক। সমাজে যারা দূর্বল, ভাগ্যহীন তাদের বেঁচে থাকার জন্যে নানাবিধ সাহায্যের প্রয়োজন। প্রয়োজনীয় সাহায্য প্রদানের দায়িত্ব ছিল মূলতঃ সেই সম্প্রদায়ের প্রধান এবং অন্যান্য সক্ষম মানুষের উপর। সে সময় সমাজসেবার প্রতি ভালোবাসার এবং মানুষে মানুষে ভ্রাতৃত্ববোধের খুব একটা অভাব ছিল না। অর্থ, শিক্ষা এবং সাহস প্রদানমূলক সেবার দায়িত্ব পালনে এগিয়ে আসত মন্দির, মঠ, ধর্মশালা ইত্যাদি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলিও। এগুলি ছিল সেই সময়কার সমাজসেবার মূল কেন্দ্র, ধর্মেও প্রাধান্য দেওয়া হয়েছিল সমাজসেবাকে এবং পারস্পরিক সহায়তা ও লোকহিতৈষনার মূল্যবোধগুলিকে।

কৌটিল্য তার অর্থশাস্ত্রে বলেছেন—রাষ্ট্রের দরিদ্র, বৃদ্ধ, পঙ্গু এবং ভাগ্যহীন মানুষকে রক্ষা করার দায়িত্ব ছিল রাজার। সমাজে দরিদ্র, দুর্বল, অসুস্থ, ভাগ্যহীন মানুষকে রক্ষা করা এবং তাদের জন্য উন্নয়নমুখী কাজকর্ম চলত যৌথ পরিবার এবং গ্রামীন পঞ্চায়েতের মাধ্যমে। ইসলামিক সময়ে 'জাকাত' প্রথারও প্রচলন ছিল। এই প্রথা অনুযায়ী একজন ব্যক্তিকে তার উপার্জনের এক-পঞ্চমাংশ দান করতে হত সেবামূলক কাজের জন্য। এই সেবামূলক কাজকর্ম পরিচালনা এবং নিয়ন্ত্রনের জন্য নজরদার নিয়োগ করতেন শাসকগন।

সমাজের সৃষ্টিকাল থেকে সময়ের সাথে সাথেই এসেছে নানাবিধ সামাজিক সমস্যা। এই সমস্যা সৃষ্টির সাথে সাথেই চলছে তা সমাধানের নানাবিধ প্রচেষ্টা। সামাজিক এবং অর্থনৈতিক পরিকাঠামো পরিবর্তনের সাথে সাথেই পরিবর্তিত হয়েছে সমাজ সেবামূলক ধারনা। শিল্প বিপ্লবের প্রাক্কালে সমাজ ছিল মূলতঃ কৃষি ভিত্তিক। সেখানে পরিবারের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল এবং সমাজ মূলতঃ নিয়ন্ত্রিত হত ধর্মের দ্বারা। কিন্তু শিল্প বিপ্লবের পরবর্তী সময়ে সমাজ হয়ে পড়ে শিল্পকেন্দ্রিক। এর ফলে সমাজ সেবার ক্ষেত্রেও আসে বৈজ্ঞানিক এবং যুক্তিবাদী চিন্তার প্রভাব। পূর্বেই বলা হয়েছে, অতীতে সমাজ উন্নয়নমূলক কাজকর্ম ছিল মূলতঃ সেবাধর্মী। কিন্তু ক্রমশঃ সেবার দর্শন পরিবর্তিত হয়। পরিবর্তনের মূল কারণগুলি ছিল—

১। সামাজিক পরিবর্তনের সাথে সাথে সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলির পরিবর্তন ঘটে। যার ফলে প্রতিষ্ঠানগুলি অসমর্থ হয়ে পড়ে ব্যক্তি এবং সম্প্রদায়ের প্রয়োজনীয় চাহিদা পূরণে।

২। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে সাহায্যের চাহিদা এত বাড়তে থাকে যে তা সমাজ সেবার মাধ্যমে পূরন করা সম্ভবপর ছিল না।

৩। বিজ্ঞানের অগ্রগতির ফলে মানুষের জীবনযাত্রা ক্রমাগত জটিল হয়ে পড়ে। শিল্পায়ন এবং নগরায়নের ফলে জন্ম নেয় নানাবিধ সামাজিক সমস্যা। যেমন—বস্তির সমস্যা, কিশোর অপরাধী, পরিবেশ দূষণ, যৌথ পরিবারে ভাঙন, বেওয়ারিশ শিশুর সমস্যা ইত্যাদি। একশ্রেণীর মানুষের পক্ষে বিজ্ঞানের এই গতির সাথে তাল দিয়ে চলা কঠিন হয়ে পড়ে। একদিকে মানুষের চাহিদা বাড়ছিল অন্যদিকে সামাজিক সম্পদ ছিল নির্দিষ্ট। ফলে ক্রমাগত নানাবিধ সামাজিক সমস্যা জন্ম নিতে থাকে।

৪। ধর্মীয় অনুশাসনগুলি, যা ছিল সমাজসেবার মূল মন্ত্র তাও বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদী দৃষ্টিভঙ্গির প্রভাবে শিথিল হয়ে পড়ে।

সমাজসেবা প্রাথমিক পর্যায়ে ছিল সামাজিক সমস্যা সমাধানের মূল পথ; সেই স্থানে জন্ম নেয় নতুন ধারণা এবং দর্শন। সমাজসেবার পরিবর্তে সমাজ উন্নয়নমূলক ক্রিয়াকলাপজনিত দর্শনের সৃষ্টি হয়। এর মূল উদ্দেশ্য হল একজন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীকে উপযুক্ত পরিবেশের যোগান দেওয়া যাতে সে তার নিজস্ব ক্ষমতা, প্রতিভা এবং সম্ভাবনার সম্পূর্ণ বিকাশ ঘটিয়ে এবং সদ্ব্যবহার করে তার দুর্বলতাকে এবং সমস্যাগুলিকে অতিক্রম করতে পারে বা নিজস্ব উন্নয়ন/বিকাশ সাধন করতে সক্ষম হয়। সমষ্টির নিজ সম্পদ ব্যবহার করে সমষ্টির মানুষের সক্রিয় যোগদানের মাধ্যমে কাঙ্খিত উন্নয়ন ঘটানোর দর্শন ক্রমশঃ স্থান করে নেয় সেবামূলক ভাবনার ক্ষেত্রে। পটভূমিই সমাজ কর্মকে পেশা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত এবং বিকশিত হতে সাহায্য করে। বহিপ্রযুক্ত সাহায্যকে ভিত্তি করে কোন সমাজ বা সমষ্টি প্রকৃত ও স্থায়ী উন্নয়নের পথে দৃষ্টিযোগ্য বা অনুভবযোগ্য কিছু করে উঠতে পারে না। মানুষ তার সমস্যাকে মাপতে শিখবে, তার সৃষ্টির পিছনে যে সব কারণ তা উপলব্ধি করতে শিখবে, সেই সব কারণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ও প্রতিকার গড়ে তুলবে, সম্মিলিত প্রয়াসের ভিতর দিয়ে উদ্যোগ গ্রহণ করবে সার্বিক উন্নয়নকে বাস্তবায়িত করতে। এই ক্ষেত্রে সূত্রধরের বা সমন্বয়কের ভূমিকা পালনের জন্য প্রয়োজন পড়ে উপযুক্তভাবে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত সমাজ কর্মীর। তারা ব্যক্তি, গোষ্ঠী এবং সমষ্টি সকলের সমস্যা চিহ্নিত করলে এবং তা নিরসনে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি গোষ্ঠী সমষ্টিকে সক্রিয় করে তুলবেন। সেই প্রয়োজন মেটানোর তাগিদেই সমাজ কর্ম অন্যতম এক পেশা হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করে। কালের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে তা ক্রমশঃ বিকাশ লাভ করে চলেছে দেশের সর্বত্র এবং তার কাজের পরিধিও বিস্তার লাভ করে চলেছে জীবন জীবিকার প্রায় সর্বক্ষেত্রে।

১.২ দয়া/করুণামূলক কাজ (charity) এবং সেবামূলক কাজ (Philanthropy)-এর ধারণা—

Charity বা দয়ামূলক কাজ এবং সেবামূলক কাজের (philanthropy) মধ্যে ব্যবহারিক অর্থে কোন তফাৎ করা যায় না। উভয়ের ক্ষেত্রে অন্তর্নিহিত সেবা বা পরোপকারের শক্তি বা বাসনা বিরাজমান। উভয় ধরনের কাজে মানুষের সঙ্কট মোচন সর্বাধিক গুরুত্ব পেয়ে থাকে। এর জন্য কোন শর্ত, বিধিনিষেধ, বাধ্য-বাধকতা—প্রভৃতি কিছুই থাকে না। জাতি, ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে মানুষের উপকার সাধনই মূল লক্ষ্য হিসাবে পরিগণিত হয়। তবুও আক্ষরিক অর্থে শব্দ দুটির মধ্যে কিছুটা পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। যেমন—

Charity শব্দের অভিধানগত অর্থ হল—দরিদ্রদের প্রতি দয়া বা সেবা। অন্যদিকে Philanthropy শব্দের

অভিধানগত অর্থ হল—লোকহিতৈষীতা বা লোকহিতকর। এই দুই শব্দের অর্থের ব্যবহারিক ব্যাখ্যায় কোন তফাৎ করা খুবই কঠিন। অতীতের সমাজ কল্যাণমূলক কাজ মূলতঃ দরিদ্র, নিপীড়িত, অসহায় শ্রেণীর মানুষের সাময়িক সুরাহা করার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। যে কারণে Charity বা Philanthropy জাতীয় কর্মপ্রচেষ্টার প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায়। একথা অনস্বীকার্য যে, সমাজ কর্ম চর্চার পেশাগত দিক নিরুপনের ক্ষেত্রে Charity বা Philanthropy মূলক কাজের অবদান গুরুত্বপূর্ণ। যার ফল হিসাবে পরবর্তীকালে ব্যক্তির পাশাপাশি সামাজিক বিষয় নিয়ে ধাপে ধাপে সমাজ কর্ম চর্চার বিকাশ ঘটতে থাকে। বলা যেতে পারে যে, Charity এবং Philanthropy হলো এমন এক ভিত্তিভূমি যার উপর পরিশীলিত ভাবনাকে ভিত্তি করে বর্তমান কালে বিজ্ঞান সম্মত সমাজ কর্মের ভাবনা বিকাশ লাভ করেছে।

১.৩ দয়া/করুণামূলক (Charity) কাজের ধরন বা পথ থেকে সামাজিক উন্নয়ন (Social Development)-এর পথে পরিবর্তন

দয়া/করুণামূলক কাজের দীর্ঘস্থায়ী ফল সাধারণতঃ আশা করা হয় না বা ঘটে না। কিন্তু সামাজিক উন্নয়ন একটি দীর্ঘস্থায়ী প্রক্রিয়া এর ফল হয় সুদুর প্রসারী। সমাজের বিভিন্ন দিকের/বিষয়ের ক্রমাগত পরিবর্তন সাধন ও তাদের অগ্রগতির পথে উত্তরণ ঘটানোকেই সামগ্রিকভাবে সামাজিক উন্নয়নের পথে অগ্রসর হওয়ার পর্যায় বলেই ধরে নেওয়া যেতে পারে। দয়া বা করুণামূলক কাজের ধরন থেকে কিভাবে ধীরে ধীরে সামাজিক উন্নয়নের পরিবর্তন ঘটেছে সে বিষয় নিয়ে আলোকপাত করার আগে দয়া বা করুণামূলক কাজের যে বিভিন্ন দিকগুলি লক্ষ্য করা যায় তার কয়েকটি এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। যেমন—

ক) ব্যক্তিকেন্দ্রিক প্রচেষ্টা বা উদ্যোগ অর্থাৎ কোন বিপদগ্রস্থ ব্যক্তিকে সেবা বা দয়া প্রদর্শন করা।

খ) সাময়িক পরিত্রাণের উদ্যোগ নেওয়া বা প্রতিরোধের পথে উদ্যোগী হওয়া।

গ) সেবা/দানশীল কর্মের উপর সমস্যাসঙ্কুল মানুষের নির্ভরশীলতা।

ঘ) দয়া/করুণা প্রদর্শনের প্রয়োজন ফুরোলেই সবকিছু মিটে যায় বলে মনে করা।

ঙ) ব্যক্তিকেন্দ্রিক/নিজস্ব অভাব মেটানোর প্রচেষ্টাকেই বেশী গুরুত্ব প্রদর্শন।

চ) পরোপকার করা বা মানুষের জন্য কাজ করা হচ্ছে বলে মনে করা।

ছ) সামগ্রিকভাবে সমস্যাগুলি সম্পর্কে না ভেবে কোন একটি সমস্যার প্রতি দৃষ্টি দেওয়া।

ঝ) মানুষের অবস্থার পরিবর্তন না ঘটিয়ে পরিবেশ পরিবর্তনের চেষ্টা করা।

ঞ) নৈতিক দায়-দায়িত্বের প্রতি গুরুত্ব দেখিয়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উদ্দেশ্য সাধনে ব্রতী হওয়া প্রভৃতি।

দয়া বা করুণামূলক পরোপকারের উপরোক্ত বিভিন্ন দিকগুলির পাশাপাশি স্থান, কাল ও পাত্র ভেদে আরও নানান দিকের সংযোজন বা বিয়োজন ঘটতে পারে। তবে পরবর্তী পর্যায়ে কিভাবে সামাজিক উন্নয়নের পথে দয়া/করুণামূলক পরোপকারের ধরনের পরিবর্তন ঘটেছে তার কয়েকটি নিচে উল্লেখ করা হল। যেমন—

ক) অতীতের বহু প্রচলিত ব্যক্তিকেন্দ্রিক পরোপকার সাধনের প্রচেষ্টা থেকে ধীরে ধীরে প্রতিষ্ঠানগত বা সংঘবদ্ধ দয়া/করুণামূলক পরোপকারের পথে অগ্রসর হওয়ার উদ্যোগ গ্রহণ।

খ) সহানুভূতি প্রদর্শনের আবেগপ্রবণ আচরণকে আরও সংযত ও নিয়ন্ত্রিত আচরণের স্তরে এনে মানুষের পাশে দাঁড়ানো।

গ) সাময়িক সেবার পরিবর্তে প্রতিরোধমূলক কাজে উদ্যোগী হওয়া।

ঘ) সংকটকালীন/অভাবের সময়ে ত্রাণের পরিবর্তে সংকট মোকাবিলা করার দীর্ঘস্থায়ী পন্থা অবলম্বনের পথে উদ্যোগী হওয়া।

ঙ) মানুষের জন্য কাজ করার পরিবর্তে নিজেদের জন্য নিজেদের কাজ করার পথে মানুষের ধ্যান ধারনা পাল্টানোর পথ সুগম করা।

চ) ব্যক্তিকেন্দ্রিক/নিজস্ব অভাব/বিপদ কাটিয়ে ওঠার প্রচেষ্টাকে সমান গুরুত্ব দিয়ে সামাজিক চাহিদা ও প্রয়োজন মেটানোর পথে অগ্রসর হওয়া।

ছ) সাধারণভাবে সমাজ সেবার পরিবর্তে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে সামাজিক কল্যাণ (Specialised Social Welfare) সাধনে গুরুত্ব প্রদর্শন।

জ) পরিবেশের অবস্থা পাল্টানোর সাথে সাথে মানব সম্পদের উন্নয়ন ও পরিবর্তন সাধনের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা।

ঝ) পরোপকার বা সেবামূলক কাজের উপর নির্ভরশীলতা কাটিয়ে স্বনির্ভরতার পথে উদ্যোগী হওয়া।

ঞ) বাড়ী বাড়ী গিয়ে দয়া/করুণামূলক কাজ না করে প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে কল্যাণমূলক কাজের বিস্তার ঘটানো।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে সহজেই অনুমান করা যায় যে দয়া/করুণামূলক কাজ থেকে ধীরে ধীরে সামাজিক উন্নয়নের ধারায় উন্নীত হওয়া যায়। অর্থাৎ প্রচলিত পরোপকারমূলক আচরণ থেকে আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে কিভাবে মানুষ নিজের চেষ্টায় নিজের কল্যাণ সাধন করতে পারে সেই বিষয়টি তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে এখানে। উপরোক্ত উপায়ে যে কোন সমাজেই শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পুষ্টি, বাসস্থান, বস্ত্র, রাস্তাঘাট, পানীয়জল ও অন্যান্য নানান বিষয়ে উন্নয়নের পথে অগ্রসর হওয়ার পথ যত প্রশস্ত হবে, সমাজ ততটাই উন্নয়নের পথে এগিয়ে যাবে, যা কিনা দয়া/করুণামূলক কাজের ধরন আঁকড়ে রেখে কখনোই কল্পনা করা যায় না।

১.৪ অনুশীলনী

১। পেশা হিসাবে সমাজ কর্মের বিকাশ কিভাবে ঘটলো? এর পিছনে কি কি কারণ ছিল?

২। 'করুণামূলক' এবং 'সেবামূলক' কাজের ধারণা কি?

৩। করুণামূলক পথ থেকে সামাজিক উন্নয়নের পথে পরিবর্তনের ব্যাপারে আলোকপাত কর।

একক ২ ❑ ভারতবর্ষে সমাজ কর্মের ঐতিহাসিক বিকাশ

গঠন

২.১ উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে সমাজ সংস্কার আন্দোলন

২.২ ব্রিটিশ আমলে সমাজ কল্যাণ

২.৩ স্বাধীনোত্তরকালে ভারতবর্ষে সমাজ কর্ম

২.৪ গ্রন্থপঞ্জি

২.৫ অনুশীলনী

২.১ উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দিতে সমাজ সংস্কার আন্দোলন

- **প্রেক্ষাপট**

সমাজ সংস্কার আন্দোলন মূলতঃ সমাজের বহুদিন ধরে চলে আসা কোন অভ্যাস, বিশ্বাস বা রীতি-নীতির পরিবর্তন আনার লক্ষ্যেই সংঘটিত হয়েছে। সমাজের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে চিন্তাভাবনা করা বা নতুন রূপ দেওয়ার নেতৃত্বে যারা এসেছেন তাদের সমাজ কল্যাণমূলক চিন্তা ভাবনার সাথে সমাজ কর্মের নানা দিকের সামঞ্জস্য লক্ষ্য করা গেছে। কোন একটি জনগোষ্ঠীর মূল্যবোধের প্রতি যথোপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন করেই সমাজ সংস্কারের পথে অগ্রসর সম্ভব হয়েছে।

ভারতবর্ষের সাথে আধুনিক ইউরোপের প্রথম যোগাযোগ গড়ে ওঠে ১৪৯৮ সালে, যখন ভাস্কো-দা-গামা—চারটি ছোট্ট জাহাজ সঙ্গে নিয়ে দক্ষিণ ভারতের কালিকট বন্দরে পদার্পন করেন। পরবর্তীকালে পর্তুগীজ, ডাচ এবং তারও পরবর্তী পর্যায়ে অর্থাৎ সপ্তদশ শতকের গোড়ায় ব্রিটিশেরা ধীরে ধীরে ভারতবর্ষে প্রবেশ করেছেন। ভারতে কোম্পানী শাসনের প্রায় প্রথম ৬০ বছর ভারতবাসীর শিক্ষা ব্যবস্থা, সমাজ সংস্কার, সাংস্কৃতিক উন্নতির প্রতি তারা উদাসীন থেকেছে। ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দে নাগাদ শিল্প-বণিকসভায় নতুন চিন্তা ভাবনার উদ্রেক হল। ইংল্যান্ডের বহু শিল্পপতি ও তাদের সমিতি মনে করল আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত ও ইউরোপীয় ভাবধারায় ভাবিত না হলে ভারতে ইংল্যান্ডের শিল্পদ্রব্যের ব্যবহার বাড়বে না। বেকন, লক ও বেনথামের চিন্তাধারায় ভাবিত কিছু ইংরাজ অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতকের গোড়ায় ভারতবাসীর উন্নতির জন্য শিক্ষা সংস্কার, সমাজ সংস্কার ও শাসন সংস্কারের উপর জোর দিলেন। ফলে ভারতীয় শিক্ষা, সমাজ ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে পরিবর্তনের সূচনা হল।

(ক) খ্রীষ্টীয় মিশন

১৭৫৭-১৮১৩ খ্রীঃ পর্যন্ত কোম্পানীর শাসন কর্তারা, ভারতীয়দের আধুনিক শিক্ষাদানের ব্যাপারে উদাসীনতা দেখালেও খ্রীষ্ট ধর্ম প্রচারক ও পাদ্রীরা এবং উদারপন্থী মানবতাবাদীরা ভারতবাসীদের পাশ্চাত্য শিক্ষাদানের ব্যাপারে এগিয়ে আসেন। ১৮০০ খ্রীঃ লর্ড ওয়েলেস্‌লী তরুন ইংরাজ সিভিলিয়ানদের ভারতীয় ভাষা, আইন ও ইউরোপীয় সাহিত্য এবং দর্শন শিক্ষাদানের জন্য কলকাতাস্থ ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের প্রতিষ্ঠা করেন। এই কলেজের অধ্যাপক মন্ডলী বিশেষতঃ কেরী ও মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার প্রভৃতির চেষ্টায় বাংলা ভাষার উন্নতি হয়। খ্রীষ্টীয় মিশনারীরা বিশ্বাস করতেন যে, খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ এবং পাশ্চাত্য শিক্ষার আলোক না পেলে ভারতীয়দের মধ্যে প্রচলিত নানা ধরনের কু-সংস্কার দূর হবে না। এজন্য ভারতের বিভিন্ন বিদ্যালয় ও কলেজ প্রতিষ্ঠার জন্য তারা উদ্যোগ নেন।

খ্রীষ্টীয় মিশনারীদের মধ্যে ব্যাপ্টিষ্ট মিশনের পাদ্রী উইলিয়াম কেরী ১৮১৮ খ্রীঃ (কেউ কেউ বলেন ১৮১৫ খ্রীঃ) হুগলীর শ্রীরামপুরে একটি ইংরাজী শিক্ষার বিদ্যালয় স্থাপন করেন। সেই সঙ্গে ব্যাপ্টিষ্ট মিশন প্রেস নামে একটি ছাপাখানা ও স্থাপন করেন। ১৮১৯ খ্রীঃ বিশপ্স কলেজ স্থাপিত হয়। ১৮৩০ খ্রীঃ জেনারেল এ্যাসেম্ব্রিজ ইনষ্টিটিউশন নামে কলকাতায় একটি বিদ্যালয় স্থাপিত হয় যা পরবর্তীকালে স্কটিশচার্চ কলেজে পরিণত হয়। রেভারেন্ড ডাফ এবং রাজা রামমোহনের সহায়তায় গড়ে উঠেছিল এই কলেজ। এমনকি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠার সময়ে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচী রচনায় রেভারেন্ড ডাফের বিশেষ ভূমিকা ছিল। ১৮৩৫ খ্রীঃ জেসুইট মিশনারীরা সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ, লরেটো হাউস কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। মাদ্রাজে খ্রীষ্টান কলেজ, বোম্বাইতে উইলসন কলেজও প্রতিষ্ঠিত হয় মিশনারীদের উদ্যোগে। স্ত্রী শিক্ষার বিস্তারেও মিশনারীদের অবদান অনস্বীকার্য। মাদাম লস্ন্ (Madame Lawson) এক ফিমেল জুভেনাইল সোসাইটি স্থাপন করেন। চার্চ মিশনারী সোসাইটি মিস কুকের সহায়তায় কয়েকটি মহিলা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। ১৮৪৯ খ্রীঃ ড্রিঙ্ক ওয়াটার বেথুন বিখ্যাত বেথুন স্কুল বা হিন্দু মহিলা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। এভাবে মিশনারীদের ও বেসরকারী উদ্যোগের ফলে পাশ্চাত্য শিক্ষা বিস্তার বেশ কিছুটা গতি পেলে সরকারের পক্ষে ঐ বিষয়ে আর উদাসীন থাকা সম্ভব ছিল না। সরকারও শিক্ষা প্রসারের কাজে উদ্যোগী হতে লাগলেন।

শিক্ষা বিস্তারের কাজে ক্রমশঃ সরকারী উদ্যোগ বৃদ্ধি পেলেও লর্ড উইলিয়াম বেন্টিং-এর আমলে শিক্ষাখাতে ব্যয় বরাদ্দ এতটাই কম ছিল যে সরকারী প্রচেষ্টায় শিক্ষা বিস্তারের কাজ খুব বেশী প্রসারিত করা যায়নি।

তবু, তারই মধ্যে ১৮৩৪ খ্রীঃ কলকাতায় মেডিক্যাল কলেজ স্থাপিত হল। শিক্ষাদানের অঙ্গ হিসাবে স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা বিদ্যার উপর গুরুত্ব দেওয়া শুরু হল। ১৮৪৪ খ্রীঃ লর্ড হার্ডিঞ্জ আইন প্রণয়ন করে বলেন যে, সরকারী চাকরী পেতে গেলে ইংরাজী ভাষায় জ্ঞান থাকা আবশ্যিক। এর ফলে ভারতবাসীর মধ্যে ইংরাজী শিক্ষায় আগ্রহ বাড়তে থাকে।

১৮৫৪ খ্রীঃ বোর্ড অব কন্ট্রোলের সভাপতি স্যার চার্লস উড (Sir Charles Wood) ভারত সরকারের কাছে শিক্ষা বিষয়ক এক নির্দেশনামা পাঠান। তার সুপারিশ অনুসারে ১৮৫৭ খ্রীঃ কলকাতা, মাদ্রাজ ও বোম্বাইয়ে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়। ইংরাজী শিক্ষার প্রসার ভারতীয়দের মধ্যে সমাজ সংস্কারক ধর্ম প্রচারক, শিক্ষাবিদ, জাতি গঠনকারীর উদ্ভবের ক্ষেত্রে সহায়ক হয়। সেই সব ব্যক্তির নিস্বার্থ প্রচেষ্টায় ভারতে নবজাগরনের সূচনা হয়।

(খ) ব্রাহ্মসমাজ

প্রাচ্যের যা কিছু শ্রেষ্ঠ তা বজায় রেখে প্রতীচ্যের যা কিছু শ্রেষ্ঠ তাকে গ্রহণ করে উভয়ের সমন্বয় সাধনের দ্বারা জাতিকে সমৃদ্ধ করার আধুনিক ভাবনায় ভাবিত সংস্কারক ও চিন্তাবিদ হিসাবে রাজা রামমোহন রায়কে পথিকৃৎ বলা হয়। তুলনামূলক ধর্মশাস্ত্রে সুপন্ডিত ছিলেন রাজা রামমোহন রায়। তিনি উপনিষদের আলোকে হিন্দু ধর্মকে যাচাই করে বলেন যে, ঈশ্বর এক এবং নিরাকার। যাগযজ্ঞ, জাতিভেদ, মূর্তিপূজা এ সবের বিরোধীতা করেছেন তিনি। হিন্দু ধর্মে পৌত্তলিকতা, বহু দেবতার পূজা প্রভৃতি বিষয়ের প্রাসঙ্গিকতা এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক বিষয় আলোচনার জন্য আত্মীয় সভার স্থাপন করেন। সর্বসাধারনের উপকারের জন্য তিনি উপনিষদের বঙ্গানুবাদ ও বেদান্ত সার নামে ধর্মগ্রন্থ প্রকাশ করেন। একেশ্বরবাদকে প্রচার করার জন্য ১৮২৮ খ্রীঃ (মতান্তরে ১৮২৯ খ্রীঃ) ফিরিঙ্গী কমল বোসের বাড়ীতে ব্রাহ্ম সভার প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮৩০ খ্রীঃ এই সভার নাম বদলে ব্রাহ্মসমাজ রাখা হয়। এই সমাজের উদ্দেশ্য ছিল—

- নিরাকার পরম ব্রহ্মের উপাসনা ও মূর্তি পূজোর বিরোধিতা করা।
- একেশ্বরে বিশ্বাসী মানুষজনকে একত্রে সমবেত করা।
- সমাজ সংস্কারের পথ প্রশস্ত করা।

ব্রাহ্ম সমাজের প্রথম সম্পাদক হন তারাপদ চক্রবর্তী, রাজা রামমোহন রায় বিলেত যাওয়ার পর রবীন্দ্রনাথের পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সমাজের নেতৃত্বের দায়িত্ব বর্তায়। তিনি উপনিষদের আলোকে ব্রাহ্ম সমাজকে অনুপ্রাণিত করেন এবং তত্ত্ববোধিনী সভা প্রতিষ্ঠা ও তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা প্রকাশ করে ব্রাহ্মসমাজের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি করেন। দেবেন্দ্রনাথের পর কেশব চন্দ্র সেন (১৮৫৮) ব্রাহ্মসমাজের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তার আমলে ব্রাহ্ম আন্দোলন এক সর্ব ভারতীয় আন্দোলনের রূপ নেয়। শ্রী সেনের নেতৃত্বে ব্রাহ্ম সমাজ ভারতবাসীর শিক্ষা বিস্তারে ও স্ত্রী শিক্ষার প্রসারে অনেক উল্লেখযোগ্য কাজ করে। ১৮৬২ খ্রীঃ ক্যালকাটা কলেজ স্থাপিত হয়, এবং 'বামা বোধিনী' পত্রিকা প্রকাশ পায়। নব্য ব্রাহ্মদের সহায়তায় ব্রাহ্ম সমাজে পুরুষদের বহুবিবাহ, বাল্য বিবাহ ও জাতিভেদ প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন জোরদার করেন। ব্রাহ্ম সমাজের প্রভাবে ১৮৭২ খ্রীঃ হিন্দু বিবাহ বিধি আইন পাশ হয়। আইনটির প্রকৃতনাম ছিল হিন্দু নেটিভ ম্যারেজ অ্যাক্ট—১৮৭২। এই আইন প্রণয়নের ফলে ব্রাহ্মরা তাদের সমাজে বাল্য বিবাহ, বহুবিবাহ নিষিদ্ধ ঘোষনা করেন। অসবর্ণ বিবাহ চালু করেন, পর্দা প্রথা রদ করেন এবং স্ত্রী-শিক্ষার প্রচার করেন। তারা বঙ্গ মহিলা বিদ্যালয় স্থান করেন।

এছাড়াও ব্রাহ্ম সমাজের নব্য ও প্রবীণ, শ্রমিকদের মধ্যে সুরাপান বন্ধ করার জন্যে প্রচার চালান। 'মদ না গরল' নামে এক পয়সা দামের একটি পত্রিকা প্রকাশ করে মদ্য পানের অপকারিতা প্রচার করা হয়। ব্রাহ্মসমাজ দুর্গতদের সেবার কাজেও অংশ গ্রহণ করে। অর্থাৎ প্রচলিত ধর্ম ও সমাজকে যুক্তিবাদি সংস্কারের মাধ্যমে নতুন প্রাণ শক্তি দানের ক্ষেত্রে ব্রাহ্মসমাজের অবদান ছিল সুদূর প্রসারী।

(গ) আর্য্য সমাজ

উনবিংশ শতকের ধর্ম আন্দোলনের ক্ষেত্রে ব্রাহ্ম সমাজ আন্দোলন ছিল যুক্তিবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। অন্যদিকে আর্য্য সমাজ গড়ে উঠে ভারতীয় ঐতিহ্যকে আশ্রয় করে। এই সমাজ আন্দোলনের প্রবর্তক স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী (আদি নাম ছিল শংকর) তিনি স্বামী বিরজানন্দের শিষ্যত্ব গ্রহণের পর হিন্দু সমাজের গোঁড়ামি ও কুসংস্কার দূর করার জন্যে প্রচার চালান। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, আদি বৈদিক ধর্ম ছিল অতি বিশুদ্ধ ও পবিত্র। সকল জ্ঞান এবং সকল সত্য নিহিত আছে বেদের মধ্যেই।

হিন্দুদের তন্ত্র, মন্ত্র, জাতিভেদ, অস্পৃশ্যতাকে তিনি বেদের প্রতি অবজ্ঞা বলে মনে করতেন। সেইজন্য ১৮৭৫ খ্রীঃ তিনি বোম্বাই নগরে আর্য্য সমাজ প্রতিষ্ঠা করেন। সমাজের উদ্দেশ্য ছিল ঃ

- মুর্তিপূজো, বাল্য বিবাহ, জাতিভেদকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা
- নিরাকার পরম ব্রহ্মের উপাসনাই একমাত্র শ্রেষ্ঠ পথ হিসাবে ঘোষনা করা
- শুদ্ধি আন্দোলন দ্বারা অন্য ধর্মাবলম্বী মানুষকে হিন্দুধর্মে দীক্ষা দানের ব্যবস্থা করা।
- অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলা।

আর্য্য সমাজের বিশিষ্ট কর্মী লালা হংসরাজ, স্বামী শ্রদ্ধানন্দ, গুরু দত্ত প্রভৃতি সমাজ সংস্কার আন্দোলনকে পাঞ্জাব ও উত্তরভারতে ছড়িয়ে দেন। লাহোর ও উত্তর ভারতে দয়ানন্দ এ্যাংলো-বৈদিক কলেজ স্থাপিত হয়। হরিদ্বারে গুরুকুল বিদ্যালয়ে প্রাচীন আশ্রমের আদর্শে বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। 'সত্যার্থ প্রকাশ' ছিল আর্য্য সমাজের মুখপত্র। এই পত্রিকা দয়ানন্দের মতবাদকে ঘরে ঘরে ছড়িয়ে দিতে সাহায্য করে। কেবলমাত্র বৈদিক ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব তুলে ধরাই দয়ানন্দের মূল উদ্দেশ্য ছিল। সমাজ কল্যাণমূলক কাজ বিশেষ করে শিক্ষা বিস্তারে আর্য্য সমাজের অবদান সীমিত হলেও তাদের ভাব ধারা ছিল চরমপন্থী মতবাদের মত।

(ঘ) থিওজোফিক্যাল সোসাইটি

প্রেক্ষাপট

১৮৭৫ সালের ১৭ই নভেম্বর কলোনেল ওলিয়েট (Colonet Oleott)-এর সভাপতিত্বে এই সমাজের প্রতিষ্ঠা হয়। নিউ ইয়র্ক শহরের একটি প্রকাশ্য সভায় ওলিয়ট ঘোষনা করেন, "জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে যে কোন মানুষ, যার মধ্যে করুনা ও দয়া আছে এবং যারা আমাদের কর্মপন্থার প্রতি আন্তরিক, তাদের সকলের কেন্দ্রবিন্দু হবে এই থিওসোফিক্যাল সোসাইটি।" ঐ সভাতেই ১৩ জন আধিকারিক ও সাংসদ নির্বাচিত হন। ম্যাডাম ব্ল্যাভাটস্কি (Madame Blavatsky) আজীবন কালের জন্য সমিতির বার্তা সচিব (Corresponding Secretary) হিসাবে নির্বাচিত হন।

'Theo' শব্দের অর্থ 'God' বা ভগবান এবং 'sophos' কথার অর্থ হল wise বা জ্ঞান। কলোনেল ওলিয়েট Theosophical এর অর্থ বলেছেন Divine Wisdom (প্রকৃতির অবিনশ্বর নীতি যা মানুষের অন্তর্নিহিত পরম পবিত্র জ্ঞানালোকের সম্মিলন), যার ব্যাখ্যায় তিনি বলেন eternal principle of nature with which interior inter-active faculty in man was akin:

উদ্দেশ্য

এই সমিতি গঠনের উদ্দেশ্যগুলি হল নিম্নরূপ—

১। জাতি, ধর্ম বর্ণ নিবিশেষে বিশ্ব ভ্রাতৃত্বের (Universal Brotherhood) প্রাণকেন্দ্র হিসাবে গড়ে তোলা

২। প্রাচ্যের সাহিত্য, ধর্ম, বিজ্ঞান ও আর্য্য সম্বন্ধীয় পাঠ ও গবেষনার সুযোগ বাড়ানো

৩। মানুষ ও প্রকৃতির অন্তর্নিহিত শক্তির অনুসন্ধান ও উভয়ের মধ্যে সুসম্পর্ক স্থাপনের রহস্য উদঘাটন।

কাজের অগ্রগতি

১৮৭৯ সালে ১৬ই ফেব্রুয়ারী কলোনেল ওলিয়ট, ম্যাডাম ব্ল্যাভাটস্কি, মিস ব্যাটেন (Baten) এবং মিষ্টার উইম্রিজ (Mr. Wimbridge) ভারতবর্ষের বোম্বাইতে অবতীর্ন হলেন।

প্রথম কিছুদিন তারা সোসাইটির ভাবনাচিন্তা ও উদ্দেশ্য নিয়ে নানান জায়গায় সভা সমিতি করলেন। ধীরে ধীরে মানুষ আলোড়িত হতে শুরু করলেন। সে সময় বোম্বাই শহরের পুলিশ মনে করতেন কোন রাজনৈতিক মতাদর্শনের কথা বলার জন্য বিদেশ থেকে এইসব লোকজন এসেছেন। দীর্ঘদিন নজর রাখার পর, তারা বুঝলেন যে এরা কোন রাজনৈতিক ক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত নয়। তবু যখন মহারাষ্ট্রের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে পুলিশের কাছে অভিযোগ আসতে থাকলো, তখন এই সমিতির অগ্রগতিকে থামানো হল।

পরে সম্ভবত ১৮৮০ সালে কলোনেল ওলিয়েট তার সঙ্গীদের নিয়ে উত্তর ভারতে সমিতির ভাবধারা প্রচারের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। ৭ই অক্টোবর সিমলাতে আধ্যাত্মিকতা ও থিওসোফি বিষয়ে প্রকাশ্য সভায় ভাষণ দেন। পবে অমৃতসরে অনুরূপ একটি সভাতেও তিনি ভাষণ দেন। বাধার মধ্যেও কিছুটা অগ্রগতি ঘটতে লাগলো। ১৮৮৭ সালে পুনরায় তিনি বোম্বাই শহরে থিওসোফি-র শত্রু ও মিত্র বিষয়ে এক সভায় বক্তব্য রাখেন। ওলিয়টের অবর্তমানে পরবর্তী প্রজন্ম এই সমিতির কর্মধারাকে আর সেভাবে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারেন নি। মিসেন এ্যানি ব্যাসান্থ এই সম্প্রদায়ে যোগ দেন ও হিন্দু ধর্মের উন্নতির চেষ্টা করেন। তাঁর উদ্যোগে বারানসীতে সেন্ট্রাল স্কুল স্থাপিত হয়। কালক্রমে এই বিদ্যার্লয়কে কেন্দ্র করে কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে ওঠে।

(ঙ) রামকৃষ্ণ মিশন

উনবিংশ শতকে ভারতের ধর্ম আন্দোলনের দুই সমান্তরাল ধারা, একটি যুক্তিবাদের পথে ও অপরটি ভারতীয়

ঐতিহ্যবাদের পথে প্রবাহিত হচ্ছিল। রামকৃষ্ণ পরমহংস দেব এই উভয় ধারার মধ্যে সমন্বয় ও সেতু বন্ধন করেন। তিনি কোন বিশেষ ধর্মের প্রচার করেন নি। প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের মতে "রামকৃষ্ণ শৈব নন, শাক্ত নন, এমনকি কট্টর বেদান্তবাদীও নন। তথাপি তাঁর মধ্যে আছে এই সকল মতবাদের মিশ্রন।" জনৈক সমালোচকের মতে "তাঁর মধ্যে দেখা যায় উদাসী বাউলের বৈরাগ্য, চৈতন্যের বিশ্বজননীতা ও ঔদার্য্য, রামপ্রসাদের শিশু-সুলভ সরলতা, আবার বেদান্তের শান্ত-গম্ভীর সংযম।" তিনি লোকের মুখের ভাষা কথ্য বাংলায় বেদান্তের মর্মবাণী প্রচার করতেন। অদ্বৈতবাদের তত্ত্ব অনুযায়ী তিনি বলেন 'ঈশ্বর এক ও অভিন্ন' যিনি রাম, তিনি রহিম, লোকে তাকে বহুনামে ডাকে। ১৮৫৬-১৮৬৭ খ্রীঃ এই বারো বছর তিনি তন্ত্র মতে, বৈষ্ণব মতে, সুফী মতে ও খ্রীষ্টীয় মতে সাধনার দ্বারা সিদ্ধিলাভ করেন। তাঁর নিজ জীবনের সাধনার দ্বারা দেখিয়ে দেন যে, হিন্দু, খ্রীষ্টীয় ও ইসলামীয় মতে সাধনার দ্বারা একই ঈশ্বরে উপনীত হওয়া যায়। বেদান্তের মানবতাবাদকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে সহজ সরলভাবে জীব সেবা ও মানব সেবাকেই ঈশ্বরের সেবা বলে তিনি মনে করতেন ও প্রচার করতেন।

রামকৃষ্ণের জ্ঞান, ভক্তি ও ভাবের কথা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়লে বহুমানুষ তাঁর কাছে আসেন ও তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। তাঁর শিষ্যদের মধ্যে ছিলেন নরেন্দ্রনাথ দত্ত বা স্বামী বিবেকানন্দ ও বিখ্যাত নাট্যকার মহাকবি গিরীশচন্দ্র ঘোষ, এছাড়া তাঁর বাণী সংকলনের উদ্যোগী শ্রী মহেন্দ্রনাথ বা "শ্রীম" ছিলেন তাঁর বিশিষ্ট শিষ্য। তাঁর পত্নী সারদামণি শিষ্যবর্গের কাছে সারদামাতা নামে পরিচিত ছিলেন। ১৮৮৬ খ্রীঃ তাঁর ভাব ধারা অনুযায়ী "তাঁর জীবাত্মা পরমাত্মায় লীন হয়ে যায়।" তাঁর তিরোধানের পর শিষ্য মন্ডলী কাশীপুরের মঠে রামকৃষ্ণ সংঘ স্থাপন করেন। "যত্র জীব তত্র শিব" গুরুর এই মহামন্ত্রকে স্বামী বিবেকানন্দ বাস্তবে রূপায়িত করার জন্য ১৮৯৭ খ্রীঃ রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন প্রতিষ্ঠা করে এই সংঘকে মানব সেবার কাজে ব্রতী করেন। ড. ত্রিপাঠীর মতে, "শিল্পী ও ভাস্কর মাইকেল এ্যাঞ্জেলো যেরূপ শিল্পকে বাস্তবে জীবনের সঙ্গে সংযুক্ত করেন, বিবেকানন্দ সেরূপ ধর্মকে জাতীয় ও বাস্তব জীবনের সঙ্গে সংযুক্ত করেন।" কুসংস্কার, অস্পৃশ্যতা, জাতিভেদ, ধনী-দরিদ্র প্রভেদ দূর করে তিনি জাতিকে ঐক্য ও কর্মশক্তিতে উদ্দীপ্ত হওয়ার আহ্বান জানান। বেদান্তের মানবতাবাদকে আশ্রয় করে তিনি জাতিকে ক্ষাত্রতেজে, ব্রহ্মবীর্যে জ্বলে ওঠার ডাক দেন। উচ্চবর্ণের, উচ্চ শিক্ষিত ভারতবাসীদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, "হে ভারত, ভুলিও না, দরিদ্র ভারতবাসী, চন্ডাল ভারতবাসী, মুর্খ ভারতবাসী তোমার ভাই। ভুলিও না ভারতই তোমার শৈশবের শিশু শয্যা, যৌবনের উপবন, বার্ধ্যক্যের বারানসী।" তিনি ছিলেন ভারতীয় জাতীয়তাবাদের উদগাতা, দরিদ্র নিপীড়িত শ্রেণীর বন্ধু। যুব শক্তির উপর ছিল তার প্রগাঢ় ভরসা। তাদের উজ্জীবন মন্ত্রে আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন "উত্তিষ্ঠিত, জাগ্রত, প্রাপ্য বরান নিবোধত।" অর্থাৎ "ওঠো, জাগো, নিজে লক্ষ্যে না পৌঁছনো পর্যন্ত থেমো না।"

স্বামীজী ভারত পরিক্রমার সময় ভারতের পরাধীনতা, সাধারন ভারতবাসীর অশিক্ষা, দারিদ্র্য, কু-সংস্কার দেখে ব্যথিত হন। পাশ্চাত্য ভ্রমণের পর পাশ্চাত্যের আত্মবিশ্বাসী, ঐশ্বর্যবান সমাজের সঙ্গে দেশবাসীর দারিদ্র্যের তুলনা করে তিনি আক্ষেপের সঙ্গে বলেন, "পাশ্চাত্যের এই ঐশ্বর্যের পাশে হায়। আমার দরিদ্র ভারতভূমি তুমি কোথায়?" ভারতবর্ষকে উন্নত করার জন্যে তিনি দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করেন। ১৮৯৩ খ্রীঃ শিকাগো ধর্ম সম্মেলনে ভারতের মানবতাবাদ, ভারতী সভ্যতার বিশ্বজনীনতা, সমন্বয়বাদ ও বেদান্তের উদারতত্ত্ব ব্যাখ্যা করে শ্রোতাদের হৃদয় স্পর্শ করেন। দ্বিতীয়বার ১৮৯৯ খ্রীঃ তিনি ইউরোপ ও আমেরিকা ভ্রমণ করে "ব্রাহ্মণের ত্যাগ, দয়া ও সংযমের" প্রতীক হিসাবে দেখা দেন। পাশ্চাত্যের কর্মযোগ, আত্মবিশ্বাস, অধ্যবসায়, উদ্যম ও নিষ্ঠাকে গ্রহণ করার ডাক দেন তিনি সমস্ত ভারতবাসীকে। তার সঙ্গে প্রাচীন ভারতের আধ্যাত্মবাদ, মানবতাবাদকে যুক্ত করে নব ভারত গড়ার কথা বলেন। তিনি বলেন, গতিই হল জীবনের চিহ্ন।"

শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ আন্দোলনের ফলে ভারতীয় সমাজ সংস্কারের যে দিকগুলি আলোড়িত হয় তার মূল কয়েকটি হল নিম্নরূপ ঃ

- উনবিংশ শতকে পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত কিছু শিক্ষাভিমানী লোকের মধ্যে ধর্ম সম্পর্কে যে উন্নাসিকতা ছিল, অবিশ্বাস ছিল, তা দূর হয়।
- বিভিন্ন ধর্মমতের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব, বিভেদ ও সাম্প্রদায়িক চিন্তা দেখা দেয় তা সর্বধর্ম সমন্বয়ের আদর্শ প্রচারের মাধ্যমে লাঘব হয়।
- বেদান্তের উদার ব্যাখ্যার দ্বারা তিনি মানব সেবার যে আদর্শ প্রচার করেন, অনুষ্ঠান-সর্বস্ব হিন্দুধর্মে তা নতুন দিগন্তের উন্মোচন ঘটায়। স্বামী বিবেকানন্দ এই ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হয়ে জীবকে শিবজ্ঞানে সেবার কাজ করতে শুরু করেন।
- শ্রী রামকৃষ্ণ মূর্তিরূপা দেবী কালিকাকে মাতৃরূপে পূজা করে নারীকে আদ্যাশক্তির অঙ্গরূপে প্রচার করেন, এর ফলে নারী মুক্তির আন্দোলনের পথ প্রশস্ত হয়।

রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠা ও শ্রীরামকৃষ্ণের 'শিবজ্ঞানে জীব সেবার' কর্মযজ্ঞ ছিল সুদূর প্রসারী। শিক্ষা বিস্তার, চেতনা সঞ্চার, কারিগরি দক্ষতা বৃদ্ধি ও স্বনির্ভর কর্মকান্ডের মাধ্যমে ধীরে ধীরে সমাজ কল্যাণের বিভিন্ন দিকের উপর গুরুত্ব দেওয়া ও আত্ম-শক্তির প্রতিষ্ঠায় রামকৃষ্ণ মিশন ভারতবর্ষ তথা বিশ্বের এক অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে।

(চ) প্রার্থনা সমাজ

কেশব চন্দ্র সেনের প্রভাবে ১৮৬৭ খ্রীঃ বোম্বাই শহরে প্রার্থনা সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়। আত্মারাম পান্ডুরঙ্গ ছিলেন এর প্রতিষ্ঠাতা।

মহাদেব গোবিন্দ রানাডে ও পন্ডিত রামকৃষ্ণ ভান্ডারকর এই সমাজে যোগ দিলে প্রার্থনা সমাজ আন্দোলন বলবতী হয়। মূর্তিপূজোর বিরোধিতা, একেশ্বরবাদ প্রচার ও সমাজ সংস্কার যথা—অস্পৃশ্যতা ও জাতিভেদ প্রথার বিরোধিতা, বিধবা বিবাহ সমর্থনে আন্দোলন করা ও স্ত্রী শিক্ষার প্রসার ও প্রচার দ্বারা এই সমাজের গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়। মহারাষ্ট্রের একটি বিশাল জনগোষ্ঠী এই সমাজের আদর্শ ও ভাবধারায় আলোড়িত হন। কিন্তু নানা কারণে এই সমাজের কার্য্যকলাপ মহারাষ্ট্রের নির্দিষ্ট কিছু এলাকার বাইরে আশানুরূপ বিস্তৃত হয়নি।

২.২ ব্রিটিশ আমলে সমাজ কল্যাণ

ব্রিটিশদের আমলে সমাজ কল্যাণ কাজের ধারা অধ্যয়ন করতে গেলে ঐ সময়কালে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতি কিছুটা জেনে রাখা যেতে পারে। একথা অনস্বীকার্য যে, প্রাক্ ব্রিটিশ আমলে সমাজ কল্যাণের কাজের অগ্রগতি যে মাত্রায় বৃদ্ধি পেয়েছিল ব্রিটিশ আমলে তার গতি কিছুটা মন্থর হয়। অন্যান্য অনেক কারণের পাশাপাশি দেখা গেছে নিম্নলিখিত কারণগুলো সেজন্য অনেকটা প্রভাবশালী ছিল। যেমন—

প্রথমতঃ ব্রিটিশেরা ভারতবর্ষে বাণিজ্য করতেই এসেছিল। সেজন্য এ দেশের সাধারণের চাওয়া-পাওয়া তাদের কাছে কোন গুরুত্ব পায়নি। ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর শেয়ার হোল্ডারদের ভালোমন্দই তাদের কাছে অনেকটা গুরুত্বপূর্ণ ছিল।

দ্বিতীয়তঃ ইউরোপীয়ানদের উপর যে ধরনের আইন প্রয়োগ করা হয়েছিল, ভারতীয়দের উপর তা করা হয়নি। পুরোনো হিন্দু ও মুসলিম ব্যক্তিগত আইন কঠোরভাবে ভারতীয়দের উপর প্রয়োগ করা হয়েছিল। যার ফল হিসাবে, সমাজে নিত্য নতুন ভাবনা চিন্তার যে পরিবর্তন এসেছিল, তার প্রসার আশানুরূপ ঘটেনি।

তৃতীয়তঃ ক্রীশ্চীয়ান মিশনারীদের অক্লান্ত প্রচেষ্টা, উদ্যমের কাছে ব্রিটিশ শক্তি দানা বাঁধতে পারেনি। অর্থাৎ ভারতীয়দের প্রচলিত ধ্যান-ধারনা, কু-সংস্কার প্রভৃতি নিয়ে প্রতিবাদী মনোভাব ব্যক্ত করলেও মিশনারীদের মতো গঠন মূলক কাজের চিন্তাভাবনা খুব কমই ছিল।

১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন সারা দেশের সর্বস্তরের মানুষের প্রতিবাদ, সব মিলিয়ে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে ক্ষোভের পরিবেশ তৈরি হয়। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ, অশ্বিনীকুমার দত্ত প্রভৃতি 'আত্মশক্তি' প্রতিষ্ঠার আহ্বান জানান। মহারাষ্ট্রে গোপাল কৃষ্ণ গোখলের নেতৃত্বে Servants of Indian Society প্রতিষ্ঠিত হল। শুরু হল অর্থনৈতিক, সামাজিক ও শিক্ষাবিস্তার মূলক কর্মযজ্ঞ। কবি ও অন্যান্য চিন্তাবিদদের উদ্যোগে শিক্ষিত ও নিরক্ষর দেশবাসীদের মধ্যে দূরত্ব কমানোর উদ্যোগ গ্রহণ করা হল। ১৯০৫ খ্রীঃ থেকেই জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপন, জাতীয় শিক্ষা পরিকল্পনা, কারিগরি শিক্ষার প্রসার প্রভৃতি কাজ উদ্যম সহকারে নেওয়া হল। বোলপুরে কবিগুরুর ব্রহ্মাচর্যাশ্রম বিদ্যালয় স্থাপিত হল। দেশীয় শিল্প স্থাপন, কুটির শিল্পের উন্নতির চেষ্টা করা হয়। আচার্য্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় ও ড. নীলরতন সরকার প্রভৃতির উদ্যোগে বিদেশী কলকারখানা, বাণিজ্য প্রতিষ্ঠা হয়।

এর পরবর্তী পর্যায়ে ১৯১৫ খ্রীঃ সমাজ কল্যাণের ইতিহাসে মহাত্মাগান্ধীর অবদান ছিল অনস্বীকার্য। গান্ধীজীর সঙ্গে সমকালীন নেতাদের ভাবনা-চিন্তা ও কর্মপদ্ধতির মৌলিক পার্থক্য লক্ষ্য করার মতো ছিল। রাজনৈতিক চর্চার পাশাপাশি গান্ধীজি দেশবাসীর সেবার কাজকে একযোগে সম্পাদন করতে উদ্যোগী হলেন। স্বদেশের অধঃপতিত হরিজন, দরিদ্র, কিষাণ, নিরক্ষর গ্রামবাসীদের উন্নয়ন ছিল তাঁর ধ্যানজ্ঞান। নিঃস্বার্থ দেশ সেবাই গান্ধীজীকে সকল শ্রেণীর নেতৃত্বের আসনে বসিয়ে দেয়। ফলে দক্ষিণ আফ্রিকায় ফিনিক্স উপনিবেশ, টলস্টয় খামার প্রভৃতি পরীক্ষার দ্বারা তিনি যে গ্রাম সেবামূলক কাজের অভিজ্ঞতা লাভ করেন, ভারতে এসে তিনি দ্বিগুন উদ্যমে সেইসব কাজ করে মানুষের উন্নয়ন ঘটানোর জন্য ঝাঁপিয়ে পড়েন। তাঁর স্বরাজ ও সত্যাগ্রহের একটি মূল অঙ্গ ছিল গ্রাম সংগঠন, আত্মশক্তির বিকাশ। এছাড়া যে দুটো বিষয়ের উপর গান্ধীজী জোর দিয়েছিলেন তা হল অস্পৃশ্যতা দূর ও নারীর মর্য্যাদা বৃদ্ধি। নারীর অবস্থার উন্নয়নের জন্য, তাদের সমান সুযোগ ও অধিকার দানের জন্য তিনি জোরদার আন্দোলন করেছিলেন। অপরদিকে হরিজনদের প্রতি ঘৃনা ও বৈষম্যমূলক আচরণেরও তীব্র বিরোধিতা করেন। তিনি সামগ্রিক অর্থে মানব-উন্নয়নের পবিত্র কর্তব্য পালন ও নতুন ভারত গড়ার জন্যই আজীবন ব্রতী হয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, "আমি চাই, আমার ঘরের চারিদিকে অবাধে সকল দেশের সংস্কৃতির হাওয়া বয়ে চলুক। কিন্তু আমি এই হাওয়ার বেগে আমার মূল শিকড় ছিঁড়ে উড়ে যেতে প্রস্তুত নই।" তিনি শীর্ণ শরীরে, সামান্য পোষাকে, সাধু সুলভ আচরণে ভারতীয় কৃষকদের প্রতিনিধি হিসাবে ডান্ডি পর্যন্ত যে অভিযান করেন, তা ভারতীয় কৃষক ও অসহায় গরীব-দুঃখীর কাছে বিশেষ অনুপ্রেরনার সঞ্চার করে। মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে পরবর্তীকালে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সভায় রাজনৈতিক চর্চার পাশাপাশি ভারতবর্ষের সামাজিক অবস্থার পর্যালোচনা ও সমাজকল্যাণমূলক কাজকর্মের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। ১৯২০ সালে সর্বভারতীয় ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা ও শ্রমিক কল্যাণের নানান দিক নিয়ে দাবি পেশ করা, সমাজ কল্যান কাজের অন্য আরেকটি দিকে সূচনা করল। বোম্বাইয়ের এই কংগ্রেস অধিবেশনে লালা লাজপৎ রায় সভাপতিত্ব করেন ও শ্রমিক স্বার্থে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে কর্মসূচী গৃহিত হয়। এরপর ১৯৪৩ খ্রীঃ কংগ্রেস সোস্যালিষ্ট ফোরাম নামে কংগ্রেসের সমাজবাদী সংগঠনের আত্মপ্রকাশ ঘটে। দেশকে ব্রিটিশ মুক্ত করার পাশাপাশি, শ্রমিক, কৃষকদের কল্যাণের জন্যও কাজ করাই ছিল এই সংগঠনের মুখ্য উদ্দেশ্য। শ্রী জয়প্রকাশ নারায়ন ছিলেন এই আন্দোলনের পুরোভাগে। ১৯৩৭ খ্রীঃ থেকে ১৯৪০ খ্রীঃ পর্যন্ত জাতীয় কংগ্রেস ও সমাজবাদী সংগঠনের উদ্যোগে যে ধরনের সমাজ কল্যাণমূলক কাজগুলো হয় তা হল—

(ক) শ্রমিকদের বেতন বৃদ্ধি, শ্রমিক ইউনিয়নের স্বীকৃতি ও নারী শ্রমিকদের জন্য মাতৃমঙ্গল কেন্দ্রের ব্যবস্থা।

(খ) গান্ধীজি প্রবর্তিত ওয়ার্ধা শিক্ষা পরিকল্পনাকে গুরুত্ব দেওয়াও ডঃ জাকির হোসেন মুসলিমদের জাতীয় শিক্ষার জন্য উর্দু পাঠ্যপুস্তক রচনা করেন।

(গ) মাদ্রাজে কৃষকদের বকেয়া ঋণ মকুব করা, উত্তরপ্রদেশ ও বোম্বাইয়ে কৃষি ঋণের উপর সুদের পরিমাণ হ্রাস করা হয়।

(ঘ) মাদক দ্রব্যের দোকানের লাইসেন্স প্রদানে কড়াকড়ি করা,

উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর মধ্যকাল পর্যন্ত ব্রিটিশ আমলে রাজনৈতিক কাজকর্মের গতির তুলনায় সামাজিক কাজকর্মের গতি আশানুরূপ না থাকলেও এই সময়ে ভারতবর্ষে সমাজ কল্যাণমূলক কাজের বিভিন্ন প্রচেষ্টার উদাহরণ দেখা যায়।

২.৩ স্বাধীনোত্তর কালে ভারতবর্ষে সমাজ কর্ম

ভারত স্বাধীন হওয়ার পর সমাজ কল্যাণের---মূল দায়িত্ব বর্তায় সরকারের উপর। ১৯৫১ খ্রীঃ থেকে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের উন্নয়ন প্রকল্পের পরিকল্পনা গ্রহণ ও তার বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেয় সরকার। ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাগে বিভক্ত অঞ্চল বা ব্লক গড়ে তোলা হয় এবং শুরু হয় সমষ্টি উন্নয়ন অঞ্চল বা কম্যুনিটি ডেভ্লপমেন্ট ব্লক (Community Development Block)। ১৯৫৩ খ্রীঃ আগষ্ট মাসে কেন্দ্রীয় সমাজ কল্যাণ পর্ষদ প্রতিষ্ঠিত হয়। সরকারী নানান উন্নয়নমূলক প্রকল্পগুলি সরকারী বিভাগ বা সংস্থা ছাড়াও বেসরকারী, স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানকে আর্থিক সহযোগিতার মাধ্যমে বাস্তবায়নের লক্ষ্যেই এই পর্ষদ স্থাপিত হয়। ভারত সরকারের শিক্ষা মন্ত্রকের অধীন একটি স্ব-শাসিত সংস্থা হিসাবে কেন্দ্রীয় সমাজ কল্যান পর্ষদের প্রতিষ্ঠা লাভ। এই সংস্থার রাজ্যস্তরে রাজ্য সমাজ কল্যাণ পরামর্শদাতা পর্ষদ (State Social Welfare Advisory Board)।

ব্রিটিশ আমলে দরিদ্র্য কৃষক, হরিজন, অসহায় নারী ও দুর্বল শ্রেণীর মানুষদের জন্য যে ধরনের কল্যাণমূলক উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল, স্বাধীনোত্তর ভারত সরকার তার উপর আরও বেশী গুরুত্ব আরোপ করে। দুর্গত মানুষদের জন্য অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থানের আয়োজনের জন্য গৃহীত হল নানা ধরনের কর্মসূচী। ভারতীয় সংবিধানের নির্দেশমূলক নীতির (Directive Principles) অবলম্বনে জাতি, ধর্ম, বর্ণ, সম্প্রদায়, লিঙ্গ ও শ্রেণী নির্বিশেষে সকলের জন্য সমান সুযোগ ও সুবিধার বিষয়টি মাথায় রেখেই সমাজ সেবা ও সমাজ উন্নয়নের প্রকল্পগুলি বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। অন্ধদের জন্য বিদ্যালয়, অনাথ ও গৃহহীনদের জন্য গৃহনির্মাণ, কিশোর অপরাধীর জন্য সংশোধনাগার, নিরক্ষরদের শিক্ষাদান, রুজিরোজগারহীনদের জন্য কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচী প্রভৃতি বিভিন্ন দিকের উপর গুরুত্ব আরোপ ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ে গৃহীত কর্মসূচি ধীরে ধীরে সমাজে কিছু লক্ষণীয় পরিবর্তন আনতে সচেষ্ট হয়। এই বহুমুখী উন্নয়ন কর্মসূচীকে নিম্নলিখিত কয়েকটি ভাগে আলোচনা করা যায়।

ক) **গৃহনির্মাণ ও উন্নয়ন ঃ** বাসস্থান বা গৃহ সব মানুষের একটি মৌলিক প্রয়োজনীয়তার মধ্যে পড়ে। গৃহহীনকে গৃহদান, বসবাসের যোগ্য বাসস্থান নির্মাণের জন্য, বাসস্থান ও বাসস্থান উন্নতকরণ প্রকল্প (Scheme for Housing and Shelter upgradation) এবং ইন্দিরা আবাস যোজনা এই দুটি প্রকল্পই ব্যাপকভাবে বাস্তবায়িত করা হয়।

খ) **শিক্ষা ঃ** নিরক্ষরতার হাত থেকে দেশকে মুক্ত করা এবং শিক্ষা বিস্তারের জন্য সরকারী উদ্যোগে স্কুল, কলেজ,

বিশ্ববিদ্যালয়, প্রথাবহির্ভুত শিক্ষা কেন্দ্র, বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্র প্রভৃতি নানান ধরনের পরিকাঠামোর মাধ্যমে শিক্ষা বিস্তারের উদ্যোগ নেওয়া হয়। এর ফলে ১৯৫১ খ্রীঃ ২.৩১ লক্ষ বিদ্যালয় ও কলেজ থেকে ১৯৯১ খ্রীঃ ৭.৮৯ লক্ষে পৌছায়। প্রাথমিক শিক্ষাকেন্দ্র ১৯৫১ খ্রীঃ তুলনায় শতকরা ১০০ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে ১৯৯১ খ্রীঃ এর মধ্যে। অপারেশন ব্ল্যাকবোর্ড (Operation Blackboard) অভিযানের মাধ্যমে সকলের জন্য প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হয়। ৮ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মধ্যবর্তী সময়ে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রীর ঘোষনা অনুসারে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীর উপস্থিতিকে আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য মধ্যাহ্ন আহার (Mid-Day-Meal) চালু করা হয়। যার ফলস্বরূপ ঐ সময়কালে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়তে আসা শিশুর সংখ্যা সর্বাধিক হয়। এছাড়াও মাধ্যমিক স্তরে ১৪.৮ লক্ষ ছাত্র ছাত্রীর সংখ্যা (১৯৫১) থেকে বেড়ে ১৯৯১ খ্রীঃ ১৬৮ লক্ষে পৌছায়। প্রত্যেক জেলায় নবোদয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়।

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ও উচ্চ শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধির উপরও গুরুত্ব আরোপ করা হয়। ১৯৫১ খ্রীঃ স্নাতোকোত্তর স্তরে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ১.৭৪ লক্ষ থেকে বেড়ে ১৯৯১ খ্রীঃ ৩৪.৪৭ লক্ষে পৌছায়। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার শুরুতে সাক্ষরতার হার ছিল ১৮ শতাংশ। ২০০১ খ্রীঃ তা হয়ে দাঁড়ায় ৬৫%। জাতীয় সাক্ষরতা মিশনের (National Literary Mission) উদ্যোগে সাক্ষরতার হার পরিবর্তনের ক্ষেত্রে সাফল্য এসেছে যথেষ্ট পরিমানে।

গ) **দারিদ্র্য দূরীকরণ ঃ** পরাধীনতার শেষের দিকে ভারতবর্ষের প্রায় ৬০% মানুষ দরিদ্র্যসীমার নিচে বসবাস করতো। ভারত স্বাধীন হওয়ার পর দারিদ্র্য সীমার নিচে বসবাসকারী মানুষের সংখ্যা কমিয়ে আনার জন্য নানান প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। যার ফলস্বরূপ সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার শেষের দিকে দারিদ্র্য সীমার নিচে বসবাসকারী মানুষের শতকরা হার কমে ৩৭% তে পৌছায়। অন্যান্য প্রকল্পের সাথে নিম্নলিখিত প্রকল্পগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঃ

- নেহরু রোজগার যোজনা (শহরাঞ্চলের জন্য)
- জওহর রোজগার যোজনা (গ্রামাঞ্চলের জন্য)
- কর্মসংস্থান নিশ্চয়তা প্রকল্প
- সুসংহত গ্রামোন্নয়ন প্রকল্প
- জাতীয় তফশিলী জাতি ও তফশিলী উপজাতি উন্নয়ন ও আর্থিক সংস্থা স্থাপন
- সম্পূর্ণ গ্রামীন রোজগার যোজনা
- স্বর্ণ জয়ন্তী গ্রাম স্বরোজগার যোজনা ও শহরী-স্বরোজগার যোজনা
- গ্রামীণ বেকার যুবকদের জন্য স্বনিযুক্তি প্রকল্প প্রভৃতি

ঘ) **স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও পরিবার পরিকল্পনা ঃ** জনস্বাস্থ্য ও চিকিৎসা বিজ্ঞানে স্বাধীনোত্তর ভারতবর্ষে একটি নতুন দিগন্তের সূচনা হয়। মানুষের গড় আয়ু ৩২ বছর (১৯৫১ খ্রীঃ) থেকে বেড়ে ৫৯.৮ বছরে পৌছায় (১৯৯১ খ্রীঃ)। অপর দিকে, মৃত্যুর হার কমে প্রতি হাজারে ২৭ থেকে কমে ৯.৭ তে নেমে আসে ঐ একই সময়কালে। শিশু মৃত্যুর হার প্রতি হাজারে ১৪৬ (১৯৫১) জন থেকে কমে (১৯৯১) ৭৯-এ পৌছায়। জনসংখ্যা নীতি প্রনয়ন ও পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ে ব্যাপক প্রচারের ফলে জন্মহার ৪০ থেকে (১৯৫০) কমে ৩০.২ এ পৌছায় ১৯৯১ খ্রীঃ। এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য প্রকল্পগুলির মধ্যে ছিল—

- সুসংহত শিশু বিকাশ প্রকল্প
- জাতীয় পরিবার পরিকল্পনা প্রকল্প
- মা ও শিশুর স্বাস্থ্য প্রকল্প
- জাতীয় জনসংখ্যা নীতি প্রণয়ন
- নিবিড় স্বাস্থ্য বিধান প্রকল্প।
- জাতীয় ডায়েরিয়া, ম্যালেরিয়া, যক্ষ্মা, গুটিবসন্ত, এড্‌স, কুষ্ঠ, প্রভৃতি রোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রন প্রকল্প।
- মাতৃত্ব সুবিধা প্রকল্প (Maturity Benefit Scheme)

উপরোক্ত প্রকল্পও নীতি প্রণয়নের ফলে স্বাধীন ভারতের মানুষের জীবনে বহু দূরারোগ্য রোগ প্রতিরোধ করা সম্ভব হয়েছে এবং অন্যদিকে সুস্বাস্থ্যের বাতাবরণ তৈরী করা সম্ভব হয়েছে।

ঙ) **সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্প ঃ** শ্রমিক কর্মচারীদের জন্য প্রভিডেন্ট ফান্ড ও অবসরকালীন পেনশন প্রদান—এই দুটি উল্লেখযোগ্য সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্প ভারত সরকার স্বাধীনতা লাভের প্রায় প্রাথমিক কাল থেকেই চালু করেছিলো। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা কাল থেকে অষ্টম পরিকল্পনার মাঝামাঝি সময়ের মধ্যে পারিবারিক পেনশান প্রকল্প ব্যাপক সাড়া জাগায়। প্রায় দু' কোটি মানুষ এই প্রকল্পের সুবিধাভোগ করার আওতায় আসেন। এছাড়া জাতীয় বার্ধক্য পেনশন, সামাজিক সহায়তা প্রকল্প প্রভৃতি দারিদ্র্য সীমার নীচে বসবাসকারী মানুষের জন্য বিশেষ ধরনের সুরক্ষা প্রদানের বিষয়ের কথা মাথায় রেখেই প্রণয়ন করা হয়। জাতীয় বীমা প্রকল্পের মাধ্যমে দুর্ঘটনা ও আকস্মিক মৃত্যুর জন্য আর্থিক নিরাপত্তার বিষয়টি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

কিছু প্রকল্পের এক ঝলক ঃ

উপরিউক্ত বিভিন্ন ধরনের উন্নয়ন ও নিরাপত্তার বিষয়গুলি ছাড়াও বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে ধরনের প্রকল্পগুলি নেওয়া হয়েছে তার একটি সংক্ষিপ্ত রূপরেখা নীচে দেওয়া হল—

(i) **কেন্দ্রীয় সমাজ কল্যাণ পর্ষদের কার্যাবলী ঃ**

- সাধারণভাবে আর্থিক-অনুদান দেওয়া।
- কল্যাণমূলক প্রকল্প সম্প্রসারণ ও ব্যাপক বিস্তৃতি।
- কনডেন্সড শিক্ষায় বয়স্কদের অংশগ্রহণ বাড়ানো।
- নৈশাবাস ও কর্মরত মহিলাদের হোস্টেল করা।
- শিশুদের জন্য 'হলিডে হোম'।
- মহিলা মন্ডল গঠন ও মহিলাদের ক্ষমতায়ন।
- পঞ্চায়েত, মিউনিসিপ্যালিটি প্রভৃতি ক্ষেত্রে মহিলাদের অংশগ্রহণ ও প্রতিনিধিত্ব।
- সীমান্ত এলাকায় কল্যাণমূলক কাজের সম্প্রসারন।
- সুসংহত প্রাক্ বিদ্যালয় শিক্ষা প্রকল্প রূপায়ন।
- বালওয়াদি প্রদর্শনমূলক কর্মসূচী।

- শিশু ও পরিবার পরিকল্পনা প্রকল্প।
- বালওয়াদি কেন্দ্রের মাধ্যমে পরিপূরক পুষ্টি প্রদান প্রকল্প।
- প্রাণী পালন ও কৃষিভিত্তিক স্বনিযুক্তি প্রকল্প।
- মহিলাদের জন্য বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ।
- অসুস্থ ও কর্মরত মায়েদের শিশুদের জন্য রক্ষণাগার চালু করা।
- জন-সমবায়-আন্দোলনের জন্য গ্রামীণ মহিলাদের প্রশিক্ষণ।
- মতামত—নেতৃত্বের (opinion leader) জন্য অনুপ্রেরণা শিবিরি, প্রভৃতি।

(ii) **শিশুদের উন্নয়ন ও পুষ্টি**

- শিশুদের জন্য পুষ্টি নীতি (১৯৭৪)
- শিশুদের জন্য জাতীয় তহবিল (১৯৭৯)
- সুসংহত শিশু বিকাশ প্রকল্প
- পথ শিশু ও দুর্গত শিশুদের কল্যাণ ও নিরাপদ সুরক্ষা
- বিশ্ব খাদ্য প্রকল্প
- CARE ও UNICEF সহায়ক প্রকল্প

(iii) **মহিলা উন্নয়ন ও কল্যাণ**

- বয়স্ক মহিলাদের কাজ চলার মত শিক্ষাদান
- কর্মরত মহিলাদের জন্য হোস্টেল
- বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র
- রোজগার মূলক কাজের সহায়ক আর্থিক প্রকল্প
- আইনানুগ নিরাপত্তা ও সুবিধাদান
- সমান মজুরী ও গর্ভবতী/প্রসূতি কালীন সুবিধা আইন

(iv) **শারীরিক প্রতিবন্ধীদের কল্যাণ**

- বিশেষ শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তন
- চাকরী ও শিক্ষার সুযোগের জন্য সংরক্ষণ ব্যবস্থা
- ভ্রমণ কালীন সুযোগ সুবিধা দান প্রভৃতি

(v) **তপশিলী উপজাতি কল্যাণ**

- পঞ্চায়েত ও বিধানসভায় আসন সংরক্ষণ, শহরে মিউনিসিপ্যালিটি ও স্থানীয় স্ব-শাসিত সরকারের জন্য আসন সংরক্ষণ।
- কর্মক্ষেত্রে সমান সুযোগ সুবিধা ও চাকরীর জন্য সংরক্ষণ
- উপজাতিদের নিজস্ব প্রশাসনিক ব্যবস্থায় বিশেষ সুবিধা
- তপশিলী জাতি ও উপজাতিদের জন্য কমিশন গঠন
- কল্যাণমূলক বিভাগ প্রবর্তন
- কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ ও শিক্ষালাভের জন্য বয়সের ও অন্যান্য যোগ্যতাবলীর শিথিলতা ও বৃত্তি প্রদান
- গবেষনা ও সামাজিক নিরাপত্তার জন্য বিশেষ ধরনের সংস্থা প্রতিষ্ঠা

(vi) **যুব কল্যাণ**

- সমাজ সেবার ও শ্রম কল্যাণ শিবিরের প্রতিষ্ঠা
- যুব নেতৃত্ব বিকাশ প্রশিক্ষণ
- যুব কল্যাণ কমিটি গঠন
- যুব সংগঠন প্রতিষ্ঠা
- আন্তঃরাজ্য ও আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় যুব-উৎসব
- যুব আবাস, নির্মাণ
- শারীর শিক্ষা ও ব্যায়ামাগার প্রতিষ্ঠা
- খেলাধূলার প্রতিযোগিতা
- বিভিন্ন ধরনের পত্রিকা ও নিউজ বুলেটিন প্রকাশ
- U.G.C–কর্তৃক প্রদত্ত সুযোগ-সুবিধাদান

(vii) **বিভিন্ন মন্ত্রকের অধীন কল্যাণ মূলক উদ্যোগ**

- <u>গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রকের</u>
  - গ্রামীণ বেকার যুবকের জন্য স্বনিযুক্তির প্রশিক্ষন (Trysem)
  - গ্রামীণ শিশু ও নারী কল্যাণ (DWCRA)
  - উন্নত যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম গ্রামীণ কারিগরদের প্রদান (SITRA)
  - সুসংহত গ্রামোন্নয়ন প্রকল্প, (IRDP)
  - জ্বালানী ও কাঠ উৎপাদনের বিশেষ প্রকল্প

- ইন্দিরা আবাস যোজনা, (IAY)
- সম্পূর্ণ গ্রামীণ রোজগার যোজনা—১ ও ২ (SGRY-I & II)
- স্বর্ণজয়ন্তী গ্রামস্থ রোজগার যোজনা (SGSY)
- প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনা (PMGSY)

- **স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের**
  - পরিবার কল্যাণ ও স্বাস্থ্যের প্রশিক্ষণ
  - চিকিৎসা পরিষেবা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ
  - গ্রামাঞ্চলের জন্য বিশেষ স্বাস্থ্য প্রকল্প
  - গবেষণা, শিক্ষা ও চিকিৎসার জন্য বিশেষ আর্থিক সহায়তা প্রকল্প
  - অপারেশন ও জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য বিশেষ আসন প্রকল্প
- **শিল্প মন্ত্রকের অধীন**
  - উদ্যোগ পরিচালন প্রকল্প (EDP)
  - শিক্ষিত বেকারদের জন্য স্বনিযুক্তি প্রকল্প
  - সুসংহত ঋণদান প্রকল্প
- **মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রকের অধীন**
  - শিশু রক্ষণাগারের জন্য স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনকে অনুদান প্রকল্প
  - মহিলাদের স্বনিযুক্তির প্রশিক্ষণ কেন্দ্র
  - মেধাবী ছাত্রদের (গ্রামীণ) জন্য বৃত্তি প্রদান প্রভৃতি।
- **শ্রম কল্যাণ মন্ত্রকের অধীন**
  - অনুর্দ্ধ ১৪ বছরের শিশুদের কর্মক্ষেত্রে নিয়োগ নিষিদ্ধকরণ
  - ১৯৪৮ সালের কারখানা আইন অনুসারে পুরুষ ও মহিলাদের জন্য বিশেষ সুবিধাদান
  - ঠিকা আইন (১৯৭০) অনুসারে ঠিকা শ্রমিকদের বিশেষ সুবিধা দান
  - শ্রমিকদের জন্য বিভিন্ন ধরনের আইনগত সুযোগ সুবিধাদান প্রভৃতি
- **নগরোন্নয়ন মন্ত্রকের অধীন**
  - গৃহহীনদের জন্য আবাস-স্থান ও গৃহ নির্মাণের বিশেষ সুযোগ দান
  - শহরের বেকার যুবকদের জন্য স্বনিযুক্তির প্রকল্প (SESUY)
  - স্বর্নজয়ন্তী শহরী স্বরোজগার যোজনা রূপায়ন (STSY)
  - অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল শ্রেণীর জন্য গৃহ নির্মাণের সুবিধা

স্বাধীন ভারতের কল্যাণমূলক কাজকর্মের যে রূপরেখা উপরে বর্ণনা করা হল তা একটি বৃহদ বিষয়কে অতি সংক্ষিপ্ত আকারে তুলে ধরার উদ্যোগ মাত্র। প্রতিটি বিষয় বা কাজের জন্য আরও বিস্তারিতভাবে জানার জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রকের বিভিন্ন প্রকাশনা অনুশীলন করা যেতে পারে।

২.৪ সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

১। অধ্যাপক প্রভাতাংশু মাইতি, আধুনিক ভারত, শ্রীধর প্রকাশনী

২। Visva-Bharati, Gandhi Centenary Volume, 1869-1969

৩। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শিক্ষা ও সাধনা

৪। স্বামী লোকেশ্বরানন্দ, ভারত সংস্কৃতির রূপরেখা

৫। Publication Division, India—2003, Reference Annual, Ministry of Information and Broadcasting, Govt. of India.

২.৫ অনুশীলনী

১। ব্রিটিশ আমলের সমাজকর্ম সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোকপাত কর।

২। ব্রাহ্ম সমাজ প্রতিষ্ঠার পিছনে মূল উদ্দেশ্য কি ছিল?

৩। খ্রীষ্টিয় মিশনের সমাজ কল্যাণমূলক কাজের বিবরণ দাও।

৪। স্বাধীনোত্তর ভারতবর্ষে সমাজকর্মের রূপরেখা তুলে ধর।

একক ৩ ☐ যুক্তরাজ্য এবং আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে সমাজ কল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান এবং পেশাগত সমাজ কর্মের ইতিহাস

গঠন

৩.১ প্রস্তাবনা

৩.২ যুক্তরাজ্যে সমাজ কল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান ও পেশাগত সমাজ কর্মের ইতিহাস

৩.৩ আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে সমাজ কল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান ও পেশাগত সমাজ কর্মের ইতিহাস

৩.৪ বর্তমান প্রবনতা

৩.৫ গ্রন্থপঞ্জি

৩.৬ অনুশীলনী

৩.১ প্রস্তাবনা

সমাজ কল্যাণের প্রয়োজন যেমন পৃথিবীর সর্বপ্রান্তে অনুভূত হয়েছে তেমনি সেই পরিষেবা দানের জন্য নানা ধরনের ব্যবস্থাও গৃহীত হয়েছে প্রায় সব দেশে। যুক্তরাজ্য বা গ্রেট ব্রিটেন এবং আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র হলো সেই দুই দেশ যারা এক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে। নানা ধরনের বিধি প্রণয়নের মাধ্যমে এবং নানা পরিকাঠামোর সাহায্যে প্রয়োজনীয় সমাজ কল্যাণমূলক পরিষেবা দানের ব্যবস্থা করে। এক্ষেত্রে বর্তমানের ব্যাপক ব্যবস্থা এবং পেশা হিসাবে সমাজ কর্ম প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পিছনে এই সব প্রাথমিক উদ্যোগগুলি এক কার্যকরী ভূমিকা পালন করেছে। সেজন্য এই বিষয়টির আলোচনা অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক।

৩.২ যুক্তরাজ্যে সমাজ কল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান ও পেশাগত সমাজ কর্মের ইতিহাস

যুক্তরাজ্য (U.K.) ও আমেরিকা যুক্তরাজ্য (U.S.A) উভয় দেশকেই সমাজ কর্মের ভিত্তিভূমি হিসাবে বলা হয়ে থাকে। উভয় দেশের মধ্যেই সমাজ ব্যবস্থার উপর ভিত্তি করে মানুষের সংকট মোকাবিলা করার জন্য নিত্য নতুন পদ্ধতি ও রীতিনীতি আবিষ্কৃত হয়েছে। তাই এই দুই দেশের সমাজ কল্যাণমূলক কর্মপ্রচেষ্টার ইতিহাস জানাটা অত্যন্ত জরুরী।

বুথ এবং এডওয়ার্ড ডেনসন (Booth and Edward Dension) যুক্ত রাজ্যের দুই বিখ্যাত সাহিত্যিক তাদের 'লন্ডন বাসীর জীবন ও শ্রম' (Life and labour of the people of London) পুস্তকে গবেষনালব্ধ তথ্য দিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করেন যে স্বেচ্ছাসেবার উপাদান/অনুদান দিয়ে প্রকৃত দরিদ্র ও সমস্যাসঙ্কুল মানুষের সমস্যার মোকাবিলা করার কাজে যথেষ্ট ত্রুটি-বিচ্যুতি রয়েছে। শুধু তাই নয়, এই কাজের মধ্যে সমঝোতা (Settlement)-র আন্দোলন তৈরী হয়েছে। যার ফলে শিক্ষাদানের মাধ্যমে অনুপ্রেরনা ও সচেতনতা বৃদ্ধির কাজে সমস্যা সঙ্কুল মানুষকে আনা যাচ্ছে না। সামুয়েল বারনেট (Samuel Barnett) পূর্ব লন্ডনের টইন বি হলে (Toynbee Hall)-এ এই

সমঝোতা আন্দোলনের মাধ্যমে যাদের যথেষ্ট সম্পদ ও সামর্থ্য রয়েছে তাদের কাছ থেকে যাদের কিছুই নেই তাদের সেই সম্পদ ও সামর্থ্য বন্টনের উদ্যোগ শুরু করেন। এই কাজ করতে গিয়ে তিনি যে যে বিষয়ে শিক্ষা পেলেন তা হল—

- সামাজিক সংহতি ও ঐক্য স্থাপনের মাধ্যমে জনগনের মধ্যে শান্তি ও স্বাচ্ছন্দ্য ফিরিয়ে আনা যায়।
- সমাজের উচ্চ শ্রেণীর মানুষজনদের কাছ থেকে গরিব ও অসহায় মানুষ সম্পদ কেড়ে নেবে এ ধরনের যে ভয় ও ভীতি ছিল তা দূর হয়।
- উভয় শ্রেণী ধনীরা বা বিত্তবানেরা গরীব, অসহায় মানুষের কাছ থেকে যেমন কিছু শিক্ষা পেল অপরদিকে গরীব, অসহায় মানুষ বিত্তবানেদের কাছ থেকে কিছু শিখবার পথ প্রশস্ত হয়।
- সমঝোতা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি শিশুরা আচরণ ও ব্যবহার বিষয়ে শিক্ষালাভ করার সুযোগ পেল।
- সমাজ সংস্কার ও কল্যাণমূলক উদ্যোগের নিত্য নতুন পন্থা উদ্ভাবন কেবল শিক্ষিত ও বিত্তবানেরাই করলেন এমনটার বদলে বহু ক্ষেত্রে দেখা গেল অসহায়, সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষও সেই পন্থা ও রীতিনীতি উদ্ভাবনের কাজে সক্রিয় ভূমিকা পালন করল।

এই সমঝোতা আন্দোলনের (Settlement movement)-এর ফলে উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি যুক্তরাজ্যে শহরাঞ্চলে গরীব ও অসহায় মানুষের সংখ্যা বাড়তে থাকে। Jane Addams ও Samuel Burnett এইসব বহিরাগত গরিব ও অসহায় মানুষের দায়িত্ব ও কর্তব্যের শিক্ষা দান করার কাজে বিশেষ উদ্যোগী হন।

<u>সেবামূলক সমিতি গঠন (Charity Organisation Society) :</u>

আমেরিকা যুক্তরাজ্যে বসবাসকারী ইংল্যান্ডবাসী ও যুক্তরাজ্যে বসবাসকারী আমেরিকা বাসীর মধ্যে উভয় দেশের নানা বিষয়ে ভাবের আদান-প্রদান, সমাজ কল্যাণ কাজের অনেক বিষয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও গবেষণায় প্রত্যক্ষ প্রভাব ফেলেছিল। বাফেলো (Buffalo) প্রথম ইংল্যান্ডের জনরোষ ও অশান্ত পরিবেশকে শান্ত করতে Charity Organisation Society প্রতিষ্ঠা করেন। উনবিংশ শতকের শেষার্ধে ও বিংশ শতকের প্রাথমিক কয়েক দশক দয়া/সেবা দানকারী বাহিনী মাথা চাড়া দেয়। Jane Addams-এর মতে তৎকালীন ধনতান্ত্রিক প্রথা দেশের গরীব বা অসহায় মানুষের তুলনায় ধনী বা বিত্তবানদের মধ্যে সাম্য প্রতিষ্ঠার কাজে উদ্যোগী হওয়ার ফলে ব্যক্তিকেন্দ্রিক সমস্যা মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। এমনকি প্রথম বিশ্ব যুদ্ধের পরে সমাজ কর্মের কাজে যুক্ত লোকজনদের প্রয়োজন ও গুরুত্ব বাড়তে থাকে। শুরু হয় ব্যক্তিকেন্দ্রিক সমাজ কর্ম চর্চার এক নবতম অধ্যায়। যাকে আজ কাল Case work হিসাবে অভিহিত করা হয়। মেরী রিচমন্ড (Marry Richmond) এই কাজে যুক্ত ওয়ার্কারদের জন্য প্রশিক্ষণ, শিক্ষাদানের পাশাপাশি কিছু পারিশ্রমিক দেওয়ার কাজে বিশেষ অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেন।

মেরী রিচমন্ড যখন Charity Organisation Society-র কাজে নিযুক্ত তখন সেই কাজের পাশাপাশি জনগনের কাছে তাঁর বার্তা ছিল ব্যক্তিকেন্দ্রিক সমাজ কল্যাণ (case work) এর সঙ্গে সমাজ সংস্কারকে যুক্ত করা। তিনি পরবর্তীকালে, (১৯১৭ খ্রীঃ), Social Diagnosis নামে একটি বই প্রকাশ করে সমাজ কর্মের উপর তাঁর গভীর ভাবনা চিন্তার প্রতিফলন ঘটালেন। সমাজ কর্মীর কাজ তাঁর নির্দেশিত পথ ও পন্থা অবলম্বন করে বহু বছর ধরে চলতে থাকলো। দীর্ঘদিনের অনুধাবন থেকে তিনি সমাজ কর্মের System Development-এর উপর গুরুত্ব দেন। এভাবে ইংল্যান্ডের সমাজ কর্ম শিক্ষার প্রাথমিক পর্ব থেকেই ব্যক্তিকেন্দ্রিক সমাজ কর্ম চর্চার সাথে গোষ্ঠী ভিত্তিক সমাজ কর্ম

চর্চার উপরও গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, সমঝোতা (Settlement), সমষ্টিভিত্তিক সংগঠন (Community Organisation), সেবামূলক সংগঠন সমিতি (Charity organisation Society), প্রশিক্ষণ এবং চালমার্স নির্দেশিকা (Chalmer's guidelines) মতে স্বেচ্ছাসেবীদের শিক্ষাদান প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

পরবর্তী পর্যায়ে **সিগ্‌মন্ড ফ্রয়েড (Sigmund Freud)** প্রথমে যুক্তরাজ্যে ও পরে ইংল্যান্ডে সমাজ কর্ম চর্চায় মানসিক স্বাস্থ্যের সংযোজন ঘটালেন। তিনি দেখিয়েছিলেন চিকিৎসালয়ে বা কোন চিকিৎসাকেন্দ্রে কেবলমাত্র শারীরিক অসুখ-বিসুখের চিকিৎসা দিয়ে মানুষকে সম্পূর্ণ সুস্থ করে তোলা যায় না। ব্যক্তিত্বের প্রবাহ (dynamism of personality) এবং মনের অবচেতন অবস্থা (unconsciousness) থেকেই মানসিক অসুখ দেখা দেয়। তিনি প্রমাণ করে দেখিয়েছেন যে, এই ধরনের অসুখের চিকিৎসা করা ও সম্পূর্ণ নিরাময় করা সম্ভব।

ফ্রয়েডের পরবর্তী স্তরে প্রতিষ্ঠানগত কাজের অভিজ্ঞতা থেকে 'A Mind that found itself, নামে গবেষণামূলক প্রবন্ধ লিখে Clifford Beer's মানসিক অসুখ ও ঐ বিষয়ে ভাবনাচিন্তার প্রয়োজনীয়তার নতুন দিক সংযোজন করেন। যার ফলস্বরূপ প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর পরিস্থিতি সমাজকর্ম চর্চায় নতুন ধরনের সমস্যাগ্রস্থ ব্যাক্তি ও গোষ্ঠীর সন্ধান পাওয়া যায়।

সমাজ কর্ম চর্চার অন্য আরেকটি দিকের সন্ধান পাওয়া যায় এই যুক্ত রাজ্যে (U.K.)। **Federal Emergency Relief Administration (FERA)** প্রতিষ্ঠা ও তহবিলের আয়োজন করা, যা কি না, সামন্ততান্ত্রিক (Federal) কর্মসূচি বলে অভিহিত হয়। এই তহবিলের বেশীর ভাগটাই সরকারী সংস্থা ও পেশাদার সমাজ কর্মীদের মাধ্যমেই ব্যবহৃত হয়। বিষন্নতার (depression) ফলে কাজ হারানো লোকের জন্যই মূলতঃ এই তহবিলের সদ্ব্যবহার করা হয়।

দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের পর সামাজিক নিরাপত্তার বিষয়টি আইনগত মর্য্যাদা পায়। Workmen's Compensation, old age Pension, বেকারদের জন্য নিশ্চয়তা বিমা ও বাধ্যতামূলক অসুস্থতার সুরক্ষা (compulsory sickness contributory) প্রভৃতি আরও বেশী গুরুত্ব সহকারে প্রচলন করা হয়।

এই সময়কালে সমাজ কর্ম চর্চায় যে বিভিন্ন দিকগুলো নিয়ে ভাবনা চিন্তা ও সংযোজনা হয় তা হল—

- সমষ্টি সংগঠন (Community Organisation)
- সমষ্টির উন্নয়ন (Community Development)
- সমষ্টিভিত্তিক পরিকল্পনা (Community Based Planning)

অর্থাৎ সমাজ কর্ম চর্চার পেশাগত দিকের প্রতিষ্ঠা হয় এই সময় থেকেই। এই পেশার তিনটি মূল পদ্ধতি চিহ্নিত হয়—(১) ব্যক্তিকেন্দ্রিক সমাজ কর্ম (Case work) (২) গোষ্ঠীকেন্দ্রিক সমাজ কর্ম (Group work) এবং (৩) সমষ্টি সংগঠন (Community organisation)। Council for Social Work Education নামে একটি পর্ষদ প্রতিষ্ঠিত হয়। যার কাজ ছিল পেশাগত সমাজ কর্মের জন্য কি ধরনের পঠন-পাঠন দরকার, সমাজ কর্মের সমস্ত বিষয় চর্চা করতে গেলে আর কি কি করা দরকার এবং সমাজ কর্ম চর্চার সম্ভাবনা খতিয়ে দেখা। এর ফলে এই পর্ষদ খুবই জনশ্রুত হয়। ওয়ার্নার বোম (Werner Boehm) তার শ্রেষ্ঠ অবদান Encyclopedia of Social Work-পুস্তকের মাধ্যমে সারা বিশ্বে সমাজ কর্ম চর্চার দ্বার উম্মোচন করেন। পরবর্তীকালে এই বিদ্যাচর্চার নতুন নতুন দিক সংযোজিত হয়েছে। জনগনের অংশগ্রহণ ও সহভাগী উন্নয়নের পরিকল্পনার মতো বিষয়ের সূচনা ও এই দেশ থেকে হয়েছিল ব'লে প্রকাশনায় উল্লেখ পাওয়া যায়।

৩.৩ আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে সমাজ কল্যানমূলক প্রতিষ্ঠান ও পেশাগত সমাজ কর্মের ইতিহাস

সমাজ কর্মের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রেই মূলতঃ এই পেশার চর্চা শুরু হয়। যদিও তখন পেশাগত দিকগুলি বিশেষভাবে খতিয়ে দেখা হয়েছে কিনা তা জানা যায় না। দেখা গেছে, এই দেশে সরকার ও বেসরকারী স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের সহাবস্থান শতাধিক বছর ধরে মানুষের নানাবিধ কল্যাণ সাধন করেছে। সরকারী উদ্যোগের নানান কর্মপ্রচেষ্টা গ্রহণ করার পাশাপাশি মানুষের সর্বাঙ্গীন কল্যাণ সাধনের জন্য এই দেশে নানা রকমের আইন প্রনীত হয়েছে। যার ফলস্বরূপ সরকারী প্রতিষ্ঠান বা বিভাগের সাথে বেসরকারী স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের কর্ম প্রচেষ্টা পরস্পরের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতার সৃষ্টি করেছে। এই কারণে জনগনের কল্যাণ ও সেবার কাজে উভয়ে সর্বতোভাবে সচেষ্ট হয়েছে।

প্রাথমিক স্তর বা পর্যায় ঃ

এই দেশে সমাজ কর্মের পেশাগত দিকগুলি প্রকট হতে শুরু করে কলোনী করণের (colonization) প্রাথমিক অবস্থা থেকে। সরকার নিজের ক্ষমতা ও সাধ্য দিয়ে অর্থনৈতিক অবস্থার সঙ্কট মোকাবিলা করতে সক্ষম না হয়ে বেসরকারী কল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানের কাজের উপর নির্ভরশীল হতে বাধ্য হয়। কলোনী জীবনে গড়ে ওঠা পরিবারগুলি নিজেদের হাজার রকমের সমস্যা মোকাবিলা করতে না পেরে সরকারী ত্রাণ ও সেবার দাবী করতে শুরু করে। কিন্তু সরকারী সামান্য আইনগত ব্যবস্থাপনায় উদ্ভুত সমস্যার মোকাবিলায় ব্যর্থ হয়। এমন কি ১৮১২ খ্রীষ্টাব্দের যুদ্ধ ও যুদ্ধোত্তর পরিস্থিতিতে (১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দ) জনজীবনে বিষাদের ছায়া নেমে আসায় এক ভয়াবহ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। ভিক্ষাদান ভবন (Alms house) ও সামান্য আইনি পরিকাঠামোর মাধ্যমে অসংখ্য মানুষের ত্রাণ ও সেবার দাবি মেটানো সম্ভব ছিল না। সরকারী সহায়তার সীমাবদ্ধতা যখন সমস্যাকে আরও জটিল অবস্থায় পরিণত করেছে তখন দিশেহারা মানুষের ঢল নামলো স্বেচ্ছাসেবী কল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানের উপর। দান, সেবা ও কল্যাণের ব্রত নিয়ে গজিয়ে ওঠা হাজার খানেক কল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান সংঘবদ্ধভাবে এই সব অসহায় মহিলা, শিশু, বৃদ্ধ/বৃদ্ধা, বিকলাঙ্গ ও প্রতিবন্ধী মানুষের জন্য গঠনমূলক কাজে অবতীর্ণ হল। যার মধ্যে ছিল—

- শারীরিক প্রতিবন্ধী, খোঁড়া, মুক ও বধির ও মানসিক ভারসাম্যহীনদের জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও বিশেষ ব্যবস্থায় শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা।
- গৃহহীন ও অনাথ শিশুদের জন্য আশ্রয় ও বাসস্থানের পাশাপাশি তাদের জন্য শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সুরক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
- সকলের জন্য সংস্কারমূলক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গঠন করা।
- অবিবাহিত মায়েদের জন্য আশ্রয়/বাসস্থানের ব্যবস্থা করা,
- মৎস্যজীবি ও সমুদ্রের সম্পদ আহরণ করে জীবিকা নির্বাহকারীদের জন্য মিশন গড়ে তোলা
- যুবকদের জন্য সংগঠন ও বিনোদনের ব্যবস্থা করা প্রভৃতি বহুমুখী কর্ম প্রচেষ্টা গৃহিত হয়। সরকারী উদ্যোগের সঙ্গে বেসরকারী সেবা/কল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সু-সম্পর্ক আরও দীর্ঘায়িত হয়। এর কারণ মূলতঃ দুটো। প্রথমতঃ সরকারী অনুদান ব্যবস্থা এবং দ্বিতীয়তঃ সেবা মূলক প্রতিষ্ঠান গঠন (Charitable Organisation Society)।

দুটো কারণই খুব সংক্ষেপে নিম্নলিখিত উপায়ে বর্ণনা করা যেতে পারে ঃ

সরকারী অনুদান ব্যবস্থা (Subsidy System) ঃ

বিশেষ কোন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সরকারী অর্থ প্রদানকেই এই আলোচনায় অনুদান হিসাবে চিহ্নিত করা যায়। যার কোন ফেরৎ হয় না। আমেরিকার মতো দেশে ক্রমাগত জনসংখ্যা বৃদ্ধি, বাইরে থেকে আসা মানুষের চাপ ও দ্রুতহারে নগরায়নের (urbanisation) ফলে স্থানীয় সরকারের (Local Government) পক্ষে এই বিশাল জনগোষ্ঠীর সামগ্রিক অভাব মেটানো দুঃসাধ্য হয়ে দাঁড়ায়। ক্রমাগত বাড়তে থাকা খোঁড়া, বিকলাঙ্গ, মূক ও বধির এবং মানসিক ভারসাম্যহীন মানুষের জন্য ভিক্ষা দান ভবনের (Alm houses) আশা ছেড়ে স্বেচ্ছাসেবী কল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানের শরনাপন্ন হতে হয়। দেশের সরকার তার কল্যাণমূলক তহবিল থেকেই এইসব সেবামূলক প্রতিষ্ঠানকে অনুদান দিত, যাতে তা সমস্যাসঙ্কুল মানুষের কাছে পৌঁছায়। ফলে এইসব প্রতিষ্ঠানগুলিতে অনুদানের আশা বাড়তে থাকে। সরকার থেকে অনুদানের জন্য অর্থ প্রদান করা একটি চিরাচরিত রীতিতে পরিণত হয়। ফলে সরকারের সাথে তাদের সম্পর্ক আরও সুদৃঢ় হয়।

সেবামূলক সমিতি গঠন (Charitable Organisation Society) ঃ

সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগে কল্যাণমূলক ত্রাণ ও সেবার অপ্রতুলতা করার জন্য এবং ১৮৭৩ খ্রীঃ অর্থনৈতিক বিষন্নতা কাটিয়ে প্রকৃত গরীব মানুষের সেবার জন্য S. Humphrey Gurteen (এস. হাম্‌ফ্রি গারটিন্‌) এই সমিতি গড়ে তোলেন। ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে আরও ২৫টি সমিতি গড়ে ওঠে যা কেবল গরীব মানুষের সেবার কাজ না করে তাদের স্বনির্ভরতার পথে উদ্যোগী হয়। এই সমিতির কর্মী থাকাকালীন Marry Richmond (মেরী রিচমন্ড) ১৮৯৭ খ্রীঃ দয়াবান কাজের ব্যবহারিক শিক্ষাদানের স্কুল প্রতিষ্ঠার (establishment of training school for applied philanthropy in new york) পরিকল্পনা তৈরী করেন।

পরবর্তীকালে বিশ্বযুদ্ধের প্রভাবও মানুষের মনে বিষাদের অবসান ঘটানোর জন্য দেশের সরকার নানান উদ্যোগ গ্রহণ করে। ১৯৩৫ খ্রীঃ Social Security Act (সামাজিক নিরাপত্তা আইন) প্রণয়ন করা হয়। ১৯৩৮ খ্রীঃ National Foundation For Infantile Paralysis প্রতিষ্ঠা করেন তৎকালীন প্রেসিডেন্ট F. D. Roosvelt (এফ. ডি. রুশভেল্ট)। স্বাস্থ্যের জগতে এই Foundation-এর কর্মধারা বিশেষ প্রভাব ফেলেছিল।

৩.৪ বর্তমান প্রবনতা

যুদ্ধোত্তরকালে এই দেশে সরকারী ব্যয়ের একটি বিশাল অঙ্ক সমাজ কল্যাণের জন্য বরাদ্দ করা হয় এবং কল্যাণমূলক রাষ্ট্র হিসাবে এই দেশকে চিহ্নিত করা হয়, যার প্রভাব প্রত্যক্ষভাবেই দেশের স্বেচ্ছাসেবী কল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানের উপর পড়ে। এর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা নিচে করা হল—

- অকল্পনীয়ভাবে সরকারী বিভাগ/প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বৃদ্ধি ও বাজার চাহিদার একটি বড় অংশ মেটানোর ফলে স্বেচ্ছাসেবী কল্যাণমূলক সংস্থার সংখ্যা ধীরে ধীরে কমতে থাকে।
- এর ফলে স্বেচ্ছাসেবী কল্যাণমূলক সংস্থাগুলোতে আর্থিক অনুদান পাওয়ার ধারা কমতে থাকে। পরবর্তীকালে এই সব সংস্থা নিজেদের অর্থ সংগ্রহের জন্য অন্য দেশে যাওয়ার কথা ভাবলো।
- ১৯৬০ খ্রীঃ সরকারী অর্থ ব্যয়ের জন্য স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের উপর কঠোর নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করার ফলে সরকারী বিভাগ/প্রতিষ্ঠানের সাথে এই সব প্রতিষ্ঠানের সম্পর্কে পরিবর্তন ঘটতে শুরু করে। এছাড়া ১৯৭৪ খ্রীঃ

সামাজিক নিরাপত্তা সংশোধনী আইনে (Social Security Amendment Act) বেসরকারী প্রতিষ্ঠান থেকে সেবা কেনা বা আহ্বান করার উপর নিয়ন্ত্রণ জারী করা হয়।

- উদ্ভুত পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে নতুন ধরনের সমিতি যেমন—মিউচুয়াল এইড্ (Mutual Aid), consumer oriented association, ও Alternative Agencies প্রভৃতির উৎপত্তি হয়।
- স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের সরকারী তহবিল ব্যবহার করে জনগনের সেবা করার বা দায়িত্ব নিয়ে কাজ করার নীতির ক্ষেত্রে ব্যাপক রদবদল ঘটে।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে এটা সহজেই অনুমান করা যায় যে দিন যত বদলেছে সমাজ কল্যাণ কাজের ধরন ততই পরিবর্তিত হয়েছে। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের মতো দেশে সরকারী ও বেসরকারী সংস্থার সহাবস্থানের ফলে কল্যাণমূলক কাজের নিত্য নতুন নীতি প্রণয়নের ও পরিবর্তনের প্রয়োজন দেখা দেয়। ফলে সমাজ কল্যাণমূলক কাজের বিভিন্ন রকমের পদ্ধতি প্রকরণেরও সূত্রপাত ঘটে। যার সুদূর প্রসারী ফল সমাজ কর্ম চর্চার পথ প্রশস্ত করে।

৩.৫ গ্রন্থপঞ্জি

i) Introduction to Social Welfare and Social Work—Beulen Compton

ii) 'Education for Social Work' in Encyclopedia of Social Work-I—Werner Boehm.

iii) Henrietta Barnett, Canon Barnett—His life, work and Friends.

iv) Indian Social problems Vol-II—G. R. Madan

৩.৬ অনুশীলনী

১। স্যানুয়েল বার্নেট সম্পদ ও সামর্থ বন্টনের উদ্যোগ নিতে গিয়ে কি শিক্ষা পেয়েছিলেন?

২। Charity Organisation Society সম্পর্কে বিস্তারিত লেখ।

৩। কোন ধরনের মানুষের জন্য আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে কল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানগুলি পরিষেবা দানে উদ্যোগী হয়?

একক ৪ ❑ সমাজ কল্যাণের ক্ষেত্রে সরকার ও বেসরকারী সংগঠনের পরিবর্তিত ভূমিকা

গঠন

৪.১ স্বেচ্ছাসেবা সম্পর্কিত ধারনা

৪.২ স্বেচ্ছাসেবী কার্যাদির বৈশিষ্ট

৪.৩ ভারতবর্ষে স্বেচ্ছাসেবী কার্যকলাপের ঐতিহ্য

৪.৪ সমাজ কল্যাণে রাষ্ট্র এবং বেসরকারী সংগঠনগুলির পরিবর্তিত ভূমিকা

৪.৪.১ বৃদ্ধ ব্যক্তিদের কল্যাণের জন্য

৪.৪.২ শিশুদের কল্যাণের জন্য

৪.৫ অনুশীলনী

৪.১ স্বেচ্ছাসেবা সম্পর্কিত ধারণা

কিছু মানুষ কোন আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে আর্থ সামাজিক উন্নতির লক্ষ্যে কোন সমাজে যখন স্বাধীনভাবে এবং স্ব ইচ্ছায় স্বেচ্ছাশ্রম দান করে তখন তাকে স্বেচ্ছাসেবা বলা হয়। ওই সকল ব্যক্তি সাধারনতঃ দুর্বল শ্রেণীর কল্যাণ ও উন্নয়নে এবং সামাজিক ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করতে প্রবৃত্ত হয়। National Institute of Public Co-operation and Child Development নামক সর্বভারতীয় প্রতিষ্ঠানটি স্বেচ্ছাসেবায় নিযুক্ত সংগঠন সম্পর্কে বলেছে যে, "একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন হলো কয়েকজন ব্যক্তির নিজ আগ্রহে অথবা বাহ্যিক অনুপ্রেরণায় গঠিত গোষ্ঠী যারা সমাজ কল্যাণ সাধনে ব্রতী।"

৪.২ স্বেচ্ছাসেবী কার্যাদির বৈশিষ্ট্য

অবহেলিত, নিষ্পেষিত, নির্যাতন মানুষের জীবনে আর্থ-সামাজিক অবস্থানের পরিবর্তন, সামাজিক ন্যায়বিচার, এবং অন্যান্য সামাজিক উন্নয়নের উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে গোষ্ঠীবদ্ধ কিছু মানুষের উদ্যোগে শুরু হয় স্বেচ্ছাসেবী কার্যাদি।

এর বৈশিষ্ট্যগুলি হলো নিম্নরূপ ঃ-

(ক) এই কাজ সমস্যা কেন্দ্রিক

(খ) এই কাজ শুধুমাত্র সাময়িক সমস্যা সমাধানের জন্যই গ্রহণ করা হয় না, সমস্যার পুনরাবৃত্তি কে প্রতিহত করার জন্যও গ্রহণ করা হয়।

(গ) সমস্যাগুলির প্রকৃত রূপটিকে চিনতে শেখায়, গুরুত্বের বিচারে তাদের সাজিয়ে নিতে সাহায্য করে এবং তার থেকে বেরিয়ে আসার উপায়গুলি অনুসন্ধান করে।

(ঘ) একদল স্বাধীনচেতা মানুষের প্রচেষ্টা এই কার্যাবলীকে বাইরের সহায়তা ছাড়াই এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে। কোনপ্রকার বাহ্যিক নিয়ন্ত্রণ ছাড়াই স্বতপ্রবৃত্তভাবে স্বেচ্ছাসেবা মূলক কাজ পরিচালিত হয়।

প্রকৃতপক্ষে, স্বেচ্ছাসেবী কার্যকলাপের লক্ষ্য হলো কোনও সমস্যার একটা সময়োপযোগী সমাধানসূত্রের অনুসন্ধান যা ব্যক্তিমানুষ বা সমষ্টি মানুষের জীবনে সার্বিক উন্নতি নিয়ে আসবে।

৪.৩ ভারতবর্ষে স্বেচ্ছাসেবী কার্যকলাপের ঐতিহ্য

ভারতবর্ষে এক ঐতিহ্যবাহী স্বেচ্ছাসেবার ইতিহাস রয়েছে। সভ্যতার আদিকাল থেকেই স্বেচ্ছাশ্রম মানুষের কল্যাণ সাধনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে।

(ক) আগেকার দিনে সম্ভ্রান্ত ধনী ব্যক্তিগন তাদের আয়ের একাংশ সমাজের দরিদ্র মানুষদের জন্য দান করতেন। তাই স্বেচ্ছাসেবী কার্যকলাপ তখন ছিল অনুদান ভিত্তিক।

(খ) ব্রিটিশ শাসনকালে সমাজের অভিজাত ব্যক্তিবর্গ গরীব মানুষদের জন্য কল্যাণমুখী কিছু কাজ বিক্ষিপ্তভাবে করে থাকতেন স্থানীয় সংঘ বা ওই ধরনের সংস্থার মাধ্যমে।

(গ) গান্ধিজির আমলে স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলির নানা ধরনের গঠনাত্মক কাজের সঙ্গে জড়িত থাকত।

(ঘ) ১৯৫৪ সালের পর থেকেই কেন্দ্রীয় সমাজ কল্যাণ দপ্তর ও আরো কয়েকটি মন্ত্রকের অনুদানে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে বহু স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন মাথা চাড়া দেয়।

(ঙ) বর্তমান যুগে যুব উন্নয়ন মন্ত্রকের উদ্যোগে বিভিন্ন যুব-সংগঠন ও মহিলা মন্ডলের সৃষ্টি হয়। ফলে সমাজকল্যাণমুখী ক্রিয়াকলাপ আরো জোরদার হয়ে উঠেছে।

(চ) ইদানিং কালে Voluntary action পেশাদারীত্ব লাভ করেছে। এই কাজগুলি অনুদান ভিত্তিক কাজের জায়গা থেকে পেশাদারী মনোভাবের জায়গায় নিজেকে নিয়ে গিয়েছে।

৪.৪ সমাজ কল্যাণে রাষ্ট্র এবং বেসরকারী সংগঠনগুলির পরিবর্তিত ভূমিকা

স্বাধীন ভারতবর্ষে সরকার তার আর্থিক সামর্থের মধ্যে সমাজ কল্যাণমূলক কাজে বিশেষ উদ্যোগ নেয়। সরকারী অনুদান পাওয়ার ফলে সমাজের সর্বস্তরের অবহেলিত, নির্যাতিত মানুষের পাশে এসে দাঁড়াতে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে বহু স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন বিকাশ লাভ করে। সরকার পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাতেও সমাজ কল্যাণের বিষয়টিকে যথেষ্ট গুরুত্ব দেয়। সেই পরিকল্পনাকে বাস্তবায়নের দায়িত্ব নেয় বিভিন্ন বেসরকারী সংস্থা যারা উন্নয়নের কল্যাণ হস্ত দরিদ্রের মধ্যে দরিদ্রতম মানুষটির কাছেও এগিয়ে দিতে চায়। তাদের দেখাতে চায় সমস্যা থেকে উত্তরনের নতুন পন্থা। স্বার্থকতার সঙ্গে সমাজকল্যাণমুখী কার্যাদির রূপায়ণের জন্য প্রয়োজন দেখা দেয় কিছু প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত দক্ষ সমাজকর্মীর। অতীতের স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলি তাদের ক্রিয়াকলাপকে আরো পেশাদারী হয়ে উঠতে আগ্রহী হয়ে ওঠে। তাই একদিন যে কাজ ছিল মুষ্টিমেয় মানুষের হৃদয়জাত, দায়বদ্ধতাহীন, অনুদানভিত্তিক পরোপকার মাত্র, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সমাজকর্মী নিয়োগের মাধ্যমে তা-ই হয়ে ওঠে সমাজের কাছে দায়বদ্ধতা এবং তার পরিধিও প্রসার লাভ করে।

সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের সমস্যার প্রকৃতরূপটিকে বিশ্লেষণ করে তা থেকে বের করে আনার উপায় অনুসন্ধানের দায়িত্ব গ্রহণ করে এই সব সংগঠন। স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের ধারণাকে পিছনে ফেলে বেসরকারী সমাজ কল্যাণ সংস্থার (NGO)-এর ধারনার ক্রমবিকাশ ঃ-

স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন অপেক্ষা বেসরকারী সংগঠন (NGO) এর ধারণাটি যথেষ্ট আধুনিক। স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন হলো কোনও ব্যক্তিগত বা স্থানীয় মানুষের স্বতস্ফূর্ত উদ্যোগে গড়ে ওঠা সংগঠন। সাধারণতঃ স্থানীয় মানুষই এর ব্যয়ভার বহন করেন। প্রকৃতপক্ষে এগুলি জনগণের সংগঠন, জনগণের দ্বারা পরিচালিত সংগঠন এবং জনগণের জন্য কর্মরত সংগঠন। অনেকক্ষেত্রেই, তাই এরা সরকার বা বহিরাগত কোনও সাহায্যের প্রত্যাশা করে না। এই ধরনের স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের উদ্যোগ যথেষ্ট প্রশংসনীয় হলেও বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে, দায়বদ্ধতার অভাব, উপযুক্ত পরিকাঠামোর অনুপস্থিতি এবং সদস্যদের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্বের কারণে কিছুদুর অগ্রসর হবার পর এর গতি অনেকটা শ্লথ হয়ে পড়ে। সেদিক থেকে বিচার করলে বেসরকারী সংগঠনগুলি কিন্তু বেশ কয়েক পা এগিয়ে। এই ধরনের সংগঠনের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যগুলি নিম্নরূপ—

- বেসরকারী সংগঠন হলো Society's Registration Act, Trust Act অথবা Company's Act এর অধীনে নিবন্ধভুক্ত। (তাদের কাজের ধরন ও উদ্দেশ্য অনুসারে)।
- এই সংগঠনগুলি একটি সাধারণ দল (general body), কার্য নির্বাহী সভা, মূখ্য কার্যনির্বাহী সম্পাদক, বেতনপ্রাপ্ত কর্মচারী এক স্বেচ্ছাসেবী মানুষদের নিয়ে তৈরী হয়ে থাকে। সুদৃঢ় প্রশাসনিক পরিকাঠামো নিয়ে এই ধরনের প্রতিষ্ঠান বা সংস্থাগুলি স্থানীয় জেলা অথবা রাজ্যস্তরে বিভিন্ন জন কল্যাণ কর্মসূচীকে সার্থকভাবে রূপায়িত করে।
- বিভিন্ন সরকারী দফতর, সরকারী অনুদান ও আংশিকভাবে পরিষেবা গ্রহণকারী মানুষের আর্থিক সহযোগিতায় এই বেসরকারী সংস্থাগুলির পূর্ণবিকাশ সম্ভবপর হয়।

যেসব সমস্যার ক্ষেত্রে সরকার সরাসরি নিজেকে অন্তর্ভুক্ত করতে পারে না, সেক্ষেত্রে অনেক সময় এই সব বেসরকারী সংগঠনের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। এইসব সংগঠন স্থানীয় সম্পদকে কাজে লাগিয়ে মানুষের প্রয়োজন মেটানোয় সার্থক ভাবে কাজ করে। এছাড়া এরা জানে সামাজিক সমস্যাগুলিকে প্রতিহত করতে মানব-সম্পদকে কিভাবে কাজে লাগাতে হয়।

সমাজ কল্যাণমূলক কার্যাবলীর নির্ধারণের জন্য পরিকল্পনা থেকে তার রূপায়ন—এই সব কটি স্তরেই সরকার NGO গুলিকে অন্তর্ভুক্ত করে। এর কারণ স্থানীয় চাহিদা, সমস্যা ও পুঁজির সম্পর্কে এরাই সম্যক অভিজ্ঞতার অধিকারী। তাছাড়া NGO-গুলি সাধারণ মানুষের অনেক কাছের এক কঠোর নিয়মানুবর্তি আমলাতান্ত্রিক নিয়মের থেকে অনেকাংশেই মুক্ত। তাই বর্তমান কালে সরকারের সমাজ কল্যাণের উদ্দেশ্যকে সফলভাবে বাস্তবায়ন করতে বেসরকারী সংস্থাগুলিই হলো নির্ভরযোগ্য হাতিয়ার। তাই সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (১৯৮৫-৯০) তে স্বেচ্ছাসেবী ও বেসরকারী সংগঠনের হাতে এই গুরু দায়িত্বের সিংহভাগই অর্পণ করা হয়।

৪.৪.১ বৃদ্ধ ব্যক্তিদের জন্য সমাজকল্যাণের কর্মসূচী

বৃদ্ধ ব্যক্তিদের জন্য সাংবিধানিক ও আইনি অধিকার ঃ

ভারতীয় সংবিধানের ৪১ নং ধারায় সামাজিক নিরাপত্তার বিষয়ে রাষ্ট্রের কর্তব্যগুলিকে নির্দিষ্ট করা আছে। এই ধারায় বলা হয়েছে যে রাষ্ট্র তার অর্থনৈতিক সামর্থ অনুযায়ী বৃদ্ধ মানুষদের ব্যক্তিদের কর্ম, শিক্ষা, বেকারত্বের জন্য ভাতা প্রভৃতি প্রসঙ্গগুলি নিয়ে যথাসাধ্য কাজ করবে। অসমর্থ পিতামাতা তার সাবলিক স্বনির্ভর সন্তানদের থেকে

খরপোষের দাবি করতে পারে Cr. P.C এর ১২৫(১) (ঘ) (১৯৭৩) নং ধারা এবং হিন্দু দত্তক ও খোরপোষ (Hindu adoption & maintenance Act) আইন অনুসারে।

হিমাচল প্রদেশ ও মহারাষ্ট্র সরকার ১৯৯৭ সালে পিতামাতার জন্য খোরপোয আইন প্রণয়ন করেন। যেসব পিতামাতা তার সন্তানদের কাছ থেকে খোরপোষ লাভ থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন তাদের জন্য ব্যবস্থাটি সরলীকরণ করা হয়। অন্যদিকে সন্তানদের দিক থেকে এটা বাধ্যতামূলক করা হয় যাতে তারা তাদের বয়স্ক পিতামাতার প্রতি যথাসাধ্য যত্নবান হয়। এই আইনের উদ্দেশ্য হলো সমস্ত ব্যবস্থাপনার সরলীকরণ করা একজন Sub-divisional officer-এর তত্ত্বাবধানে যাতে সিদ্ধান্তগ্রহণ, ন্যায়বিচার, বয়স্ক মানুষদের অসুবিধাগুলির উপশম করায় অধিক বিলম্ব না হয়।

- বৃদ্ধ ব্যক্তিগণের জন্য জাতীয় কর্মপন্থা (National Policy on Older persons)

ভারত সরকার ১৯৯৯ সালের জানুয়ারী মাসে বৃদ্ধ ব্যক্তিদের জন্য জাতীয় কর্মপন্থার কথা ঘোষণা করেন। এই কর্মসূচী সরকারের অন্তর্বিভাগীয় এক সরকারী ও বেসরকারী সংগঠনগুলির মধ্যে যোগাযোগের জন্য নির্ভরযোগ্য কাঠামো হয়ে দাঁড়ায়। এই কর্মসূচী অর্থনৈতিক সহযোগিতা, স্বাস্থ্য পরিষেবা, পুষ্টি, বাসস্থান, শিক্ষা, তাদের জীবন ও সম্পত্তির নিরাপত্তা দানের মতো বিষয়গুলির ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপের প্রয়োজনীয়তা আবিষ্কার করেন। মানুষের প্রয়োজন সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে বেসরকারী সংগঠনগুলিকেই রাষ্ট্রীয় প্রচেষ্টার যোগ্য পরিপূরক হিসাবে প্রাধান্য দেওয়া হয়।

সামাজিক ন্যায়বিচার ও ক্ষমতায়ন মন্ত্রকের উদ্যোগে National Council of older persons (NCOP) ঃ কর্মকান্ড শুরু হয় নিম্নলিখিত উদ্দেশ্যগুলি নিয়ে।

১। সরকারকে বৃদ্ধ ব্যক্তিদের জন্য কর্মসূচী নির্ধারণের বিষয়ে পরামর্শ দান।

২। বিভিন্ন পরিকল্পনা রূপায়নের থেকে সংগৃহিত অভিজ্ঞতার থেকে সরকারকে প্রয়োজনীয় সংবাদাদি প্রদান। যাতে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা আরও সুসংহত ও বাস্তব হয়ে ওঠে।

৩। বয়স্ক ব্যক্তিদের আগ্রহকে যথা সম্ভব গুরুত্ব প্রদান। বয়স্ক মানুষদের ব্যক্তিগত জীবনের দুর্দশাগুলিকে প্রশমিত করাবার জন্য জাতীয় স্তরে কাজের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে ওঠা।

৪। বয়স্ক ব্যক্তিদের জন্য বিশেষ অধিকার সুবিধা বা ছাড় প্রদানের মাধ্যমে তাদের কাছে জীবনকে সহজতর, সাবলীল ও উপভোগ্য করে তোলা।

৫। বৃদ্ধ মানুষদের সমবেত সিদ্ধান্ত গ্রহণকে সরকারের কাছে পেশ করা।

৬। বার্ধক্যকে গঠনমুখী এক উপভোগ্য করে তোলা।

৭। দুই প্রজন্মের মানুষের মধ্যে দূরত্ব কমানোর জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া।

Old Age Social and Income Security (OASIS) :

ভারতবর্ষের কর্মরত মানুষের মাত্র ১১% বার্ধক্যকালীন আর্থিক নিরাপত্তার আওতায় পড়েন। অসংগঠিত ক্ষেত্রের ২৬.৮ কোটি মানুষ এই সুবিধা লাভ থেকে বঞ্চিত। তাই প্রায় ৮৯ শতাংশ মানুষের কাছে আজও বৃদ্ধাবস্থায় কোনও আর্থিক নিরাপত্তা পৌঁছয় না। তাই বৃদ্ধাবস্থায় এদের অনেককেই দারিদ্রের অন্ধকারে ডুবে যেতে হয়। তাই ২০০০ সালে OASIS এর মাধ্যমে অবসরপ্রাপ্ত মানুষদের জন্য আর্থিক নিরাপত্তা দানের নিশ্চয়তা দেওয়া হয়। তাই কর্মজীবনের একদম শুরুর দিকে তাদের IRA account খোলার দরকার। এখান থেকে তারা একটি IRA নম্বর দেওয়া হবে যা

তার সঙ্গে সারা জীবন থাকবে। কর্মজীবনে সে এইখানে তার অর্থ সঞ্চয় করবে। এক্ষেত্রে একবারে ১০০ টাকার কম বা বছরে ৬০০ টাকার কম অর্থ জমা করা যাবে না। প্রত্যেক মাসে টাকা সঞ্চয় করবার জন্য সঞ্চয়করণের ওপরে চাপ দেওয়া হবে না। সঞ্চিত পুঁজির ওপর ব্যক্তির অধিকার সর্বদা বজায় থাকবে। শুধু তাই-ই নয়, সেই অর্থ সে কিভাবে অবসরের পর পেতে চায় তার ওপরেও নিয়ন্ত্রণ থাকবে তার নিজেরই। অবসরের পর সেই ব্যক্তি মাসিক উত্তরবেতন (pension) পাবেন। ভারতবর্ষের লক্ষ কোটি মানুষের জন্য IRA তহবিল বিভিন্ন পোস্ট অফিসের মাধ্যমে কাজ করে চলেছে।

Integrated Programme for older persons :

বিভিন্ন বৃদ্ধাশ্রম, পরিবার পরামর্শদান কেন্দ্র, এবং ভ্রাম্যমান চিকিৎসা প্রদানের মতো কাজে আর্থিক অনুদান পৌঁছে দিয়ে IPOP বৃদ্ধ মানুষদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে।

পঞ্চায়েত, স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনকেও বিভিন্ন প্রণালীর মাধ্যমে বৃদ্ধাশ্রম এবং বৃদ্ধ-ব্যক্তিদের নির্ভরতা প্রদানের জন্য আর্থিক অনুদান দেওয়া হচ্ছে। লাইসেন্স প্রদান, দত্তকদের পরবর্তী পর্যায়ও আলোচনা বজায় রাখা, রিপোর্ট এবং নথিপত্র ঠিকভাবে পালনের মাধ্যমে CARA তার সমস্ত দায়িত্ব সাফল্যের সঙ্গে এগিয়ে নিয়ে চলেছে।

যেসব শিশু দত্তক পিতা মাতা পাওয়ার জন্য অপেক্ষা করছে তাদের ক্ষেত্রে প্রাতিষ্ঠানিক যত্নের পরিবর্তে পালক পরিবারের সান্নিধ্য অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ। রাজ্য সরকারের ব্যক্তিগত উদ্যোগে ভারতবর্ষের মধ্যে এবং ভারতের বাইরে অন্য দেশে শিশুদের দত্তক প্রদানের বিষয়টিকে সার্থকভাবে রূপায়ণ করার চেষ্টা চলছে।

অনেক স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনই এখন অন্তর্দেশীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে দত্তক প্রদানের বিষয়টি নিয়ে কাজ করে চলেছে। তবে তাদের সর্বাগ্রে নিজেদের নথিভুক্ত করতে হবে এবং CARA-র মাধ্যমে রাজ্য সরকারের অনুমোদন লাভ করতে হবে। নিম্নলিখিত শর্তগুলির ওপর ভিত্তি করে।

১। এই সব সংস্থাকে শিশুকল্যাণের কাজে কমপক্ষে ৫ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

২। Women and children institution (Licencing) act, 1956 এবং Orphange or Charitable institution (supervision and control) act, 1960-র অনুসারে এদের রাজ্য সরকারের সর্বোতভাবে অনুমোদন লাভ করতে হবে।

৩। শিশুদের নিরাপত্তা দেবার জন্য এই উপযুক্ত পরিকাঠামোর ব্যবস্থাও রাখতে হবে এই সংস্থাগুলিকে।

৪। দত্তক প্রদানের বিষয়টিকে দেখাশোনা করবার জন্য অন্তত একজন পেশাদার সমাজকর্মীকে নিযুক্ত করতে হবে।

J. J. (Care & Protection of children) Act, 2000 :

আইনী দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়া এবং যত্ন ও নিরাপত্তাবিহীন শিশুদের জন্য যত্ন, নিরাপত্তা, উন্নয়ন ও পুনর্বাসনের সমস্ত রকম বন্দোবস্ত করে দেওয়াই এই আইনের উদ্দেশ্য। এর জন্য শিশুর সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ ও তার সার্বিক মঙ্গলের প্রতি দৃষ্টি রাখা বাঞ্ছনীয়।

১৮ বছরের মধ্যে সব ছেলে মেয়েকে এই আইনের আওতাভুক্ত করা হয়। আইনী দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়া শিশু ও যত্ন আর নিরাপত্তার অভাবে জর্জরিত শিশুদের জন্য পৃথকভাবে ভাবনা চিন্তা করা শুরু হয়। এক্ষেত্রে আইনী দ্বন্দ্বে জড়িত শিশু বলতে বোঝায় তাদেরই যারা কোনও অপরাধমূলক কাজে জড়িয়ে পড়েছে। যত্ন ও নিরাপত্তাহীন শিশু বলতে গৃহহীন, ভরণপোষণের দায়িত্ব পালনে অক্ষম অভিভাবকদের শিশু, মানসিক ও শারিরীকভাবে সঙ্কট এর সম্মুখীন শিশু, মারণরোগ বা দুরারোগ্য ব্যাধি জর্জর শিশু যাদের ভরসা দানের মতো কেউ নেই, এবং অনাথ ও পরিত্যক্ত শিশু, ড্রাগের নেশায় ভিড়িয়ে দেওয়া শিশু, নির্যাতিত ও প্রবঞ্চিত শিশু, যৌনকাজে ব্যবহৃত অথবা অবৈধ

কাজে ব্যবহৃত শিশুদের বোঝানো হয়েছে। আইনী দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়া শিশুদের Juvenile board ও নিরাপত্তাহীন শিশুদের Child welfare Committee-র মাধ্যমে পরিষেবা প্রদান করা হচ্ছে।

J.J. Act এর সফল-রূপায়ণের স্বার্থে M.S.J.E রাজ্যসরকারকে সর্বোতভাবে সহায়তা করছে। অবহেলিত ও অপরাধমূলক কাজের সহিত যুক্ত শিশুদের জন্য পর্যবেক্ষণ হোম (observation home), জুভেনাইল হোম বিশেষ হোম ও প্রতিপালনের জন্য হোম (After care home)-এর ব্যবস্থাও করা হয়।

- মানবাধিকার উন্নয়ন মন্ত্রক এবং এর অধীনস্থ নারী ও শিশু উন্নয়ন দফতর-এর প্রয়াসে বালওয়ারী নিউট্রিশন প্রোগ্রাম (BNP) ও Early childhood education (ECE)-এর স্কীম দুটি সেইসব জায়গায় রূপায়িত হয় যেখানে ICDS পরিষেবা পৌঁছয়নি।

পথশিশুদের জন্য সুসংহত কর্মসূচী ঃ ৮টি শহরের পথশিশুদের ওপর একটি নিরীক্ষা করে দেখা যায় যে এদের অনেকেই চরম নিঃসঙ্গতা, অভাব, অবহেলা অপব্যবহার ও বঞ্চনার স্বীকার হচ্ছে। কিন্তু যে পরিস্থিতিগুলি এর জন্যে দায়ী তার উপর তাদের নিয়ন্ত্রণ নেই। তবু শহরাঞ্চলে এইসব গবেষণা বা নিরীক্ষা সংক্রান্ত কাজগুলি সুসংহত উপায়ে ফলপ্রসূ হবার সুযোগ পায় না। ১৯৯২-৯৩ সালে পথশিশুদের কল্যাণার্থে একটি স্কীম চালু হয় যার উদ্দেশ্য থাকে অপ্রতিষ্ঠানিক সাহায্যের মাধ্যমে সুসংহত শিশু সমষ্টি গঠন করা। এই স্কীমকে সংশোধন করে ১৯৯৮-৯৯ সালে পথশিশুদের জন্য একটি সুসংহত কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়। এর উদ্দেশ্য থাকে খাদ্য, বাসস্থান, স্বাস্থ্য পরিষেবা, পরিচ্ছন্নতা, পানীয় জল, শিক্ষা, বিনোদনমূলক সুবিধাগুলি পথশিশুদের দিকে বাড়িয়ে দেওয়া এবং তাদের অপব্যবহার ও প্রবঞ্চনার হাত থেকে রক্ষা করা।

যেসব স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন শিশুদের সার্বিক কল্যাণ ও উন্নয়নের জন্য কাজ করছে তাদের প্রকল্প রূপায়নের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের ৯০ শতাংশ দেওয়া হবে ভারত সরকারের তহবিল থেকে ১০ শতাংশ সেই সংস্থা বা সংগঠনকে নিজে জোগাড় করে নিতে হবে।

এই কর্মসূচীর লক্ষ্য থাকে গৃহহীন শিশুরা যারা পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন অপব্যবহার ও প্রবঞ্চনার সম্মুখীন পথশিশুরা এবং যৌনকর্মী ও ফুটপাথবাসী মানুষের সন্তানরা।

Child line : Child line হলো ২৪ ঘন্টার জন্য বিনামূল্যের জাতীয় টেলিফোন পরিষেবা। যেকোনও শিশু বা তার জন্য চিন্তিত প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি ১০৯৮ নম্বরে ডায়াল করতে পারেন এই বিশ্বাস নিয়ে যে তার জন্য সাহায্যদানে ইচ্ছুক মানুষটি মাত্র একটি ফোন কল দূরে আছে। ২০০০ সালের জুন মাসে Child line পরিষেবা ১৯টি শহরে চালু হয় এবং ২০০১ সালের মধ্যে এই পরিষেবা ৩০টি শহরে বিস্তার লাভ করে। ভারত সরকারের সামাজিক ন্যায় বিচার ও ক্ষমতায়ন মন্ত্রক (MSJE) এই প্রকল্পটির পৃষ্ঠপোষকতা করছে এবং Child line India foundation-কে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে যে একটা সংস্থা হিসাবে Child line পরিষেবাকে সারা ভারতবর্ষে প্রসারিত করবার জন্য।

NICP শিশুদের নিরাপত্তা বিধানে জাতীয় উদ্যোগ ঃ-

ভারত সরকারের সামাজিক ন্যায়বিচার ও ক্ষমতায়ন মন্ত্রক (MSJE) National Institute of social defence এবং Child line India foundation-এর মাধ্যমে শিশুদের নিরাপত্তা বিধানে জাতীয় উদ্যোগের (NISD) জন্য প্রচারকার্য শুরু করে। শিশুদের রক্ষা ও উন্নয়নের সাথে সম্বন্ধযুক্ত ধারা বা বিভিন্ন সংস্থার মধ্যে সহযোগীতার সম্পর্ক স্থাপন করা NICP-র প্রধান উদ্দেশ্য। এই সম্বন্ধযুক্ত ধারাগুলি হলো পুলিশ, স্বাস্থ্য পরিষেবা, শিক্ষা, যানবাহন, শ্রমিক বিভাগ গণমাধ্যম, টেলিযোগাযোগ বিভাগ, কর্পোরেট সেক্টর এবং Juvenile Justice system-এর প্রতিনিধিগণ। লক্ষ্যে পৌঁছানোর আশা নিয়ে NICP মানুষকে প্রশিক্ষণ দিচ্ছে। এরা কাজ করবে শিশুদের রক্ষা ও উন্নয়ন সম্বন্ধিয়

কাজের সহিত জড়িত সংগঠনের সঙ্গে। এদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি পেলে অচিরেই সমস্ত শিশু তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত হবে না।

CARA (Central Adoption Resource Agency) :

MSJE-র তত্ত্বাবধানে ১৯৯০ সালে এটি স্থাপিত হয় একটি স্বশাসিত প্রয়াস হিসাবে। দত্তকদান ও লালন-পালনের দায়িত্ব প্রদানের মাধ্যমে অনাথ এক দুঃস্থ শিশুদের পুনর্বাসন-এর ব্যবস্থা করাই CARA-র উদ্দেশ্য হয়। একজন ভারতীয় শিশুর দত্তক সংক্রান্ত নির্দেশাবলী এমন এক পরিকাঠামোয় গ্রন্থিত আছে যাতে জন্মদাতা ও পালক পিতা-মাতা উভয়েরই স্বার্থ ক্ষুণ্ন না হয়।

৪.৪.২ শিশুদের অবস্থার উন্নয়ন বিকাশে সামাজিক কাজের উদ্যোগ

শিশুদের জন্য জাতীয় কর্মসূচী ঃ ভারতীয় সংবিধানে শিশুদের চাহিদা এবং তাদের প্রতি আমাদের কর্তব্যগুলি নির্দিষ্ট করা হয়েছে। শিক্ষার জন্য যে জাতীয় কর্মসূচী সংসদ কর্তৃক গৃহীত হয়েছে তাতে কিছু সংকল্পের কথা রয়েছে। এগুলিই রাজ্য স্তরের কর্মসূচীতে প্রতিফলিত হয়েছে। এই কর্মসূচীতে যে লক্ষ্য স্থির করা হয়েছে তা সফল করতে জাতীয় সংস্থানকে দক্ষতা এবং বিচক্ষণতার সঙ্গে ব্যবহার করা বাঞ্ছনীয়। এইরকম মনোভাব নিয়েই ১৯৭৪ সালের আগস্ট মাসে ভারত সরকার শিশুদের জন্য জাতীয় কর্মসূচী গ্রহণ করে।

রাজ্যস্তরে শিশুদের জন্য গৃহীত কর্মসূচীতে শিশুর জন্মের আগে ও পরে তার শারীরিক, মানসিক এবং সামাজিক বিকাশের সময় বিভিন্ন কর্তব্যপালনের অঙ্গীকার করা হয়েছে। রাজ্যের হাতে দায়িত্ব আসায় এই কর্মসূচীর সফল রূপায়নের সম্ভাবনা বিস্তৃত হয়েছে। লক্ষ্য রাখা হয়েছে যাতে সব শিশুরা একটা নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যেই তাদের ভারসাম্যপূর্ণ বৃদ্ধির ও বিকাশের জন্য একটা অনুকূল পরিবেশ পায়। এই কর্মসূচীর লক্ষ্যগুলি নিম্নরূপ—

১। শিশুদের সুসংহত স্বাস্থ্য কর্মসূচীর আওতায় নিয়ে আসা।

২। শিশুদের খাদ্য সংক্রান্ত অভাব দূর করতে পরিপূরক পুষ্টির ব্যবস্থা করা।

৩। গর্ভবতী ও সদ্য প্রসবা দুগ্ধপ্রদায়ী জননীদের সুরক্ষা, পুষ্টি এবং শিক্ষার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা করা।

৪। ১৪ বছর বয়স পর্যন্ত সব শিশুর জন্য অবৈতনিক ও অপবিহার্য শিক্ষার ব্যবস্থা করা।

৫। প্রথাগত ঘিদ্যালয়ের শিক্ষা গ্রহণে অক্ষম শিশুদের জন্য তাদের প্রয়োজন অনুসারে অন্য ধরনের শিক্ষার সুবন্দোবস্ত করা।

৬। শারীর-শিক্ষা, ক্রীড়া প্রভৃতি বিনোদনমূলক সাংস্কৃতিক এবং বিজ্ঞানমনস্ক কর্মসূচীকে বিদ্যালয়, সমষ্টিগত ও প্রতিষ্ঠানিক প্রয়াসের দ্বারা এগিয়ে নিয়ে যাওয়া।

৭। শহর ও গ্রামের বিভিন্ন তফশিলী জাতি। উপজাতি বা অনগ্রসর সম্প্রদায়ভুক্ত শিশুদের জন্য সমান সুযোগ-সুবিধা এবং বিশেষ ধরনের সহায়তা প্রদান করা।

৮। অপরাধমূলক কাজের অভিযুক্ত শিশুরা বা যাদের ভিক্ষা করতে বাধ্য করা হয়েছে বা সে সব শিশুরা বিপর্যয়ের মুখে পড়েছে, তাদেরও সফল নাগরিক জীবনে ফিরিয়ে নিয়ে আসবার জন্যে শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হবে।

৯। শিশুদের অবহেলা, নিষ্ঠুরতা ও প্রবঞ্চনার হাত থেকে বাঁচানো।

১০। ১৪ বছরের নীচে কোনও শিশুকে কোনও বিপজ্জনক বা ঝুঁকিপূর্ণ কাজে যুক্ত করা যাবে না।

১১। শারীরিক এবং মানসিকভাবে অক্ষম শিশুদের চিকিৎসা, শিক্ষা, পুনর্বাসন এবং যত্নের জন্যেও বিশেষ সুযোগ দেওয়া।

শিক্ষার ক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়া রাজ্যগুলিতে ৩-৬ বছরের শিশুদের জন্য বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন ECE স্কীমের মাধ্যমে প্রাক্-বিদ্যালয় শিক্ষার ব্যবস্থা করছে। BNP স্কীম ৩-৫ বছরের শিশুদের পরিপূরক পুষ্টি দেওয়ার কাজটি করছে।

জাতীয় ক্রেস (chreche) তহবিল → বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের প্রয়াসে সারা দেশে ২৪৭০টি ক্রেস গড়ে উঠেছে। অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে পড়া কর্মরতা মহিলাদের শিশুরা এখানে থাকতে পারে। এইসব স্বল্পকালীন শিশু আবাস কেন্দ্রে শিশুদের জন্য দিবাকালীন সমস্ত পরিষেবা, পরিপূরক পুষ্টি, স্বাস্থ্য পরিষেবার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। এক্ষেত্রে অর্থনৈতিক ঘাটতি পূরণের উদ্দেশ্যেই জাতীয় ক্রেস তহবিল প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে ১৯৯৪ সালের মার্চ মাসে। শিশুদের অতিরিক্ত প্রয়োজন মেটানোর জন্য ১৯.৯০ কোটি টাকার আর্থিক তহবিল নিয়ে।

নারী ও শিশু কল্যাণকারী স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলির সমাজ কল্যাণে একটি ঐতিহ্যবাহী ভূমিকা রয়েছে। সরকারী কার্যকলাপের অধিকাংশই এই সকল সংগঠনগুলির মাধ্যমে পরিচালিত হয়। মহিলাদের স্বাস্থ্য, শিক্ষা, সচেতনতা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার দানে এই সব সংগঠনগুলির কার্যকলাপ কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখে।

বর্তমানে বহু বেসরকারী সংস্থা সামাজিক কল্যাণে, মানব সম্পদ উন্নয়ন তথা পুনর্বাসনের কাজ কৃতিত্বের সঙ্গে করে চলেছে। মানসিক ও শারীরিকভাবে প্রতিবন্ধী, নেশাগ্রস্থ মানুষ, যক্ষারোগী, যৌন ব্যবসায়ী, পথ শিশু, অসহায় ও পরিত্যক্ত শিশু এবং অর্থনৈতিক ও সামাজিকভাবে পিছিয়ে পড়া শ্রেণীর পুনর্বাসন, কল্যাণ, ন্যায়বিচার ও অধিকার দানে ও তাঁদের সামাজিক অবস্থান সুনিশ্চিত করতে, বর্তমানের কিছু স্বেচ্ছাসেবী ও বেসরকারী সংস্থার কার্যকলাপ নবদিগন্তের দীক্ষা দিচ্ছে।

● গণতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ ও কল্যাণকারী রাষ্ট্র হিসাবে ভারতবর্ষের আপামর জনসাধারনকে উন্নয়ন কার্যকলাপে সক্রিয় অংশগ্রহণ করাতে, সরকারী সাহায্য ও প্রকল্পের সঠিক রূপায়নে ও পরিকল্পনা প্রণোয়নে, মানুষের অধিকার ও দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতনতা গড়ে তুলতে রাষ্ট্র ও বেসরকারী বা স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের যুগ্ম প্রয়াস আগামী দিনে ভারতবর্ষকে উন্নয়নশীল থেকে উন্নত ও উন্নততর দেশ হিসাবে গড়ে তোলার ইঙ্গিত দেয়। কারণ স্বেচ্ছাসেবী বা বেসরকারী সংগঠনগুলিই সরকারের একমাত্র বিশ্বস্ত অংশীদার যার মাধ্যমে সর্বস্তরের মানুষের কার্যকারী উন্নয়ন ও ন্যায়বিচারের প্রতিফলন ঘটানো সম্ভব। কারণ স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলিরই আছে পরিবর্তনশীল আর্থ-সামাজিক বাতাবরনে সাধারণ মানুষের কাছে পৌছানোর ঐশ্বরিক ক্ষমতা।

৪.৫ অনুশীলনী

১। স্বেচ্ছাসেবার অর্থ এবং বৈশিষ্ট্য কি?

২। ভারতবর্ষে স্বেচ্ছাসেবার ঐতিহ্য সম্পর্কে লেখ।

৩। সমাজ কল্যাণে রাষ্ট্রের পরিবর্তিত ভূমিকা কি?

৪। সমাজ কল্যাণে স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের পরিবর্তিত ভূমিকা সম্পর্কে উল্লেখ কর।

একক ৫ ❑ স্বামী বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সমাজভাবনা

গঠন

৫.১ স্বামী বিবেকানন্দের সমাজভাবনা

৫.২ রবীন্দ্রনাথের সমাজভাবনা

৫.৩ অনুশীলনী

৫.১ বিবেকানন্দের সমাজভাবনা

স্বামী বিবেকানন্দের সমাজভাবনা যে সময়ের, সেই সময়ের ইংরেজ-উপনিবেশ ভারতবর্ষের প্রধানতর সমস্যাগুলির মধ্যে তাঁর চোখে উল্লেখযোগ্য ছিল—শিক্ষাহীনতা, জাতবিচার, কুসংস্কার। তাই দেশের অবনতির কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি বলেছিলেন "আমার মনে হয়, দেশের ইতরসাধারণকে অবহেলা করাই আমাদের প্রবল জাতীয় পাপ এবং তাহাই আমাদের অবনতির অন্যতম কারণ" (বাণী ও রচনা, ৯ম খন্ড, পৃঃ ৪৭২)। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীতে, 'মানব' শব্দটি তৈরী হয়েছে মনু-র থেকে এবং 'মন' ধাতুর অর্থ মনন অর্থাৎ চিন্তন প্রক্রিয়া; চিন্তাহীনতা তৈরী হয় শিক্ষাহীনতা থেকে। আবার এই শিক্ষাহীনতা জন্ম দেয় কুসংস্কারের যা বিবেকানন্দের সময়ের ভারতবর্ষে প্রকট থাকলেও আজ যে সম্পূর্ণ বিলীন হয়ে গেছে একথা বলা যায় না।

বিবেকানন্দের ধারণায়, অপরজাতির সঙ্গে না মেশা জাতীয় অবনতির আর একটি কারণ ছিল। উদাহরণস্বরূপ, তিনি বলেছিলেন "পাশ্চাত্যের সহিত আমরা কখনই পরস্পরের ভাব তুলনায় আলোচনা করিবার সুযোগ পাই নাই। আমরা চিরকাল কূপমন্ডুক হইয়াই রহিয়াছি।" আসলে, বিবেকানন্দ-কথিত এই কূপমন্ডূকতার আচার বেশ পুরানো;—এর উদ্দেশ্য ছিল হিন্দুরা যেন চারপাশের বৌদ্ধদের সংস্পর্শে না আসে। এই আচারের ভিত্তি ছিল ঘৃণা। বিবেকানন্দ এই ভিত্তিমূলেই আঘাত হানতে চেয়েছিলেন।

জাতীয় অবনতির কারণ ব্যাখ্যার সময়, বিবেকানন্দ বলেছিলেন যে, ভারতবাসীর মধ্যে 'সমবেত প্রয়াস' অর্থাৎ একসাথে কাজ করার চেষ্টা (Organization) খুবই বিরল। তাঁর মতে, সংঘবদ্ধতার মূল শর্ত হলো আজ্ঞাবহতা (Obedience)।

বিবেকানন্দের যুক্তিতে, সেই সময়ের ভারতবর্ষের অবনমনের আর একটি প্রধান কারণ ছিলো নারীজাতিকে অবদমিত করে রাখা। প্রসঙ্গতর উল্লেখ্য, আজ, তাঁর মৃত্যুর একশো দুই বছর পরেও এই সমস্যাটি কম-বেশী তার আগের জায়গাতেই থেকে গেছে।

বিবেকানন্দের আশাবাদ স্পষ্ট হয় তাঁর ভারতের পুনঃরুত্থানের উপায়-ভাবনায় "এ সনাতন ধর্মের দেশ। এই দেশ পড়ে গেছে বটে, কিন্তু নিশ্চয়ই আবার উঠবে। এমন উঠবে যে, জগৎ দেখে অবাক হয়ে যাবে। দেখিসনি—নদী বা সমুদ্রে তরঙ্গ যত নামে তারপর সেটা তত জোরে ওঠে? এখানেও সেইরূপ হবে।" (বাণী ও রচনা, ৯ম খন্ড, পৃঃ ১৩৪)। এই উদ্দেশ্যেই তিনি চেয়েছিলেন সামাজিক পরিবর্তন—সমগ্র মানবজাতির যে নিজস্ব পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে উৎকর্ষ ও উন্নতি নিশ্চিত হবে। তিনি বিশ্বাস করতেন সমাজ বা জাতির সামগ্রিক উন্নতি সম্ভবপর হতে পারে পরিবর্তনের মাধ্যমেই এবং সেই পরিবর্তন মানুষের ভিতর থেকে উত্থিত হবে। পরিবর্তনের এই উত্থান, স্বামীজির

দৃষ্টিভঙ্গি, অনুযায়ী খুবই স্বাভাবিক কেননা তিনি মনে করতেন প্রতিটি মানুষের ভিতরই অসীম কর্মশক্তি প্রজন্ম রয়েছে এবং মানবজাতির উৎকর্ষতা ও উন্নতিকে নিশ্চিত করতে হলে এই অন্তর্নিহিত শক্তিকে চিনতে হবে। স্বামীজির ভাবনায়, অন্তর্নিহিত এই শক্তিকে চিনতে হলে যে যে আদর্শকে বাস্তবায়িত করতে হবে সেগুলো নিম্নরূপ ঃ-

শিক্ষা ঃ স্বামী বিবেকানন্দ মনে করতেন যে মানুষকে তার উৎকর্ষতা এবং উন্নতির দিকে সঠিকভাবে চালনা করে শিক্ষা। তবে 'শিক্ষা' শব্দটির আবহমান অর্থকে তিনি অস্বীকার করেছিলেন। তাঁর ভাবনায় "প্রকৃত শিক্ষার ধারণা কিন্তু এখনো আমাদের উদিত হয় নাই। ... আমি কখনো কোন কিছুর সংজ্ঞা নির্দেশ করি না। তথাপি এইভাবে বর্ণনা করা যাইতে পারে যে, শিক্ষা বলিতে কতিকগুলি শব্দ শিখা নহে; আমাদের বৃত্তিগুলির শক্তিসমূহের বিকাশকেই শিক্ষা বলা যাইতে পারে; অথবা বলা যাইতে পারে শিক্ষা বলিতে ব্যক্তিকে এমনভাবে গঠিত করা, যাহাতে তাহার ইচ্ছা সদ্বিষয়ে ধাবিত হয়, এবং সফল হয়।" (বাণী ও রচনা, ৯ম খন্ড পৃঃ ৪৮৫)। স্বামীজির ভাবনায় বিশ্ববিদ্যালয়-কেন্দ্রিক শিক্ষা এমন কিছু গুরুত্বপূর্ণ নয় কেননা সেই শিক্ষা কখনোই একজন মানুষকে 'মৌলিক ভাবসম্পন্ন' হিসেবে তৈরি করতে পারে না। যুগোপযোগী হয়ে ওঠা শিক্ষার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হওয়া উচিত; সেই সময়ের প্রেক্ষিতে তাই তিনি দাবি করেছিলেন 'এই চাই স্বাধীনভাবে স্বদেশী বিদ্যার সঙ্গে ইংরেজী আর বিজ্ঞান পড়ান, চাই technical education (কারিগরি বিদ্যা), আর যাহাতে industry (শিল্প) বাড়ে, লোকে চাকরি না করিয়া যাহাতে কিছু উপার্জন করিতে পারে।' বিবেকানন্দের চিন্তায়, এই পৃথিবীতে শিক্ষার মাধ্যমে আমরা যে জ্ঞান লাভ করি, তার সবটুকুই আমাদের ভিতরেই রয়েছে। কোন জ্ঞানই আমাদের বাইরে নেই। আমাদের মধ্যে থাকা এই জ্ঞানসমূহকেই বিবেকানন্দ চিহ্নিত করেছিলেন শক্তি হিসাবে "... আমাদের ভিতর শক্তি পূর্ব হইতেই অন্তর্নিহিত ছিল অব্যক্তভাবে কিন্তু উহা ছিল নিশ্চয়ই"। (জ্ঞানযোগ পৃ. ৪১৫-৪১৬)

শিক্ষাকে বিবেকানন্দ মনে করতেন আবিষ্কার করা (discovering) বা আবরণ উন্মোচন করা (unveiling)। শিক্ষার একমাত্র মাধ্যম, তাঁর মতে, হল একাগ্রতা। তাঁর একান্ত মনোযোগ ছিল যাতে শিক্ষাটি সংস্কারে পরিণত হয়ে ধমনীগত হয়। "যদি শিক্ষা বলিতে কতকগুলি বিষয় জানা মাত্র বুঝায়, তবে লাইব্রেরীগুলিই তো জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী, অভিধানসমূহই তো ঋষি।" (বাণী ও রচনা, ৫খন্ড, পৃ. ১৯৯-২০০)।

রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের বাংলা মাসিক মুখপত্র 'উদ্বোধন' এর মাধ্যমে তিনি সাধারণ মানুষকে সবসময় গঠনমূলক ভাব এবং ইতিবাচক ধারণা (Positive ideas) দিতে চেয়েছিলেন; তাঁর মতে, নেতিবাচক ভাব (Negative thoughts) মানুষকে নির্জীব করে তোলে।

বিবেকানন্দের ধারণায়, শিক্ষা মানুষকে সত্যের ধারণার দিকে এগিয়ে দেয়; তাকে অন্তরে বাহিরে শক্তিশালী করে তোলে। এই প্রসঙ্গেই নারী-শিক্ষার প্রসারে তাঁর অনন্ত উৎসাহ ছিল। নারীজাতিকে তিনি কখনোই উৎপাদন যন্ত্র (Manufacturing machine) হিসাবে দেখতেন না; তাঁর ধারণায় '... যাদের মা শিক্ষিতা ও নীতিপরায়ণা হন তাদের ঘরেই বড়মানুষ জন্মায়'। শিক্ষার মাধ্যমেই নারীজাতিকে অবদমনের হাত থেকে বাঁচানো যাবে এবং সমগ্র মানুষজাতিকে উন্নতির পথে এগিয়ে দেওয়া যাবে। 'মেয়েদের আগে তুলতে হবে, জনসাধারণকে (mass) জাগাতে হবে, তবে তো দেশের কল্যাণ—ভারতের কল্যাণ।' (বাণী ও রচনা, ৯ম খন্ড, পৃ. ৩৩-৩৪) তিনি মনে করতেন, শিক্ষার মাধ্যমে নারীজাতির সমস্ত গুরুতর সমস্যার সমাধান সম্ভব; তবে শিক্ষা যদি 'ধর্মহীন' হয় তাহলে সেই গলদপূর্ণ শিক্ষা ব্যবস্থা কখনোই স্ত্রী-শিক্ষার প্রসারের মহৎ উদ্দেশ্যকে সফল করতে পারবে না। বিবেকানন্দ চেয়েছিলেন, স্ত্রী শিক্ষার বিষয় হওয়া উচিত ধর্ম, শিল্প, বিজ্ঞান, ঘরকন্না, রন্ধন, সেলাই, শরীর-পালন।

শিক্ষার ক্ষেত্রে জাতিভেদের বাধাকে বিবেকানন্দ সর্বাগ্রে সরাতে চেয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন 'যদি প্রকৃতিতে বৈষম্য থাকে তথাপি সকলের পক্ষে সমান সুবিধা থাকা উচিত। কিন্তু যদি কাহাকেও অধিক, কাহাকেও কম সুবিধা

দিতেই হয়, তবে বলবান অপেক্ষা দুর্বলকে অধিক সুবিধা দিতে হইবে। অর্থাৎ চন্ডালের বিদ্যাশিক্ষা যত আবশ্যক, ব্রাহ্মণের তত নহে। যদি ব্রাহ্মণের ছেলের একজন শিক্ষকের আবশ্যক, চন্ডালের ছেলের দশজনের আবশ্যক। কারণ যাহাকে প্রকৃতি স্বাভাবিক ভাবে প্রখর করেন নাই, তাহাকে অধিক সাহায্য করিতে হইবে।... কেবল শিক্ষা, শিক্ষা শিক্ষা! বাহিরের শিক্ষা দ্বারা যদি হৃদয়স্বরূপ গ্রন্থ খুলিয়া যায়, তবেই তাহার কিছু মূল্য আছে—বলা যাইতে পারে।'

সমাজ ঃ বিবেকানন্দের ধারণায়, সমাজ-উন্নতির প্রথম এবং অতি আবশ্যক শর্ত হল স্বাধীনতা। স্বাধীনতা বলতে তিনি বুঝিয়েছিলেন চিন্তার স্বাধীনতা, বাক-স্বাধীনতা, খাদ্য গ্রহণের স্বাধীনতা, পোশাক-স্বাধীনতা, বিবাহের স্বাধীনতা এবং অন্যান্য সব বিষয়ের স্বাধীনতা। তবে তিনি সবসময় সেই স্বাধীনতার পক্ষপাতী ছিলেন যে স্বাধীনতা অন্যের অনিষ্ট করে না। সঠিক স্বাধীনতার ভিত্তি হিসাবে তিনি চিহ্নিত করেছিলেন শিক্ষাকে।

বিবেকানন্দের সময়ের ভারতবর্ষে প্রকট থাকা (যা এখনো রয়ে গেছে) জাতবিচারকে, তিনি, স্বাধীনতার অন্যতম প্রধান বাধা বলে মনে করতেন। সমাজ স্বাধীনতার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে তিনি বলেছিলেন "যতদিন না লোকে শিক্ষিত হয়ে নিজেদের অভাব বোঝে আর নিজেদের সমস্যা নিজেরাই সমাধান করতে প্রস্তুত ও সমর্থ হয়, ততদিন অপেক্ষা করতে হবে।" (বাণী ও রচনা, ৯ম খন্ড, পৃ. ৪৬৬)

সমাজ-স্বাধীনতায় ধর্মের ভূমিকা প্রসঙ্গে তিনি বলেছিলেন যে ভারতবর্ষে ধর্মচিন্তায় স্বাধীনতা আছে কিন্তু সমাজ-ব্যবহারে (Social behaviour) নেই আবার পাশ্চাত্য দেশে, বিশেষতঃ ইউরোপে, সামাজিক আচরণে স্বাধীনতা থাকলেও ধর্মাচরণে (Religious behaviour) কণামাত্র স্বাধীনতা নেই। এই কারণেই ভারতীয় আদর্শ অর্ন্তমুখী বা ধর্মমুখী যেখানে ইউরোপে বর্হিমুখী বা বৈজ্ঞানিক আদর্শ গড়ে উঠেছে। তাঁর মতে "গ্রীক মন—যা ইউরোপীয় জাতির বর্হিমুখ শক্তিতে প্রকাশ পাচ্ছে—তার সঙ্গে হিন্দু মন মিলিত হলে ভারতের পক্ষে আদর্শ সমাজ হবে"। (বাণী ও রচনা, ৯ম খন্ড, পৃ. ৪৬৯)।

আমরা জানি, প্রাচীন ভারতীয় সমাজে জীবিকানুয়ায়ী চারটি বর্ণ ছিল—পুরোহিত (ব্রাহ্মণ), সৈনিক (ক্ষত্রিয়), ব্যবসায়ী (বৈশ্য) এবং মজুর (শূদ্র)। বিবেকানন্দের ব্যাখ্যা থেকে আমরা বুঝতে পারি, পুরোহিত অর্থাৎ ব্রাহ্মণ শাসনকালে সঙ্কীর্ণতা অতি প্রকট ছিল; যদিও বিভিন্ন বিজ্ঞানের চর্চার শুরু এই সময়েই হয়েছিল তবু বিদ্যা বা শিক্ষা অর্জন এবং প্রদান করার অধিকারে ছিল বর্ণ সঙ্কীর্ণতার ছাপ এবং ব্রাহ্মণরা এগুলো করেছিলেন কারণ তাঁদের বুদ্ধি দিয়ে অন্যকে শাসন করতে হত। রাজতন্ত্র এবং সামন্ততন্ত্র ব্যাখ্যায় বিবেকানন্দ বলেছিলেন যে, ক্ষত্রিয় শাসন বড়ই নিষ্ঠুর এবং অত্যাচারপূর্ণ কারণ তাদের শিক্ষা ছিল না। তাঁরা সাধারণকে শাসন করার মাধ্যম হিসাবে বেছে নিয়েছিলেন বাহুবলকে। তবে তাঁরা ব্রাহ্মণ শাসকদের থেকে উদার ছিলেন। পুঁজিবাদ এবং তার জন্য তাবৎ ক্ষত, যা আজ আমাদের বোধগম্য হয়েছে, চমৎকারভাবে ব্যাখ্যাত হয়েছিল বিবেকানন্দের ধারণায়;—তিনি বলেছিলেন যে, বৈশ্য শাসনযুগের ভিতরে শরীর নিষ্পেষণ ও রক্তশোষণকারী ক্ষমতা অথচ বাইরে প্রশান্তভাব—বড়ই ভয়াবহ। পুঁজিবাদের ভাল দিকটাও তিনি দেখিয়েছিলেন 'এ যুগের সুবিধা এই যে, বৈশ্যকূলের সর্বত্র গমনাগমনের ফলে পূর্বোক্ত দুই যুগের পুঞ্জীভূত ভাবরাশি চর্তুদিকে বিস্তৃতি লাভ করে। ক্ষত্রিয় যুগ অপেক্ষা বৈশ্যযুগ আরও উদার কিন্তু এই সময় সভ্যতার অবনতি শুরু হয়।' সাম্যবাদের ধারণাও বিবেকানন্দ প্রাঞ্জল ভাষায় আমাদের বুঝিয়েছিলেন—তার সম্ভাব্য ফলাফল;—'শূদ্রশাসনযুগের সুবিধা হবে এই যে, এ সময়ে শারীরিক সুখস্বাচ্ছন্দ্যের বিস্তার হবে, কিন্তু অসুবিধা এই যে, হয়তো সভ্যতার অবনতি ঘটবে। সাধারণ শিক্ষার পরিসর খুব বাড়বে বটে, কিন্তু সমাজে অসাধারণ প্রতিভাশালী ব্যক্তির সংখ্যা ক্রমশঃ কমে যাবে।'

বিবেকানন্দের স্বপ্ন-সমাজে জায়গা নিয়েছিল ব্রাহ্মণযুগের জ্ঞান, ক্ষত্রিয়ের সভ্যতা, বৈশ্যের সম্প্রসারণ শক্তি এবং শূদ্রের সাম্যের আদর্শ। যদিও সেই স্বপ্ন সমাজের অস্তিত্ব আদ্যে কোনোদিন সম্ভব হবে কিনা—এ নিয়ে তাঁর যথেষ্ট

সন্দেহ ছিল। তবে তিনি যথেষ্ট আশাবাদী ছিলেন "আমি মানসচক্ষে দেখিতেছি, এই বিবাদ-বিশৃঙ্খলা ভেদপূর্বক ভবিষ্যত পূর্ণাঙ্গ ভারত বৈদান্তিক মস্তিষ্ক এবং ইসলামিয় দেহ লইয়া মহামহিমায় ও অপরাজেয় শক্তিতে জাগিয়া উঠিতেছে।" (বাণী ও রচনা, ৮ম খন্ড, পৃ. ৩৯)।

যদিও আমরা এমন কোনো আচরণগত বৈশিষ্ট্য এখনো, তাঁর, বিবেকানন্দের মৃত্যুর একশো দুই বছর পরও তৈরী করে উঠতে পারিনি, যাতে করে বলা যায়, তাঁর 'মানসচক্ষু' সত্য দেখেছিল। আশা এই যে, হয়তো একদিন পেরে যাব যেদিন বিবেকানন্দ-ব্যাখ্যাত শিক্ষার প্রসার আমাদের মধ্যে সম্পূর্ণতা পারে।

জাতিভেদ ঃ স্বামী বিবেকানন্দ জাত বিভাগ (যথা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র) কে সমর্থন করতেন কারণ সেগুলির উৎপত্তি ছিল প্রাচীন ভারতের জীবিকা বিন্যাস। কিন্তু জাতিভেদের তীব্র বিরোধী ছিলেন তিনি কারণ জাতিভেদ বৈদান্তিক দর্শনের বিরোধী। তাঁর মতে, জাতিভেদ রাজনৈতিক ব্যবস্থাসমূহ থেকে তৈরি হয়েছিল। অন্যভাবে বললে, যা বংশ পরম্পরাগত ব্যবসায়ী সম্প্রদায়গুলির সমবায় (Trade Guild)। মুক্ত অর্থনীতি (open economy), নগরায়ন (urbanization) যে জাতিভেদকে ভেঙে দেবে—এ সম্পর্কে তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল "কোনরূপ উপদেশ অপেক্ষাও ইউরোপের সহিত বাণিজ্যের প্রতিযোগিতায় জাতিভেদ বেশি ভাঙিয়াছে।" (বাণী ও রচনা, ৫ম খন্ড, পৃ. ১৫৪)।

বিবেকানন্দ চেয়েছিলেন যে, চারটে বর্ণকে আলাদা করে গঠন করে বৈদিক প্রণালীতে আনতে হবে যাতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য জাতির নব অভ্যুদয় হবে কিন্তু শূদ্র বলে কোনো জাতি আর থাকবে না। তাদের জন্য নির্দিষ্ট সব কাজ যন্ত্রের মাধ্যমে করা হবে। অর্থাৎ উচ্চবর্ণকে অবনমিত করে নয়, নিম্নবর্ণকে উন্নত করেই সমাজকে উৎকর্ষতার পথে এগিয়ে দেওয়া সম্ভবপর হবে।

কর্ম ঃ কর্তব্যের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বিবেকানন্দ বলেছিলেন "যে সমাজে আমরা জন্মগ্রহণ করিয়াছি, সেই সমাজের আদর্শ ও কর্মধারা অনুসারে এমন কাজ করা, যাহা দ্বারা আমাদের জীবন উন্নত ও মহৎ হয়।" (বাণী ও রচনা, ১ম খন্ড, পৃ. ৮৫) কর্তব্যের ব্যাপ্তি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বিবেকানন্দ প্রাথমিক শর্ত দিয়েছিলেন যাতে মানুষ নিজেকে ঘৃণা না করে। তাঁর যুক্তিতে, যে মানুষ নিজেকে ঘৃণা করতে আরম্ভ করেছে তার অধঃপতন নিশ্চিত। উন্নতি ও উৎকর্ষতার জন্য প্রথমে নিজের ওপর, পরে ঈশ্বরের ওপর বিশ্বাস জরুরী। এই উন্নত এবং মহৎ জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় কর্মের শ্রেষ্ঠ মাধ্যম ছিল স্বামীজি মনোনয়ন করেছিলেন দেশের যুবসমাজকে। যে ভবিষ্যত ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠত্বের স্বপ্ন তিনি দেখেছিলেন, তাঁর দৃষ্টিতে, সঠিক শিক্ষায় পরিণত হওয়া উদারমনস্ক এবং সমৃদ্ধ যুবসমাজ-ই সেই শ্রেষ্ঠত্ব আনার পক্ষে শ্রেষ্ঠ মাধ্যম বলে তিনি মনে করেছিলেন। যে মাধ্যমের চালিকাশক্তি হিসাবে তিনি চিহ্নিত করেছিলেন ধর্মকে। ভারতীয় আদর্শ ধর্মমুখী হওয়ায়, তাঁর ভাবনানুযায়ী, অনেক সুপরিবর্তনই ধর্মের মাধ্যমে আনা সম্ভব। এই ধর্মচেতনাই ছিল তাঁর কাছে আধ্যাত্মিকতা; তাঁর ভাষায়—"আত্মার বিজ্ঞান"।

৫.২ রবীন্দ্রনাথের সমাজ ভাবনা

ভারতের বরনীয় পুরুষদের অন্যতম পুরোধা রবীন্দ্রনাথ ছিলেন বিশুদ্ধ ভারতীয়ের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। ঋষিকল্প এই মানুষটি পরিপুষ্ট করেছেন বাঙলা তথা বিশ্ব সাহিত্য-সংস্কৃতি-সভ্যতাকে। তাঁর আশী বছরের দীর্ঘায়ত জীবনের নিরলস সাধনায় অনুপ্রাণিত করেছেন পৃথিবীর বহুতর মানুষকে। উদার বোধসম্পন্ন, কল্যাণব্রতী, মধুর ব্যক্তিত্বশালী, দূরদর্শী, রুচিবোধযুক্ত, সংহতি ভাবনাময়, মননশীল, সৃষ্টিমুখ উল্লাসী রবীন্দ্রনাথ শুধু বাঙালী বা ভারতবাসীকে নয়, গর্বিত করেছেন সারা বিশ্বের মনুষ্য সমাজকে। তাঁর অগাধ ও অকৃত্রিম সৃষ্টি মানুষের চিন্তা-চেতনাকে প্রাণিত করেছে

সীমাহীনভাবে। অননুকরণীয় চৈতন্যবোধের অধিকারী রবীন্দ্রনাথ ছিলেন প্রকৃত অর্থেই বিস্ময় পুরুষ। সারাটা জীবন অন্তরের অন্তঃপুরে যে কর্মশালাকে তিনি সদাজাগ্রত রেখেছিলেন তার যতটা প্রকাশ ঘটেছে বাইরে, তাতেই মানুষ বিস্মিত। এমন যে রবীন্দ্রনাথ, তাঁর সমাজ দর্শন কি ছিল?

রবীন্দ্রনাথের সমাজদর্শন মানুষের জীবন জীবিকার সম্ভাব্য সমস্ত বিষয়কে ঘিরেই প্রতিফলিত হয়েছে। আমরা সেগুলিকে পর্যায়ক্রমে ব্যাখ্যা করতে পারি।

(ক) শিক্ষা ঃ

রবীন্দ্রনাথ, অন্য অনেকের মত বিশ্বাস করতেন বা এই জীবনদর্শনে স্থির ছিলেন যে সাক্ষরতা, সচেতনতা ও শিক্ষা ব্যতিরেকে সমাজের অগ্রগতি সম্ভব নয়। দেশের মানুষের নিরক্ষরতা ও অজ্ঞতার বহর দেখে কবি অত্যন্ত ব্যথিত হয়েছেন। তাই তিনি লিখিতভাবেই ঘোষনা করেছেন, "শিক্ষা সংস্কার ও পল্লী সঞ্জীবনই আমার জীবনের প্রধান কাজ।" শিক্ষাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক কর্মসূচী গ্রহণ করার মাধ্যমেই পল্লী সঞ্জীবন সম্ভব এই ভাবনায় ভাবিত ছিলেন তিনি। তাই সেই ভাবনার ফলিত রূপ আমরা দেখতে পাই শ্রীনিকেতনকে কেন্দ্র করে বয়স্ক শিক্ষা, বিধিমুক্ত শিক্ষা, চেতনাবৃদ্ধির কর্মসূচী ইত্যাদির মধ্যে। বিধিবদ্ধ শিক্ষার আয়োজনও তিনি করেছেন শ্রীনিকেতন এবং শান্তিনিকেতনে।

শিক্ষা পদ্ধতির ব্যাপারেও তাঁর নিজস্ব ভাবনা ছিল। তিনি মনে করতেন, শিক্ষার মধ্যে বস্তু পরিচয়, কর্মসাধন, সংগীত, শিল্পের যোগ থাকবে, থাকবে "আত্মপ্রকাশের আনন্দময় উপায় উপকরন।" তাঁর মনের মধ্যে এই চিন্তা দৃঢ়ভাবে কাজ করেছে যে, আমাদের দেশের প্রচলিত শিক্ষা শুধুই বিষয়শিক্ষা, যা "মনুষ্যত্বের কুঞ্জে কুঞ্জে নতুন পাতা ঝরিয়ে ফুল ফুটিয়ে তুলছে না।" সেজন্যই আমাদের শিক্ষা সমাপ্ত হলেও "প্রকৃতির মধ্যে একটা পরিনতির শক্তি প্রাচুর্য জন্মে না।"

সমাজের এক অংশের মানুষ শিক্ষার সুযোগ পাবেন আর এক অংশের মানুষ তা থেকে বঞ্চিত থাকবেন এই বাস্তব অবস্থাকে রবীন্দ্রনাথ মেনে নিতে পারেন নি। তাই এ ক্ষেত্রে তাঁর ভাবনার প্রকাশ দেখি এই বাক্যে—"যে সমাজের এক অংশে শিক্ষার আলোক পড়ে, অন্য বৃহত্তর অংশ থাকে শিক্ষাবিহীন যে সমাজ আত্মবিচ্ছেদের অভিশাপে অভিশপ্ত।" উপরোক্ত ব্যক্যটিও শিক্ষাক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের এই সমাজদর্শনকে প্রকট করে শিক্ষার সুযোগ বা অধিকার থাকবে প্রতিটি মানুষের। তিনি এও মনে করতেন যে ভারতের সনাতন মূল্যবোধ ও শিক্ষা চিন্তার সঙ্গে তাল রেখে আশ্রমিক পরিবেশে, প্রকৃতির সঙ্গে যোগ রেখে শিক্ষাদান করা ভাল। শিক্ষা যেন ভীতিকর না হয়, আত্মবিকাশের স্বাভাবিক পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে শিক্ষাকেন্দ্রগুলি যেন আনন্দযজ্ঞের পীঠস্থান হয়ে উঠে এই ছিল তাঁর ভাবনা।

(খ) অখন্ডতা ঃ

'স্বদেশ আত্মার বাণীমূর্তি' রবীন্দ্রনাথের কাছে দেশ নিতান্ত এক ভৌগলিক সীমানা নয়। তিনি একে 'মহামানবের সাগরতীর' বলে মনে করেছেন। স্বদেশ-স্বভূমির প্রতি তাঁর ছিল প্রগাঢ় প্রেম। তিনি দেশকে কখনো খন্ড ক্ষুদ্র করে দেখেননি। শুধু দেশ কেন, 'এই বৃহৎ ধরণীর প্রতি একটা নিবিড় টান' তিনি অনুভব করেছেনস চিরদিন। তাই 'মানববিধাতার রাজপথে মহামানবের গান গেয়ে বেড়াব' এই ছিল তাঁর ঘোষনা। বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়েও এই সমাজ ভাবনাই ব্যক্ত করেছেন যে, বিচ্ছিন্নতা বা বিভেদ নয়—ঐক্যই হোক মনুষ্য জীবনের মূল মন্ত্র। তিনি বলেছেন, "মুক্তি সাধনার সত্য পথ মানুষের ঐক্য সাধনায়।" রাখীবন্ধন অনুষ্ঠান, শান্তিনিকেতনের পৌষমেলা, শ্রীনিকেতনের মাঘমেলা ইত্যাদি প্রবর্তনের মধ্য দিয়েও রবীন্দ্রনাথ তার ঐক্য ও অখন্ডতা ভাবনার প্রকাশ ঘটিয়েছেন। অখন্ডতা এবং পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে থাকে সভ্যতার ইমারত। তাকে আধার করেই ঘটে প্রগতি। তিনি স্পষ্টতই এই সমাজ দর্শনে বিশ্বাসী ছিলেন এবং সেজন্যই লিখেছেন, "যেখানে সেই সহযোগিতার বিচ্ছেদ,

সেইখানেই আমাদের যতকিছু দুর্গতি।" বিশেষতঃ গ্রাম ভারতের অবস্থা দেখে কবির উপলব্ধি এই যে গ্রাম ভারত যেন ক্রমাগত বিচ্ছিন্ন হচ্ছে, খন্ডিত হচ্ছে। যেহেতু এই অবস্থা উন্নয়নের পরিপন্থী তাই পল্লীর উন্নয়নের স্বার্থে সহযোগিতার ভিত্তি গড়ার প্রয়োজনীয়তা তিনি অনুভব করেছিলেন এবং অখন্ডতাবোধের ভাবনাটিকে নানাভাবে আমাদের লক্ষ্যভূত করেছেন। তিনি চেয়েছেন মানুষ অবুদ্ধি, দুর্বুদ্ধি এবং ভেদবুদ্ধি থেকে মুক্ত হোক।

(গ) স্বাবলম্বন ঃ

রবীন্দ্রনাথের সমাজভাবনার মধ্যে স্বাবলম্বনের বিষয়টিও গুরুত্ব পেয়েছে। তিনি আত্মশক্তির উদ্বোধনের মাধ্যমে উন্নয়ন সাধনে বিশ্বাসী ছিলেন। বহিঃপ্রযুক্ত শক্তি বা অর্থের সাহায্যে উন্নয়নকে বাস্তবায়িত করা সম্ভব নয়, এই ছিল তাঁর চিন্তা। শ্রীনিকেতনে পল্লী সংগঠন বিভাগের পত্তনের মাধ্যমে তিনি তাঁর সেই সমাজ ভাবনার ফলিত রূপ দিয়েছেন। তাঁর কাজের পদ্ধতি ছিল পল্লীবাসীদের সমস্যা সম্পর্কে, সম্ভাবনা সম্পর্কে, নিজ ক্ষমতা সম্পর্কে, সমাজ জীবনে দায়বদ্ধতা সম্পর্কে সচেতন করে তাদের স্বাবলম্বী হতে শেখানো। স্বাবলম্বনের জন্য দরকার আত্মবিশ্বাস। হারিয়ে যাওয়া সেই আত্মবিশ্বাসকে আবার জাগিয়ে তোলার ভাবনা প্রকট ছিল তাঁর মনে। তাই তিনি চাইতেন, এ দেশের মানুষের হোক আধুনিক পাশ্চাত্য মন। নিজেকে ভাঙা আর গড়ার মধ্য দিয়েই এই স্বাবলম্বীতাকে ধরা যায়। সমাজের তাবৎ মানুষ যখন কোরাস গাইবে 'আপনাকে এই জানা আমার ফুরাবে না' তখন আমরা কদম কদম স্বাবলম্বনের পথে এগোতে পারবো।

রবীন্দ্রনাথ অনুভব করেছেন যে আমাদের কেউ শেখায়নি যে নিজের কাজ নিজ উদ্যমে কর এবং ফলের জন্য নিজের উপর নির্ভর কর। ফলতঃ আমরা অতি মাত্রায় প্রত্যাশী হয়ে পড়েছি। আমরা "কেবলমাত্র চাইবার জন্যই প্রস্তুত হয়েছি, কিন্তু নেবার জন্য প্রস্তুত হইনি।" এ ধরনের অসামর্থকে তিনি বরদাস্ত করতে প্রস্তুত ছিলেন না। তিনি এই সমাজ দর্শনে বিশ্বাসী ছিলেন যে মানুষ "আপন শক্তিতে আপন কল্যাণের বিধান করবে।" একদল দেবে এবং একদল নেবে এই মানসিকতাকে তিনি সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করেছেন। তাঁর কামনা ছিল, প্রতিটি 'আত্মশক্তি ও আত্মইচ্ছায়' জেগে উঠে নিজের কল্যাণ সাধন নিজে করুক। সমাজকে আত্মশাসনের শক্তিতে উদ্বোধিত করাই তাঁর সমাজ দর্শন।

(ঘ) কুসংস্কারহীনতা ঃ

দেশের মানুষের মধ্যে প্রচলিত নানা কুসংস্কারের কথা রবীন্দ্রনাথ জানতেন। শিক্ষা, চেতনা এবং সুকোমল বৃত্তির বিকাশ সাধনের মাধ্যমে মানুষের হৃদয় জুড়ে থাকা এই অন্ধকার বৃত্তকে তিনি সরাতে চেয়েছেন প্রাণপনে। তিনি চেয়েছেন সম্ভাব্য সমস্তরকম উপায়ের মাধ্যমে মানুষকে কুসংস্কারের উর্দ্ধে মাথা তুলে দাঁড়ানোর কাজে সাহায্য করা দরকার। কারণ অজ্ঞতাভিত্তিক এই সব কুসংস্কারই তাদের পশ্চাৎপদ হয়ে থাকার পিছনে অন্যতম প্রধান কারণ।

এই সমাজ দর্শন তাঁর হৃদয়ে বদ্ধমূল ছিল যে, 'কর্মের মূলে যা দরকার তা হলো জ্ঞানের প্রেরনা।' জ্ঞানহীন জীবন ও কর্মধারা প্রকৃত উন্নয়নকে নিশ্চিত করে না বলেই 'আচরিক সংকীর্ণতা'-র ঘুর্নাবর্তে পাক খেতে খেতেই সমাজ জীবন ভারাক্রান্ত হয়ে উঠে। 'পুরাতন জীর্ন সংস্কার ত্যাগ করবার জন্য, সকল প্রকার অন্যায়কে চূর্ন করবার জন্য' তিনি মানুষকে চেতনামুখী করার কাজে সর্বদা গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

(ঙ) ব্যবসার সঙ্গে লোকহিত ঃ

রবীন্দ্রনাথের আর এক উল্লেখযোগ্য সমাজ দর্শন হলো ব্যবসার সঙ্গে লোকহিত। তিনি পরামর্শ দিয়েছেন ব্যবসার সঙ্গে লোকহিতকে যুক্ত করার। আমরা আমাদের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক উন্নতির জন্য ঘনিষ্ঠ প্রয়াস চালাবো এর মধ্যে কোন ত্রুটি নেই। কিন্তু তাঁর দর্শন ছিল এই যে, সেই প্রচেষ্টার মধ্যেই মানব ব্রহ্মকে নিস্বার্থ সেবা দেওয়ার মত উদ্যম

ও সময় যেন আমাদের থাকে। একজন শিক্ষক দু'একজন দরীদ্র ছাত্রছাত্রীকে পঠন পাঠনে বিশেষ সহায়তা দিলে বা একজন চিকিৎসক মানে কয়েক সঙ্খ্যা দরীদ্র মানুষকে নিঃশুল্ক পরিষেবা দিলে তাদের তেমন ক্ষতি হয় না অথচ লোকহিতে ভূমিকা পালন করা যায়। কবি মনে করতেন এভাবেও সমাজে উন্নয়ন ঘটানো সম্ভব।

(চ) নারী উন্নয়ন ঃ

নারী জীবনের সর্বক্ষেত্রে বেদনাদায়কভাবে পিছিয়ে এই সত্য উপলব্ধি রবীন্দ্রনাথের ছিল। সেজন্য তাঁর সমাজ দর্শনে নারীর উত্থানের প্রসঙ্গটি অবশ্যই স্থান পেয়েছে। তিনি লিখেছেন, "মানব সমাজে স্ত্রীলোক সর্বাপেক্ষা পুরাতন; পুরুষ নানা কার্য নানা অবস্থা নানা পরিবর্তনের মধ্যে সর্বদাই চঞ্চলভাবে প্রবাহিত হইয়া আসিতেছে; স্ত্রীলোক স্থায়ীভাবে কেবলই জননী এবং পত্নীরূপে বিরাজ করিতেছে, কোন বিপ্লবেই তাহাকে বিক্ষিপ্ত করে নাই। এই জন্যই সমাজের কর্মের মধ্যে নারী এমন সংহতরূপে" রয়েছেন। কিন্তু সেই নারীর দুর্দশা ও অবমাননা তাঁকে ব্যথিত করেছে বলেই তিনি আবার মন্তব্য করেছেন "মানুষকে পুরা পরিমানে মানুষ করিব ইহা বুঝি আমাদের অন্তরের ইচ্ছা নহে।" এই পরিপ্রেক্ষিতে তার সমাজ দর্শন চমৎকারভাবে পরিস্ফুট হয়েছে ঘরে বাইরে উপন্যাসে বর্ণিত এই বাক্যে, "স্ত্রী বলে যে তুমি আমাকে কেবলই মেনে চলবে তোমার উপর আমার এ দৌরাত্ম্য আমার নিজেরই সইবে না।" এখানে আমরা সুস্পষ্টভাবে অনুভব করতে পারছি যে তিনি নারীর উপর দৌরাত্ম্য নয়, তাকেও সমমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। 'একটা আস্ত মানুষকে আগাগোড়া পুরে ফেলে' তিনি তাকে 'তালাবন্ধ করে রাখা'-র বিপক্ষে ছিলেন।

(ছ) উপযুক্ত কাজের পদ্ধতি ঃ

রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন কর্মসূচী যতটা জরুরী সমাজ কল্যাণের স্বার্থে ঠিক ততটাই জরুরী কর্মপদ্ধতি। আমরা যে নানা ক্ষেত্রে পশ্চাৎপদ তার পিছনে কর্মসূচীর যতটা অভাব তার চেয়ে বেশি অভাব উপযুক্ত কর্মপদ্ধতির । সেজন্য তিনি এই সমাজ দর্শনে বিশ্বাসী ছিলেন যে, সমাজকে বা এলাকাকে তন্ন তন্ন করে জানতে হবে, মানুষের সমস্যা ও সম্ভাবনাকে ঠিকভাবে উপলব্ধি করতে হবে, মানুষের শক্তিতে আস্থা রাখতে হবে, আপন শক্তিতে সমাজকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে, গরীবের প্রতি অবজ্ঞা ভাবের উর্দ্ধে উঠতে হবে, আমিই সব করব গোছের মনোভাব ত্যাগ করতে হবে, উপকার করব না—উপকার ঘটাব এই মনোভাবের অধিকারী হতে হবে, যুব শক্তিকে জাগ্রত করতে হবে ইত্যাদি। তিনি মনে প্রাণে বিশ্বাস করতেন যে একমাত্র এভাবেই সমাজের উন্নতি সম্ভব। তাই তাঁর সমাজ দর্শনে কর্মপদ্ধতি এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে রয়েছে।

(জ) উৎসাহদান ও প্রাণশক্তির জাগরন ঃ

যে কোন কাজে সাফল্য করায়ত্ত করতে হলে প্রয়োজন উপযুক্ত প্রাণশক্তির। এই তত্ত্ব ব্যক্তিজীবনে যেমন সত্য তেমনি সত্য সমাজ জীবনেও। রবীন্দ্রনাথ এ সম্পর্কে সচেতন ছিলেন বলেই সংকল্প গ্রহণ করেছিলেন মুর্ছিত প্রাণশক্তিকে সতেজ করার। 'প্রাণের দৈন্য'-কে তিনি সব চেয়ে বড় অপমান মনে করতেন বলেই এক্ষেত্রে তাঁর সমাজ দর্শন স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়। কোন কাজই খুব সহজভাবে সম্পন্ন হয় না, নানা বাধাবিপত্তির মুখোমুখি হতে হয়। তাতেও বিচলিত বোধ করে উৎসাহ বিসর্জন দিয়ে বসলে চলবে না। এতে "গড়ে তোলবার শক্তি কেবলই খোঁচা খেয়ে মরে।" কাজের দুরূহতাকে মেনে নিয়ে তার মুখোমুখি হয়ে নতুন পথনির্মাণের আনন্দ উপভোগ করতে হবে। ঔৎসুক্য ও আগ্রহকে সম্বল করে কর্মপথে বিচরন করতে হবে—এও ছিল রবীন্দ্রনাথের অন্যতম সমাজদর্শন।

দারিদ্র মোচন ঃ

দেশের মানুষের অন্য নানান সমস্যা রবীন্দ্রনাথকে ব্যথিত করেছে কিন্তু তাঁকে অত্যন্ত পীড়িত করেছে মানুষের দারিদ্রের বহর। 'সভ্যতার সংকট' নামক প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন, "সেদিন ভারতবর্ষের জনসাধারনের যে নিদারুন দারিদ্র

আমার সম্মুখে উদ্‌ঘাটিত হল তা হৃদয় বিদারক। অন্ন, বস্ত্র, পানীয়, শিক্ষা, আরোগ্য প্রভৃতি মানুষের শরীর মনের পক্ষে যা কিছু অত্যাবশ্যক তার এমন নিরতিশয় অভাব বোধহয় .... কোনও দেশে ঘটেনি।" এই অভাব দূরীকরনে তিনি নানাভাবে ব্রতী থেকেছেন চিরদিন। চাষীদের আধুনিক কৃষি পদ্ধতিতে শিক্ষিত করার জন্য পুত্র ওজানাতাকে বিদেশ থেকে কৃষিবিদ্যা শিখিয়ে আনা, তাদের জন্য সমবায় ব্যাঙ্ক গঠন, শ্রীনিকেতনে কৃষিবিজ্ঞানে পঠন পাঠনের ব্যবস্থা, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পে সংস্কার সাধন করে তাকে জাগ্রত করা, হলকর্ষন উৎসবের মাধ্যমে চাষীদের উৎসাহিত করা ইত্যাদি পদক্ষেপের মাধ্যমে তিনি দারিদ্র মোচনে উদ্যোগী হয়েছিলেন। ভারতের পল্লীগ্রামের চেহারা যেহেতু কবিকে কখনো স্বস্তি দেয়নি তাই তিনি নিরলসভাবে তার সমাধানে ব্রতী থেকেছেন। সর্বক্ষেত্রে তিনি উন্নত শৈলী গ্রহণে উদ্যোগী হয়েছিলেন কারণ তিনি অনুভব করেছিলেন, "প্রাচীন কালের গ্রাম্যতার গন্ডীর মধ্যে আর আমাদের ফিরিবার রাস্তা নাই।" তাঁর সমাজ দর্শন ছিল "প্রকৃতির দান এবং মানুষের জ্ঞান এই দুইয়ে মিলেই মানুষের সভ্যতা" সুতরাং সমাজের সমস্যা সমাধানে, বিশেষ করে দারিদ্র মোচনে "এই দুটোকেই সহযোগীরূপে চাই।"

৫.৩ অনুশীলনী

১। স্বামী বিবেকানন্দের সমাজভাবনার সারাৎসার বর্ণনা কর।

২। রবীন্দ্রনাথের সমাজদর্শন সংক্ষেপে বর্ণনা কর।

একক ৬ □ সামাজিক ন্যায় ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় ভারতীয় সংবিধান এবং পেশাদারী সমাজ কর্মের অবদান

গঠন

৬.১ মানবাধিকারের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট

৬.২ মানবধিকারের প্রেক্ষিতে ভারতীয় সংবিধানের কয়েকটি ধারা

৬.৩ মানবাধিকার এবং সংবিধান

৬.৪ মানবাধিকার এবং সমাজ কর্ম

৬.৫ সামাজিক ন্যায়

৬.৬ সংবিধানের দর্শন ঃ সংবিধান এবং অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ন্যায়বিচার

৬.৭ সামাজিক ন্যায় বিচার এবং সমাজ কর্ম

৬.৮ অনুশীলনী

৬.১ মানবাধিকারের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট

মানব সভ্যতার আদি থেকেই মনুষ্যত্বের সামগ্রিক প্রেক্ষিতে মানবিকতা একজন মানুষের শ্রেষ্ঠগুণ হিসাবে বিবেচিত হয়ে আসছে। এটা যে শুধু মানুষের সামাজিক সম্পর্কগুলির মধ্যেই প্রযোজ্য তা নয়, ধর্মের ক্ষেত্রে বিশ্বাসের যে মতবাদ মানব-মুক্তির পথ দেখাচ্ছে সেই মতবাদেও আমরা মানবিকতার উজ্জ্বল উপস্থিতি দেখতে পাই। 'মানবাধিকার' শব্দটির সাথে মানব সভ্যতার একটা নিবিড় যোগসূত্র রয়েছে। বর্তমানে 'মানবাধিকার' কে নিয়ে সারা বিশ্ব জুড়ে যে আলোড়ন উঠেছে সেই ব্যাপারে বিশদ আলোচনার আগে, আমরা, খুব সংক্ষেপে দেখে নেব, প্রাচীন ভারতে মানবিকতা প্রসঙ্গে কি কি প্রধান মতবাদ ছিলো যেগুলিকে আজকের 'মানাবধিকার' এর পূর্বসূরী বলা যায়—

১. হিন্দুধর্ম থেকে আমরা পেয়েছিলাম 'বসুধৈব কুটুম্বকম' এর ধারণা। যার অর্থ বিশ্ব সৌভ্রাতৃত্ব, যা বিশ্বব্যাপী একক পরিবারকে সূচিত করে।

২. খ্রীষ্টপূর্ব তিনশো বছরের ও আগে, বৌদ্ধধর্ম আমাদের দিয়েছিলো 'অহিংসা পরমধর্ম' এর ধারণা। যে মতবাদ অহিংস ভাবনা এবং ব্যবহারকে সূচিত করে।

৩. জৈন ধর্মেও মানবিকতাকে সবার উর্ধ্বে স্থান দেওয়া হয়েছিলো।

বর্তমানের 'মানবাধিকার'-এর ধারণার পূর্বসূরী হিসাবে মনুস্মৃতি (খ্রীঃ পূ. ২০০-১০০ খ্রীষ্টাব্দ), মহাভারত (খ্রীঃ পূ. ১০০০), অর্থশাস্ত্র (খ্রীঃ পূ. ৩০০) এবং শুক্রাচার্যের শুক্রানিতিসরকে উল্লেখ করা যায়।

মধ্য সময়ের ভারতে 'মানবাধিকার' তথা মানবিকতার ধারণা কিছুটা ক্ষুণ্ণ হয়েছিলো। উদাহরণ হিসাবে বলা যায়, পূজার স্বাধীনতা সেই সময়ের কেড়ে নেওয়া হয়েছিলো; আমরা এই সময়ে 'জাজিয়া' কর-এর উল্লেখ দেখি যা পরে আকবর নিষিদ্ধ করেছিলেন। আকবরের 'দীন-ই-ইলাহী' ধর্মমত, ধর্মবিশ্বাস এবং পূজার অধিকার ফিরিয়ে দিলেও সেই ধর্ম বেশীদিন অস্তিত্বশীল ছিলো না। আকবরের সময় বাসগৃহের অধিকার স্বীকৃতি পায়; উদাহরণস্বরূপ রাজবাহাদুরের

বৃত্তান্ত স্মর্তব্য। এই সময় যে দু'টি নীতি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো মানবাধিকারের সোপান হিসাবে সে দু'টি হলো—

১. যুদ্ধবন্দীদের বিনিময় এবং ২. যুদ্ধে মৃতদের তাদের মাতৃভূমিতে প্রত্যার্পণ। উদাহরণ হিসাবে, ঐতিহাসিক কাশীনাথ লিখিত বই থেকে জানা যায় যে, তৃতীয় পানিপথের যুদ্ধ (১৭৬১) চলাকালীন যুদ্ধক্ষেত্রে মৃত রাজা বিশ্বাস রাও এর মরদেহ, দুরানি (পার্শী ঐতিহ্য) ঐতিহ্য মেনে, পারস্যে নিয়ে যাওয়া হয়েছিলো।

স্বাধীনতা উত্তর ভারতে 'মানবাধিকার' এর অগ্রগতি হিসাবে সংবিধানের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ যা পরে আলোচিত হবে।

এখন আমরা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে, 'মানবাধিকার' শব্দটির অস্তিত্ব খুব সংক্ষেপে বর্ণনার প্রয়াস পাবো। মানবাধিকারের আন্তর্জাতিক তথ্যতে, অধিকারগুলো খুবই আলঙ্কারিক ভাবে লিপিবদ্ধ আছে যেগুলো, সাধারণভাবে কাঙ্খিত হিসেবে অনুভূত হওয়া সমস্ত লক্ষ্যের চরমতম ইচ্ছা হিসাবে প্রতিভাত হয়। এই আলঙ্কারিক থেকে বাস্তব পৃথিবীর পক্ষে মানানসই হয়ে ওঠার জন্য মানবাধিকারগুলোর পুনঃ পরীক্ষা প্রয়োজন।

এই উদ্দেশ্যে যে যে প্রশ্নগুলো জরুরী তা হলো ঃ

১. অধিকারের ধন্যাত্মকীকরণ (positivisation) এবং দৃঢ়করণ (concretization) কি সেই অধিকারের সীমাবদ্ধতাকে কমিয়ে দেয়? অন্যভাবে বললে সব নিয়ন্ত্রণই কি সীমাবদ্ধতা দোষে দুষ্ট?

২. দৃঢ়করণের প্রক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রিত না করে একজন আইন রচয়িতা কি অধিকারকে সীমাবদ্ধ করতে পারেন? এইসব শর্তগুলির উপস্থিতি এবং গভীরতা মাপার জন্য এবং মান নির্ধারণ করার জন্য আদালত কি কি পরীক্ষা তৈরি করেছে?

৩. অধিকারের সীমার জন্য যদি আইনানুগ কারণ থাকেও, কতদূর অবধি একটা অধিকারকে সীমায়িত করা যাবে?

যাইহোক, মানবাধিকার-এর ক্ষেত্রে যে অধিকার এবং স্বাধীনতার কথা বিশেষভাবে উল্লেখিত হয়েছে সেগুলি হলো ঃ-

(ক) জীবনের প্রতি অধিকার।

(খ) অত্যাচার, অমানবিক অথবা অপমানজনক ব্যবহার অথবা শাস্তি থেকে মুক্তি।

(গ) দাসত্ব এবং (servitude) থেকে মুক্তি।

(ঘ) স্বাধীনতা এবং ব্যক্তি নিরাপত্তার অধিকার।

(ঙ) সুবিচার পাওয়ার অধিকার।

(চ) প্রত্যেকের ব্যক্তিগত এবং পারিবারিক জীবনে সম্মান পাওয়ার অধিকার

(ছ) ভাবনা, উপলব্ধি এবং ধর্ম-এর ক্ষেত্রে স্বাধীনতা।

(জ) মতপ্রকাশের স্বাধীনতা।

(ঝ) সংগঠিত হওয়ার এবং সংঘ তৈরির অধিকার।

(ঞ) বিবাহ এবং পরিবার তৈরির স্বাধীনতা।

(ট) কারোর অধিকার ক্ষুণ্ণ হলে সঠিক বিচার পাওয়ার অধিকার।

১৯০০ সালের ২০ মার্চ উপরোক্ত অধিকারগুলির সঙ্গে আরো তিনটি অধিকার যুক্ত হয়। সেগুলি হলো ঃ

(ঠ) সম্পত্তির প্রতি অধিকার

(ড) পিতামাতার অধিকার যাতে তাঁরা তাঁদের ধর্ম ও দর্শনের মধ্যে থেকে তাঁদের সন্তানের শিক্ষা নিশ্চিত করতে পারেন

(ঢ) মুক্ত নির্বাচনের অধিকার

চতুর্থ নিয়মাবিধি আরো চারটি অধিকারকে যুক্ত করে, যেমন ঃ

(ন) ঋণের জন্য কারাদন্ড থেকে মুক্তি

(ত) যে কোনো রকম আন্দোলন করার স্বাধীনতা এবং বাসগৃহ নির্বাচন করার স্বাধীনতা।

(থ) নির্বাসন থেকে মুক্তি এবং মাতৃভূমিতে ফেরার অধিকার।

৬.২ মানবাধিকারের প্রেক্ষিতে ভারতীয় সংবিধানের কয়েকটি ধারা

আধুনিক সংবিধানকে বিভিন্ন ভাবে বর্ণনা করা যায় ঃ লিখিত (written) অথবা অলিখিত (unwritten); অনমনীয় (rigid) বা নমনীয় (flexible); এবং আইন মন্ত্রকের ওপর সংবিধানের অধিকার যা আমেল অর্থাৎ যুক্তরাষ্ট্রীয় (federal) অথবা একক (unitary) অর্থাৎ মৈত্রীবদ্ধ (confederate); গণ প্রজাতন্ত্রী (republican) অথবা রাজতান্ত্রিক (monardial) ইত্যাদি।[১] এই পরিসরে আমরা দুটো বিভাগকে আলোচনার জন্য বেছে নেব—(ক) নমনীয় অর্থাৎ সহজে সংস্কারযোগ্য (flexible) অথবা অনমনীয় (rigid) এবং (খ) আমেল বা যুক্তরাষ্ট্রীয় (federal) অথবা একক বা এককেন্দ্রিক (unitary) অথবা মৈত্রীবদ্ধ (confederate)। যদি আইনমন্ত্রক যেভাবে আইন প্রণয়ন করে সেভাবেই সংবিধানের পরিমার্জনা করতে পারে তবে সংবিধানকে নমনীয় বলা যায়।

এই প্রেক্ষিতে আমরা ভারতীয় সংবিধানের প্রাসঙ্গিক ধারাগুলি এবার আলোচনা করব। ভারতীয় সংবিধানের ভূমিকায় উল্লেখিত 'সবার জন্য প্রযোজ্য' শর্তগুলির মধ্যে নীচের গুলি প্রধানতম—

ন্যায় (Justice)—সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক;

স্বাধীনতা (Liberty)—ভাবনা, মতপ্রকাশ, বিশ্বাস (belief), আস্থা (faith) এবং পূজা;

সাম্য (Equality)—স্তর (Status), সুযোগ (opportunity); এবং সবার মধ্যে এগুলির প্রয়োগ;

সৌভ্রাত্র (Fraternity)—যা প্রতিটি ব্যক্তির সম্মান/মর্যাদা (dignity) এবং দেশের ঐক্য (unity) কে নিশ্চিত করছে।

আমাদের আলোচনায় মুখ্যতঃ প্রাধান্য পাবে সংবিধানের সেইসব ধারাগুলি যেখানে ভারতীয় নাগরিকদের মৌলিক অধিকারগুলি বিধৃত হচ্ছে—

১৪ নং ধারা ঃ এই ধারানুসারে, আইনের চোখে সব ভারতীয় নাগরিকই সমান। এই ধারায় বর্ণিত মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হলো ঃ 'রাষ্ট্র, আইনের কাছে কোনো ব্যক্তির সাম্যতাকেই অগ্রাহ্য করবে না এবং ভারতীয় ভূ-খন্ডে, কোনো ব্যক্তির সমান আইনি প্রতিরক্ষাকেই অস্বীকার করবে না।' প্রতিপাদ্যটির প্রথম ভাগটুকু নেতিবাচক ভাব সম্পন্ন (Negative concept) যেটা কোনো বিশেষ ব্যক্তির বা বিশেষ কোনো শ্রেণীর সাধারণ আইনের কাছে বিশেষ সুযোগকে কোনোরকম স্বীকৃতি দিচ্ছে না। এবং দ্বিতীয় ভাগটুকু ইতিবাচক ভাবসম্পন্ন (of Positive concept) যেটা একই পরিস্থিতিতে একইরকম অর্থাৎ সমান দৃষ্টিকোণকে নিশ্চিত করছে।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, এই ধারায় উল্লেখিত 'সর্বসাধারণ' বলতে সব ভারতীয় নাগরিককেই নির্দেশ করা হয়েছে শুধুমাত্র রাষ্ট্রপতি এবং রাজ্যপাল ব্যতিরেকে।

১৫ নং ধারা ঃ এই ধারানুযায়ী, ধর্ম, জাতি, গোত্র (Caste), লিঙ্গ (Sex) এবং জন্মগ্রহণের জায়গার (place of birth) ভিত্তিতে কোনোরকম পার্থক্য (discrimination) কে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এই ধারায় বর্ণিত মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হলো ঃ

(i) রাষ্ট্র ধর্ম, জাতি, গোত্র, লিঙ্গ এবং জন্মগ্রহণের জায়গার ভিত্তিতে কোনো নাগরিকের সঙ্গে কোনো রকম বৈষম্যমূলক আচরণ করবে না।

(ii) শুধুমাত্র ধর্ম, জাতি, গোত্র, লিঙ্গ এবং জন্মের জায়গার ভিত্তিতে কোনো নাগরিককে

(ক) দোকানে যাওয়ার অধিকার, সার্বজনীন রেঁস্তোরাতে যাওয়ার অধিকার, হোটেলে যাওয়ার অধিকার, সার্বজনীন চিত্তবিনোদনের অধিকার; অথবা

(খ) কুয়ো, জলাধার (Tank), স্নানের ঘাট (bathing ghats), রাস্তা এবং সর্বসাধারণের জন্য সরকারের পুরো বা আংশিকভাবে অনুদানে চলা কোনো আশ্রয়ের জায়গা—এগুলির অধিকার থেকে অক্ষম, দায়ী, বিধি-আরোপিত এবং শর্তসাপেক্ষ করা যাবে না।

১৬ নং ধারা ঃ এই ধারানুসারে, সরকারী চাকরীর ক্ষেত্রে প্রতিটি নাগরিকের সমান সুযোগ আছে। এই ধারায় বর্ণিত মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হল—

১। রাষ্ট্রাধীন কোনো দপ্তরে চাকরি বা নিয়োজিত হওয়ার ক্ষেত্রে প্রত্যেক নাগরিকের সমান সুযোগ আছে।

২। শুধুমাত্র ধর্ম, জাতি, গোত্র, লিঙ্গ এবং জন্মের জায়গার ভিত্তিতে কোনো নাগরিককে রাষ্ট্রাধীন কোনো দপ্তরে চাকরী পাওয়ার ক্ষেত্রে অযোগ্য বলে বিবেচনা করা যাবে না।

১৭ নং ধারা অনুযায়ী অস্পৃশ্যতা নিষিদ্ধ হয়েছে এবং ১৮ নং ধারা মালিকানাকে নিষিদ্ধ করেছে।

১৯ নং ধারা সংবিধানের এই ধারাটিতেই মৌলিক অধিকারের আকর বিধৃত হয়েছে। এই ধারায় বর্ণিত মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হলো ঃ

(১) যে কোনো কিছু বলার এবং মতপ্রকাশের অধিকার।

(২) যে কোনো জায়গায় শান্তিপূর্ণভাবে এবং নিরস্ত্র অবস্থায় সমবেত হওয়ার অধিকার।

(৩) সংঘ তৈরি করার অধিকার।

(৪) ভারত ভূ-খন্ডের যে কোনো জায়গায় যাওয়ার অধিকার।

(৫) ভারত ভূ-খন্ডর যে কোনো জায়গায় বসবাস করার অধিকার।

(৬) যে কোনো জীবিকা গ্রহণের অধিকার, যে কোনো ব্যবসা বা বাণিজ্য করার অধিকার।

(৭) সম্পত্তি দখলের, নিজ মালিকানায় রাখার এবং বিক্রির অধিকার

তবে সংবিধানের মাধ্যমে এই মৌলিক অধিকার সুরক্ষিত হলেও এর পাশাপাশি সংবিধান। রাষ্ট্রকে যৌক্তিক নিষেধাজ্ঞা জারি করার ক্ষমতাও প্রদান করেছে যদি এই মৌলিক অধিকার বৃহত্তর গোষ্ঠীর বৃহত্তর স্বার্থকে ক্ষুণ্ন করে।

এভাবেই সংবিধান 'ব্যক্তিস্বাধীনতা' এবং 'সামাজিক নিয়ন্ত্রণ' (Social control)-এর মধ্যে ভারসাম্য তৈরির করার চেষ্টা করেছে কারণ সংবিধানের উদ্দেশ্যই হলো ভারতবর্ষকে মাঙ্গলিক রাষ্ট্র (welfare state) হিসাবে প্রতিষ্ঠা করা। সুতরাং সংবিধানে মৌলিক অধিকারগুলিকে সুরক্ষিত করে নিম্নলিখিত শর্তসাপেক্ষে—

(ক)	অবমাননা	(defamation)
(খ)	আদালতের আদেশ অমান্য করা	(contempt of court)
(গ)	শোভনতা বা নৈতিকতা	(decency or morality)
(ঘ)	রাষ্ট্রের নিরাপত্তা	(security of state)
(ঙ)	বিদেশী রাষ্ট্রের সঙ্গে বন্ধুতার সম্পর্ক	(friendly relations with foreign states)
(চ)	দপ্তরকে সক্রিয় করা	(incitement to an office)
(ছ)	গণফরমান।	(public order)
(জ)	ভারতের সার্বভৌমত্ব এবং সংহতি বজায় রাখা	(maintenance of sovereignty and integrity of India)

২০ নং ধারা ঃ এই ধারা অপরাধী হিসাবে সাব্যস্ত হওয়ার ক্ষেত্রে সুরক্ষা কে নিশ্চিত করে। এই ধারা অনুযায়ী, একই অপরাধ একাধিকবার ঘটলেও বিচারের সময় দুবার শাস্তি দেওয়া যাবে না এবং আত্মপক্ষ সমর্থনের সাক্ষ্যের উপস্থিতি যে কোনো বিষয়ের সময় বাধ্যতামূলক। এই ধারার মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হলো 'কোনো ব্যক্তিকেই, তার এমন কোনো কাজ যা ঘটার সময় বহাল থাকা আইন অনুযায়ী যদি আইন-লঙ্ঘনকারী হিসাবে প্রমাণিত হয়—সেইক্ষেত্র ব্যতিরেকে অপরাধী হিসাবে সাব্যস্ত করা যাবে না, আইন অনুযায়ী শাস্তির চাইতে বেশী শাস্তি দেওয়া যাবে না।

২১ নং ধারা ঃ এই ধারা ব্যক্তিস্বাধীনতাকে দু'ভাবে নিশ্চিত করছে। এই ধারানুযায়ী, কোনো ব্যক্তিকেই তার স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত করা যাবে না যদি না সেই ব্যক্তি আইনের চোখে অপরাধী না হয়। সেই সঙ্গে, ভিত্তিহীন কারণে গ্রেফতার এবং হেফাজতে রাখার জন্য কিছু নির্দিষ্ট আইনি সুরক্ষা। এই ধারাতে বর্ণিত মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হলো ঃ "কোনো ব্যক্তিকেই আইনে নির্ধারিত কারণ ছাড়া আর কোনোভাবেই তার জীবন এবং তার ব্যক্তিগত স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত করা যাবে না।

২২ নং ধারা ঃ এই ধারাটি ২০ নং ধারার সঙ্গে যুক্ত পূর্ণাঙ্গ রূপ দিয়েছে। প্রতিরোধমূলক বিলম্বীকরণ (Preventive Detentian) হলো এই ধারার মূল উদ্দেশ্য, যা আইন প্রণেতাদের হাতে দেওয়া হয়েছে একটি কর্তৃত্ব হিসাবে যার মাধ্যমে তাঁরা রাষ্ট্রের নিরাপত্তা, সর্বসাধারনের জন্য নির্দেশ, গোষ্ঠীর জন্য প্রয়োজনীয় পরিষেবার সরবরাহের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য আইন প্রণয়ন করতে পারেন। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে সেনাবাহিনী, বিদেশনীতির রক্ষণাবেক্ষণ। এই আইনের মাধ্যমে বিনা বিচারে সন্দেহভাজন কাউকে কারারুদ্ধ করা যায়, তার ব্যক্তিস্বাধীনতাকে অধিগ্রহণ করা যায়।

২৩ নং ধারা ঃ এই ধারার মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হলো 'মানুষ পাচার—ভিক্ষুক বা জোর করে কোনো শ্রমিক হিসাবে নিষিদ্ধ এবং এই ধারার লঙ্ঘন আইনত দন্ডনীয়। জনস্বার্থে রাষ্ট্র যদি কোনো সেবা আরোপ করে তবে কিছু করা যাবে না এবং রাষ্ট্র এক্ষেত্রে ধর্ম, জাতি, গোত্র, শ্রেণী ইত্যাদির প্রেক্ষিতে কোনো পার্থক্য করতে পারে না'।

২৩ নং ধারা ঃ এই ধারার মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হলো 'চোদ্দ বছরের কম কোনো বাচ্চাকে কারখানায়, খনিতে বা অন্য কোনো কায়িক কষ্টদায়ক এবং বিপজ্জনক কাজে নিযুক্ত করা যাবে না।'

২৫ নং ধারা—২৮ নং ধারা ঃ এই ধারাগুচ্ছ অনুযায়ী, উপলব্ধির স্বাধীনতা, যে কোনো পেশা অবলম্বন করার স্বাধীনতা, যে কোনো ধর্মমতে বিশ্বাস করার স্বাধীনতা, যে কোনো দাতব্য প্রতিষ্ঠান চালানোর স্বাধীনতা নিশ্চিত হয়েছে। কোনো ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান চালানোর জন্য রাষ্ট্র কোনো কর বসাতে পারবে না।

৩১ নং ধারা ঃ এই ধারা নিশ্চিত করছে সম্পত্তির অধিকারকে। সম্পত্তির অধিকার থেকে কোনো ব্যক্তিকে একমাত্র তখনই বঞ্চিত করা যাবে যদি সেই অধিকার জনস্বার্থকে ক্ষুণ্ণ করে এবং সেক্ষেত্রেও এই অধিকার অধিগ্রহণের জন্য ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। অর্থনৈতিক ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ এবং বিশ্রেণীকরণ করার উদ্দেশ্যে কৃষিক্ষেত্রের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত মালিকানার সর্বোচ্চ সীমা নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে।

৩২ নং ধারা এবং ২২৬ নং ধারা ঃ এই দুটি ধারা অনুযায়ী, সংবিধানে উল্লেখিত প্রতিটি অধিকারকে দেশের প্রতিটি ব্যক্তি যাতে রপ্ত করতে পারে—সেটি নিশ্চিত হয়েছে। যদি কোনো ব্যক্তি মনে করে যে সংবিধানের তৃতীয় খন্ড বর্ণিত তার কোনো অধিকার ক্ষুণ্ণ হয়েছে তাহলে সে সেই অধিকার পাওয়ার জন্য সুপ্রীম কোর্টে যেতে পারে।

৬.৩ মানবাধিকার এবং সংবিধান

মানবাধিকারের মূল নীতি হলো স্বাধীনতা এবং যা উৎসর্গীকৃত হয়েছে এই প্রস্তাবনায়—"সমস্ত মানুষ-ই সমান হিসাবে সৃষ্ট হয়েছে।" এই নীতিই প্রতিধ্বনিত হয়েছিলো Constituent Assembly of India তে, যখন স্বর্গীয় প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু সংবিধানের উদ্দেশ্য ঘোষণা করেছিলেন মহাত্মা গান্ধীর 'রামরাজ্য'-এর স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করা। 'রামরাজ্য' অর্থাৎ সমস্ত ভারতবাসীর কাছে সামাজিক এবং অর্থনৈতিক বিচার সম্ভবপর করে তোলা। 'রামরাজ্য'-এর মূল ধারণা হলো মানুষের মর্যাদাকে প্রতিষ্ঠিত করা এবং সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক শোষণ থেকে মুক্তি নিশ্চিত করা।

সংবিধানের মুখবন্ধের (Preamble) শুরুটা হচ্ছে এইভাবে ঃ-

"আমরা ভারতের মানুষরা শপথগ্রহণপূর্বক দৃঢ়সঙ্কল্প করছি ভারতবর্ষকে সার্বভৌম (Sovereign), সমাজবাদী (Socialist), ধর্মনিরপেক্ষ (Secular), গণতান্ত্রিক (democratic) এবং প্রজাতান্ত্রিক (republic) দেশে পরিণত করার এবং এই দেশের সমস্ত নাগরিকের কাছে—বিচার-সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক; স্বাধীনতা ভাবনার, প্রকাশের, বিশ্বাসের, আস্থার এবং পূজার; সাম্য—স্তরের এবং সুযোগের; এবং সবার ক্ষেত্রে প্রয়োগের জন্য; সৌভ্রাত্র—প্রতিটি ব্যক্তির মর্যাদা এবং দেশের ঐক্য এবং সংহতি নিশ্চিত করছি।"

এই ঘোষণাই সংবিধানের তৃতীয় খন্ডের মৌলিক অধিকারগুলি এবং চতুর্থ খন্ডের নির্দেশমূলক নীতিগুলিকে বারবার পুনরাবৃত্ত হয়েছে এবং এইগুলি সংবিধানের নৈতিক চেতনা নামে পরিচিত।

মৌলিক অধিকারগুলি যে অধ্যায়ে বিবৃত হয়েছে সেই অধ্যায়টি দেশের সামাজিক এবং রাজনৈতিক জীবনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দু'শো বছর ব্যাপী ব্রিটিশ শাসনে ভারতীয় নাগরিকেরা কখনোই রাজনৈতিক স্বাধীনতার স্বাদ পায়নি এবং সেই সময়ের সামাজিক ব্যবস্থা, দেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীকেই সামাজিক এবং অর্থনৈতিক স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত করেছিল। সংবিধান রচয়িতা শঙ্কিত হয়েছিলেন এই ভেবে যে, স্বাধীনতা উত্তর ভারতীয় জীবনে রাজনৈতিক স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠাই শুধু যে কষ্টকর তা নয়; বর্ণসমস্যা এবং অস্পৃশ্যতার কারণে সামাজিক এবং অর্থনৈতিক স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠাও অসুবিধাজনক হয়ে দাঁড়াবে। ফলতঃ, আমেরিকার সংবিধানের উচ্চ-আদর্শ, আইরিশ সংবিধানের বর্ণিত মূল অধিকারসমূহ থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে তাঁরা ভেবেছিলেন যে, এই স্বাধীনতাগুলি, তাদের পূর্ণমাত্রায় মৌলিক অধিকারের অধ্যায়ে থাকা উচিত। দেশের তত্ত্বাবধানের জন্য অর্থনৈতিক এবং সামাজিক বিচার নির্দেশমূলক নীতিতে অর্ন্তভুক্ত হয়েছিলো।

চুয়ান্ন বছর পরেও সংবিধান রচয়িতাদের দূরদৃষ্টির প্রমাণ মেলে। আইনি প্রতিবেদনের পাতায় পাতায় দেশের নীচু থেকে উঁচু অর্থাৎ সবস্তরে মানবাধিকার-এর উল্লেখ ও প্রয়োগের ব্যাপারে হাইকোর্ট এবং সুপ্রীম কোর্টের অসংখ্য ঘোষণা উল্লেখিত আছে। কিন্তু এর উদ্দেশ্য হলো এশিয়া এবং অপরাপর জায়গার মানুষদের, তাদের মৌলিক অধিকার এবং মানবমর্যাদা সম্পর্কে জাগিয়ে তোলা। আদালত এখানে গণতন্ত্র, মুক্তি এবং ব্যক্তি স্বাধীনতার অভিভাবক এবং প্রহরী, যেখানে কেন্দ্রের ও রাজ্যের আইন প্রণেতারা অসংখ্য আইন প্রণয়ন করেছেন সামাজিক এবং অর্থনৈতিক বিচারের উদ্দেশ্যে।

সংবিধান প্রণেতা বা তাঁদের জ্ঞান ও দূরদৃষ্টির জন্য তিনটি মহৎ আদর্শের উল্লেখ করেই থেমে যান নি. মানবাধিকার প্রয়োগ এবং মানব মর্যাদা সংরক্ষণ করার উপায় তাঁরা দিয়েছিলেন। আমাদের সংবিধানের অন্তর্গত শক্তির পরিচয় এখানেই যে, অনেক ঝড় ঝাপটা সামলে ভারতীয় সংবিধান এখন ফুল ফোটাচ্ছে পূর্ণমাত্রায়। 'মানবাধিকার' হিসাবে আমরা নীচের অধিকারগুলিকেই বিবেচনা করবো।

(1) মৌলিক অধিকার ঃ সংবিধানের তৃতীয় খন্ড বিধৃত মৌলিক অধিকার সমূহ, মানবাধিকার-এর মূল ভিত্তিকে নির্দেশ করে। মৌলিক অধিকার সমূহ বিবৃত হয়েছে ১৪ নং ধারা থেকে ২৮ নং ধারা অবধি, ৩১ নং ধারায়, ৩২ নং ধারায় এবং ২২৬ নং ধারায়।

ধারাগুলির প্রতিপাদ্য, এই লেখায়, আগে ব্যাখ্যাত হয়েছে।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, দেশে এখনো রয়ে যাওয়া অসাম্য এবং যাবতীয় বেমানান অবস্থাকে দূর করার জন্য রাষ্ট্র, আইন-প্রণেতাদের দ্বারা সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে, অনুন্নত সম্প্রদায় (Backward classes), তপশীলি জাতি, তপশীলি গোত্র, নারী এবং শিশু, দরিদ্র এবং প্রতিবন্ধীদের জন্য নির্বাচনের সময় ও পরবর্তী ক্ষেত্রে আইনসভায়, শিক্ষা-কেন্দ্রে এবং সরকারী পরিষেবা ও চাকরীতে আসন সংরক্ষণ করেছে। শ্রেণীহীন সমাজ গঠনের উদ্দেশ্যেই অস্পৃশ্যতাকে অপরাধ বলে গণ্য করা হয়েছে; একই কারণে পদবী প্রদান নিষিদ্ধ হয়েছে। যে কোনো নাগরিকের নির্বাচনে দাঁড়াবার (পঞ্চায়েত থেকে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন) অধিকার গৃহীত হয়েছে।

স্বাধীনতার ক্ষেত্রে, সংবিধান, আইন প্রণেতাদের ক্ষমতা দিয়েছে যাতে জনস্বার্থে প্রতিটি ব্যক্তি স্বাধীনতাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন। সুপ্রীম কোর্টের দৃষ্টিভঙ্গিতে, সংবিধান, ব্যক্তি স্বার্থের সাথে গোষ্ঠী স্বার্থের মেলবন্ধন করার আপ্রাণ চেষ্টা করেছে।

সংবিধানের ২০ নং ধারায় স্বাধীনতার সুরক্ষা এবং জীবনের অধিকারের (বিশদ ব্যাখ্যার জন্য 'সংবিধান' দ্রষ্টব্য) কথা বলা হয়েছে। স্বাধীনতার মাত্রা এবং গভীরতা বোঝা যায় ইদানীংকালে সুপ্রীম কোর্টে গৃহীত দুটি সিদ্ধান্তে— Menaka Gandhi Vs. Union of India এবং Sunil Batra Vs. State। এর মধ্যে Menaka Gandhi Case-তে ব্যক্তির বিদেশ ভ্রমণের অধিকার সমর্থিত হয়েছিলো। পর্যবেক্ষণ ছিলো নিম্নরূপ—

"এটা বিশ্বাস করা শক্ত যে, সংবিধান প্রণেতারা যখন এই অধিকারগুলি ঘোষণা করেছিলেন তখন তাঁরা সেগুলিকে শুধুমাত্র ভারত ভূখন্ডের ভিতর সীমাবদ্ধ রাখতে চেয়েছিলেন। বাকস্বাধীনতা এবং অভিব্যক্তির অধিকার বলতে মতপ্রকাশের অধিকার এবং কথনের এবং নিজেকে প্রকাশের অধিকারও বোঝায় যা দেশে ও বিদেশে উভয় ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। ভাবনা ও ধারণার আদানপ্রদান শুধুমাত্র ভারতে বসবাসকারী মানুষের মধ্যে নয়, অন্যদেশের মানুষের সঙ্গেও অনুমোদিত 'ভারত-ভূখন্ডের মধ্যে (in the territory of India)' শব্দটি যোগ করে সংবিধান প্রণেতারা আলাদা কোনো সীমা আরোপ করতে চাননি। বাকস্বাধীনতা, ভারতবর্ষ এবং ভারতবর্ষের বাইরে উভয় ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।'

সুনীল বাত্রা মামলায়, সুপ্রীম কোর্ট, তার ঘোষণার মাধ্যমে, এমনকি, আসামীদের প্রতিটি মৌলিক অধিকার সুনিশ্চত করেছে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, সংবিধানের ২২(১) ধারায় বলা হয়েছে যে, গ্রেফতার হওয়ার পর পুলিশী জিজ্ঞাসাবাদ চলাকালীন যে কোনো ব্যক্তির অধিকার আছে নিজের পছন্দের উকিলকে আত্ম সমর্থনের জন্য নিয়োগ করে। ২০ (১)/(৩) ধারা অনুযায়ী, পুলিশ, অভিযুক্ত ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসাবাদ করার সময়, যদি সেই ব্যক্তি চায়, তাহলে তার সেই ইচ্ছানুসারে তার মনোনীত উকিলকে, তার পাশে থাকতে দিতে বাধ্য এবং এটা তার অধিকার যা পুলিশ খর্ব করতে পারবে না।

বঞ্চনার বিরুদ্ধে অধিকার ২৩ ও ২৪ নং ধারা-তে সুনিশ্চিত হয়েছে; যেখানে বলা হয়েছে মানুষ এবং ক্রীতদাস এবং কোনো শিশুকে কোনো পরিশ্রমের কাজের জন্য পাচার করা যাবে না।

ধর্মের ক্ষেত্রে স্বাধীনতার অধিকার সুনিশ্চিত হয়েছে সংবিধানের ২৫ থেকে ২৮ নং ধারায়। এখানে বলা হয়েছে যে, ধর্মীয় কোনো প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠার সময় রাষ্ট্র কোনো কর চাপাতে পারবে না; কোনো শিক্ষাকেন্দ্র তার ছাত্রদের কোনো বিশেষ ধর্মীয় নির্দেশ দিতে পারবে না। সংবিধান, ভারতবর্ষকে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র হিসাবে ঘোষণা করেছে, ধর্মবিরোধী রাষ্ট্র হিসাবে নয়।

সম্পত্তির অধিকার সুনিশ্চিত হয়েছে সংবিধানের ৩১ নং ধারায়। ৩১ (ক), ৩১ (খ), ৩১ (গ) তৈরি হয়েছে কৃষিক্ষেত্রের পুনর্গঠনের উদ্দেশ্যে উপযুক্ত সংস্কারের মাধ্যমে। এই সংস্কারগুলির লক্ষ্য হলো কৃষিক্ষেত্রের উৎপাদন বাড়ানো এবং ভারতবর্ষকে স্বনির্ভর করে তোলা। সম্পত্তির অধিকার, সংবিধানানুসারে, মানুষের মর্যাদা রক্ষার জন্য অত্যাবশ্যক। যদিও, ৪৪ তম সংশোধনের মাধ্যমে সংবিধান সংবিধি (statute) বইতে পরিণত হয়েছে। সম্পত্তির অধিকার এখন আর মৌলিক অধিকার নয়, আইনি অধিকার।

সংবিধানের ৩২ নং এবং ২২৬ ধারায়, সাংবিধানিক উপায়ের অধিকার বিবৃত আছে। ইতিহাস সাক্ষী যে, সংবিধান বর্ণিত যে কোনো মানবাধিকার অর্থাৎ মৌলিক অধিকার অধরাই থেকে যাবে যদি প্রয়োগের সঠিক কৌশল ব্যবহৃত না হয়। 'সুবোধ গোপাল-মামলায়' এর ক্ষেত্রে সুপ্রীম কোর্টের পর্যবেক্ষণ থেকে সিদ্ধান্ত নেওয়া যায় যে, মৌলিক অধিকারগুলিকে অক্ষুণ্ণ রাখার নিশ্চিততম উপায় হলো সেগুলিকে সাংবিধানিক উপকরণ হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করা যতক্ষণ সেগুলিকে বলবৎ করার জন্য ফলদায়ক উপায় তৈরি না হয়। এই উদ্দেশ্যেই সংবিধান, স্বাধীন বিচারব্যবস্থা তৈরি করেছে এবং বিভিন্ন প্রকারের আদেশপত্র তৈরি করেছে যাতে মৌলিক অধিকারগুলি বলবৎ হয়।

সংবিধানের চতুর্থ খন্ডে আছে নির্দেশমূলক নীতি সমূহ যেগুলি দেশের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য মৌলিক এবং যা রাষ্ট্রকে বাধ্য করায় সেগুলিকে বলবৎ করতে। নির্দেশমূলক নীতিসমূহ-ই নাগরিকের সামাজিক, অর্থনৈতিক বিচার নিশ্চিত করে। রাষ্ট্র, সামাজিক বিধি এবং ক্রম-যার মধ্যে আছে দেশের জীবনের প্রতিষ্ঠানকে গঠন করা আর্থ-সামাজিক এবং রাজনৈতিক বিচার, বলবৎ করতে নির্দেশবদ্ধ। প্রতিটি মানবাধিকার তথা মৌলিক অধিকারসমূহ নির্দেশমূলক নীতিসমূহের মাধ্যমেই প্রতিষ্ঠিত হয় যা মানুষের মর্যাদা প্রতিষ্ঠার এবং সুখকে অনুসরণ করার জন্য দরকারী। এই লক্ষ্যকে পূরণ করার জন্য পার্লামেন্ট এবং রাষ্ট্রীয় আইনমন্ত্রক বহু আইনি ব্যবস্থা নিয়েছে।

স্বাধীন বিচারব্যবস্থার নিশ্চয়তা বলতে একক প্রাপ্তবয়স্ক সংস্থা এবং গণতান্ত্রিক সরকারকেই দেশ করেছিলো সংবিধান যেখানে মানবাধিকারের অলঙঘন নিশ্চয়তা পেয়েছিলো। প্রসঙ্গক্রমে বলা যায়, বিচার সিদ্ধান্ত সমগ্র ব্যবস্থার সামান্য অংশ যেটা নজরগ্রাহ্য। এটার মাধ্যমে এটাই ঘোষিত হয় যে, যে কোনো ভুলের সংশোধনের উপায় আছে। যে কোনো অপরাধ ভয়হীনতার একটা বাতাবরণ তৈরি করে এবং সেই জন্য ভয় দেখিয়ে সেই জাতীয় কাজ থেকে বিরত রাখাই হলো বিচার সিদ্ধান্তের উদ্দেশ্য। যদিও, গণতন্ত্র, বৃহত্তর জনমত এবং সচেতনতাই হলো মানুষের মূল্যবোধ

এবং নূন্যতম স্বাধীনতার রক্ষাকবচ। স্বাধীন বিচার ব্যবস্থার সৃষ্টির জন্য সংবিধান, ঊর্ধ্বতন এবং অধস্তন বিচার ব্যবস্থা তৈরি করেছে যাতে তৃণমূল স্তর থেকে উচ্চতম স্তর পর্যন্ত কোথাও মানবাধিকার লঙ্ঘিত না হয়। সেখানকার বিচারকদের ব্যবহার পার্লামেন্টে বা আইন মন্ত্রকে আলোচনাসাপেক্ষ নয়। যদিও, সুপ্রীম কোর্ট, ভারতের প্রধান বিচারপতির সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে তাদেরকে জনস্বার্থে অন্য কোথাও বদলি করতে পারেন।

সংখ্যালঘু এবং দুর্বল গোষ্ঠীদের অধিকারের সুরক্ষার জন্য সংবিধান বেশ কিছু স্বাধীন পর্ষদ তৈরি করেছে যেমন সংখ্যালঘু কমিশন, ভাষা কমিশন, তপশীলি জাতি এবং সম্প্রদায় কমিশন ইত্যাদি। এইভাবে মৌলিক অধিকার সমূহ ও নির্দেশমূলক নীতিসমূহ সংবিধানের আত্মা ও চেতনা গঠন করেছে।

সংবিধানের ৩৫৮ ধারাতেই, সংবিধান পরিমার্জনার কথা উল্লেখিত আছে। যদিও 'গোলোক নাথ মামলা' এর পরিপ্রেক্ষিতে সংবিধান রায় দিয়েছে যে, মানবাধিকার এবং মৌলিক অধিকারগুলি এতই মৌলিক যে, সংস্কার প্রক্রিয়ার সময়ে এদেরকে নিবৃত্ত করা যাবে না। যদিও 'কেশব নন্দ ভারতী' মামলায় এই দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তিত হয়েছে, বলা হয়েছে যে, যে যে মৌলিক অধিকারগুলি জীবন, স্বাধীনতা, মুক্তি এবং প্রতিরক্ষার সঙ্গে সম্পর্কিত শুধু সেগুলিকেই কখনো নিবৃত্ত করা যাবে না।

এমনকি, জরুরী অবস্থা চলাকালীন জীবনের প্রতি অধিকার এবং স্বাধীনতার অধিকারকে ক্ষুণ্ণ করা যাবে না।

সংবিধান প্রণেতারা মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণার মাধ্যমে এতোটাই উদ্দীপিত হয়েছিলেন যে শুধুমাত্র সংবিধান প্রণয়ন করেই তাঁরা থেমে যান নি; একটা সুষ্ঠ, সাম্য সমান গঠনের জন্য রাষ্ট্রকে নির্দেশ দিয়েছিলেন। অনেক ইতিবাচক পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে যাতে ব্যক্তি নির্যাতন রোধ করা যায়। এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য ক্রীতদাস নিষিদ্ধকরণ আইন, পণপ্রথা নিবারণ আইন, নারীপাচার নিষিদ্ধকরণ আইন প্রকৃতি এবং অনেক কল্যাণমূলক পরিমাপ যেমন ন্যূনতম বেতন আইন, কর্মীদের প্রভিডেন্ট ফান্ড আইন প্রভৃতি। অপরাধ আইনও অনেক সংশোধিত হয়েছে যাতে বিচার ব্যবস্থা আরো সুষ্ঠ হয়। এই সমস্ত আইন প্রণীত হয়েছে পার্লামেন্ট থেকে এবং বলা বাহুল্য যা দিল্লীতে অবস্থিত; সুতরাং বলা যায়, ভারতের রাজধানীই মানবাধিকারের বিকীরণ কেন্দ্র। প্রসঙ্গতঃ ১৯৮৫-এর জুলাই মাসে, জাস্টিস ভগবতী পরামর্শ দিয়েছিলেন যে, যদি জাতিপুঞ্জ মানবাধিকার কমিশনার নিয়োগ না করে তাহলে দেশের উচিত মানবাধিকারের ন্যাশনাল কমিশনের সাথে একজন চেয়ারম্যানকে নিয়োগ করা।

এইভাবে মানবাধিকারের রক্ষণাবেক্ষণে সংবিধান তার ভূমিকা পালন করে চলেছে যাতে মনুষ্যত্বের মৌলিক নিয়মের প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে নবযুগের সূচনা করা যায় যা মানব জাতি, প্রবক্তা প্রভৃতি মানবাধিকারের এককতার ওপর নির্ভরশীল।

৬.৪ মানবাধিকার এবং সমাজ কর্ম

প্রথমেই বলা প্রয়োজন, সোশ্যাল ওয়ার্ক আজ শুধুমাত্র সমাজ সেবা নয়। সোশ্যাল ওয়ার্ক এখন পেশা এবং প্রফেশনাল সোশ্যাল ওয়ার্কের প্রাথমিক শর্তই হলো বিজ্ঞান ভিত্তিক জ্ঞান—যেটা বিবিধ ব্যবহারিক বিজ্ঞানের ওপর ভিত্তি করে দাঁড়িয়ে আছে। (উদাহরণ হিসাবে সমাজতত্ব, অর্থনীতি, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, মনস্তত্ব, পরিসংখ্যানবিদ্যা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য)। একজন প্রফেশনাল সোশ্যাল ওয়ার্কারের বহুমাত্রিক জ্ঞানের মধ্যে একটি অবশ্য অন্তর্ভুক্ত বিষয় হলো সমাজকল্যাণ নীতি এবং পরিষেবা। সুতরাং এই বিষয়টির পরিপ্রেক্ষিতে মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় সোশ্যাল ওয়র্ক পেশা হিসাবে কিভাবে তার অবদান রেখেছে সেটি আলোচনা করা জরুরি।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, জীবিকা আর পেশা এক নয়। **একটি জীবিকা** পেশা হয়ে ওঠে যখন তার মধ্যে আমরা—বিশেষ

জ্ঞান, বিশেষ প্রশিক্ষণ, নিজস্ব ক্ষেত্রে কাজ করার বিশেষ ক্ষমতা, পেশাগত সংস্থা, পেশাগত নীতিজ্ঞান এবং সামাজিক স্বীকৃতি—এই ছ'টি বৈশিষ্ট্য স্পষ্টতঃ দৃষ্টিগ্রাহ্য হয়। যেহেতু সোশ্যাল ওয়র্ক একটি পেশা হিসাবে যাবতীয় বিজ্ঞানভিত্তিক জ্ঞান এবং দক্ষতার মাধ্যমে ব্যক্তির বা দলের বা গোষ্ঠীর সমস্যাকে নির্দেশ করে এবং সেই সমস্যার সমাধানের সঠিক পথ-নির্দেশ দিয়ে সেই ব্যক্তি বা দল বা গোষ্ঠীর সামগ্রিক সামাজিক ক্রিয়াকে উন্নততর করে তোলে এবং সেই ব্যক্তি বা দল বা গোষ্ঠীকে এমন ভাবে সাহায্য করে যাতে ভবিষ্যতে তারা যে কোনো সমস্যার সমাধান নিজেরাই করতে পারে অর্থাৎ সামগ্রিক সামাজিক ক্রিয়ার প্রেক্ষিতে স্বাবলম্বী হয়ে ওঠে; তাই পেশাগত শিক্ষাদানের সময় থেকেই এই ছ'টি বিষয় সোশ্যাল ওয়র্কের মধ্যে বর্তমান। পেশাগত সমাজ কর্মের মূল্যবোধগুলিকে তিনটি বিভাগে ভাগ করা যায়। ১) নিগূঢ় মূল্যবোধ (যেমন গণতন্ত্র, বিচার, স্বাধীনতা) ২) মধ্যবর্তী মূল্যবোধ (ভালো পরিবার, ভালো গোষ্ঠী) ৩) সহায়ক মূল্যবোধ (যেমন, ভালো সরকার বা পেশাদারের বৈশিষ্ট্য)

পেশা হিসাবে সমাজ কর্মের মূল্যবোধগুলি নিম্নরূপ ঃ

(ক) পরিষেবা ঃ সমস্যায় পড়া মানুষকে সাহায্য করা এবং সমস্যাকে সঠিক ভাবে চিহ্নিত করা সোশ্যাল ওয়র্কের প্রদেয় পরিষেবার মধ্যে অন্যতম। একজন প্রফেশনাল সোশ্যাল ওয়ার্কার তার ব্যক্তিস্বার্থের এবং ব্যক্তি পছন্দের উর্ধ্বে রাখতে এই পরিষেবা প্রদানের উদ্দেশ্যকে। এই প্রসঙ্গে মানবাধিকার কনভেনশনের ধারা ২, ধারা ৩, ধারা ৬, ধারা ৮ স্মর্তব্য। একজন পেশাগত সমাজকর্মীর প্রদেয় পরিষেবাগুলি মূলতঃ এই ক্ষেত্রগুলিতেই দেখা যায়।

(খ) সামাজিক বিচার ঃ যে কোনোরকম সামাজিক অবিচারের প্রতিবাদে করাই হলো প্রফেশনাল সোশ্যাল ওয়ার্কারের দায়িত্ব। এ জন্য প্রতিটি মানবাধিকার, সংবিধানে উল্লেখিত মৌলিক অধিকারসমূহ এবং নির্দেশমূলক নীতিসমূহ এবং তাদের শেষতম সংশোধন এবং সাধারণ আইন জানা তার দরকার। অবদমিত ব্যক্তির প্রতি অত্যাচার, দারিদ্র্য, প্রভৃতির বিরুদ্ধে একজন প্রফেশনাল সোশ্যাল ওয়ার্কার, তার শেখা জ্ঞান, সব্বা অভিজ্ঞতার মাধ্যমে প্রতিবাদ করবে। এ প্রসঙ্গে মানবোধিকার কনভেনশনের প্রায় প্রতিটি ধারাই, বিশেষতঃ ধারা ২, ধারা ৩, ধারা ৪, ধারা ৫, ধারা ৮, ধারা ৯, ধারা ১০, ধারা ১১, ধারা ১২, ধারা ১৩, ১৯৫২ সালে যুক্ত হওয়া ধারা ১, ধারা ২, ফোর্থ প্রোটোকলের ধারা ২ উল্লেখযোগ্য।

(গ) মানুষের মর্যাদা ঃ একজন প্রফেশনাল সোশ্যাল ওয়ার্কার মানুষের ওপর অর্ন্তনিহিত মর্যাদাকে সম্মান করবে, তাদের সাংস্কৃতিক পার্থক্যকে বুঝবে, প্রতিটি মানুষই যে একে অন্যের থেকে আলাদা সেটা উপলব্ধি করবে। এ প্রসঙ্গে মানবাধিকার কনভেনশনের ধারা ২ এবং ধারা ৯ তাকে বিশেষভাবে সহায়তা করে।

পেশাদার সমাজ কর্মের মূল্যবোধের মধ্যে উপরে উল্লেখিত তিনটি মূল্যবোধকে একজন পেশাদার সমাজকর্মী এমন ভাবে তার কাজের মধ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠা করবে যাতে মানবাধিকার কনভেনশনে উল্লেখিত অধিকারগুলি বাস্তব পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং প্রতিটি মানুষ সেই অধিকারগুলির সাথে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে। এ কথা স্বীকার্য যে, অন্যথায়, অধিকারগুলি, কনভেনশনের পাতায় লিখিত এক তত্ত্ব হিসাবেই রয়ে যাবে। সেগুলিকে বাস্তবায়িত করার অন্যতম দায়িত্ব একজন প্রফেশনাল সোশ্যাল ওয়ার্করের।

পেশাদার সমাজ কর্মের নীতিজ্ঞান আলোচনা করলে আমরা 'মানবাধিকার' প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সোশ্যাল ওয়র্কের ভূমিকা আরো ভালোভাবে বুঝতে পারব। তবে তার আগে আমাদের জেনে নিতে হবে মূল্যবোধ, ঘটনা (facts), অধিকারের মধ্যে পার্থক্যটাকে। 'মূল্যবোধ' হলো 'ঔচিত্য বোধ' অর্থাৎ যা হওয়া উচিত বা কাম্য; সেক্ষেত্রে 'ঘটনা' হলো ঠিক যা ঘটেছে। 'মূল্যবোধ' হলো মানুষের তাবৎ প্রয়োজনকে সর্বতভাবে মেটানোর জন্য কাঙ্খিত পরিবেশের প্রকাশ; যেখানে 'অধিকার' হলো সামাজিক সম্পদগুলোকে পাওয়ার জন্য আইনানুগ প্রত্যাশা। অপরপক্ষে 'নীতিজ্ঞান'

হলো মার্জিত এবং প্রত্যাশিত ব্যবহারসমূহ; এ প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার 'নীতিজ্ঞান' সবসময় ক্রিয়াকেন্দ্রিক (action oriented) 'নীতিজ্ঞান' কখনোই তাত্ত্বিক হতে পারে না যেখানে 'নীতিসমূহ' (principle) তাত্ত্বিক কেননা এটার জন্ম 'মূল্যবোধ' থেকে। যাই হোক, প্রফেশনাল সোশ্যাল ওয়ার্কের 'নীতিজ্ঞান' তে স্পষ্ট উল্লেখিত এবং এখানে প্রাসঙ্গিক বিষয়গুলি নীচে লেখা হলো—

১। পেশাদার সমাজকর্ম সাধারণ মানুষের জন্যই নির্ধারিত (public work)।

২। পেশাদার সমাজকর্ম সবসময়ই মানবিকভাবে ও গণতান্ত্রিক আদর্শ নিয়ে তার কাজকে গ্রহণ করবে। এটি ধারা ৩, ধারা ৫ কে আরো জোরদার করে তুলছে।

৩। অন্যের অনুভূতি ও মননের প্রসঙ্গে একজন পেশাদার সমাজ কর্মের সবসময় সংবেদনশীল থাকবে। এ প্রসঙ্গে স্বাতন্ত্র্য ধারা ৮, ৯, ১০ যা বাস্তবায়িত হচ্ছে এই নীতিজ্ঞানের মাধ্যমে।

৪। প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যে নিহিত 'আলাদা সত্ত্বা'-কে একজন পেশাদার সমাজ কর্মী সবসময় সচেতনভাবে মনে রাখবে এবং ফলতঃ তার ব্যবহারিক ধরন বহুমাত্রিক হবে।

৫। অন্যের সমস্যার জন্য তখনই এবং একমাত্র তখনই একজন পেশাদার সমাজকর্মী সমাধানের রাস্তা দেখাতে সাহায্য করবে যখন সেই ব্যক্তির/দলের/গোষ্ঠীর সমর্থন থাকবে। এটি সুদৃঢ় করছে মানবাধিকার কনভেনশনের ধারা ৬, ধারা ১৩।

'মানবাধিকার' কে বাস্তবায়িত করে তোলার ক্ষেত্রে পেশাদার সমাজ কর্মের গুরুত্বপূর্ণ যে অবদান রেখেছে সেটা সবচেয়ে স্পষ্টভাবে উপলব্ধ হয় যখন আমরা এর নীতিসমূহকে বিবেচনা করব। নীতিসমূহ হলো সমাজ কর্মের নির্দেশিকা অথবা বলা যায় নীতিসমূহ হলো আনুমানিক এবং পরীক্ষিত প্রকল্পসমূহ যা পেশাগত সমাজ কর্মকে প্রয়োগগত দিক থেকে সঠিক করে তোলে।

১। প্রতিটি ব্যক্তির মর্যাদার নীতি ঃ বলাই বাহুল্য, এই নীতি 'মানবাধিকার কনভেনশনের' ২ নং ধারা এবং ৮নং ধারাকে প্রতিষ্ঠিত করছে; যেখানে, এই নীতি একজন পেশাগত সমাজকর্মীকে নির্দেশ দিচ্ছে যে, প্রতিটি ব্যক্তি/দল/গোষ্ঠীর নিজস্ব মর্যাদাকে সম্মান করতে হবে।

২। গ্রহণের নীতি ঃ

এই নীতি অনুযায়ী, ধর্ম, শ্রেণী, ধর্মবিশ্বাস, জন্মস্থান ইত্যাদির নির্বিশেষে কোনো ব্যক্তি বা দল বা গোষ্ঠীকে তাদের অবস্থায় একজন পেশাগত সমাজকর্মী গ্রহণ করবে। এটি সম্ভব যদি প্রত্যেকের মর্যাদার প্রতি তার সম্মান সম্ভবপর হয়।

৩। স্ব-নির্ণয়ের নীতি ঃ

এই নীতি অনুযায়ী, একজন ব্যক্তি বা দল বা গোষ্ঠীকে একজন পেশাগত সমাজকর্মী এমনভাবে স্বাবলম্বী করে তুলবে যাতে সমস্যাকে ঠিকভাবে চিহ্নিত করার পর সেই ব্যক্তি/দল/গোষ্ঠী নিজেই সমাধানের পথ খুঁজে বার করতে পারে। পেশাগত সমাজকর্মী শুধুমাত্র সমাধানের সম্ভাব্য পথগুলি জানাতে পারে কিন্তু নির্বাচন বা বর্জনের অধিকার এবং ক্ষমতা—দুটোই যেন ক্লায়েন্টের থাকে। এই নীতি যেমন একদিকে সুবিচার পাওয়ার অধিকার (ধারা ৬) কে নিশ্চিত করে পাশাপাশি উপলব্ধির স্বাধীনতাকেও (ধারা ৯) নিশ্চিত করে।

৪। অনুভূতির সঠিক প্রকাশের নীতি ঃ এই নীতি গ্রহণের এবং অংশগ্রহণের প্রয়োজনীয়তাকে সূচিত করে। একজন পেশাগত সমাজকর্মী তার ক্লায়েন্টকে এমনভাবে সাহায্য করবে যাতে অনুভূতির সেইমতো প্রকাশ হয় যা তার সমস্যার সমাধানের জন্য কার্যকরী। এইজন্য, প্রাথমিকভাবে, একজন সমাজ কর্মীর কর্তব্য হলো তার ক্লায়েন্টের মানুষ

হিসাবে প্রতিটি অনুভূতিকে প্রকাশ করার জন্য উৎসাহিত করা যা থেকে প্রাসঙ্গিকটুকু উঠে আসবে বারংবার যোগাযোগের মাধ্যমে। এই নীতি মানবাধিকার কনভেনশনের ধারা-৮, ধারা ১০ কে সুদৃঢ় করছে।

৬.৫ সামাজিক ন্যায়

সামাজিক বিচার, সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গিতে, হলো যে কোনোরকম অবিচার, অসম্পূর্ণ বিচারের সংশোধন। এই অসম্পূর্ণ বিচার; অবিচার বা এমনকি, ভুল বিচার ঘটে থাকে মানুষের ব্যক্তিগত সম্পর্কের মধ্যে। সুতরাং সামাজিক বিচার, মানুষের ব্যক্তিগত সম্পর্কের নিরিখে বিচারের বৈষম্য দূর করে মানুষের ব্যক্তিগত সম্পর্কের উন্নতিসাধন করে। আমরা জানি যে, যেহেতু ব্যক্তিগত সম্পর্কের উন্নতি আসলে সামগ্রিক মানবোন্নয়নের অন্যতম শর্ত তাই মানুষের পরিপূর্ণ বিকাশের জন্য সামাজিক বিচার অত্যাবশ্যক।

যদিও এখন, 'সামাজিক বিচার' শব্দটি মানুষের অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং রাজনৈতিক জীবনের যে ভারসাম্যহীনতা দূর করার জন্য ব্যবহৃত হচ্ছে। সামাজিক বিচারের অন্যতম শর্ত হলো অনগ্রসরদের প্রয়োজনীয় সাহায্য দেওয়া যাতে তারা বেঁচে থাকার জন্য দরকারী প্রতিটি সুযোগ সমানভাবে পেতে পারে। বর্তমানে 'সামাজিক বিচার' শব্দটি বলতে বোঝায় কোনো সার্বজনীন মাঙ্গলিক লক্ষ্যকে পৌঁছানোর জন্য একটি সমবেত প্রতিজ্ঞা।

এই প্রসঙ্গে, সুপ্রীম কোর্টের একটি পর্যবেক্ষণ এইরকম ঃ 'যতোদিন কলকারখানাতে ব্যক্তিগত মালিকানা এমন অনুপাতে থাকবে যাতে আমাদের দেশের আর্থিক কাঠামোতে তার গুরুতর প্রভাব থাকবে, ততোদিন, এমনকি, সংবিধানের মুখবন্ধে 'সমাজতান্ত্রিক'—এই শব্দটা যোগ করার পরেও, সমাজতন্ত্রের কোনো লক্ষণই দেখা যাবে না বা ব্যক্তিগত মালিকানার বা ব্যক্তিগত অধিগ্রহণের স্বার্থকে দূর করবার মতো স্তরে সামাজিক বিচার প্রতিষ্ঠিত করা যাবে না।'

সুতরাং, এটা বোঝা যাচ্ছে যে, সামাজিক বিচারকে বাস্তবায়িত করার প্রথম শর্ত হলো অর্থনৈতিক বিচার। অর্থনৈতিক বিচার সুষম হলে মানুষকে মানসিকভাবে উন্নত করে তোলা সম্ভব। অর্থনৈতিক বিচারের প্রাথমিক শর্ত হলো অর্থনৈতিক বন্টন বা আয় বন্টন। এটা বলা হয়ে থাকে, আয় বন্টন সুষম হলে অনগ্রসরদের আয় বাড়বে, ফলে ব্যয় বাড়বে এবং সঞ্চয় বাড়বে। এখন ব্যয় বাড়লে ভোক্তা দ্রব্যের চাহিদা বাড়বে। সেই বর্ধিত চাহিদা মেটানোর জন্য প্রয়োজন বাড়তি জোগানের। বাড়তি যোগান তখনই সম্ভব যদি, একমাত্র, উৎপাদন বাড়ে। আবার উৎপাদন বাড়ার জন্য প্রয়োজন বাড়তি বিনিয়োগ। এখন, এই বাড়তি বিনিয়োগ সম্ভব হবে যদি জাতীয় আয়ের সুষম বন্টন হয়। কারণ সেই সুষমভাবে বন্টিত আয়, সঞ্চয়কে বাড়াবে।

আয় বন্টন করা সম্ভব হবে যদি চাকরী তৈরি (employment generation) করা যায়। এই উদ্দেশ্যে, উৎপাদনের চারটি স্তম্ভ (factor of production) যথা জমি, শ্রম, মূলধন এবং এন্টারপ্রাইজের সর্বোচ্চ ব্যবহার একান্ত জরুরি। জমি থেকে ভাড়া, শ্রম থেকে মজুরী, মূলধন থেকে ইন্টারেস্ট এবং এন্টারপ্রাইজ থেকে লাভ উদ্ভুত হয়। আয় বন্টনের জন্য এগুলোকেই বাড়াতে হবে।

যাই হোক, সামাজিক বিচার বলতে একনজরে আমরা যা বুঝি—

১। ধর্ম, জাতি, গোত্র, লিঙ্গ এবং জন্মগ্রহণের জায়গার ভিত্তিতে সাম্যতা।

২। চাকরী পাওয়ার অর্থাৎ অর্থনৈতিকভাবে স্বনির্ভর হওয়ার সমানাধিকার।

৩। স্বাধীন কথন ও মত প্রকাশ।

৪। যে জায়গাতে শান্তিপূর্ণ ও নিরস্ত্রভাবে সম্মিলিত হওয়ার সমানাধিকার।

৫। দেশের মধ্যে যে কোনো জায়গায় যাওয়া-আসার অবাধ স্বাধীনতা।

৬। দেশের মধ্যে যে কোনো জায়গায় বসবাস করার অবাধ স্বাধীনতা।

৭। যে কোনো জীবিকা অবলম্বন করার অবাধ স্বাধীনতা।

৮। আইনি প্রতিরক্ষার অবাধ স্বাধীনতা।

৯। শিশুদের প্রতি যে কোনো অবদমনকে প্রতিরোধ করা।

লক্ষ্যণীয় সামাজিক বিচারের অন্যতম শর্তসমূহ হিসাবে উপরে যা উল্লেখ করা হল, ভারতীয় সংবিধানের তৃতীয় খন্ডে এগুলি 'মৌলিক অধিকার' হিসাবে চিহ্নিত। এছাড়াও, দেশের রাজনৈতিক কর্মকান্ডে যথা ভোটাধিকার, নির্বাচনে প্রার্থী হিসাবে জায়গা পাওয়ার অধিকার অর্থাৎ রাজনৈতিক বিচার ও সুষম সামাজিক বিচারের অর্ন্তভুক্ত।

৬.৬ সংবিধান এবং অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ন্যায় বিচার

ভারতীয় সংবিধানের মুখবন্ধে ভারতবর্ষকে যে গণপ্রজাতন্ত্রী হিসাবে বলা হয়েছে তা শুধু রাজনৈতিক নয়, সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকেও। অন্যভাবে বললে, এটা শুধু যে সরকারের গণতান্ত্রিক গঠনকে নিশ্চিত করে তা নয়, এটা গণতান্ত্রিক সমাজকেও নির্দেশিত করে যা বিচার, স্বাধীনতা, সাম্য এবং সৌভ্রাত্রের ধারণার মিলিত প্রয়াস।

রাজনৈতিক বিচার ঃ গণপ্রজাতন্ত্রের আদর্শ, যা সংবিধানের মুখবন্ধে নির্দেশিত, সবথেকে ভালো ব্যাখ্যাত হবে সর্বজনীন ভোটাধিকারের সূত্রে। এই সর্বজনীন বা সারা দেশে একই রকম ভোটাধিকারের (universal sulfrage) লিঙ্গভিত্তিক সাম্য শুধু যে আইনের কাছে—তা নয়, এটা রাজনৈতিক মহলেও প্রযোজ্য। সংবিধানের মুখবন্ধে উল্লেখিত 'রাজনৈতিক বিচার' কে নিশ্চিত করার জন্য যা প্রয়োজন তা হলো, ভারতীয় ভূ-খন্ডে যে কোনো ব্যক্তির, সে তার শিক্ষাগত যোগ্যতা যাই হোক না কেন, রাজনৈতিক কান্ডে অংশগ্রহণ করার জন্য অন্য ব্যক্তির মতোই সমান সুযোগ তার থাকা উচিত। ভোটাধিকারের বয়সকেও, এই একই কারণে, সবজায়গায় এক রাখা হয়েছে। এটা বোঝাচ্ছে যে, প্রতি পাঁচ বছর অন্তর কেন্দ্র এবং রাজ্যের আইন মন্ত্রকের সদস্যরা সারা দেশের সমস্ত প্রাপ্তবয়স্ক মানুষদের মাধ্যমে নির্বাচিত হবেন। এই নির্বাচন হবে 'একটি মানুষ, একটি ভোট'—এই নীতি অনুযায়ী।

সামাজিক বিচার এবং গণতান্ত্রিক সমাজ ঃ প্রতিটি পুরুষ ও নারীকে, তাদের জাত, গোত্র, ধর্মবিশ্বাস নির্বিশেষে সমান সুযোগ দেওয়া, বিশেষ করে সরকারী চাকরীর ক্ষেত্রে, গণতান্ত্রিক আদর্শকেই প্রতিষ্ঠিত করে। সাংবিধানিক সুরক্ষা ছাড়াও, সংখ্যালঘুদের সাথে আচরণবিধি খুবই স্পষ্টভাবে ইঙ্গিত করে যে ক্ষমতাসীন ব্যক্তিদের দ্বারা সংবিধানের দর্শন লঙ্ঘিত হবে না। ঘটনা হলো যে, কেন্দ্র ও রাজ্য—উভয় ক্ষেত্রেই সংবিধানের নির্দেশ মেনেই মুসলিম এবং খ্রীষ্টান গোষ্ঠী থেকে নির্বাচিত সদস্যরা মন্ত্রীপর্ষদের (Council of ministers) এর মধ্যে অর্ন্তভুক্ত। একই কথা প্রযোজ্য সুপ্রীম কোর্ট এবং (diplomatic mission) এর সদস্যের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। এই প্রসঙ্গে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, সাংবিধানিক সংরক্ষণ ছাড়াই, যারা কর্মরত তাদের প্রকৃত চেতনাকে সংবিধান কখনোই অগ্রাহ্য করবে না অর্থাৎ প্রত্যেক নাগরিক যেন ভারতবর্ষকে নিজের দেশ বলে মনে করে।

এইভাবে 'মাঙ্গলিক রাষ্ট্র' (Welfare state) এর ধারণার মাধ্যমে, গণপ্রজাতন্ত্র বলতে বোঝায় সবার জন্য কল্যাণকে (good for all) যেটা রাজ্যের নির্দেশমূলক নীতি উদ্দীপিত করে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, সংবিধানের ১৫ নং—১৯নং ধারায় বিধৃত মৌলিক অধিকারগুলি সামাজিক বিচারকে নিশ্চিত করছে যাতে প্রতিটি নাগরিক সেইসব স্বাধীনতাগুলির প্রতিটি নিয়ে বাঁচতে পারে যেগুলি তাদের জীবনকে উন্নতি, উৎকর্ষ, সামাজিক নিরাপত্তাবোধে পরিপূর্ণ করবে।

অর্থনৈতিক বিচার ঃ দারিদ্র্য দূরীকরণের জন্য বিত্তবানদের দখলচ্যুত করার বদলে, ভারতীয় সংবিধান অনুযায়ী, জাতীয় সম্পদের বৃদ্ধিকে এবং উৎপাদন ব্যবস্থার সঙ্গে জড়িত সবার মধ্যে (resources) এর সমসত্তব বিভাজনকেই (equitable distribution) রাষ্ট্র তার নির্দেশমূলক নীতিতে লক্ষ্য হিসাবে রেখেছে। বলা হয়েছে যে, এই লক্ষ্য পূরণ হলেই ভারতীয় উপমহাদেশে অর্থনৈতিক গণতন্ত্র (Economic democracy) প্রতিষ্ঠিত হবে।

এই ধারণানুসারে, গণতন্ত্র কখনোই আসতে পারে না যদি না কিছু ন্যূনতম অধিকার, যেগুলি মুক্ত এবং সভ্য বেঁচে থাকার জন্য জরুরি, একটা গোষ্ঠীর প্রতিটি ব্যক্তির জন্য প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। এই ন্যূনতম প্রয়োজনীয় মৌলিক অধিকারগুলি সংবিধানের মুখবন্ধে উল্লেখিত হয়েছে ঃ ভাবনা, মতপ্রকাশ, বিশ্বাস, আস্থা এবং পূজার অধিকার। এগুলি রাষ্ট্রের যাবতীয় ক্ষমতার পরিপ্রেক্ষিতেই নিশ্চিত করা হয়েছে সংবিধানের তৃতীয় খন্ডে এবং সবার জন্য কল্যাণের উদ্দেশ্যে নির্দেশমূলক নীতি বাস্তবায়িত করা হয়েছে।

তবে প্রতিটি ব্যক্তির জন্য কিছু অধিকারকে নিশ্চিত করা কোনো কাজে আসবে না যদি না সামাজিক কাঠামো থেকে সকল অসমতা দূরীভূত হয় এবং প্রতিটি ব্যক্তির জন্য সমান মর্যাদা এবং তার মধ্যে প্রচ্ছন্ন যাবতীয় উন্নয়নের জন্য সমান সুযোগ এবং তার জন্য নিশ্চিত অধিকারগুলিকে প্রতিষ্ঠা করার পদ্ধতি নিশ্চিত হয়। এটাই সংবিধানে উল্লেখিত হয়েছে যাতে নাগরিকদের মধ্যে রাষ্ট্র কোনো অনৈতিক পার্থক্য করতে না পারে।

উপরে বলা সামাজিক বিচারের পাশাপাশি, সংবিধান, সমস্ত প্রাপ্তমনস্ক ও প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিকদের জন্য রাজনৈতিক সাম্যকে প্রতিষ্ঠা করেছে যাতে সাধারণের জন্য সাম্য আনা যায়। এছাড়াও সংবিধান লক্ষ্য রেখেছে যাতে কোনো নাগরিকই তার সাধারণ নির্বাচকের ভূমিকা থেকে অপসৃত না হয় অথবা ধর্ম, জাতি, গোত্র বা লিঙ্গের ভিত্তিতে কোনো বিশেষ নির্বাচক ভূমিকায় অন্তর্ভুক্ত না হয়।

আবার, অর্থনৈতিক বিচার সমান হলে তবেই একমাত্র সামাজিক বিচার পূর্ণতা পাবে। অর্থনৈতিক গণতন্ত্রের জন্য, নির্দেশমূলক নীতি (ভাগ-IV)- তে পরিষ্কার ভাবে বলা আছে যে, রাষ্ট্র, অর্থনৈতিক মর্যাদার ক্ষেত্রে দু'টি লিঙ্গকেই যেন সমানভাবে দেখে এবং প্রতিটি পুরুষ এবং নারীর অধিকার সমান এবং একই কাজ করার জন্য একই মজুরী পাওয়ার অধিকারও প্রযোজ্য।

এখন প্রশ্ন হলো, এইসব অধিকার কি ভাবে প্রতিষ্ঠিত হবে। কল্যাণকর বা মাঙ্গলিক রাষ্ট্র হিসাবে ভারতবর্ষকে প্রতিষ্ঠা করার উপায় ঠিক করতে গিয়ে সংবিধান ক্রমশঃ 'সমাজ প্রধান অবস্থা' থেকে 'সমাজবাদে'-র দিকে এগিয়েছে। অর্থাৎ বেসরকারী কারখানা এবং শিল্পকে রাষ্ট্রাধীন করে তোলা এবং বাণিজ্য ও ব্যবসাকে রাষ্ট্রের একটা কাজ হিসাবে পরিণত করা সংবিধানের মাধ্যমেই সম্ভবপর হয়েছিলো। সম্পত্তির ব্যক্তিগত মালিকানা নিষিদ্ধ না হলেও, রাষ্ট্র, সেটাকে একটা সীমার মধ্যে বেঁধে দেয় জাতির বৃহত্তর স্বার্থকে মাথায় রেখে যার মাধ্যমে দরিদ্রের উন্নয়ন সম্ভবপর হয়। সুতরাং, এভাবেই রাষ্ট্রকে একটা মিশ্র অর্থনীতির দিকে এগিয়ে দেয় সংবিধান। যদিও ১৯৯২ সালের পর থেকে অর্থনীতির প্রবণতা সমাজবাদ থেকে সরে বেসরকারীকরণের দিকে ঝুঁকতে থাকে। সরকারী ক্ষেত্রের বিনিয়োগ কমতে শুরু করে ব্যক্তিগত স্বার্থে এবং অনেক কারখানা এবং পরিষেবা, যা এতোদিন একান্তই রাষ্ট্রাধীন ছিলো, ক্রমশঃ বেসরকারী মালিকানার কাছে উন্মুক্ত হতে শুরু করে। কিন্তু রাষ্ট্রের অধিগ্রহণের জন্য ব্যক্তিগত মালিকানাকে প্রদেয় ক্ষতিপূরণের সাংবিধানিক বাধ্যতা (৩১ নং ধারা) ফিরিয়ে নেওয়া হয়।

সংবিধানে একতার কথা সুস্পষ্টভাবে উল্লেখিত। 'ঐক্য' (unity)-র সাথে 'সংহতি' (integrity)-এর কথাও সংবিধানে বলা হয়েছে। কিন্তু ভারতবর্ষের মত বিচিত্র ও ভিন্ন রকমের জনবহুল দেশে, যেখানে বিভিন্ন জাতির মধ্যে অস্তিত্বের জাত্যাভিমান, ধর্ম বিশ্বাসের এবং সংস্কৃতির ভিন্নতা বর্তমান, সেখানে সৌভ্রাতৃত্বের যে অস্পৃশ্যতা দূরীকরণের জন্য সংবিধানে প্রথম, ব্যবহৃত হয়েছিলো) আলাদা চেতনা না আরোপ করলে রাজনৈতিক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা অসম্ভব ছিলো। তাই সংবিধান ধর্মকেন্দ্রিক, শ্রেণীকেন্দ্রিক, স্থানকেন্দ্রিক সমাজবিরোধী অনুভূতিকে বিলোপ করার পাশাপাশি বৃহত্তর অবস্থানকে (greater belongingness) গুরুত্ব দিয়েছে। ধর্ম, ভাষা, সংস্কৃতি, জাতির উর্ধ্বে স্থান পেয়েছে সৌভ্রাতৃত্বের চেতনা।

কিন্তু এই সৌভ্রাত্রকে প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজন প্রতিটি ব্যক্তির মর্যাদার সুরক্ষা। আর তার জন্যই সংবিধানে বর্ণিত মৌলিক অধিকারসমূহ গুরুত্বপূর্ণ।

দারিদ্র্যদূরীকরণ ও আর্থ-সামাজিক পরিবর্তনের জন্য নির্দেশমূলক নীতি গুরুত্বপূর্ণ এবং এই পরিবর্তনকে অনিবার্য করে তুলেছে মৌলিক অধিকারগুলি।

সুতরাং, এইভাবেই, সংবিধান, সামাজিক বিচারকে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করেছে। অর্থনৈতিক বিচারের জন্য শুধুমাত্র মৌলিক অধিকারের ঘোষণা নয়, সেগুলিকে বাস্তবায়িত করার জন্য বিভিন্ন আইন প্রণীত হয়েছে। উদাহরণ হিসাবে বলা যায়—ফেয়ার ওয়েজেস অ্যান্ড মিনিমাম ওয়েজেস অ্যাট, প্রোটেকশান অফ ওয়েজেস অ্যান্ড স্যালারিজ অ্যাক্ট, ফ্যাক্টরিজ অ্যাক্ট—১৯৪৮, প্ল্যানটেশান অ্যাক্ট ১৯৫৮, প্রহিবিশান অ্যান্ড রেগুলেশান অফ চাইল্ড লেবার—২০০০, প্রোটেকশান অফ চাইল্ড লেবার অ্যাক্ট।

শিক্ষার অধিকার, শিক্ষার প্রসার এবং সর্বোপরি, সঠিক শিক্ষার জন্য ১৯৭৬ সালে সংবিধানের ৪২ তম সংশোধন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষক তৈরির জন্য মুদালিয়র কমিশন এই সংশোধনের ফলেই তৈরি হয়েছিলো।

অনূর্ধ্ব আঠারো শিশুদের পরিপূর্ণ বিকাশ, আরো মানবিক ভাবে বিচারের উদ্দেশ্যে জুভেনাইল জাষ্টিস অ্যাক্ট প্রণীত হয়েছে। ২০০০ সালে এই অ্যাক্টের আদ্যোপান্ত সংশোধন হয়েছে যাতে শূন্য থেকে সতেরো বছরের প্রতিটি ভারতীয় শিশুর সুরক্ষিত ভবিষ্যত সুনিশ্চিত হয়।

৬.৭ সামাজিক ন্যায় বিচার এবং সমাজ কর্ম

পেশাদার সমাজ কর্মের ব্যষ্টিগত লক্ষ্য (microlevel objective) হলো সমাজের অপেক্ষাকৃত দুর্বল এবং বঞ্চিত অংশের প্রতিটি মানুষের সমস্যার সাথে লড়াই করার এবং উন্নয়নের ক্ষমতাকে বাড়ানো। যাতে তাদের সামগ্রিক সামাজিক ক্রিয়া উন্নত হয়। এই জন্য প্রতিটি মানুষকে সম্পদ, পরিষেবা এবং সুযোগ সমানভাবে দিতে হবে সংগঠন, বিনিময়, সহজীকরণ (mobilisation) প্রভৃতির মাধ্যমে।

আবার, সমষ্টিগত লক্ষ্য (Macrolevel objective) হলো নীতি (Policy) বিশ্লেষন, নীতি উন্নয়ন, নীতির জন্য তদ্বির, নীতিগুলোকে পরিষেবায় পরিণত করা (প্রশাসন), সমন্বয় সাধন (Co-ordination), পরামর্শ বিনিময় প্রভৃতির মাধ্যমে ব্যষ্টিগত লক্ষ্যকে আরো সুষম করে তোলা। যার জন্য সামাজিক প্রতিক্রিয়া (Social action), গবেষণা জরুরী।

পেশাদার সমাজ কর্মের মূল্যবোধগুলির (যথা পরিষেবা, মানুষের মর্যাদা, মানুষের সম্পর্কের গুরুত্ব, সংহতি, বিশ্বস্ততা, যোগ্যতা ইত্যাদি) মধ্যে পরিষ্কার ভাবে উল্লেখ করা হয়েছে সামাজিক বিচারের কথা—একটি অন্যতম

মূল্যবোধ হিসাবে। যেখানে বলা হয়েছে যে, একজন প্রফেশনাল সোশ্যাল ওয়ার্কার যে কোনো সামাজিক অবিচার, অসম্পূর্ণ বিচারের বিরোধিতা করবে। যে কোনো সামাজিক পরিবর্তনকে সে-ই নিয়ে আসার জন্য উদ্যোগী হবে; বিশেষতঃ যে পরিবর্তনগুলি সমাজের অপেক্ষাকৃত দুর্বল, অবদমিত ব্যক্তি/দল/গোষ্ঠী-এর উন্নতির সহায়ক। তার মধ্যে যে যে সামাজিক পরিবর্তনগুলি ওপর সে প্রাথমিকভাবে গুরুত্ব দেবে, সেগুলি দারিদ্র্য, বেকার সমস্যা, অস্পৃশ্যতা বা অপরাপর সামাজিক পার্থক্যকে অপসারিত করতে দরকারী। এইজন্য সে তার ধ্যানধারণাকে প্রয়োগ করবে এবং দেশীয় সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের পাশে পাশে দেশীয় অবদমনের রকমফের সম্পর্কেও জ্ঞান সঞ্চয় করবে। একজন প্রফেশনাল সোস্যাল ওয়ার্কারের প্রাথমিক কর্তব্যই হলো প্রয়োজনীয় তথ্যসমূহ, পরিষেবা, এবং সম্পদকে একত্রিত করা যাতে সুযোগের সাম্য এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে প্রতিটি ব্যক্তির অর্থপূর্ণ অংশগ্রহণ সম্ভবপর হয়।

পেশাদার সমাজ কর্মের পরিগ্রহসমূহ (assumptions) তে উল্লেখিত আছে—

১. এটি অন্যান্য পেশাগুলির মতোই সমস্যার সমাধানের একটি পেশা।

২. পেশা হিসাবে এটি তৈরিই হয়েছে মানুষের প্রয়োজনগুলিকে মেটানোর জন্য এবং সমাজ-নির্ধারিত পন্থাতেই এটি কাজ করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। সুতরাং প্রকৃতিগত দিক থেকে এই পেশা পরিবর্তনশীল।

৩. সমাজের যে অংশে এই পেশা কাজ করবে, সেই অংশের সমস্ত মূল্যবোধকে সে গুরুত্ব দেবে; সেই মূল্যবোধের সাপেক্ষেই এই পেশার মূল্যবোধ গড়ে উঠবে।

পেশাদার সমাজ কর্মের নীতিজ্ঞান সমূহ (elinice)-এর যে যে অংশ সামাজিক বিচারকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য গুরুত্বপূর্ণ সেগুলি নীচে লেখা হলো ঃ

১. একজন পেশাদার সমাজ কর্মী তার পেশাকে মানবিক এবং গণতান্ত্রিক আদর্শে গ্রহণ করবে।

২. প্রতিটি পরিষেবার উন্নতির প্রতি সে দায়বদ্ধ যাতে প্রতিটি ব্যক্তির সামগ্রিক সামাজিক ক্রিয়া উন্নত হয়।

৩. এই পেশা সার্বজনীন এবং মানুষের সামাজিক অর্ন্তক্রিয়া (Social interaction) কে উন্নত করার প্রক্রিয়া।

৪. এই পেশাকে গ্রহণ করা ব্যক্তি সর্বদা অন্যের অনুভূতি, মননকে সম্মান করবে।

৫. প্রত্যেকের মধ্যে অর্ন্তনিহিত ভিন্নতাকে সে উপলব্ধি করবে এবং ফলতঃ একইরকমভাবে সবাইকে দেখবে না।

৬. কারোর ব্যক্তিগত ব্যাপারে অংশ নিতে হলে, সে, সবসময়ই তার পরামর্শ নেবে। অন্যভাবে বললে, পরামর্শ ছাড়া কারোর ব্যক্তিগত ব্যাপারে সে অংশ নেবে না।

৭. নিজের পেশাকে সে আরো উন্নত করবে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের মাধ্যমে যাতে প্রতিটি মানুষের কল্যাণ আরো ভালোভাবে করা যায়।

পেশাদার সমাজ কর্মীর নীতিসমূহ, যা আগেই আলোচনা করা হয়েছে,

১. প্রতিটি ব্যক্তির মর্যাদার নীতি ঃ-

২. গ্রহণের নীতি ঃ-

৩. স্ব-নির্ণয়ের নীতি ঃ-

৪. অনুভূতির সঠিক প্রকাশের নীতি

৫. পার্থক্য না করার নীতি ঃ

এই নীতি অনুযায়ী, একজন প্রফেশন্যাল সোশ্যাল ওয়ার্কার তার ক্লায়েন্টকে কোনো কিছুরই ভিত্তিতে আলাদা করবে না। মনে রাখতে হবে, সমস্যার সমাধানের অধিকার ও ফলতঃ বাঁচার অধিকার প্রত্যেকের সমান।

৬. অংশগ্রহণের নীতি ঃ-

যে কোনো উন্নয়নশীল কাজ, যাদের জন্য উন্নয়ন, তাদের প্রত্যেকের সক্রিয় এবং অর্থপূর্ণ অংশগ্রহণ ছাড়া অসম্পূর্ণ থেকে যায়। অংশগ্রহণ ছাড়া স্বনির্ভরতা আসে না। অংশগ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ বোঝে যে, যে উন্নয়নশীল কাজটা চলছে তাতে সেও একজন শরিক এবং এইভাবে তার দায়িত্ববোধ জন্মায়।

৭. ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের নীতি ঃ-

এই নীতি বোঝায় যে, প্রতিটি মানুষ অর্ন্তগতভাবে আলাদা যা তার স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে উদ্ভাসিত। একজন প্রফেশন্যাল সোশ্যাল ওয়ার্কার এই স্বাতন্ত্র্যকে সম্মান করবে যাতে সব ক্লায়েন্ট একইরকমের ব্যবহার না পায়।

এইভাবে, পেশাদার সমাজ কর্ম তত্ত্বগত এবং ব্যবহারিক—উভয় দিক থেকে সামাজিক বিচারকে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করে আসছে যাতে প্রতিটি মানুষের সর্বাঙ্গসুন্দর বেঁচে থাকা একদিন এই নশ্বর পৃথিবীতে বাস্তবায়িত হয়। কারণ একথা আজ সবার জানা যে, জীবনের প্রতি, বাঁচার প্রতি অধিকার প্রত্যেকের সমান।

৬.৮ অনুশীলনী

১। 'সামাজিক ন্যায়' বলতে কি বোঝ?

২। 'মানবাধিকার' শব্দের প্রকৃত অর্থ ও তাৎপর্য কি?

৩। ভারতে মানবাধিকার এবং সামাজিক ন্যায় রক্ষার ক্ষেত্রে সংবিধানের কি ভূমিকা রয়েছে?

৪। মানবাধিকার এবং সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে পেশাদার সমাজ কর্ম কি ভূমিকা পালন করতে পারে?

একক ৭ ❑ সমাজ কর্মের মৌলিক ধারণা, মূল্যবোধ, পেশাগত নৈতিকতা ও নীতিসমূহ

গঠন

৭.১ মৌলিক ধারণা

৭.২ সমাজ কর্মের মূল্যবোধ

৭.৩ পেশাগত নৈতিকতা ও নীতিসমূহ

৭.৪ পেশাগত সমাজকর্মের নীতিসমূহ

৭.৫ গ্রন্থপঞ্জি

৭.৬ অনুশীলনী

৭.১ মৌলিক ধারণা

সমাজ কর্ম বাস্তবে অভ্যাস করার সময় কিছু মৌলিক বিষয়ের কথা মাথায় রাখা দরকার হয়। সেগুলি হলো নিম্নরূপ ঃ

(ক) অন্যান্য পেশার মত সমাজকর্মও ব্যক্তি, গোষ্ঠী এবং সমষ্টির সমস্যা সমাধানের কাজ করে থাকে।

(খ) সমাজ কর্ম সামাজিক মূল্যবোধ সমৃদ্ধ ও বিজ্ঞানভিত্তিক একটি কলা। এর নিজস্ব শৈলী কিছু মূল্যবোধের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে।

(গ) সমাজবদ্ধ মানুষের চাহিদা ও প্রত্যাশা পূরনের জন্যই সমাজ কর্মের প্রতিষ্ঠা ও বিস্তার লাভ ঘটে চলেছে। মানুষের সমাজ অনুমোদিত কিছু চাহিদা বা আকাঙ্খাকে পরিতৃপ্ত করার লক্ষ্য নিয়ে তার যাত্রা।

(ঘ) বৈজ্ঞানিক ভিত্তি থাক বা না থাক, দীর্ঘদিন ধরে অভ্যাসে পরিণত এমন সামাজিক মূল্যবোধের সঙ্গে সমাজ কর্মের মূল্যবোধ ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত।

(ঙ) সমাজ কর্মের বিজ্ঞান সম্মত ভিত্তি নিম্নলিখিত—তিন ধরনের জ্ঞানের সঙ্গে সংযুক্ত।

—পরিক্ষীত বা গবেষণালব্ধ জ্ঞান

—অনুমিত জ্ঞান যা পরিক্ষীত জ্ঞানে পরিণত হবে।

—দৈনন্দিন অভ্যাসগত জ্ঞান যা অনুমিত জ্ঞান ও পরবর্তী পর্যায়ে পরীক্ষিত জ্ঞানে পরিণত হবে। একে ধরে নেওয়া বা মেনে নেওয়া জ্ঞানও বলা যায়।

(চ) যে ধরনের সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্য নিয়ে কিছু করার কথা ভাবা হয় সেই সমস্যার ধরনের উপর নির্ভর করে সমাজ কর্মের কোন্ বিশেষ জ্ঞান প্রযুক্ত হবে।

(ছ) সমাজ কর্ম সামাজিক মূল্যবোধ ও পেশাগত জ্ঞানের আন্তঃ সম্পর্কিত।

(জ) সমাজ কর্মীর কাজের মাধ্যমেই সমাজ কর্মের পেশাগত দক্ষতার প্রকাশ ও প্রসার ঘটে।

(ঝ) এই পেশা সততঃ গতিশীল। সমাজ থেকেই এর মূলবোধগুলি নেওয়া যা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তনশীল।

(ঞ) নির্দিষ্ট অভীষ্ট এবং সমস্যার দিকে লক্ষ্য রেখেই সমাজ কর্মের জন্য প্রয়োজনীয় বিদ্যা নিরূপন করা হয়ে থাকে।

(ট) এর জন্য একজন পেশাদার সমাজ কর্মীকে পেশাগত জ্ঞানকে আত্মস্থ করতে হবে।

(ঠ) একজন পেশাদার সমাজ কর্মীর কার্যাবলীতে পেশাগত দক্ষতার প্রকাশ ঘটবে।

৭.২ সমাজ কর্মের মূল্যবোধ

একজন মানুষ তার ব্যক্তিগত ও সমাজ জীবনে যে ভাবে আত্মমর্যাদা নিয়ে বেড়ে উঠেন তা রক্ষা করাই সমাজ কর্মের মূল্যবোধের অঙ্গ হিসাবে বিবেচিত হয়। অর্থাৎ সমাজ কর্মের মূল্যবোধ প্রকারান্তরে সমাজের মূল্যবোধ ছাড়া আর কিছু নয়। সমাজবদ্ধ মানুষ সামাজিক প্রক্রিয়ায় একে অপরকে শ্রদ্ধা জানাতে শেখেন, কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন, সুশোভন আচরন প্রদর্শন করেন ইত্যাদি। বিভিন্ন ধরনের এই সামাজিক অভ্যেস, বিশ্বাস, প্রথা বা রীতি ইত্যাদি মাথায় রেখে সমাজ কর্ম চর্চা করাই পেশাগত মূল্যবোধ রক্ষার উপায়।

মূল্যবোধ বলতে বোঝায় কিছু অন্তর্নিহিত বা স্পষ্টভাবে বর্ণিত ধারনা যা কোনও এক বিশেষ গোষ্ঠীর মানুষ আদর্শ হিসাবে পোষন করে। এটি একটি নিয়ম, আচরনবিধি অথবা নীতি যা পেশাগত ব্যবহারকে অভিভাবকের মত ভূমিকা পালন করে সঠিক পথে চালনা করে। ব্যক্তি বা সমষ্টির জীবনে বিশেষ লক্ষ্য স্থির করা এবং তার এগিয়ে চলার পথকে সামনে রেখে এই সব মূল্যবোধগুলি নির্দ্ধারিত হয়ে থাকে। পেশাগত ক্ষেত্রটিকে সঠিক পথে পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় নৈতিক কর্তব্যগুলির ব্যুৎপত্তিও এইসব মূল্যবোধগুলি।

মূল্যবোধগুলিকে তিন স্তরে ভাগ করা যায়।

ক) ভাবগত মূল্যবোধ—যেমন গণতন্ত্র, ন্যায়বিচার, আত্মোপলব্ধি ও স্বাধীনতা।

খ) মধ্যবর্তী মূল্যবোধ (intermediate values) যেমন একজন সৎ, নিয়ন্ত্রিত মানুষের গুণাবলী এক একটি সুন্দর সমষ্টি।

গ) বস্তুগত বা যান্ত্রিক মূল্যবোধ (instrumental values) যা গড়ে ওঠে সরকারী, পেশাদারী মনোভাবসম্পন্ন মানুষ এক ভালো সংগঠনের সমন্বয় হিসাবে।

প্রকৃতপক্ষে, মূল্যবোধগুলি কিছুটা ভাবমূলক রূপে বিমূর্ত হয়ে ওঠে। কিন্তু যখন আমরা সেই ভাবমূলক জগৎ থেকে বাস্তবের মাটিতে বা বস্তুগত জগতে পদার্পণ করতে চাই তখনই সেখানে কিছু বিশেষত্ব আনার প্রয়োজনীয়তা দেখা যায়। আদর্শগত ধারণাকে স্বার্থক রূপদানের জন্য মূল্যবোধের গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

মূল্যবোধ বিষয়টি কিন্তু তথ্য, প্রয়োজনীয়তা, দাবি অথবা ধারণা নামক বিষয়গুলি থেকে যথেষ্টই আলাদা। এই শব্দটির মাধ্যমে কিছু প্রাধান্যকে বোঝায় যেখানে তথ্যাদি হলো পরীক্ষালব্ধভাবে আবিষ্কৃত প্রকৃতপক্ষে বিরাজমান সত্য। মানুষের প্রয়োজনীয়তাগুলি চরিতার্থ করবার প্রত্যাশিত পথই হলো মূল্যবোধ। কিন্তু দাবি (rights) হলো সামাজিক সম্পদকে বৈধ উপায়ে কাজে লাগিয়ে কোনও প্রত্যাশাকে চরিতার্থকরণ। অন্যদিকে, আদর্শ হলো কিছু বিশ্বাস যা সামাজিক মূল্যবোধের প্রতিফলন এবং যা সামাজিক বিবর্তনের পাথেয়।

মূল্যবোধ হলো ব্যক্তিগত অথবা সমষ্টিগতভাবে গড়ে ওঠা মূল্যের জটিল বিন্যাসিকরণ। মূল্যবোধের ভিতরে সৃষ্ট বিরোধের থেকেই মূল্যবোধের বিন্যাসিকরণ সম্ভব হয়।

মূল্য হলো যেগুলি উত্তম, কিন্তু নীতি বলতে বোঝায় যেগুলি সঠিক।

নৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ বলতে বোঝায় মানুষের কার্যকলাপের নীতিগুলিকে অনুসন্ধান করে পারস্পরিক প্রতিদ্বন্দ্বী মূল্যবোধের থেকে একটিকে বেছে নেওয়া। তাই পেশাদারী নৈতিক কর্তব্য বলতে বোঝায় কার্যকরী মূল্যবোধগুলিকে। সামাজিক কাজের ক্ষেত্রে নৈতিক কর্তব্য হলো তৃণমূল স্তরে কর্মরত পেশাদার সমাজ কর্মীদের দ্বারা অনুসরণীয় কিছু নীতি। এগুলিকে বলা হয় সুক্ষ্ম নৈতিক কর্তব্য। অন্যদিকে স্থুল নৈতিক কর্তব্যগুলি হলো কোনও সংস্থা পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত মূল্যবোধ ও নীতিসমূহ যা সমাজ কল্যাণমূলক কর্মসূচীকে বাস্তবায়নে সাহায্য করে।

৭.৩ পেশাগত নৈতিকতা

সংকলিত নৈতিক কর্তব্য হলো যে কোন জীবিকারই অপরিহার্য অঙ্গ। এগুলি হলো সাধারনভাবে এই পেশায় যুক্ত প্রত্যেকের জন্য আবশ্যিকভাবে মান্য কিছু বৈশিষ্ট ও মূল্যবোধ। সংকলিত নৈতিক কর্তব্যগুলি একই পেশার মানুষের মধ্যে এক সাধারন বন্ধন বিশেষ। সমাজ কল্যাণের নৈতিক কর্তব্যগুলি একজন সমাজকর্মীকে সঠিক পথে চালনা করে। পেশাদারী সমাজ কর্মের ক্ষেত্রে নৈতিক কর্তব্যগুলি হলো ঃ

(ক) সমাজ কর্মী সর্বদাই তার কর্মক্ষেত্রে দায়বদ্ধ থাকবেন। নতুন কর্মদর্শন এবং দক্ষতার ক্রমবিকাশে একান্তভাবে আত্মনিয়োগ করবেন।

(খ) যে বিদ্যা বা জ্ঞানের উপর ভিত্তি করে সামাজিক কাজের পেশাটি দাঁড়িয়ে আছে, একজন সমাজকর্মী অবশ্যই তাকে গ্রহণ করবে এবং তাকে উন্নত করার ব্যাপারে সচেষ্ট থাকবে।

(গ) যেহেতু সামাজিক কাজ হলো জনগনের কাজ তাই তার জন্য সামাজিক মিথ ক্রিয়াকে আরও সাবলীল করে তুলতে হবে।

(ঘ) সমস্যাগ্রস্থ ব্যক্তি কর্মরত প্রতিষ্ঠান বা সংগঠন, সহকর্মী, সমষ্টিবদ্ধ লোকজন—সমাজকর্ম পেশায় যুক্ত সকলের সঙ্গে সমাজ উন্নয়ন কর্মীর সুসম্পর্ক বজায় রাখা দরকার।

(ঙ) যাদের উন্নয়নের জন্য পেশাদার সমাজকর্মী নিযুক্ত রয়েছেন তাদের নিজেদের ভাবনা-চিন্তা ও বিবেচনাবোধের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে হয়।

(চ) নিজের সংগঠনের প্রতি দায়িত্ববান ও কর্তব্যপরায়ন হতে হয়। সবসময় সংগঠনের ভালোমন্দ ইত্যাদি বিষয়ে সঠিক তথ্য ও খবরাখবর দিয়ে নিয়োগ কর্তাকে সহায়তা করতে হয়। সব সময় সংগঠনের নিয়মনীতি নিষ্ঠা ও শ্রদ্ধা সহকারে পালন করতে হয়।

(ছ) সহকর্মীদের কাজে এবং তাদের প্রতিকূলতা কাটিতে উঠার ক্ষেত্রে সহযোগিতা করতে হয়। সহকর্মীদের প্রত্যাশা পূরনের জন্য তাকে যত্নবান হতে হয়।

(জ) সমস্ত রকমের বঞ্চনা, প্রতারনা ও বৈষম্যের হাত থেকে সমাজকে মুক্ত করার জন্য বিশেষ উদ্যোগী হতে হয়।

(ঋ) ব্যক্তি, গোষ্ঠী এবং সমষ্টিবদ্ধ মানুষের স্বার্থকেই সর্বাধিক গুরুত্ব দিতে হয়।

(ঞ) বৈবাহিক সম্বন্ধ, রক্তের সঙ্গে সম্পর্কিত এবং দত্তকসূত্রে আবদ্ধ ব্যক্তিকে গোষ্ঠী বা সমষ্টির অন্য সদস্যদের থেকে পৃথকভাবে গণ্য করা ঠিক নয়।

সমাজ কর্ম চর্চার পেশাগত নৈতিকতা স্থান-কাল-পাত্র ভেদে ভিন্ন ভিন্ন ধরনের হতে পারে। বিভেদ বৈষম্যের কথা বিবেচনায় রেখে, স্থানীয় মানুষের বিশ্বাস, ধ্যান-ধারনা এবং রীতির বিষয়গুলিকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে পেশাগত নৈতিকতার বিষয়গুলি অভ্যেস করা সম্ভব হলে পেশার অগ্রগতি এবং গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পায়।

৭.৪ পেশাগত সমাজকর্মের নীতিসমূহ

পেশাগত সমাজকর্মের সঙ্গে মূল্যবোধ ও নৈতিক কর্তব্যের যেমন যোগ রয়েছে, তেমনি কতগুলি নীতি মেনে চলাও এই পেশার প্রয়োজনীয় একটি দিক। সেই নীতিগুলি হল—

(ক) উদ্দেশ্যমূলক সম্পর্কস্থাপনের নীতি (Principle of Purposeful Relationship) :

উদ্দেশ্যমূলক সম্পর্ক বলতে সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তি, গোষ্ঠি বা সমষ্টিবদ্ধ লোকজনের সঙ্গে সেই সম্পর্কের কথা বলা হয়েছে যা কিনা সংশ্লিষ্ট উদ্দেশ্য পূরণ করার সময় পর্যন্ত সীমিত। যে ধরনের সম্পর্ক গড়ে তুললে সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তি, গোষ্ঠি বা সমষ্টিবদ্ধ মানুষ তার বা তাদের নিজেদের সমস্যা সমাধানের জন্য অনুপ্রাণিত হবেন অথচ সমাজকর্ম চর্চায় নিযুক্ত পেশাদার কর্মীর ওপর নির্ভরশীল হবেন না—সেই সম্পর্কের কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ এই ধরণের সম্পর্ক পেশার উদ্দেশ্য পূরণ করবে এবং উদ্ভুত পরিস্থিতি কাটিয়ে তুলতে সহায়ক হবে। কোন রকম সহায়তা প্রদানের পূর্বে সমাজকর্মীকে সাহায্যপ্রত্যাশী মানুষটির সাথে একটা সম্পর্ক স্থাপন করতে হবে যা অবশ্যই পেশাগত প্রয়োজনের সীমারেখাকে লঙ্ঘন করবেনা। এই সম্পর্ক একদিকে লক্ষ্য (objectivity) ও গোপনীয়তা (confidentiality)-র দ্বারা নিয়ন্ত্রিত থাকবে আবার অন্য দিকে তাতে থাকবে আন্তরিকতা ও অনুভূতিপ্রবণতা।

পেশাগত সমাজকর্মীর নিজস্ব দক্ষতার গুনে তাদের এই সম্পর্ক কোন গঠনাত্মক দিকে মোড় নিতে পারে। ব্যক্তিমানুষের মধ্যে সম্পর্ক, ব্যক্তির সাথে তার গোষ্ঠী বা সমষ্টির সম্পর্ক এবং দুটি ভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের উন্নতি ঘটানোও পেশাদার সমাজকর্মের অন্যতম নীতি।

(খ) গোপনীয়তা রক্ষার নীতি (Principle of Maintaining Confidentiality) :

সমাজকল্যাণ কাজে নিযুক্ত পেশাদার কর্মী কাজ করতে গিয়ে বহু মানুষের সুখদুঃখ, ব্যথাবেদনা, অত্যাচার-বঞ্চনা ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে অবহিত হন। সমাজকর্ম পেশার স্বার্থে এইসব তথ্য অপরের কাছে প্রকাশ করা যায়না কারণ তাতে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা সমষ্টির স্বার্থে বিঘ্ন ঘটতে পারে। একমাত্র বিশেষ কারণে বা পরিস্থিতিতে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা সমষ্টির অনুমতি নিয়ে তা করা যেতে পারে। গোপনীয়তার নীতি মেনে চলা সমাজকর্ম পেশার একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কোন একটি নির্দিষ্ট এলাকায় কোন ব্যক্তি বা সমষ্টির কোন গোপন তথ্য যদি অন্যদের কাছে প্রকাশ পায় তাহলে এই পেশায় নিযুক্ত কর্মীর প্রতি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা জনসমষ্টির বিশ্বাস নষ্ট হবে, যা কিনা পেশার অবমাননার সম্ভাবনা বাড়াবে।

একজন সহায়তা প্রত্যাশী মানুষ (client) যখন একজন সমাজকর্মীকে বিশ্বস্ত মনে করবেন তখনই তিনি সমস্যা সমাধানের প্রক্রিয়ায় সাফল্যের সঙ্গ নিজেকে যুক্ত করতে পারবেন। তাই সমাজকর্মীকে সর্বদা তাঁর ক্লায়েন্টের সমস্যাগুলির গোপনীয়তা রক্ষা করতে হবে। একমাত্র ক্লায়েন্টের সমস্যার সমাধানের স্বার্থে প্রয়োজন অনুযায়ী সমাজকর্মী বিষয়টি নিয়ে কোনও কোনও উপযুক্ত মানুষের সঙ্গে আলোচনা করতে পারেন।

(গ) গ্রহণযোগ্যতার নীতি (Principle of **Acceptibility**) :

একজন মানুষ বা একটি গোষ্ঠী বা সমষ্টির কাছে কি ভাবে নিজেকে উপস্থাপন করলে তিনি বা তাঁরা পেশাদার **সমাজকর্মী**কে নিজেদের লোক বলে মনে করবেন সেই পথ অবলম্বন করাই হল গ্রহণযোগ্যতার নীতি। এর জন্য **সংশ্লিষ্ট** ব্যক্তি বা সমষ্টির আচার-ব্যবহার, পোষাক-পরিচ্ছদ, চাল-চলন, জীবনযাত্রার মান, রীতি-নীতি, বিশ্বাস ইত্যাদি **বিষয়**গুলিকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে গ্রহণযোগ্যতার নীতি মেনে চলার চেষ্টা করতে হয়।

(ঘ) গণতান্ত্রিক আত্মনির্ধারনের নীতি (Principle of Democratic Self-Determination) :

আত্মনির্ধারণ (Self-determination) বলতে নিজের বিদ্যাবুদ্ধি ও বিবেচনাবোধের ওপর ভিত্তি করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও তার রূপায়নের কথা বলা হয়েছে। নিজের ভাবনাচিন্তার ওপর আস্থা রেখে সমস্যা দূরীকরণের জন্য উপযুক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণই আত্মনির্ধারণ। কোন এলাকায় কোন জনগোষ্ঠীর সকলের সম্মিলিত প্রত্যয়কেই গণতান্ত্রিক আত্মনির্ধারণের আধার বলা হয়ে থাকে। গোষ্ঠীবদ্ধ মানুষের প্রত্যেকের পছন্দ-অপছন্দ করার ও ভালমন্দ বিবেচনা করার ক্ষমতা আলাদা আলাদা হবে। পেশাদার সমাজকর্মীকে এই বিষয়টি মাথায় রেখে সকলের মতামত নিয়ে গরিষ্ঠ সংখ্যক মানুষের মতকে ভিত্তি করে কাজ করতে হবে।

মানুষকে স্বাধীন ও আত্মনির্ভরশীল করে তোলাই হল সামাজিক কাজের উদ্দেশ্য। তাই সহায়তা প্রত্যাশী মানুষটির (ক্লায়েন্ট) প্রয়োজনীয় বিষয়টি বুঝে নেওয়াও অত্যন্ত জরুরি। তাকে তার নিজস্ব সিদ্ধান্তগ্রহণের ক্ষেত্রেও পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া প্রয়োজন। পেশাদার সমাজকর্মীর মনে রাখা উচিত যে ব্যক্তিমানুষ তার সমস্ত বস্তুগত ও আবেগতাড়িত সমস্যা বা চাহিদাগুলিকে নিয়েও আত্মনিয়ন্ত্রনের অধিকারী। সাহায্যপ্রত্যাশী মানুষটি নিজে যদি নিজেকে সাহায্য করতে আগ্রহী হন তবেই তার অর্থনৈতিক বা মনস্তাত্বিক জগতে কিছু কাঙ্খিত পরিবর্তন আনা সম্ভব হবে। সেজন্য এক্ষেত্রে কখনই সমাজকর্মী তাঁর নিজের মতামত সেই ব্যক্তির ওপর চাপিয়ে দেবে না।

(ঙ) নিরপেক্ষ আচরণের নীতি (Principle of Nonjudgemental Attitude) :

কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীবদ্ধ মানুষের প্রতি বেশি গুরুত্ব দেওয়া ও অন্যান্যদের প্রতি কম গুরুত্ব দেওয়া বা এড়িয়ে চলার আচরণ সমাজকর্ম পেশায় করা যায় না। কোন অপরাধী বা সমস্যাগ্রস্থ ব্যক্তিকে কোনভাবেই তার অপরাধ বা সমস্যার জন্য তিরস্কৃত বা বিশেষভাবে চিহ্নিতকরণ (levelling) করা হবে না। অর্থাৎ কোন ব্যক্তি বা জনগনের কোন কাজের উপর নিজের ভালোমন্দ বিচার মতো সমাজকর্মের পেশায় নিযুক্ত কর্মীর থাকা উচিত নয়। নিরপেক্ষভাবে তিনি কেবল সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা জনগনের অবস্থার উন্নয়নের পথে সহায়কের ভূমিকাই পালন করবেন।

(চ) সংযত আবেগের নীতি (Principle of Controlled Emotion) :

সাধারনতঃ কোন দুর্ঘটনা বা উৎসব অনুষ্ঠানের আবেগে মানুষ বেশি আপ্লুত হয়ে পড়েন। এই ধরণের **আবেগ** বা উদ্বেগ যেন সমাজ কর্ম চর্চায় প্রভাব না ফেলতে পারে সেজন্যই যে ধরণের আচরণ প্রদর্শন করা দরকার **তাকেই** **সংযত** আবেগের নীতি বলা হয়েছে। কোন উৎসবের সময়ে পেশা চর্চায় উন্নয়নকর্মী আনন্দে মেতে উঠবেন—**সেটাও** অভিপ্রেত নয়। তার পক্ষে সংযত আবেগ সম্বলিত আচরণ করাই কাম্য।

মানুষ সাধারণভাবে আবেগপ্রবণ। তার অনুভূতিপ্রবণ মন অন্যের দুঃখ, কষ্ট, বেদনার সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে অপ্রত্যাশিতভাবেই। কিন্তু এই ব্যাপারে একজন সমাজকর্মীকে নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ রাখতে হবে। তাকে ভুলে গেলে চলবে না যে ঠিক কতটুকু সম্পর্ক স্থাপন তার কাছে সাহায্যপ্রত্যাশী মানুষটিকে তার নিজের সমাজ জীবনে মানিয়ে নিতে সাহায্য করবে। তাই এই সম্পর্ক থেকে সমাজকর্মী যে সন্তুষ্টি লাভ করবেন তা যেন বিষয় ও সময়-কেন্দ্রিক

(অর্থাৎ সাময়িকতাকে লঙ্ঘন না করে) হয়। কর্মজগতে সমাজকর্মী তার নিজের এবং সাহায্যপ্রত্যাশী মানুষটির আবেগপ্রবণতাকে তার পেশাদারী দক্ষতা দিয়ে এমনভাবে নিয়ন্ত্রণ করে যাতে তাদের সম্পর্কটাই সমস্যার সমাধানের পথনির্দেশ করে এবং বৈধ পেশাদারী দায়িত্বের পরিধিকে অতিক্রম না করে। অন্যের অনুভূতির রাজ্যে প্রবেশের ক্ষমতার প্রয়োগ এবং তার লক্ষ্যের মধ্যে যেন একটা ভারসাম্য বজায় থাকে।

(ছ) সময়োপযোগী কর্মপন্থার নীতি (Functional Flexibility) :

নিত্যনতুন পরিবর্তনশীল সমাজের সাথে তাল মিলিয়ে সংশ্লিষ্ট এলাকার মানুষজনকে খাপ খাওয়ানোর পথে নিয়ে যাওয়ার মত সময়োপযোগী কর্মপন্থা নির্ধারণের নীতি মেনে চলতে হয়। কোন একটি বিশেষ ধরণের কর্মপদ্ধতি বা ধারাকে চিরকাল আঁকড়ে ধরে রাখলে সমাজের পরিবর্তনশীল স্রোতে চলা যায় না। এমন কি, স্থান, কাল ও মানুষ ভেদে বিভিন্ন রকমের কর্মপন্থা নির্ধারণ করার মতো শিথিলতার কথা মাথায় না রাখলে সমাজকর্ম পেশায় চর্চায় সফল হওয়া যায় না।

(জ) সম্পদ সদ্ব্যবহারের নীতি (Resource Mobilisation) :

উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় স্থানীয় সম্পদ (প্রাকৃতিক ও মানবিক)-এর সদ্ব্যবহার করার কাজে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা জনগোষ্ঠীকে উদ্বুদ্ধ করা সমাজ কর্ম পেশার একটি অন্যতম বিবেচ্য বিষয়। সংশ্লিষ্ট এলাকার জনগনের মধ্যে (যেমন ডাক্তার, স্বাস্থ্যকর্মী, শিক্ষক, সমাজসেবক, সমাজকর্মী, ধর্মীয় নেতা, বুদ্ধিজীবী ও গবেষকদের) জ্ঞানভান্ডারকে সদ্ব্যবহার করার জন্য পেশাদার ব্যক্তি সচেষ্ট হবেন। পাশাপাশি প্রাকৃতিক সম্পদের সদ্ব্যবহারের প্রতি সংশ্লিষ্ট এলাকার মানুষজনকে উদ্বুদ্ধ করবেন।

(ঝ) অনুভূতির প্রয়োজনভিত্তিক বহিঃপ্রকাশ (Need-based Expression of Feelings) :

একজন সাহায্যপ্রত্যাশী মানুষ যখন সমাজকর্মীর কাছে আসেন তখন বিভিন্ন কারণে তার মনের মধ্যে জমে থাকে অসংখ্য অভিযোগ, ক্ষোভ, দুঃখ আর অভিমানের বাষ্প। তাই তাকে সমস্যা সমাধানের পথে নিয়ে আসবার জন্য আগে সেই ক্ষোভের বাষ্পকে লাঘব করা অত্যন্ত জরুরি। এটা করতে পারলে সমাজকর্মীর প্রতি তার একটা নির্ভরযোগ্যতার মনোভাব আসবে যা পেশাদারী সম্পর্ক স্থাপনকে সহজতর করবে। সাহায্যপ্রত্যাশী মানুষটি অর্থাৎ Client যখন সমাজকর্মীর সামনে তার সমস্যা, মানসিক চাপ ও উদ্বিগ্নতার কথা নিজে মুখে বলবে তখন সে নিজেই তার সমস্যাকে আরও স্পষ্টভাবে বুঝতে পারবে।

(ঞ) পার্থক্যকরণ থেকে বিরত থাকার নীতি (No practice of stratification) :

সামাজিক কাজের ক্ষেত্রে এই নীতি অনুসরণ করা অত্যন্ত জরুরী। এর মাধ্যমে মানুষের শ্রেণীগত বৈষম্য, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থাকে অতিক্রম করে ব্যক্তিমানুষের স্বাধীনতাকে মর্যাদা দান করে। সকলের প্রতি সমমনোভাবাপন্ন হয়ে এই সহায়তা প্রদান করার মাধ্যমে মানুষকে শ্রেণীগত বৈষম্যের শিকার হতে না দেওয়াও সমাজ কর্মের অন্যতম নীতি।

(ট) সমাজকর্মীর আত্মসচেতনতার নীতি (Principle of Self-consciousness) :

পেশাগত সম্পর্কের থেকে আলাদা করে সমাজকর্মী তার client-এর প্রতি অনুভূতিশীল হবেন। তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের কুসংস্কার বা পক্ষপাতিত্ব কখনওই এই কাজের জগতে বাধার সৃষ্টি করবে না। Client যদি এমন কোনও সামাজিক সম্প্রদায়ভুক্ত হয় যার প্রতি সমাজকর্মী নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি পোষন করেন, তার প্রভাব যেন কখনওই client-এর সাথে তাঁর ব্যবহারে প্রকট না হয়ে ওঠে। এই নীতি অনুসরণ করবার ফলে client-এর সাথে সমাজকর্মীর সম্পর্ক অনেকটাই গঠনাত্মক দিকে মোড় নেবে এবং তাতে তার মানসিক বোঝা অনেকাংশেই লাঘব হবে।

৭.৫ গ্রন্থপঞ্জি

i) History and Philosophy of Social Work

ii) Indian Social Problems—Vol. II by G. R. Madan

iii) Social Group Work—H. B. Trecker

iv) Social Group Work—Bruno Frank J.

৭.৬ অনুশীলনী

১। সমাজ কর্মের মৌলিক ধারণাগুলি কি কি?

২। মূল্যবোধ বলতে কি বোঝায় এবং তার প্রয়োজনীয়তা কি?

৩। সমাজকর্মের পেশাগত নৈতিকতার বিভিন্ন দিক সম্পর্কে উল্লেখ কর।

৪। মূল্যবোধের অর্থ কি?

৫। পেশাগত সমাজকর্মের নীতিগুলির উল্লেখ কর।

একক ৮ ☐ পেশা হিসাবে সমাজ কর্মের অভ্যুত্থান

গঠন

৮.১ উদ্দেশ্য

৮.২ সমাজ কর্ম পেশার বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য

৮.৩ প্রেক্ষাপট

৮.৪ সরকার দ্বারা গৃহীত কিছু পদক্ষেপ

৮.৫ ভারতবর্ষে পেশা হিসাবে সমাজ কর্মের অসুবিধা

৮.৬ অনুশীলনী

৮.১ উদ্দেশ্য

অন্যান্য পেশার মতো সমাজ কর্ম চর্চায় নিযুক্ত ব্যাক্তির বিশেষ ধরনের কিছু দক্ষতা ও পারদর্শিতা থাকে। সমাজ কর্মের ইতিহাস ও দর্শনকে বিশেষভাবে জানার ও পেশাদারীত্ব প্রতিষ্ঠার মূল উদ্দেশ্য ছাড়াও নিম্নলিখিত কয়েকটি উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই এই আলোচনার অবতারনা। যথা—

(১) সমাজ সংস্কারমূলক কাজের মধ্যে কোন্ কোন্ কাজ সমাজ খুব সহজে গ্রহণ করেছিল এবং তার সুদূর প্রসারী ফল কি হয়েছিল তা জানা।

(২) যে পদ্ধতি বা পন্থার মাধ্যমে অতীতে সমাজ সংস্কারমূলক কাজ করা হয়, তার সাফল্য ও সম্ভাবনা খতিয়ে দেখাও সমাজ কর্মের পদ্ধতি প্রকরন নির্দ্ধারণ করা।

(৩) দয়া-দাক্ষিণ্যের মাধ্যমে মানুষের সমস্যা-দুর্দশা মোচনের অতীত অভিজ্ঞতার প্রেক্ষিতে এই ধরনের উপায় অবলম্বনের সতর্কতামূলক বিষয়গুলি চিহ্নিত করা।

(৪) সমাজ সংস্কার ও সমাজ কল্যাণ কাজের নেতৃত্ব ও সেবামূলক মানসিকতার ভেতর থেকে পেশাদারীত্বের দিকগুলো খুঁজে বারকরা ও সেগুলোকে সমাজ কর্ম পেশায় সংযুক্ত করা।

(৫) ত্রাণ ও পুনর্বাসন কাজের পাশাপাশি স্থায়ীভাবে সমস্যা মোকাবিলার জন্য সুদূরপ্রসারী কর্মপন্থা স্থির করা।

(৬) স্থান, সময় ও সমষ্টিগত বিভেদের কথা মাথায় রেখে এলাকাভিত্তিক এবং সমষ্টিভিত্তিক কর্মপন্থা তৎকালীন ভারতবর্ষে কতটা সাফল্য অর্জন করেছিল তা খতিয়ে দেখা ও সেইমত সমাজ কর্মের চর্চায় বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া।

(৭) শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও দারিদ্র্য দূরীকরনের কাজে অতীতে স্থানীয় সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারের প্রতি কতটা গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল ও তার সুদূরপ্রসারী ফলাফল কি হয়েছিল তা জানা ও স্থানীয় সম্পদের প্রতুলতার কথা মাথায় রেখেই স্থানীয় মানুষের চাহিদা পূরনের পথ প্রশস্ত করা যায় কিনা তা বিশ্লেষন করা।

(৮) ব্রিটিশ আমলে ভারতবর্ষের সমাজ কল্যাণ কাজের অগ্রগতি কোন্ কোন্ কারণে ব্যাহত হয়েছিল ও সেই সময়ে ভারতবর্ষের স্থানীয় নেতৃত্ব যে উদ্যোগ গ্রহণ করেছিল তা বিশ্লেষণ করা।

(৯) অতীতের অভিজ্ঞতার আলোকে ভারতবর্ষে সমাজ কর্মের পেশাদারীত্বকে মজবুত করা ও এই পেশার অগ্রগতি ত্বরান্বিত করা।

(১০) সুন্দর সমাজ গঠনের কাজে সমাজ কর্মের প্রয়োজনীয়তার বিষয়টিকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া।

সমাজের অন্তর্নিহিত মূল্যবোধের সাথে প্রত্যক্ষভাবে সম্পর্কযুক্ত সমাজকর্মের পেশার গুরুত্ব দিন দিন বৃদ্ধি পাবে একথা নিসংন্দেহে বলা যায়। এই পেশা জাতি, ধর্ম, সম্প্রদায়, লিঙ্গ ও বয়সের ভেদাভেদকে মাথায় রেখেই কাজের ধরণ ও পদ্ধতি নির্দ্ধারন করে—একথা যেমন ঠিক, তেমনি এই পেশা সকলের কাছে নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গির বার্তা বহন করে। এই পেশা মানুষের সমস্যার স্থায়ী সমাধানের পথে সংশ্লিষ্ট মানুষের অন্তর্নিহিত উদ্যোগকে উজ্জীবিত করতে সহায়তা করে মাত্র। সেই কারণেই এই পেশার প্রেক্ষাপট, জানাটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

৮.২ পেশার নানান বৈশিষ্ট্য

'Profession' বা পেশা শব্দের প্রথম ব্যবহার লক্ষ্য করা যায় ত্রয়োদশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে। ধর্মীয় উৎসর্গ (বা Religious dedication) বোঝানোর জন্যই Profession শব্দটি ব্যবহৃত হয়। আব্রাহাম ফ্লেক্সার (Abraham Flexuar)-এর মতে পেশার প্রয়োগ, বুদ্ধির দ্বারা চালিত মতের পরামর্শ প্রসুত, (the test of profession are that bring consulted by Intellectual operations)। সমাজ কর্মের বহু লেখক Profession বা পেশার নানান বৈশিষ্ট্যের কথা বর্ণনা করেছেন। তাদের মধ্যে কয়েকটি হল নিম্নরূপ—

- প্রশিক্ষনের উপর ভিত্তি করে বিশেষ দক্ষতা অর্জন।
- জনমতের দ্বারা স্বীকৃত কোন কাজ করা/সম্পাদন করা।
- একই ধরনের প্রশিক্ষণ, অভিজ্ঞতা ও জন-স্বীকৃতির ফলে একটি বন্ধন বা সম্পর্ক অনুভূত হয়।
- সমস্যাসঙ্কুল ব্যাক্তির সঙ্গে সোশ্যাল ওয়ার্কার এবং জনগণের সঙ্গে বোঝাপড়ার ফলে মূল্যবোধ ও নৈতিকতার অবলম্বনে একটি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের বা প্রদর্শনের বোধ গড়ে ওঠে।
- পেশাদারী সংস্থা বা সমন্বয়ের জায়গা থাকার ফলে পেশাগত সেবার মান বাড়ানো যায়।
- পেশাদার ব্যাক্তির অন্যদের প্রতি ব্যক্তিগত দায়বদ্ধতার ও স্বচ্ছতার বোধ প্রকটভাবেই থাকে।

পেশার বৈশিষ্ট্য যাই হোক না কেন সমাজ কল্যাণ কাজের ক্ষেত্রে কিংবা সমাজ কর্মের চর্চার ক্ষেত্রে তা স্থান, কাল ও পাত্রভেদে তারতম্য হতেই পারে। তবুও বলা যায় যে, সমাজ কর্ম পেশার মূল দর্শন হল পেশাগতভাবে মানবকল্যাণের জন্য সেবাদান। এই সেবাদানের ক্ষেত্রে সকলের জন্য সমান সুযোগ ও অধিকার লাভের গণতান্ত্রিক অধিকারের প্রতি সমাজ কর্ম পেশাদারের নৈতিক দায়বদ্ধতা থাকাটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। জীবনে খেয়ে-পরে বেঁচে থাকার জন্য হাজার রকমের বাধার সম্মুখীন হতে হয় সবাইকেই। তবুও সমাজ কর্ম মানুষের নানাবিধ সমস্যা কাটিয়ে উঠার যে অন্তর্নিহিত শক্তি আছে তাকেই জাগিয়ে তোলার কাজ করে। যাতে যে কোন মানুষ তার নিজের সমস্যা নিজেই সমাধান করার কথা ভাবতে পারেন। এরই মধ্যে সমাজ কর্ম পেশার মূল্য লক্ষ্য অন্তর্নিহিত আছে। অর্থাৎ কোন মানুষ নিজের চেষ্টায় বা তার সঙ্গে বসবাসকারী অন্যান্য মানুষদের চেষ্টায় কিভাবে তার সমস্যার স্থায়ী সমাধান করবে সেই পথের সন্ধান দেওয়ার মধ্যেই সমাজ কর্ম পেশার পেশাদারিত্ব জড়িয়ে থাকে। সে কারণে পুঁথিগত বিদ্যার পাশাপাশি দৈনন্দিন কাজের অভিজ্ঞতা থেকে সমাজ কর্মী নিজস্ব জ্ঞান বুদ্ধির ভান্ডার সমৃদ্ধ করবেন সেটিই স্বাভাবিক। যে ধরনের দক্ষতা বা পেশাদারিত্ব নিয়ে তারা নিজেদের নিম্নলিখিত পরিস্থিতিতে দায়িত্ববানও যোগ্য বলে তুলে ধরতে পারেন, সেই পরিস্থিতি ভিত্তিক দক্ষতা বা পেশাদায়িত্বগুলি হলো—

● প্রত্যেক মানুষের প্রতি প্রগাঢ় ভালোবাসা, শ্রদ্ধা ও তার আত্মমর্য্যাদার প্রতি সম্পূর্ণ কৃতজ্ঞতা দেখানো দরকার। এক্ষেত্রে ঐ মানুষ বা জনগোষ্ঠীর জাতি, ধর্ম, কাজ বা অপরাধের ভিত্তিতে অবজ্ঞা বা অবহেলা প্রদর্শন করা যায় না।

● যে কোন মানুষ বা জনগোষ্ঠীর কাছে তার জন্য কাজ করার আগ্রহও ইচ্ছা প্রকাশ করা দরকার।

● সে বা যারা সাহায্যপ্রার্থী, তাদের সঙ্গে সুন্দর সম্পর্ক স্থাপন করা ও ঐ সম্পর্কের মাধ্যমে প্রকৃত সাহায্য দিয়ে ঐ জনগোষ্ঠীকে তাদের সমস্যার মোকাবিলায় উদ্বুদ্ধ করা দরকার।

● কোন ব্যাক্তি বা জনগোষ্ঠীর গোপনীয় কোন বিষয়ে কাজ করতে বা সহায়তা দিতে গেলে তাদের আচার-আচরণ লক্ষ্য রাখা, বিশ্লেষন করা ও তাদের দেওয়া তথ্যের গোপনীয়তা বজায় রাখাটা অত্যন্ত জরুরি।

● কারও কোন দ্বিমতের সমালোচনা না করা, বা কারও মতামতের উপর কর্তৃত্ব না ফলানো, বা কারও কোন তথ্যকে ভুল ব্যাখ্যা করা কখনোই পেশাদার সমাজ কর্মীর কাছে বাঞ্ছনীয় নয়।

● ব্যক্তি, গোষ্ঠী তথা সমাজের প্রতি পেশাদার সমাজ কর্মীর সার্বিক শ্রদ্ধা, ভক্তি, ভালোবাসা বজায় রাখাটা অত্যন্ত আবশ্যক।

অর্থাৎ দয়া, সেবা ও পরোপকার প্রভৃতি অন্তর্নিহিত শক্তি সমাজ কর্ম পেশার চর্চায় নিযুক্ত ব্যাক্তির মধ্যে থাকতে পারে, কিন্তু কখনোই তা আবেগ তাড়িত হবে না। সংযত ও নিয়ন্ত্রিত হতে হবে। সমাজ স্বীকৃত পথের অনুসন্ধান করাটা যেমন দরকার, ঠিক তেমন দরকার সমাজে প্রচলিত বিশ্বাস, ধ্যান ধারনা ও রীতি-নীতির প্রতিপূর্ণ মর্যাদা জ্ঞাপনের মানসিকতা। সমাজ কর্ম সমাজ সম্পর্কিত, সমাজকে কেন্দ্র করে এবং সমাজের জন্যই। সমাজ বহির্ভূত কোন বিদ্যা বা বুদ্ধির প্রচলনের জন্য নয়।

সমাজ কর্মের অগ্রগতির ইতিহাস পর্যালোচনা করলে আমরা দেখতে পাবো, কিছু ঘটনা ঘটেছে সমাজের প্রচলিত বিশ্বাস, আস্থা, নিয়মকানুন সব অটুট রাখবার জন্য বহু মানুষের প্রচেষ্টায়। আবার কিছু ঘটনা ঘটেছে প্রচলিত ধ্যান ধারনা ও নিয়মনীতির মধ্যে যুক্তি সিদ্ধ, বিজ্ঞান ভিত্তিক বিষয়গুলিকে মানুষের মধ্যে গ্রহণ যোগ্য করে তোলা ও কুসংস্কার, সামাজিক জড়তার বিষয়গুলিকে সমাজ থেকে সরিয়ে দেওয়ার জন্য। সমাজ কর্ম পেশার মূল ভিত্তি হল দুই ধরনের সমাজ ব্যবস্থার প্রতিই পূর্ণ আস্থা প্রদর্শন ও ধীরে ধীরে সমাজ সংস্কারের পথে জনগনকে উদ্বুদ্ধ করা।

৮.৩ প্রেক্ষাপট

স্বাধীন ভারতবর্ষকে কংগ্রেস সরকার একটি হিতসাধন রাষ্ট্র হিসাবে ঘোষণা করেন। তদনুসারে অবহেলিত ও নিপীড়িত মানুষের প্রয়োজনের দিকগুলিকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। তার সমাধানসূত্রগুলি খুঁজে পাওয়ার বিষয়েও আশ্বস্ত করা হয় জনগণকে। ইতিপূর্বে প্রাক্-ব্রিটিশ ও ব্রিটিশ শাসনাধীন ভারতে রাষ্ট্র কখনও জনগণের হিতসাধনের দায়িত্ব সরাসরি বা সম্পূর্ণভাবে নিতে চায়নি। সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলিই তখন এ সকল দায়িত্ব পালন করত। অবশ্য বেশ কিছু ক্ষেত্রে স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলিও বিশেষ ভূমিকায় অবতীর্ন হত। স্বাধীন ভারতবর্ষ একটি হিতসাধক রাষ্ট্র হিসাবে তার অর্থনৈতিক পরিকাঠামোর মধ্যে জনগণের জীবিকা, শিক্ষা ও সামগ্রিক উন্নয়নের সু-বন্দোবস্ত করবার অঙ্গীকার করে।

৮.৪ সরকার দ্বারা গৃহীত কিছু পদক্ষেপ

দেশের অর্থনৈতিক সংস্থানকে মাথায় রেখে ভারত সরকার রাষ্ট্রীয় কর্মপন্থা নির্ধারণ করেন। এর জন্য পরিকল্পনা নির্ধারণের ভারপ্রাপ্ত সংগঠন স্থাপিত হয় যা আমাদের সংবিধানের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এই সংগঠন তার সংস্থাগত এক

প্রশাসনিক পরিকাঠামোর মধ্যে সামাজিক পরিকল্পনার দায়িত্বটি পালন করে থাকে। এই পরিকল্পনা নির্ধারক সংগঠন (Planning commission)-এর উদ্দেশ্য যদিও দেশের অর্থনৈতিক শ্রীবৃদ্ধি তবে তাকে কখনও মানব সম্পদ উন্নয়নের বিষয়টি থেকে পুরোপুরি আলাদা করা যায় না। বরঞ্চ পরবর্তীকালের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাতে সামাজিক ক্ষেত্রগুলির উন্নতিসাধনের ব্যাপারে যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ হয়।

কয়েকটি মন্ত্রক ও দপ্তরের উন্নতি ঃ

দেশ বিভাজনের ফলস্বরূপ ছিন্নমূল মানুষের স্রোত পাকিস্থান থেকে ভারতের দিকে ধাবিত হয়। প্রয়োজন দেখা দেয় তাদের নিরাপদ পুনর্বাসনের। তাই পুনর্বাসন মন্ত্রকের আবির্ভাব ঘটে। পুনর্বাসন জনিত দৈহিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যাগুলিকে কাটিয়ে উঠতে এই মন্ত্রক সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয় উদবাস্তু মানুষগুলির দিকে। এদের কর্মসূচির মূল লক্ষ্যই ছিল অর্থনৈতিক পুনর্বাসন, বাসস্থান ও শিক্ষা। একথা অনস্বীকার্য যে, ব্যক্তিমানুষ অথবা কোনও বিশেষ সামাজিক গোষ্ঠির জন্য প্রয়োজনার্থে যে সমাজ ধরনের কর্ম হয়ে থাকে তাও সামাজিক হিতসাধনারই কল্যাণ (Social welfare) অন্তর্ভুক্ত। পরাধীন ভারতবর্ষে বিভিন্ন ব্যক্তিগত সংগঠন এই দায়িত্বগুলি পালন করত। কিন্তু স্বাধীন ভারতবর্ষের সরকার এ বিষয়ে অগ্রণী ভূমিকা নেয়। ব্যক্তিগত সংগঠনগুলিকে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দের মাধ্যমে সরকার তাদের কর্মসূচীকে ত্বরান্বিত করে। Central Social Welfare Board স্থাপিত হয় ১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দে। উন্নয়নের ক্ষেত্রে সমবন্টনের প্রয়োজনীয়তার কথা মাথায় রেখে রাজ্যস্তরে তৈরি হয় State Social Welfare Advisory Board এর উপরেই দায়িত্ব পড়ে বিভিন্ন কর্মসূচীর সফল রূপায়ণের। তবু সমাজ কল্যাণ বা সামাজিক হিতসাধনের বিষয়টি এতটাই ব্যাপ্ত যে অন্যান্য মন্ত্রকের কর্মপরিধির মধ্যেও তা চলে আসে। তাই এই কাজের জন্য বিভিন্ন মন্ত্রকের মধ্যে সমন্বয়সূত্র থাকাটা জরুরি। ১৯৮৩ সালের ২৫ শে সেপ্টেম্বর ভারত সরকার সমাজ কল্যাণ মন্ত্রক স্থাপনের মাধ্যমে সমাজ কল্যাণের এক নবদিগন্তকে উন্মোচিত করেন। শিশু কল্যাণ, মহিলা কল্যাণ, পরিবার কল্যাণ, অক্ষম মানুষের কল্যাণ, সামাজিক প্রতিরোধ ও ছিন্নমূল মানুষের পুনর্বাসনের মতো বিষয়গুলিও এই সমাজ কল্যাণ মন্ত্রকের আওতায় চলে আসে। ১৯৯৯ সালে সামাজিক ন্যায়বিচার ও ক্ষমতায়ন মন্ত্রক হিসাবে তার নতুন নামকরণ করা হয়।

নারী ও শিশু কল্যাণ দপ্তর স্থাপিত হওয়ার সাথে সাথে সমাজ কল্যাণের ক্ষেত্রে এক নতুন দিগন্তের উন্মেষ হয়। এই দপ্তর মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রকের আওতায় পড়ে। এই দপ্তরের অধীনে দুটি সংস্থা আছে। তাদের একটি হলো NIPCCD যার ওপরে গবেষণা, মূল্যায়ন ও তত্ত্বাবধান সংক্রান্ত দায়িত্বগুলি বর্তায়। অপরটি CSWB। এর কাজ হয় বিভিন্ন কর্মসূচীর সফল রূপায়ন। এদের মাধ্যমেই জাতীয় স্তরে শিশুদের জন্য যাবতীয় প্রকল্প রূপায়িত হয়। যেমন ICDS অর্থাৎ সুসংহত শিশু বিকাশ প্রকল্প। এর কর্মীদের জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা, Creche স্বল্পস্থায়ী আশ্রয় ও পরিবার পরামর্শদান কেন্দ্র গড়ে তোলা ইত্যাদি।

রাজ্যস্তরেও স্বাধীনতার পরবর্তী কালেই সমাজ কল্যাণের বিষয়টিতে নতুন চিন্তার জোয়ার আসে। রাজ্যস্তরে অনেকগুলি সমাজ কল্যাণ দপ্তর স্থাপিত হয়। এদের কাজ হয় সমাজ কল্যাণের স্বার্থে জড়িত বিভিন্ন সংস্থাকে অর্থনৈতিক সাহায্য প্রদানের মাধ্যমে তাদের কর্মধারাকে অব্যাহত রাখা।

৮.৫ ভারতবর্ষে পেশা হিসাবে সমাজ কর্মের অসুবিধা

এখনও পর্যন্ত ভারতবর্ষে পেশাদারী সামাজিক কাজের ধারণাটি সেভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারেনি। বিভিন্ন কারণ কাজ করছে তার পিছনে। সেগুলি হলো ঃ

(ক) সামাজিক গ্রহণযোগ্যতার অভাব,

(খ) ভারতবর্ষের একান্ত নিজস্ব সমস্যাগুলিকে অনুপযুক্ত আমেরিকান বিশ্লেষণ পদ্ধতির ছাঁচে ফেলে ব্যাখ্যা করবার নিষ্ফল প্রচেষ্টা,

(গ) উপযুক্ত সাংগঠনিক পরিকাঠামোর অভাব,

(ঘ) জনমানসে সমাজ কর্ম সম্পর্কে কিছু দীর্ঘলালিত ভিন্ন ধরনের মনোভাব পোষণ ইত্যাদি। সমস্যাগুলি অনতিক্রম্য নয় ঠিকই, তবে তা যে বেশ জটিল তা অনস্বীকার্য। এগুলির ব্যাখ্যা তাই নিম্নলিখিত উপায়ে বিশ্লেষণের চেষ্টা করা হলো—

(ঙ) সমাজ কর্ম সম্পর্কে বহুবিধ ধারণার অবস্থান ঃ

সমাজ কর্ম একটি পেশা হিসাবে আজও তার বাল্যাবস্থাকে অতিক্রম করতে পারেনি। এর কোনও সুস্পষ্ট সংজ্ঞা আজও জনমানসের সামনে তৈরি হয়নি। সাধারন ভাবে, ভারতীয়রা সমাজ কর্ম বলতে ব্যক্তি বা সমষ্টি মানুষের আর্থ সামাজিক বা শারিরীক উন্নয়নকারী যে কোনও সাহায্য অনুদান বা ক্ষতিপূরণ জনিত কাজকেই মনে করে। তাদের সংক্ষিপ্ত সীমারেখায় আবদ্ধ চিন্তা অনুসারে এই কাজগুলি কোন সহৃদয় ব্যক্তির দারিদ্রসেবা এবং অন্যান্য সাহায্যধর্মী কাজের থেকে বেশী কিছু ভাবা হয় না। অধিকাংশ ব্যক্তিগত বা জনগণের দ্বারা পরিচালিত সমাজকল্যাণ সংস্থাগুলি এই ধরনের ধারণাকে সম্বল করেই তাদের কাজ করে চলেছে কারণ এইসব সংস্থার অনেকেই হয়তো কোনও পেশাদার সমাজকর্মীকে তাদের কর্মকান্ডের জন্য নিয়োগ করেনি।

(চ) চিন্তার ভিত্তিতে স্বদেশীয়ানার অভাব এক বিদেশের অনুকরণের নিষ্ফল প্রচেষ্টা ঃ

পশ্চিমের দেশগুলি (যেমন—UK, USA) থেকে এদেশে পেশাদারী সমাজ কর্মের ধারণা প্রচলিত হয়। কিন্তু বৈদেশিক সূতিকাগারে জন্ম নেওয়া এই পেশাটিকে ভারতের মাটির উপযোগী করে গড়ে তোলার জন্য যে নিরলস গবেষণা বা ঐকান্তিক প্রচেষ্টার প্রয়োজন ছিল তাতে বেশ কিছু ফাঁক থেকে গেছে। ফলতঃ নিজস্বতার অভাব এই পেশাটিকে দুর্বল ও দরিদ্র করে তুলেছে। গবেষণা ও ব্যবহারিক ক্ষেত্রে স্বদেশীয়ানা এলেই হয়তো দেশের উপযোগী বইপত্র পেতে ততটা অসুবিধে হবে না। তাছাড়া, ভারতীয় সমাজের মূল সমস্যাগুলিকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করবার মতো কিছু উপযুক্ত চিন্তাবিদেরও বিশেষ প্রয়োজন। কিন্তু সেরকম গঠনাত্মক মানসিকতা সম্পন্ন বিশ্লেষনী বুদ্ধির অধিকারী সমাজ সচেতক মানুষের সংখ্যাও এদেশে তেমন বেশি নয়। ফলে পেশাটির অগ্রগতির জন্য যে ধরনের বিদ্যাচর্চার বিশেষ প্রয়োজন ছিল তার থেকেও আমরা কিছুটা পিছিয়ে আছি। এইসব কারণগুলির একত্রিত উপস্থিতিতে পেশাদারী সমাজ কর্ম প্রতিষ্ঠা লাভ এখনও পর্যন্ত ততটা সাফল্য পায়নি।

(ছ) পেশাদার সমাজকর্মীদের নিয়োগের ক্ষেত্রে অসুবিধা ঃ

পুরাতন ভাবধারাকে অনুসরন করেই বেশিরভাগ স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন কাজ করে চলেছে। অনেকক্ষেত্রে তারা দক্ষতাসম্পন্ন পেশাদার সমাজকর্মীকে নিয়োগের ব্যাপারে বিশেষ আগ্রহ দেখায় না। এর কারণ একদিকে যেমন প্রয়োজনীয় আর্থিক সংগতির অভাব, অন্যদিকে তেমনি পেশাদারী সামাজিক কাজের ধারণা গ্রহণের ক্ষেত্রে নিস্পৃহতা।

কোনও সরকারী বা বেসরকারী নিবন্ধ দফতর অথবা কোনও আইনী অনুমোদন এখনও পর্যন্ত পেশাদার সমাজকর্মীদের নিয়োগের ব্যাপারে পাশে এসে দাঁড়ায়নি। ফলে বিশেষ বিশেষ পেশায় নিয়োগের ক্ষেত্রেও পেশাদার সমাজকর্মী তার অপেশাদার প্রতিদ্বন্দ্বির থেকে কোনও বাড়তি সুবিধা সচরাচর পান না। এর জন্য উপযুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সমাজকর্মী হিসাবে স্বীকৃতি লাভের পরে তাকে সমাজ বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখায় উত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে

কাজের সন্ধান করতে হয় এবং সেই সমস্ত কাজের ক্ষেত্রেই যেখানে একজন অপেশাদার সমাজকর্মীর থেকে একজন পেশাদার সমাজকর্মী অনেক বেশী যোগ্যতার পরিচয় দিতে পারেন। তৎসত্ত্বেও সুবিধা সুযোগের ক্ষেত্রে সাধারণতঃ কোন পার্থক্য লক্ষ্য করা যায় না।

(জ) পেশাদারী বা বৃত্তিমূলক সমাজ কর্মের জনস্বীকৃতির অভাব ঃ ভারতে পেশাদারী সমাজ কর্মের অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ হওয়ার জন্য দায়ী আরেকটি কারণ হলো জনগণ এই পেশাকে এখনও যেভাবে স্বীকৃতি দিতে পারেনি। এই ধরনের কাজের একটা আদর্শ বিজড়িত ছবি মানুষের মননে উজ্জ্বলভাবে বিরাজ করছে। একজন সমাজকর্মী তাদের চোখে এক মহান হৃদয়ের অধিকারী যে প্রত্যাশা ছাড়াই অন্যের হিতের জন্য কাজ করে যেতে পারে। সামাজিক কাজে পেশাদারীত্বের মনোভাব যেন এই ছবির মহানুভবতাকে ক্ষুন্ন করছে। এর ফলে উপযুক্ত প্রশিক্ষণ প্রাপ্য প্রতিভাবান সমাজকর্মীরাও অনেক সময় সামাজিক গ্রহণযোগ্যতার অভাবে এক ধরনের নিরাপত্তাহীনতায় ভুগতে থাকে।

(ঝ) পেশাদার সংস্থাগুলির অক্ষমতা ঃ বিগত প্রায় দুই দশক ধরে Indian conference of social work সমাজ কল্যাণমূলক কাজের ক্ষেত্রে একটা গুরুত্বপূর্ণ শক্তি হিসাবে কাজ করে চলেছে। সমাজ কল্যাণমূখী কর্মসূচীর নির্ধারণ ও তাকে রূপায়নের দায়িত্বও এরা পালন করছে। কিন্তু কিছুদিন যাবৎ এর গুরুত্ব কিছুটা হ্রাস পেয়েছে নেতৃবৃন্দের বার্দ্ধক্যজনিত সমস্যা এক পেশাদার মানুষ ও গোষ্ঠির উৎসাহে ভাটা পড়ায়।

এছাড়া পেশাদারী সমাজকর্মীদের সংগঠনগুলি অসংহতি, অন্তর্বিরোধ, অদক্ষ পরিচালনার মতো সমস্যার জন্য অসাফল্যের উদাহরন রেখে চলেছে। ফলে যে প্রেরণাকে সম্বল করে তাদের কাজ শুরু হয়েছিল তাও যেন ক্রমশঃ হারিয়ে যাচ্ছে।

৮.৬ অনুশীলনী

১। সমাজ কর্ম পেশার বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যগুলি উল্লেখ কর।

২। এই পেশার বৈশিষ্ট্যগুলি উল্লেখ কর।

৩। এক্ষেত্রে সরকার দ্বারা গৃহীত পদক্ষেপ গুলি কি কি?

৪। পেশা হিসাবে সমাজ কর্ম কোন্ কোন্ অসুবিধার মুখোমুখি হয়।

একক ৯ ❑ কয়েকটি নির্দিষ্ট অর্থযুক্ত শব্দ সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা

গঠন

৯.১ সামাজিক প্রতিরক্ষা

৯.২ সামাজিক আইন প্রনয়ন

৯.৩ সমাজ সংস্কার

৯.৪ সামাজিক নীতি

৯.৫ সামাজিক উন্নয়ন

৯.৬ সমাজ কল্যাণ

৯.৭ সমাজ সেবা

৯.৮ সমাজ কর্ম

৯.৯ সামাজিক পরিবর্তন

৯.১০ সামাজিক নিরাপত্তা

৯.১১ অনুশীলনী

৯.১ সামাজিক প্রতিরক্ষা

সামাজিক প্রতিরক্ষা বলতে আমরা বুঝি সমাজকে দুর্নীতি এবং অপরাধের কবল থেকে রক্ষা করা। অতীতে সামাজিক অপরাধের ঘটনা বন্ধ করার জন্য অপরাধীকে কঠোর শাস্তিদানের ব্যবস্থা করা হতো। ক্রমশঃ এই ব্যবস্থার নিষ্ক্রিয়তা প্রকট হয়ে পড়ে। এর পরিবর্ত হিসাবে আসে এক আন্দোলন যা সামাজিক অপরাধ সংক্রান্ত বিষয়ের বিজ্ঞানসম্মত দিকটির ওপরে আলোকপাত করে। এই মতবাদ অনুসারে মানুষের অপরাধমূলক কাজের পিছনে কাজ করে দুটি কারণ, যার একটি হল তার ব্যক্তিত্বের বহুরূপতা এবং অন্যটি পরিবেশের প্রভাব, যাকে অপরাধত্ব ও সমাজতত্ত্বের আঙ্গিকে ব্যাখ্যা করা যায়। তিনটি মূল ধারণাকে কেন্দ্র করে সামাজিক প্রতিরক্ষার চিন্তা বা ধারনাটির উন্মেষ ঘটে ঃ

(ক) অপরাধীর কঠোর দন্ডবিধান করা অপেক্ষা সমাজের সুরক্ষার অধিক প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধ হয়।

(খ) অপরাধীকে পুনরায় শিক্ষাদানের মাধ্যমে তার হৃদয়ে কিছু কাঙ্খিত পরিবর্তন নিয়ে আসার গুরুত্ব অনুভূত হয়।

(গ) মনুষ্যত্বের ন্যূনতম সম্মানদান করার জন্য বিচার ব্যবস্থার মান বিকরণ প্রয়োজনীয় হয়ে ওঠে।

প্রধানত এই তিন চিন্তাভাবনাই আধুনিক সামাজিক প্রতিরক্ষার ভিত্তিপ্রস্তর রূপে বিবেচিত হয়।

৯.২ সামাজিক আইন

একটি সমাজ ঐক্যবদ্ধ বহু মানুষের সমাবেশ, যেখানে সকলেই বেঁচে থাকে কিছু দেওয়া ও কিছু পাওয়ার আগ্রহ নিয়ে। একে একটি সহায়তাপূর্ণ সহাবস্থান বলা চলে। তথাপি, সমাজ বিভিন্ন শোষনকারী সমষ্টি ও শোষিত সমষ্টির দ্বারা গঠিত হয়। এই ক্ষমতা বন্টনের ভিত্তিতে সামাজিক বিভাজন রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপকে আবশ্যক করে তোলে, যাতে করে সর্বহারা শ্রেণীর অধিকার সংরক্ষিত হয়। পারস্পরিক অধিকার ও দায়িত্ব রক্ষার্থে রাষ্ট্রের প্রয়োজন অপরিসীম। সামাজিক আন্তঃক্রিয়ার বৃদ্ধিতে সামাজিক জটিলতার সৃষ্টি হয়, যার ফলে সামাজিক সমষ্টিগুলির সংরক্ষণ আইন প্রণয়নের মধ্য দিয়ে রাষ্ট্রের বিবেচনার বিষয়ীভূত করে তোলা কোন সাম্প্রতিক ঘটনা নয়। যদিও আইন প্রণয়নের মধ্য দিয়ে ক্ষমতাহীন সমষ্টিগুলির অধিকার ও বিশেষ সুবিধার সংরক্ষণ একটি সাম্প্রতিক নিয়মবদ্ধ ও সচেতন প্রচেষ্টার প্রতিফলন যা গণতন্ত্রের অগ্রসর ও জনকল্যাণকর রাষ্ট্রের কল্পিত ধারনার সঙ্গে সংযুক্ত। সামাজিক আইন প্রণয়ন, বিশেষত গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় একটি প্রাণশক্তিপূর্ণ, নিয়ন্ত্রণ সহায়ক এবং পরিবর্তনশীল সমাজের প্রয়োজনীয়তা সাধনের মাধ্যম। সামাজিক আইন প্রণয়ন ধারনাটি বলতে বোঝায় বিগতদিনের সামাজিক প্রয়োজনীয়তার পূর্ণতা সাধন। যে আইন প্রণয়নের মধ্য দিয়ে বিদ্যমান আইন আর সমাজের বর্তমান প্রয়োজনীয়তার মধ্যে সেতু স্থাপন করাকেই সামাজিক আইন প্রণয়ন বলে। সামাজিক আইন প্রণয়ন মূলতঃ দুটি উদ্দেশ্য সাধনকে বোঝায় ঃ

(ক) সুব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করা ও ন্যায়পরতা ও নিরাপত্তা সাধন করা। (খ) সামাজিক প্রয়োজনীয়তা পূর্বেই নির্ধারন করা ও সমাজ ব্যবস্থায় পরিবর্তন সাধন করা।

৯.৩ সমাজ সংস্কার

সমাজ সংস্কার বলতে আমরা বুঝি স্বেচ্ছাকৃত প্রচেষ্টার দ্বারা সামাজিক ধারনার পরিবর্তন, সাংস্কৃতির দ্বারা নির্ধারিত আচরণ ভূমিকায় উপনীত হওয়া এবং সমগ্র কাঙ্খিত পথে মানুষের ব্যবহারের মধ্যে পরিবর্তন সাধন। সমগ্র জনসাধারনের শিক্ষার মধ্য দিয়ে উনবিংশ শতাব্দীর সমাজ সংস্কার আন্দোলন নির্দেশিত হয়েছিল ধর্মনিরপেক্ষ ধারণা, উদারপন্থী মতবাদ ও গণতান্ত্রিক আদর্শের দ্বারা। এই সমাজ সংস্কার আন্দোলনের দ্বারা উদিত মূল্যবোধ নির্ধারন করে সমষ্টিগত নতুন আচরণ, যা নতুন সমাজ ব্যবস্থায় উপযোগী হওয়ার উদ্দেশ্যে অভিষ্ট। বিধবা বিবাহ প্রচলন, সতীদাহ প্রথা রোধ ইত্যাদি হলো সমাজ সংস্কারের উদাহরণ।

৯.৪ সামাজিক নীতি

সামাজিক নীতি হল ক্রমপর্যায়ে গৃহীত মাধ্যম এবং পদ্ধতির দ্বারা কাঙ্খিত সামাজিক উদ্দেশ্য সাধনের একটি কৌশল। এই ক্ষেত্রে 'নীতি' শব্দটির অর্থ অভিপ্রেত উদ্দেশ্য সাধনের জন্য নির্দিষ্ট কর্মসূচী গ্রহণ।

নিম্নলিখিত চারটি ক্ষেত্রকে সামাজিক নীতির প্রকৃতি এবং পরিধির অপরিহার্য অংশ হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে ঃ

(ক) জাতীয় উন্নয়ন কর্মসূচীর সামাজিক উদ্দেশ্য

(খ) পর্যায়ক্রমিক পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সমাজসেবা মূলক কর্মসূচী

(গ) সমাজের দুর্বলতর শ্রেণীর স্বার্থজনিত নিরাপত্তা এবং উন্নতি সংশ্লিষ্ট বিষয়

(ঘ) বিভিন্ন স্তরের জনসাধারণের অংশগ্রহণ নীতি এবং পরিকল্পনার প্রণয়ন এবং রূপায়ন।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় যে, সমাজ কল্যাণমূলক নীতি জাতীয় প্রচেষ্টার একটি বিশেষ ক্ষেত্রের সাথে সম্পর্কযুক্ত হওয়ায় এটি অধিকতর নির্দিষ্ট এবং স্বল্পপরিধিযুক্ত। জনসাধারণের যে অংশ জীবনের চাহিদা পরিপূরণে অক্ষম, সেই অংশের নিরাপত্তা এবং পুর্নপ্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজনীয় উদ্দেশ্য প্রণোদিত এবং সুসংগঠিত পদক্ষেপ এই নীতির অন্তর্ভুক্ত।

এই পরিপ্রেক্ষিতে সার্বিকীকরণ করা যায় যে, সামাজিক নীতির অন্তর্নিহিত লক্ষ্যই হল সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠা, সমাজ কল্যাণমূলক নীতির উদ্দেশ্য হল জন্মগত এবং লব্ধ সামাজিক প্রতিবন্ধকতার নিমিত্ত অক্ষম ব্যক্তিদের সমর্থ করে তোলার অভিপ্রায়ে সাধারণ কর্মসূচীর সুযোগ প্রদান করা যা সমাজের অবশিষ্ট জনসাধারনের কাছে সহজলভ্য।

৯.৫ সামাজিক উন্নয়ন

সামাজিক উন্নয়ন একটি সবার্থসাধক ধারণা যা বৃহত্তর রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক কাঠামোগত পরিবর্তনের ইঙ্গিত প্রদান করে, সেগুলি সমাজকে একটি সার্বিক ভাবের স্তরে রূপান্তরিত করবার জন্য বিবেচিত কাজকর্মের অংশ হিসাবে ব্যবহার করা হয়। উদ্দেশ্য হল, বর্তমান সমাজের পরিবর্তে এক নতুন সমাজের সৃষ্টি যেখানে জনসাধারনের মানের এমন উন্নতি হবে যাতে তাদের জীবনধারনের জন্য প্রাথমিক প্রয়োজনগুলি অপূর্ণ না থাকে। সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্য হল, গ্রাম, নগর এবং আঞ্চলিক ভিত্তিতে বৈষম্য দূর করা। এর আরেকটি লক্ষ্য হল সমাজের সর্বস্তরের মানুষের প্রাথমিক চাহিদাগুলি পূরণ করা, যা বর্তমানে প্রশাসনের পরিকাঠামো দ্বারা কার্যকরীভাবে রূপায়ণ করা যায়।

৯.৬ সমাজ কল্যাণ

সামাজিক ক্রিয়া এবং সমাজ কল্যাণ শব্দদুটি এতই বিভ্রান্তিকর যে এই একই অর্থে প্রায়ই ব্যবহার হয়ে থাকে। সমাজকল্যাণ উক্তিটির বৃহত্তর তাৎপর্য রয়েছে। সমাজ শিক্ষা এবং জনকল্যাণকর কর্মসূচি ও ক্রিয়াকলাপকে একত্রে নিয়ে হয় সমাজকল্যাণ। ফ্রাইডল্যান্ডারের মতে, সমাজ কল্যাণ বলতে আমরা বুঝি সংগঠিত সামাজিক পরিষেবা ও প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থার দ্বারা ব্যক্তি ও সমষ্টির জীবনধারনের সন্তুষ্টিকর মান, কাঙ্খিত ব্যক্তি ও সামাজিক সম্পর্কে উপনীত হওয়া যাতে করে ব্যক্তির সহজাত ক্ষমতার পূর্ন বিকাশ হয় যা পারিবারিক ও বৃহত্তর সমাজের প্রয়োজনীয়তার সঙ্গে সংহতি রেখে উন্নতিসাধন ঘটায়।

৯.৭ সমাজ সেবা

কোন ব্যক্তি বা সমষ্টির প্রয়োজনের সময় স্বেচ্ছায় সাহায্য প্রদান করাকে সমাজসেবা বলে চিহ্নিত করা হয়। সমাজসেবা ব্যক্তির চাহিদা ও সহজাত ক্ষমতার উপর আলোকপাত করে না অথবা সমাজ সেবামূলক ক্রিয়াকলাপের মধ্য দিয়ে ব্যক্তি স্বয়ং নিজে তার সমস্যার সমাধানে উপনীত হতে পারে না। সমাজসেবা ব্যক্তির উদ্দেশ্যে সাহায্য প্রদান বোঝায় যা আবেগের দ্বারা তাড়িত ও অন্যকে সাহায্য করার অভিপ্রায়ে অনুপ্রাণিত।

৯.৮ সমাজ কর্ম

সামাজিক ক্রিয়ার একটি পেশাদারী পরিসেবামূলক রূপ আছে যা ব্যবহারিক জ্ঞান ও দক্ষতার দ্বারা পরিবেষ্টিত। একদিকে, সামাজিক ক্রিয়া যেমন ব্যক্তিকে তার চাহিদা পূরণে সাহায্য করে তেমনি অপরদিকে সব বাধা অপসারণ

ঘটিয়ে যা কাঙ্খিত বলে সমাজে বিবেচিত তা অর্জন করতে সাহায্য করে। প্রফেসার এন্ডারসন সমাজ কর্মকে পেশারূপে ব্যাখ্যা করেছেন যার উদ্দেশ্যই হল ব্যক্তির কর্মক্ষমতা ও বৃহত্তর সমাজের চাহিদার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে, ব্যক্তিকে তার কাঙ্খিত জীবনধারণের মানে উপনীত করা।

৯.৯ সামাজিক পরিবর্তন

সামাজিক পরিবর্তন বলতে আমরা বুঝি প্রতিষ্ঠিত মানবিক সম্পর্ক ও আচরণবিধিতে আদর্শানুযায়ী পরিবর্তন। চলমান মানবজীবনে প্রতিষ্ঠিত আন্তঃসামাজিক সম্পর্কের মধ্যে আচরণগত স্থায়ী পরিবর্তনই হল সামাজিক পরিবর্তন। এক কথায়, মানুষের জীবনধারার মধ্যে লক্ষ্যণীয় পরিবর্তনকেই আমরা সামাজিক পরিবর্তন বলতে পারি। তবে মানব জীবনের সকল পরিবর্তনকেই সামাজিক পরিবর্তন বলতে পারি না, যেমন ভাষাগত, সাংস্কৃতিগত পরিবর্তন সামাজিক পরিবর্তন নাও বলতে পারে। সীমিত অর্থে, সামাজিক পরিবর্তন বলতে আমরা বুঝি-সামাজিক সম্পর্কের আদর্শগত পরিবর্তন। তাই সামাজিক পরিবর্তন হল প্রতিষ্ঠানগত এবং আদর্শগত সামাজিক পরিকাঠামোর পরিবর্তন।

৯.১০ সামাজিক নিরাপত্তা

সামাজিক নিরাপত্তা বলতে আমরা বুঝি আধুনিক জীবনের যে সকল সমস্যাগুলি যেমন অসুস্থতা, বেকারত্ব, বার্ধক্য জনিত নির্ভরতা, শিল্প ক্ষেত্রে দুর্ঘটনা পঙ্গুত্ব ইত্যাদি)-র কবল থেকে মানুষ তার নিজস্ব ক্ষমতা এবং দূরদৃষ্টি বলে নিজেকে এবং তার পরিবারকে রক্ষা করতে সক্ষম হয় না, সেই সকল সমস্যাগুলির বিরুদ্ধে সমাজ প্রদত্ত সুরক্ষার কর্মসূচি। সাধারণ অর্থে, ব্যক্তিগত সমাজকল্যাণমূলক কর্মসূচী যা অধিকাংশ দেশের সমাজ কল্যাণমূলক ব্যবস্থার একটি বিশেষ অংশ, তা 'সামাজিক নিরাপত্তা' শব্দটির অন্তর্ভুক্ত নয়।

৯.১১ অনুশীলনী

১। নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা ব্যক্ত কর।

(ক) সামাজিক প্রতিরক্ষা

(খ) সামাজিক আইন

(গ) সমাজ সংস্কার

(ঘ) সমাজ কল্যাণ

(ঙ) সামাজিক উন্নয়ন

এম. এস. ডব্লু.

দ্বিতীয় পত্র

সমাজ কর্মের পদ্ধতি-১

[Methods of Social Work-1]

একক ১ ❑ সামাজিক ব্যক্তি কর্মের সংজ্ঞা, উপাদান ও নীতি

গঠন ঃ

১.১ সামাজিক ব্যক্তি কর্মের সংজ্ঞা বা অর্থ

১.২ সামাজিক ব্যক্তি কর্মের উপাদান

১.৩ সামাজিক ব্যক্তি কর্মের নীতিসমূহ

১.৪ প্রশ্নাবলী

১.১ সামাজিক ব্যক্তি কর্মের সংজ্ঞা বা অর্থ

সামাজিক ব্যক্তি কর্ম এমন এক পদ্ধতি যা একজন ব্যক্তিকে সামাজিক কর্ম পদ্ধতির মাধ্যমে সেই ব্যক্তির সমস্যাগুলির সমাধান করা যায়। এটি সমাজ কর্মের প্রাথমিক পদ্ধতি। মানুষের সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে উন্নতি ঘটিয়ে বিভিন্ন ব্যক্তি, গোষ্ঠী ও সমষ্টির সঙ্গে ভালভাবে খাপ খাইয়ে চলতে সাহায্য করে এই পদ্ধতি। সামাজিক ব্যক্তি কর্ম হলো একের সঙ্গে একের সম্পর্ক যা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে বিভিন্ন অবস্থার সঙ্গে মানিয়ে চলতে সাহায্য করে।

সমাজ বিজ্ঞানী টেলরের (Taylor) মতে সামাজিক ব্যক্তি কর্ম হচ্ছে একটি পদ্ধতি (Process) যার দ্বারা কোন ব্যক্তির সামগ্রিক ব্যক্তিত্ব বুঝতে পারা যায় এবং সামাজিকভাবে সুস্থ জীবন যাপনের স্বার্থে প্রয়োজনীয় সমন্বয় সাধন বা আপস মীমাংসা করা হয়।

ওয়াটসনের (Watson) মতে সামাজিক ব্যক্তি কর্ম হলো কোন ব্যক্তির ভেঙ্গে পড়া ব্যক্তিত্বকে পুনর্গঠন করা যাতে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি তার পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে চলতে পারে।

সমাজবিজ্ঞানী রিনোল্ডেসের (Reynolds) মতে সামাজিক ব্যক্তি কর্ম হচ্ছে সমাজ কর্মের সেই প্রণামী বা প্রচলিত প্রথা যা ব্যক্তিকে তার পরিবার, স্বাভাবিক গোষ্ঠী এবং সমষ্টির সঙ্গে মানিয়ে চলার সংগ্রামে সাহায্য করে।

আর এক প্রখ্যাত সমাজবিজ্ঞানী রিচমণ্ডের (Richmond) মতে সামাজিক ব্যক্তি কর্ম হলো মানুষের জন্য এবং মানুষের সঙ্গে কাজ করার কলাকৌশল যার মাধ্যমে ব্যক্তি এবং সমাজের কল্যান বা উন্নয়ন সম্ভব হয়।

উপরোক্ত সংজ্ঞাগুলি থেকে আমরা সামাজিক ব্যক্তি কর্মের যে ধারণাটি পাই তা হলো কোন ব্যক্তি যখন সামাজিক ও মানসিক দিক থেকে কোন সমস্যার শিকার হয়, পরিবার-পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে চলতে অসুবিধার মুখোমুখি হয় এবং সেই সব অসুবিধা নিজের চেষ্টায় সমাধান করতে পারবে বা করা যায় তা ভাবে না, সেক্ষেত্রে তাকে সমস্যার উর্দ্ধে উঠতে সাহায্য করা। এই কাজে সাহায্যকারী কোন সমাজ পরিষেবা মূলক সংস্থা বা বিভাগ বা কোন মানব কল্যাণ প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত পেশাদার কর্মী।

সামাজিক ব্যক্তি কর্মের উদ্দেশ্য হলো একক ব্যক্তি বা মক্কেল (client) যেন আনন্দদায়ক, অর্থবহ এবং গ্রহণযোগ্য জীবন যাপন করতে পারে তার সামাজিক পরিবেশের মধ্যে এবং সেজন্য তার সামগ্রিক পরিবেশে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন ঘটানো হয়। সুতরাং এর প্রধান উদ্দেশ্য হলো মানুষকে তার নিজস্ব সক্ষমতা সদ্ব্যবহারের মাধ্যমে তার / তাদের সমস্যা সমাধানে যুক্ত করে তোলা। ব্যক্তি যে তার সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক সমস্যা নিজ চেষ্টাতেই দূর করতে সক্ষম এবং ভবিষ্যতে তেমন সমস্যার সম্ভাবনা দেখা দিলে তা প্রতিরোধ করতেও সক্ষম এই বিশ্বাস সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির ভাবনায় প্রবিষ্ট করে দেওয়ার সামাজিক ব্যক্তি কর্মের উদ্দেশ্য। উদ্দেশ্য বা লক্ষ্যগুলিকে আমরা এভাবে উপস্থাপন করতে পারি।

(ক) একক ব্যক্তি যে সব সমস্যার শিকার তা উপলব্ধি করা এবং তার সমাধানে উদ্যোগী হওয়া।

(খ) সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির আত্মশক্তি ও আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি করা।

(গ) সামাজিকভাবে মানিয়ে চলার ক্ষেত্রে যে সমস্ত সমস্যা দেখা দেয় তা প্রতিকারের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া।

(ঘ) এই সমস্যা প্রতিরোধের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া।

(ঙ) জীবন যাতে কার্যকরী ও আনন্দদায়কভাবে অতিবাহিত করা যায় সেই মর্মে মক্কেলের ব্যক্তিত্বে এবং তার সামাজিক পরিবেশে উন্নতি ঘটানো।

উপরে বর্ণিত অনুচ্ছেদগুলি থেকে যে সত্যটি বা ভাবটি প্রতিষ্ঠিত হয় তা হলো একক ব্যক্তিকে সমষ্টির মধ্যে বা পরিবারের মধ্যে বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি ক্ষেত্রে মানিয়ে চলতে না পারার যে যন্ত্রণাদায়ক পরিস্থিতি তা থেকে পেশাগত সাহায্যের মাধ্যমে অব্যাহতি দেওয়াই হলো একক ব্যক্তির সার্থে কাজের উদ্দেশ্য। যেহেতু একজন দক্ষ সমাজকর্মী সমস্যা-জড়িত ব্যক্তির সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশ (Social and cultural environment)-এর উপর নজর রেখে কাজ করেন তাই এই ধরনের সমস্যার কবল থেকে মুক্ত করা তাঁর পক্ষে সম্ভব।

১.২ সামাজিক ব্যক্তি কর্মের উপাদান

সামাজিক ব্যক্তি কর্ম কয়েকটি উপাদানকে নিয়ে গঠিত। সেগুলি হলো ঃ

(ক) **ব্যক্তি বিশেষ (The person) ঃ** ব্যক্তি বিশেষ বলতে আমরা বুঝি সেই নির্দিষ্ট ব্যক্তি যে সামাজিক ও মানসিকভাবে সুস্থ জীবন যাপনের ক্ষেত্রে কিছু সাহায্যের প্রয়োজন বোধ করে। একজন ব্যক্তির শারীরিরক, সামাজিক ও মানসিক এই তিনটি দিক রয়েছে। নানান কারণে এ সব ক্ষেত্রে এমন কিছু সমস্যার মুখোমুখি তাকে হতে হয় যার মোকাবিলা করা তার পক্ষে সম্ভব হয় না। তখন সে বিশেষজ্ঞের বা পেশাদারের সাহায্য প্রত্যাশী হয়, যখন থেকে সে সাহায্য নিতে শুরু করে তখন থেকে সে একজন মক্কেল (client) বলে চিহ্নিত হয়। ব্যক্তি কর্মী (case worker) তখন তার ব্যক্তিত্বে, পারিবারিক পরিবেশ, সমস্যার উৎস ইত্যাদি বিশ্লেষণ করে তার সমাধানের পথ খোঁজে। সে জানে যে প্রতিটি ব্যক্তির সত্ত্বা ও ব্যক্তিত্ব আলাদা, পরিবেশ পৃথক, সমস্যার ধরনেও পার্থক্য। সেজন্য প্রতি সমস্যা-আক্রান্ত ব্যক্তি তার কাছে এক একটি পৃথক একক।

ব্যক্তির ছোট ছোট কথাবার্তা, হাবভাব, পরিবেশগত অবস্থা থেকে সমস্যার কারণ বা উৎস সম্পর্কে পেশাদার ব্যক্তি কর্মীকে ধারণা আহরণ করতে হয়। ব্যক্তি মাত্রই এক এক ধরনের জীবন যাপনে এবং এক এক প্রকার আবরণে অভ্যস্থ। সবাই নিজস্ব স্টাইলের অধিকারী। পরিবেশও সবার এক হয় না। এগুলি বিবেচনার মধ্যে রেখে, পেশাদার ব্যক্তি কর্মীকে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির অতীত এবং বর্তমানের অভিজ্ঞতাগুলির মধ্যে একটা যোগসূত্র খুঁজে ঠিক কিভাবে তাকে সাহায্য করলে তা কার্যকরী হবে সে সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণে অগ্রনী হতে হয়। মক্কেল (client) যে মানসিক চাপ বা সমস্যা নিজেই সৃষ্টি করে ফেলেছে তার ব্যক্তিত্বের ধরন বা আচরণের জন্য অথবা বিভিন্ন ধরনের টানাপোড়েনের মধ্যে জীবন যাপনে অক্ষমতার জন্য তার স্বাভাবিক জীবনযাপনের জন্য পেশাদারের সাহায্যের প্রয়োজন অনুভব করে। এই সমস্যা-কবলিত ব্যক্তি ব্যতিরেকে ব্যক্তি কর্মের কোন অস্তিত্ব থাকে না। তাই ব্যক্তি হলো সামাজিক ব্যক্তি কর্মের অন্যতম প্রধান উপাদান।

(খ) **সমস্যা (Problem)** ঃ মানুষের জীবনে শারীরিক, সামাজিক এবং মানসিক দিক রয়েছে। এগুলির আলাদা পরিচিতি বা অস্তিত্ব থাকলেও তারা পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। একটি আর একটিকে প্রভাবিক করে। কোন দম্পতি যদি শারীরিকভাবে সুস্থ থাকে, আর্থিক অনটনের শিকার না হয়, সামাজিক চাপে ব্যতিব্যস্ত না হয়, যৌন জীবনে স্বাভাবিকতা থাকে তবে সেই দম্পতি সুস্থভাবে জীবন যাপন করতে পারে। কিন্তু যদি উপরোক্ত ক্ষেত্রের মধ্যে কোন একটিতে বড় রকমের ছন্দপতন ঘটে তবে জীবনের অন্য ক্ষেত্রগুলিও তার দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়। একজন ব্যক্তি যদি আর্থিক অনটন কবলিত হয় এবং পরিবারের সদস্যদের ভরন-পোষণ, শিক্ষাদীক্ষা, চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে অপারগ হয় সেক্ষেত্রে সেই ব্যক্তির আত্মসম্মানে হানি ঘটে এবং স্বাভাবিক দাম্পত্যজীবন যাপন করাও সম্ভব হয়ে উঠে না। এভাবেই জীবনের এক ক্ষেত্রের সমস্যা অন্যান্য প্রভাবিত করে।

নিজের সমস্যা অনুভবের ক্ষেত্রেও মানুষে মানুষে পার্থক্য দেখা যায় এবং একই ধরনের সমস্যা মোকাবিলা করার চেষ্টাও বিভিন্নজন বিভিন্নভাবে করে থাকে তাদের নিজ নিজ অন্তদৃষ্টি ও অভিজ্ঞতা ইত্যাদির ভিত্তিতে। প্রত্যেকে তাদের নিজেদের মনের ভিতরের চিন্তা প্রবাহের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হওয়ায় এই পার্থক্য অবশ্যম্ভাবী হয়ে যায়। এই কারণেই ব্যক্তিকর্মীকে (case worker) সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির ব্যক্তিসত্বার ব্যাপারে ওয়াকিবহাল থাকতে হয়।

(গ) **স্থান (Place)** ঃ স্থান হলো ব্যক্তি কর্মের তৃতীয় প্রয়োজনীয় উপাদান। স্থান বলতে এখানে বোঝানো হচ্ছে সেই সংস্থার অফিস যা সমস্যা কবলিত ব্যক্তিকে সমস্যামুক্ত করার কাজে যুক্ত থেকে সমাজের স্বার্থরক্ষায় ভূমিকা পালন করে। প্রতিষ্ঠান ছাড়া সামাজিক ব্যক্তি করা সম্ভব নয় বলেই এটিকে অন্যতম উপাদান হিসাবে বিবেচনা করা হয়ে থাকে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় একটি শিশু উপদেশ কেন্দ্র (Child Guidance Centre) সমস্যাগ্রস্ত শিশুদের যে পেশাগত পরিষেবা দেয় তার জন্য এক সংস্থাগত পরিকাঠামোর প্রয়োজন। এই প্রয়োজনের প্রেক্ষিতেই স্থান (Place) সামাজিক ব্যক্তি কর্মের মত পেশাগত কাজের ক্ষেত্রে অন্যতম প্রয়োজনীয় উপাদানে হিসাবে চিহ্নিত হয়ে রয়েছে।

(ঘ) **কার্যপ্রণালী (Process)** ঃ সামাজিক ব্যক্তি কর্ম হলো ব্যক্তির সমস্যা সমাধানের এক রীতি বিশেষ। সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তি বা মক্কেল (client) যেহেতু জীবনের বিশেষ কিছু ক্ষেত্রে মানিয়ে চলতে অক্ষম হয় তাই সে তখন উপযুক্ত প্রতিষ্ঠানের সাহায্য প্রার্থী হয়। সেই প্রতিষ্ঠান তার দক্ষ ও পেশাদার ব্যক্তি কর্মীর (case worker) মাধ্যমে তাকে সমস্যা কাটিয়ে উঠতে সাহায্য করে। যেহেতু এ কাজ একদিনের নয় তাই ব্যক্তি কর্মকে ধারাবাহিক

কার্যপ্রণালী (continous process) বলা হয়ে থাকে। সংস্থা থেকে বা অন্য কোন প্রতিষ্ঠান থেকে প্রয়োজনীয় **সম্পদ বা** সাহায্য নিয়ে ব্যক্তি কর্মী তার ভূমিকা পালন করে। তার দ্বারা গৃহীত কার্যপ্রণালী সমস্যা কবলিত ব্যক্তিকে সমস্যার মুখোমুখি হয়ে তা থেকে উত্তরণের পথ খুঁজে পেতে সাহায্য করে। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি যে বিশ্বাস ও সাহস হারিয়ে ফেলে, বিস্তার ক্ষেত্রে যে ধোঁয়াশার সৃষ্টি করে নেয় এবং অন্য ব্যক্তির সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে জট পাকিয়ে নেয়, সেই অবস্থার হাত থেকে মুক্ত করতে ব্যক্তি কর্মীকে তার পেশাগত জ্ঞান ও দক্ষতার ভিত্তিতে নির্দিষ্ট কার্য প্রণালী অবলম্বন করতে হয়। উপযুক্ত কার্যপ্রণালীর প্রয়োগ ছাড়া সমস্যা থেকে মুক্ত হতে সাহায্য করা সম্ভব নয়। সেজন্য কার্যপ্রণালী হলো ব্যক্তি কর্মের আর এক উপাদান।

১.৩ সামাজিক ব্যক্তি কর্মের নীতিসমূহ

নীতি হলো নির্দেশাত্মক নৈতিক শক্তি (Guiding force) যার ভিত্তিতে ব্যক্তিজীবন, সমাজ জীবন বা কোন কর্মপ্রণালী পরিচালিত হয়। সামাজিক ব্যক্তিকর্ম যেহেতু এক পেশাভিত্তিক কর্মপ্রণালী তাই তাও পরিচালিত হয়ে থাকে কিছু নীতির ভিত্তিতে। ব্যক্তি কর্মী এবং তার সংস্থাকে এই সব নীতিগুলি মেনে চলতে হয়। সমাজ বিজ্ঞানী ফেলিক্সের ব্যাখ্যা অনুসারে সামাজিক ব্যক্তি কর্মের মুল নীতিগুলি হলো ঃ

(ক) **গ্রহণের নীতি (Principle of Acceptance)** ঃ সামাজিক ব্যক্তি কর্মের সঙ্গে যুক্ত পেশাদার ব্যক্তির প্রথম কর্তব্য হবে সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তি যে অবস্থায় আছে সেই অবস্থাতেই তাকে গ্রহণ করা। সেই ব্যক্তির শক্তি এবং দুর্বলতা, দোষ এবং গুণ সবই থাকবে চরিত্রের অঙ্গীভূত হয়ে। সেই সঙ্গে থাকবে সদর্থক এবং অসদর্থক অনুভূতি ও গঠনমূলক এবং ধ্বংসাত্মক প্রবৃত্তি। অভিমান, ক্রোধ, ভালবাসা, হিংসা, ক্রুরতা সব কিছুই তার চরিত্রের বর্ণ হয়ে থাকতে পারে। সামাজিক ব্যক্তিকর্মীকে এই নীতির ভিত্তিতে তাকে গ্রহণ করতে হবে যে client তার পচ্ছন্দের দৃষ্টিভঙ্গীযুক্ত, মনোভাবাপন্ন এবং গুণসম্পন্ন হবে এমন ভাবনাই অমূলক। সব মক্কেলই তার কাছে সমানভাবে গ্রহনযোগ্য এই নীতিতে আস্থা রেখে সে কাজ করবে।

(খ) **ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট দ্বারা চিহ্নিত করার নীতি (Principle of indiavidnalisation)** ঃ প্রতি ব্যক্তি চরিত্রগত বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়ে পৃথক। স্বভাবতঃই ব্যক্তি কর্মীর কাছে যে সব সমস্যা গ্রস্ত ব্যক্তি আসে তাদের মধ্যেও পৃথক পৃথক বৈশিষ্ট্য থাকবে। প্রত্যেকের এই নিজস্ব বৈশিষ্ট্যগুলি বুঝে নিয়ে এবং সেগুলিকে স্বীকৃতি দিয়ে ব্যক্তি কর্মীকে কাজ করতে হয়। সে যাতে ভালভাবে মানিয়ে চলতে পারে সেজন্য তাকে পৃথক করে দেখতে হবে এবং তার ক্ষেত্রে উপযুক্ত প্রয়োগ প্রণালীর মাধ্যমে ব্যক্তি কর্মীকে পেশাগত পরিষেবা দিতে হয়।

(গ) **গোপনীয়তা রক্ষার নীতি (Principle of maintaining Confidentiality)** ঃ ব্যক্তি কর্মীর সঙ্গে পেশাগত সম্পর্কের জন্য মক্কেল (client) এমন অনেক তথ্য প্রকাশ করতে পারে যা সে অন্যের কাছে করতে চাইবে না। ব্যক্তি কর্মীর উপর আস্থা আরোপ করার জন্যই সে ধীরে ধীরে দ্বিধা বা সঙ্কোচ কাটিয়ে উঠে সবকিছু ব্যক্ত করে। সেজন্য সর্বপ্রযত্নে গোপনীয়তা রক্ষা করার চেষ্টা করা দরকার। ব্যক্তি কর্মের ক্ষেত্রে এটিও অন্যতম মূল নীতি।

(ঘ) **নিজে সংকল্প গ্রহণের অধিকার (Right to self determination)** ঃ সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তি (client)

ব্যক্তি কর্মীর সিদ্ধান্তের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল হলে সমস্যা সমাধানের পথ সুগম হয় না। সব সময় অন্যের নেওয়া সিদ্ধান্তের দ্বারা পরিচালিত হলে তার ব্যক্তিত্ব দূর্বল হয় এবং মনোবল বৃদ্ধি পায় না। client-কে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে স্বাধীনতা না দিলে সে কার্যপ্রণালীতে সম্পূর্ণভাবে সহযোগিতাও করে না। সেজন্য তার আত্মাভিমানে আঘাত না দিয়ে, তার অধিকারকে খর্ব না করে, তার অব্যক্ত সম্ভাবনাকে (Potentiality) মর্যাদা দিয়ে তার সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকারের নীতি মেনে ব্যক্তি কর্ম করা উচিত।

(ঙ) **বিচারকের মনোভাব নয় (Non-judgemental attitude)** ঃ ব্যক্তিকর্মীর সঙ্গে তার মক্কেলের সম্পর্কের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি দিক হলো মক্কেলকে বিচারকের মনোভাব নিয়ে না দেখা। এই প্রবণতা রোধ করা ব্যক্তি কর্মের অন্যতম নীতি। সমস্যা সৃষ্টিতে client কতখানি দায়ী, তার পরিবার কতখানি দোষী এসব বিচারের ভার নেওয়া তার কর্তব্যের মধ্যে পড়ে না। তার কোন কাজটি খুব খারাপ, কোন ব্যবহার একেবারে সহ্য করা যায় না এসব বিচার ভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও তার প্রকাশ ব্যক্তি কর্মের নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্য পূর্ণ নয়।

(চ) **নিয়ন্ত্রিত আবেগময় সমাচ্ছন্নতা (Controlled emotional involvement)** ঃ সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তির সমস্যাকে কেন্দ্র করে বা তার সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তোলা ও রক্ষা করার ক্ষেত্রে ব্যক্তি কর্মীকে আবেগ তাড়িত হওয়া থেকে বিরত থাকতে হয়। আবেগ সর্বদা নিয়ন্ত্রিত অবস্থায় থাকবে। অন্যথায় পেশাদারী মনোভাব রক্ষা করে দক্ষতার সঙ্গে পরিষেবা দানের ক্ষেত্রে ব্যর্থতা আসা স্বাভাবিক।

(ছ) **অনুভবের উদ্দেশ্যপূর্ণ প্রকাশ (Purposeful expression of feelings)** ঃ মক্কেল (client) তার নিজের সম্পর্কে, পরিবারের সম্পর্কে, সমস্যা সম্পর্কে, সমাধানের সম্ভাব্য উপায় সম্পর্কে তার অনুভূতি বিনা বাধায় খোলাখুলিভাবে যাতে প্রকাশ করতে পারে সে রকম পরিবেশ সৃষ্টি করাও ব্যক্তি কর্মের আর এক বিশেষ নীতি। সে যত এই অনুভূতি প্রকাশ করবে ততই ব্যক্তি কর্মীর পক্ষে সমস্যার গভীরতা, ব্যক্তি, কারণ সম্পর্কে যেমন জানতে পারবে তেমনি বুঝতে পারবে মক্কেলের মানসিক কাঠামো, চিন্তার ধরন ইত্যাদি।

(জ) **তথ্য চাওয়ার নীতি (Principle to seek information)** ঃ ব্যক্তি কর্মের সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াটি দাঁড়িয়ে আছে তথ্য প্রাপ্তির ভিত্তির উপর। যত বেশী প্রয়োজনীয় তথ্য পাওয়া যাবে তত বেশী সমস্যার জট খোলার সম্ভাবনা বৃদ্ধি পাবে। সেজন্য সম্ভাব্য বিভিন্ন সূত্র থেকে তথ্য চাওয়া বা সংগ্রহের নীতিও ব্যক্তি কর্মে গুরুত্বপূর্ণ। সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তিও কর্মী সম্পর্কে, তার প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে, তার সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে কি ধরনেব কার্যপ্রণালী গ্রহণ করা হচ্ছে সে সম্পর্কে তথ্য চাইতে পারে।

(ঝ) **সম্পদ সদ্ব্যবহারের নীতি (Principle of Resource utilization)** ঃ ব্যক্তি কর্মের ক্ষেত্রে নানা ধরনের সম্পদের প্রয়োজন হতে পারে। এসব সম্পদ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে বা অন্য কোন উপযুক্ত প্রতিষ্ঠানে যেমন পাওয়া যেতে পারে তেমনি সমষ্টি বা পরিবারের মধ্যে পাওয়া যেতে পারে। এমনকি যে তথ্য সংগৃহীত হয় তাও সম্পদ বিশেষ। এই সব সম্পদের সদ্ব্যবহার করার মধ্যেও লুকিয়ে থাকে সমস্যা সমাধানের বীজ। তাই প্রাপ্তব্য সব ধরনের সম্পদের সদ্ব্যবহার করাও ব্যক্তি কর্মের অন্যতম নীতি।

(ঞ) **সচেতনতার নীতি (Principle of Awareness)** ঃ ব্যক্তি কর্মীর (case worker) সঙ্গে একক সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তির সুস্থ ও পেশাভিত্তিক ভাবে গড়ে উঠতে পারে তখনই যখন ব্যক্তি কর্মী তার নিজের সম্পর্কে

সচেতন থাকবে। সর্বদা সচেতন থেকেই তাকে তথ্য সংগ্রহ করতে হবে, সমস্যার কারণ বিশ্লেষণ করতে হবে, উপযুক্ত কর্মপ্রণালী নির্দ্ধারণ করতে হবে।

উপরোক্ত নীতিগুলি ব্যক্তি কর্মের স্বীকৃত নীতি হিসাবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। যে ব্যক্তি কর্মী এই নীতিগুলি সম্পর্কে যতবেশী ওয়াকিবহাল ও স্বচ্ছ ধারনার অধিকারী হবে এবং সেগুলি মেনে চলার ক্ষেত্রে আন্তরিকতা দেখাবে সে তত এই পেশায় সাফল্য অর্জন করতে পারবে।

১.৪ প্রশ্নাবলী ঃ

(১) সামাজিক ব্যক্তি কর্মের অর্থ ব্যাখ্যা কর।

(২) সামাজিক ব্যক্তি কর্মের মূল উপাদানগুলি কি কি?

(৩) সামাজিক ব্যক্তি কর্মের নীতিগুলি ব্যাখ্যা কর।

একক ২ ❑ সমস্যা সমাধান কার্যপ্রণালীর বিভিন্ন স্তর

ভিতরে গ্রহণ করা, অধ্যয়ন, সমস্যা নির্ণয়, চিকিৎসা বা পরিচালনা এবং সমাপ্তিকরণ।

২.১ সমস্যা সমাধান কার্যপ্রণালী কি ও কেন

২.২ সমস্যা সমাধান কার্যপ্রণালীর বিভিন্ন স্তর

(ক) ভিতরে গ্রহণ করা

(খ) অধ্যয়ন

(গ) সমস্যা নির্ণয়

(ঘ) সামাজিক চিকিৎসা বা পরিচালনা

(ঙ) সমাপ্তিকরণ

২.৩ প্রশ্নাবলী

২.১ সমস্যা সমাধান কার্যপ্রণালী কি ও কেন

সমস্যা, তা সে যে কোন ধরনেরই হোক না কেন, এমন এক জটিলতা যা থেকে সকলেই মুক্তি কামনা করে। কিন্তু শুধু চাওয়ার ভিতর দিয়েই সমস্যার সমাধান হয় না। সমস্যার সমাধান ঘটাতে হলে নির্দিষ্ট ও উপযুক্ত পন্থা অবলম্বন করতে হয়। গৃহীত পন্থাগুলিই হলো কার্যপ্রণালী। ব্যক্তি কর্মে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির সমস্যা দূরীকরণের জন্য যে সব পন্থা অবলম্বন করা হয় সেগুলিই হচ্ছে সমস্যা সমাধানের কার্যপ্রণালী।

সমস্যা এমনই এক অপশক্তি যা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে বিশৃঙ্খল করে দেয়। হতাশা, অসহায়তা গ্রাস করে। মানসিক চঞ্চলতা ও সিদ্ধান্তহীনতা জীবন জীবিকার বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাকে অনুপযোগী করে তোলে। সব মিলিয়ে সেই ব্যক্তি পরিবার এমন সমাজের কাছে সম্পদের পরিবর্তে দায় হিসাবে পরিগণিত হওয়ার পথে এগোয়। সমস্যা এমনই এক বিষয় যার সমাধান করা অনেক সময় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির পক্ষে সম্ভব হয়ে উঠে না। তার প্রয়োজন পড়ে পেশাদার ব্যক্তি কর্মীর সাহায্যের। সামাজিক ব্যক্তি কর্মীও খেলার ছলে সমস্যার সমাধান করে দিতে পারেন না। প্রতিটি সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তির ক্ষেত্রেই তাকে নির্দিষ্ট কার্যপ্রণালী অবলম্বন করতে হয়। এই কার্যপ্রণালীর সাহায্য ছাড়া ব্যক্তি কর্মীও নিতান্ত অসহায়, তাই কার্যপ্রণালী ব্যক্তি কর্মে এত গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হয়ে আসছে।

২.২ সমস্যা সমাধান কার্যপ্রণালীর বিভিন্ন স্তর

সমস্যা সমাধানের জন্য ব্যক্তি কর্মে যে কার্যপ্রণালী সাধারণভাবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে তাকে পাঁচটি উপাদান পুষ্ট। সেগুলি হলো সমস্যাকে ভিতরে গ্রহণ করা, তা অধ্যয়ন করা, প্রকৃত সমস্যা নির্ণয় করা, সমস্যার উপযোগী

চিকিৎসা বা পরিচালনা ব্যবস্থা গ্রহণ করা এবং সমাপ্তিকরণ। কার্যপদ্ধতির অন্তর্গত এই উপাদানগুলি সম্পর্কে এখানে প্রয়োজনীয় আলোকপাত করা যেতে পারে।

(ক) ভিতরে গ্রহণ করা (Intake) ঃ

সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তিকে জাতি ধর্ম-সামাজিক অবস্থান নির্বিশেষে ব্যক্তি কর্মী গ্রহণ করবে। তাকে সচেষ্ট হতে হবে মক্কেলের (client) সঙ্গে এমন সম্পর্ক তৈরী করে নিতে যাতে ব্যক্তিকর্মী এবং তার প্রতিষ্ঠানের কাছে সে স্বচ্ছন্দ বোধ করে। সম্পর্ক ধীরে ধীরে এমনভাবে তৈরি করে নিতে হবে যাতে মক্কেলের প্রত্যয় জন্মায় যে এই ব্যক্তির সহায়তায় সে তার সমস্যা সমাধানের পথে এগোতে সক্ষম হবে। একজন ব্যক্তি কর্মীর কয়েকজন মক্কেল থাকতে পারে। তাদের সকলকেই এমনভাবে গ্রহণ করতে হবে যাতে কোনরকম ভিন্ন ব্যবহারের ছোঁয়া না থাকে। যেহেতু গ্রহণ করাই হলো সমস্যা সমাধান কার্যপ্রণালীর একেবারে প্রথম স্তর সেজন্য এক্ষেত্রে ব্যক্তি কর্মীকে অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করতে হবে। গ্রহণ প্রক্রিয়া যত বেশী আন্তরিক ও ত্রুটিমুক্ত হবে ব্যক্তি কর্মের কাজ তত বেশী সুচারুরূপে সম্পন্ন হওয়ার সম্ভাবনা বৃদ্ধি পাবে।

(খ) অধ্যয়ন (Study) ঃ

অধ্যয়ন হলো ব্যক্তি কর্মের মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে দ্বিতীয় পদক্ষেপ (step) বা স্তর (phase)। আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে সমস্যা সমাধানের জন্য বিশেষ প্রয়োজনীয় হলো সমস্যা সম্পর্কিত তথ্যের। সেই তথ্য সংগ্রহ করার জন্যই অধ্যয়নের প্রয়োজন। সমস্যা এবং সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তি সম্পর্কে অধ্যয়ন করার উপায়গুলি হলো ঃ

—মক্কেলের সাথে সাক্ষাৎকার (interview)

—সতর্কতার সঙ্গে পর্যবেক্ষণ (observation)

—পরিবারের সদস্য, আত্মীয়, ঘনিষ্ঠ বন্ধু, সহকর্মী শিক্ষক ইত্যাদির সঙ্গে সাক্ষাৎকার।

—মক্কেল (client) যেখানে বাস করে সেখানকার পরিবেশ পরিদর্শন (visit) করা।

—মক্কেলের সাথে আলোচনা (discussion)।

উপরোক্ত মাধ্যমগুলির সাহায্যে সমস্যাজড়িত ব্যক্তির সম্পর্কে অধ্যয়ন করা সমস্যা সমাধানের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ স্তর।

(গ) সমস্যা নির্ণয় (Diagnosis) ঃ

অধ্যয়নের পরের স্তর হলো সমস্যা নির্ণয়। এই স্তরটি বিশেষভাবে জটিল। কারণ প্রকৃত বা সঠিক সমস্যা নির্ণয় করতে না পারলে সমাধানের প্রচেষ্টা ব্যাহত হওয়া স্বাভাবিক। মক্কেলের ইতিহাস অবগত হওয়া এবং তার বিশ্লেষণের মাধ্যমেই সঠিক সমস্যা নির্ণয় করা সম্ভব। প্রকৃতপক্ষে সমস্যা নির্ণয় প্রক্রিয়া শুরু হয়ে যায় ব্যক্তি কর্মী (case worker) এবং মক্কেলের প্রথম দর্শন থেকেই। ব্যক্তি কর্মীর অন্তর্দৃষ্টি, বিশ্লেষণী ক্ষমতা, সিদ্ধান্ত গ্রহণের দক্ষতা সমস্যা নির্ণয়ের ক্ষেত্রে অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কিন্তু প্রথম সাক্ষাৎ বা দর্শন থেকেই ব্যক্তি কর্মী ও মক্কেলের মধ্যে যে সম্পর্কের সূত্রপাত হয় এবং ধীরে ধীরে মজবুত হয় ব্যক্তি কর্মীকে তাই সাহায্য করে সমস্যা নির্ণয়ে।

(ঘ) **সামাজিক চিকিৎসা (Social Treatment) ঃ**

ব্যক্তি কর্মের ক্ষেত্রে সামাজিক চিকিৎসা হলো চতুর্থ এবং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্তর। সমাজ বিজ্ঞানী হ্যামিলটনের (Hamilton) মতে সামাজিক চিকিৎসা হলো কতগুলি কর্মের এবং পরিষেবার সমাহার যা সমস্যাযুক্ত একজন ব্যক্তিকে সাহায্যের জন্য নির্দেশিত। মানুষ যখন তার সামাজিক পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে চলতে অসুবিধা বোধ করে তখন পেশাগত কর্মী যে পরিষেবা দান করে তাকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফেরানোর জন্য তাই হলো সামাজিক চিকিৎসা। এর লক্ষ্য হলো ঃ

— মক্কেল যাতে ভেঙ্গে না পড়ে তা দেখা,
— সামাজিক ভঙ্গুরতা প্রতিরোধ করা,
— মক্কেলকে আনন্দদায়ক অভিজ্ঞতা দান করা,
— মনের দিক থেকে মক্কেল যে অগতির মুখোমুখি হয়েছে তা পূরণ করা,
— নিজের সমস্যা সমাধানে তার ক্ষমতা বৃদ্ধি করা,
— তাকে সামাজিক অবদান ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে আগ্রহী ও যোগ্য করে তোলা।

উপরোক্ত উদ্দেশ্য পূর্ণ করার জন্য যেমন পরিবেশগত উন্নয়নের বিষয়টি দেখতে হয় তেমনি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির ব্যবহার এবং মনোভাবে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন ঘটানোর ব্যাপারে উদ্যোগ নিতে হয়।

(ঙ) **সমাপ্তিকরণ (Termination) ঃ**

সামাজিক ব্যক্তি কর্মের শেষ স্তর বা ধাপ হলো সমাপ্তি করণ বা বিযুক্তিকরণ। এর অর্থ, সামাজিক চিকিৎসার মাধ্যমে মক্কেল স্বাভাবিক জীবনধারায় ফিরে এলে সামাজিক ব্যক্তি কর্মী (social case worker) মক্কেলের সঙ্গে তার সম্পর্কে ছেদ টানবে। যেহেতু ঐ সম্পর্ক ছিল পেশাভিত্তিক তাই ব্যক্তি কর্মের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হওয়ার পর ঐ সম্পর্ক সমাপ্ত, করতে হয়।

২.৩ প্রশ্নাবলী

(১) সমস্যা সমাধান কার্যপ্রণালীর অর্থ ও তার প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা কর।

(২) ব্যক্তি কর্মে সমস্যা সমাধানের স্তরগুলি কি কি?

(৩) অধ্যয়ন ও সমস্যা নির্ণয় এই দুটি স্তর বিশ্লেষণ কর।

একক ৩ ❑ বিবাহিত জীবনে অসন্তোষ, পারিবারিক সম্পর্কে সমস্যা, বয়ঃবৃদ্ধদের সমস্যা, মানসিক বিকাশে বাধাপ্রাপ্ত এবং কোন জটিল রোগে আক্রান্ত ব্যক্তির ক্ষেত্রে সামাজিক ব্যক্তি কর্ম দক্ষতার ব্যবহার

গঠন ঃ

৩.১ ব্যক্তি সমস্যার নানা ক্ষেত্র

৩.২ যে সব ব্যক্তি কর্মদক্ষতার ব্যবহার প্রয়োজন

৩.৩ দক্ষতা প্রয়োগের লক্ষ্য

৩.৪ সমাপিকা

৩.৫ প্রশ্নাবলী

৩.১ ব্যক্তি সমস্যার নানা ক্ষেত্র

ব্যক্তি জীবনে কোন না কোন সমস্যার মুখোমুখী হওয়া এক স্বাভাবিক ঘটনা। সেই সব সমস্যা কখন কিভাবে জন্ম নেবে আমরা তা সবসময় অনুমান করতে পারি না। সব সমস্যার গভীরতা ও ব্যাপকতাও এক হয় না এবং সব সমস্যা আমাদের সমানভাবে বিব্রতও করে না। আবার প্রত্যেক ব্যাক্তির মধ্যে সমস্যা মোকাবিলার ক্ষমতাও এক হয় না। কেউ কেউ সামান্য কোন সমস্যাতেও বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে আবার কেউ কেউ তুলনায় কঠিন সমস্যার মুখোমুখি হতেও পিছপা হয় না। ব্যক্তি বিশেষের মানসিক গঠনে পার্থক্যের জন্যই এই ধরনের পৃথক অবস্থার সৃষ্টি হয়। শারীরিক, মানসিক এবং পরিবেশগত নানা কারণে যে সব সমস্যা কোন কোন ব্যক্তিকে বিপর্যস্ত করে তুলে তার মধ্যে অন্যতম হলো—

(ক) বিবাহিত ব্যক্তিদের মধ্যে সম্পর্কে টানাপোড়েন। সভ্যতা সংস্কৃতির অগ্রগতির সঙ্গে তাল রেখে এই সমস্যাও যেন ক্রমবৃদ্ধির শিকার। দ্রুতলয়ের এই জীবনে মানুষের প্রত্যাশার পারদ সর্বদাই উর্ধ্বমুখী। এর ফলে মানসিক উদ্বেগ এখন মানুষের নিত্য সঙ্গী। সেই উদ্বেগ ও অস্থিরতা এবং পরস্পরের কাছে উচ্চমাত্রার প্রত্যাশা স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের মধ্যেও তিক্ততার জন্ম দেয় যা উভয়ের কাছেই অথবা কোন একজনের কাছে অসহনীয় হয়ে উঠে। কোন কোন ক্ষেত্রে তা শারীবিক পীড়ন ও মানসিক নির্যাতন পর্যন্ত গড়ায়।

(খ) পারিবারিক সম্পর্কে সমস্যা আর একটি দিক যা বহু মানুষকে পীড়িত করে। ভারতবর্ষের সামাজিক বিন্যাস বা পারিবারিক কাঠামো এমন যে সেখানে প্রত্যক্ষ এবং অপ্রত্যক্ষভাবে অনেক মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক রেখে চলতে হয়। এই সম্পর্ক শব্দটি শুনতে যত মধুর, তৈরী ও রক্ষা করা ততটাই কঠিন। অস্বাস্থ্যকর

প্রতিযোগিতা, ঈর্ষা, স্বার্থপরতা, সম্পত্তিকে কেন্দ্র করে বিবাদ-বিসম্বাদ, শরীকি বিবাদ ইত্যাদি কারণে পারিবারিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে এমন ক্ষত সৃষ্টি করে যে কোন কোন ব্যক্তি সেই আঘাতে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে।

(গ) বয়ঃবৃদ্ধ মানুষের একটা অংশও নানা কারণে মানসিকভাবে ভেঙ্গে পড়েন। অসহায়তা, একাকীত্ববোধ, কর্মহীনতার যন্ত্রণা, অবজ্ঞা, অর্থাভাব, শারীরিক অপটুতা, রোগযন্ত্রণা ইত্যাদি কারণগুলি বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের জীবনে সীমাহীন যন্ত্রণা বয়ে আনে—যার বোঝা বইতে তারা অক্ষম হয়। সমকালীন সমাজে, সেখানে অনু-পরিবার (Nuclear family) সংস্কৃতি গড়ে উঠা এক বাস্তব অবস্থা, এই সমস্যাও ক্রমবর্ধমান।

(ঘ) আর এক শ্রেণির মানুষ আর এক ধরনের সমস্যার শিকার। সেটি হলো মানসিক বিকাশে বাধাপ্রাপ্ত হওয়ার সমস্যা। জড়বুদ্ধি সম্পন্ন বা বয়সের তুলনায় মানসিক বিকাশ যাদের কম সেই শ্রেণির শিশু, কিশোর, যুবক-যুবতী এবং বয়স্ক মানুষের সংখ্যাও নিতান্ত কম নয়। নানা কারণে এই সমস্যার সৃষ্টি হয় এবং তারা পরিবারের কাছে দায় বিশেষ হয়ে উঠে।

(ঙ) জটিল রোগ যেমন টিবি, যৌনরোগ, এইড্স, ক্যান্সার, লেপ্রসি ইত্যাদির শিকার হলেও মানুষ মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। একদিকে মৃত্যুর হাতছানি এবং অন্যদিকে শারীরিক যন্ত্রণা তার সুস্থভাবে বাঁচার অধিকার হরণ করে। সেই সঙ্গে রয়েছে চিকিৎসাজনিত খরচের বাহুল্য যা প্রায়শঃই সাধ্যাতীত হয়ে পড়ে।

এইসব সমস্যার শিকার যেসব মানুষ সামাজিক ব্যক্তি কর্ম (social case work) তার নীতি, কর্মপদ্ধতি এবং দক্ষতা প্রয়োগের মাধ্যমে সহায়কের ভূমিকা পালন করতে পারে। একজন ব্যক্তি কর্মী (case worker) তার অর্জিত দক্ষতা প্রয়োগের মাধ্যমে উপরোক্ত সব কয়টি ক্ষেত্রেই কার্যকরীভাবে সহায়তা করতে পারে। যেহেতু সব কয়টি সমস্যাই মানসিক সমস্যায় পরিণতি পায় তাই মোটামুটিভাবে একই ধরনের দক্ষতা ব্যবহার বা প্রয়োগের মাধ্যমে ব্যক্তি কর্মী সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির সমস্যা নিরসনে ভূমিকা পালন করতে পারে। সেইসব দক্ষতাগুলি হলো নিম্নরূপ ঃ

৩.২ যে সব ব্যক্তি কর্মদক্ষতার ব্যবহার প্রয়োজন

(ক) **সাক্ষাৎকার গ্রহণ (Interviewing) ঃ** যে কোন সমস্যা নিরসনের অন্যতম, প্রাথমিক সর্তই হলো সমস্যার কারণ ও গভীরতা সম্পর্কে জ্ঞানার্জন। নানান পদ্ধতির ব্যবহারে বা বিভিন্ন দক্ষতা প্রয়োগের ভিতর দিয়ে সমস্যা সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব যার মধ্যে অন্যতম হলো সাক্ষাৎকার গ্রহণ। সমস্যা কবলিত ব্যক্তির সঙ্গে উপযুক্ত পরিবেশে সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে একদিকে যেমন ব্যক্তি কর্মী সমস্যার কারণ ও মাত্রা সম্পর্কে অবহিত হতে পারে অন্যদিকে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি (client) একজনের কাছে সব কিছু ব্যক্ত করে কিছুটা মানসিক চাপ লাঘব করতে পারে। এক্ষেত্রে ব্যক্তি কর্মীকে বিবেচনায় রাখতে হবে যে ব্যক্তি কর্মে (case work) সাক্ষাৎকার এমন এক সংবেদনশীল বিষয় যে তা সতর্কতা ও দক্ষতার সঙ্গে পরিচালিত না হলে অনিষ্ট হওয়ার আশাঙ্কা থাকে। সেজন্য ব্যাক্তিকর্মীকে এ বিষয়ে যথেষ্ট দক্ষ ও সুশিক্ষিত হতে হবে।

(খ) **পর্যবেক্ষণ (Observation) :** সমস্যাটি সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে জানতে ব্যক্তি কর্মীর দ্বারা গৃহীত সাক্ষাৎকার যেমন সাহায্য করে তেমনি পর্যবেক্ষণ দক্ষতার প্রয়োগও কার্যকরী ভূমিকা পালন করে। সাক্ষাৎকারে যেটুকু ফাঁক বা অসম্পূর্ণতা (inadequacy) থাকে তা দূর করা সম্ভব পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি স্বাভাবিকভাবে এবং বিশেষ বিশেষ পরিস্থিতিতে কি ধরনের আচরণ করে, পরিবারের সদস্য-বন্ধুবান্ধব-সহকর্মী-প্রতিবেশীরা তার সঙ্গে কি ধরনের আচরণ করে, পারিবারিক পরিবেশ, কুঅভ্যাস ইত্যাদি বিষয়গুলি সম্পর্কে যথোচিত জ্ঞানার্জন করা সম্ভব। এক্ষেত্রেও মনে রাখতে হবে যে, পর্যপেক্ষণ ক্ষমতা এক দক্ষতা বিশেষ। পর্যবেক্ষণের উদ্দেশ্য মাথায় রেখে নিয়মিত চর্চার ভিতর দিয়ে এই দক্ষতা অর্জন করলে তবেই তা প্রয়োগের ক্ষমতা জন্মায়।

(গ) **পরামর্শদান (Counselling) :** একক ব্যক্তি যখন উদ্বেগের শিকার হয় বা মানসিক চাপের কবলে পড়ে তখন তার প্রয়োজন পড়ে পরামর্শ গ্রহণের। একজন নিরপেক্ষ ব্যক্তির পেশাগত সু-পরামর্শও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে (client) সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে বা সমস্যার গভীরতা থেকে নিষ্কৃতি পেতে সাহায্য করে। বাধা-বিপত্তি এবং ঝড়-ঝঞ্ঝা সামলানোর এক এক মাত্রার ক্ষমতা থাকে এক এক ব্যক্তির। সমস্যার ব্যাপ্তি যখন এমন স্তরে পৌঁছয় যেখানে তার মোকাবিলা করা সাধ্যাতীত হয়ে যায় তখন দক্ষ পরামর্শদাতার পেশাগত সাহায্য কার্যকারী হয়। পরিস্থিতি এবং সমস্যার প্রকৃতি অনুযায়ী পরামর্শ দানের দক্ষতা প্রয়োগ করলে সমস্যা থেকে উত্তরনের সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, একজন বৃদ্ধা সংসারের সমস্ত খুঁটিনাটি বিষয়ে নিরলসভাবে মাথা গলিয়ে সংসারে অশান্তির বীজ বপন করেন এবং পরিবারের সদস্যদের মধ্যে বিরক্তি উৎপাদন করে নিজে অবাঞ্ছিত হয়ে উঠেন। একজন পেশাগত সামাজিক ব্যক্তি কর্মী তার পরামর্শদানের দক্ষতা দিয়ে ঐ বৃদ্ধাকে কোন ধর্মগ্রন্থ পাঠ ও তা অনুভবের বা নিজের জীবনকথা লেখার বা তার শ্রমে কুলোয় এমন কোন গৃহস্থালীর কাজে যুক্ত থাকার এবং সাধারণ ত্রুটি বিচ্যুতি নিয়ে মন্তব্য না করার বা কথা বলার ধরনে পরিবর্তন আনার পরামর্শদান করতে পারেন। কিন্তু এই কাজও করতে হবে অত্যন্ত দক্ষতা ও ধৈর্যের সঙ্গে। অন্যথায় সমস্যা হ্রাসপ্রাপ্ত না হয়ে তা বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেয়।

(ঘ) **মনস্তাত্ত্বিক চিকিৎসা (Psychotherapy) :** মানসিকভাবে আঘাত প্রাপ্ত হয়ে যখন একজন ভেঙ্গে পড়ে বা পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে চলার ক্ষেত্রে ঘাটতি দেখা দেয় বা মানসিক বিকাশে অসঙ্গতি থেকে যায় সেক্ষেত্রে মনস্তাত্ত্বিক চিকিৎসা দক্ষতার প্রয়োগ প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে। এই দক্ষতা ব্যবহার করে একজন ব্যক্তি কর্মী তার client-এর হারিয়ে যাওয়া মনোবল ফিরে পেতে সাহায্য করে, নতুন আশা ও ইচ্ছার জাগরণ ঘটায় এবং অসঙ্গতিপূর্ণ ব্যবহারকে সঙ্গতিদানে সাহায্য করে। মানুষের ব্যক্তিত্ব গঠনে, চিন্তা ও ব্যবহারে পরিপক্কতা আনার ক্ষেত্রে এবং যোগ্যতাবৃদ্ধিতে উপরোক্ত দক্ষতা সাহায্য করে। অবাঞ্ছিত অভ্যাসগুলি পরিবর্তনের ক্ষেত্রেও মনস্তাত্ত্বিক চিকিৎসা দক্ষতা কার্যকরী হয়।

(ঙ) **সৃষ্টিধর্মী কাজে যুক্ত করার দক্ষতা (Skill of involving in creative activities) :** সামাজিক বক্ত কর্মীকে বিভিন্ন সৃষ্টি ধর্মী কাজের ক্ষেত্রে দক্ষ হতে হয় কারণ এই ধরনের দক্ষতা থাকলে সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তিকে (client) তাতে যুক্ত করা সম্ভব হয়। নানা রকমের খেলাধূলা, সাংস্কৃতিক কর্ম ইত্যাদিতে যুক্ত করতে পারলে সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তির মানসিক অবসাদ হ্রাস পায় এবং মানসিক শক্তি বৃদ্ধি পায়। অন্যের সঙ্গে মেলামেশার ব্যাপারেও

আগ্রহ সঞ্চার হয়। সেজন্য এই দক্ষতা প্রয়োগে ব্যক্তি কর্মীকে আগ্রহী হতে হয় এবং ব্যক্তির বয়স, ঝোঁক, শারীরিক সক্ষমতা ইত্যাদির ভিত্তিতে ঐসব কর্মসূচী আয়োজনে উদ্যোগ নিতে হয়।

(চ) **সম্পর্ক গড়ে তোলার দক্ষতা (Skill of establishing relationship) ঃ** উপরোক্ত সব কয়টি ক্ষেত্রেই দক্ষতা প্রয়োগের মাধ্যমে সমস্যাগ্রস্থ ব্যক্তিকে সহায়তা দান করতে হলো ব্যক্তি কর্মীকে সংশ্লিষ্ট client এবং তার পরিবার, শিক্ষক, সহকর্মী ইত্যাদির সঙ্গে এক কার্যকরী সম্পর্ক তৈরী ও রক্ষা করতে হয়। সম্পর্ক তৈরী এবং রক্ষা করা কখনোই সহজ প্রক্রিয়া নয়। ধীরে ধীরে এই দক্ষতা অর্জন করতে হয় ব্যক্তি কর্মীকে এবং যথাযথভাবে তার প্রয়োগ করতে হবে। কারণ সম্পর্ক তৈরী না হলে সমস্যা সম্পর্কে সঠিকভাবে অবহিত হওয়া যেমন সম্ভব নয় তেমনি সম্ভব নয় সমাধানের পথে এগোনো।

(ছ) **যোগাযোগ দক্ষতা (Communication Skill) ঃ** সম্পর্ক তৈরী, সাক্ষাৎকার গ্রহণ, পরামর্শদান সব কিছুই স্বার্থকভাবে করার জন্য ব্যক্তি কর্মীকে যে দক্ষতার ব্যবহার অবশ্যই করতে হবে তা হলো যোগাযোগ দক্ষতা। এই দক্ষতার অভাব থাকলে কোন সামাজিক ব্যক্তি কর্মীই তার পেশায় সফল হতে পারবে না। একজন হতাশাগ্রস্থ, আশাহত, বিকাশে বাধাপ্রাপ্ত, মানসিক যন্ত্রণার শিকার ব্যক্তিকে সাহায্য করতে হলে দক্ষ যোগাযোগ ব্যবস্থার মাধ্যমেই তা করা সম্ভব।

উপরোক্ত সব কয়টি দক্ষতা প্রয়োগের মাধ্যমেই ব্যক্তি কর্ম এক সাহায্যকারী পদ্ধতি (helping process) হয়ে উঠে। মোটামুটিভাবে সব কয়টি দক্ষতা প্রয়োগেরই প্রয়োজন দেখা দেয় সব ধরনের সমস্যার ক্ষেত্রে। তবে সর্বক্ষেত্রে সব কয়টি দক্ষতাই (skill) সমান গুরুত্বপূর্ণ এমন নয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে তার সঠিক কারণ এবং সম্পর্কের বর্তমান অবস্থান ইত্যাদি জানতে সাক্ষাৎকার নামক দক্ষতা প্রয়োগের গুরুত্ব যথেষ্ট। কিন্তু একজন জড়বুদ্ধি সম্পন্ন শিশুর ক্ষেত্রে সাক্ষাৎকারের ভূমিকা নিতান্ত কম।

৩.৩ দক্ষতা প্রয়োগের লক্ষ্য

উপরোক্ত দক্ষতা প্রয়োগের লক্ষ্য সম্পর্কে সচেতন থেকে তা প্রয়োগ করা দরকার। সেই লক্ষ্যগুলি হলো ঃ

(ক) সামাজিক সমস্যা প্রতিরোধ

(খ) সমস্যাগ্রস্থ ব্যক্তির মনোবল ফিরিয়ে দেওয়া

(গ) Client-কে আনন্দদায়ক অভিজ্ঞতা দান

(ঘ) সমস্যাকাতর ব্যক্তির সক্ষমতা বৃদ্ধি

(ঙ) মানসিক ক্ষতগুলিকে ভরাই করা

(চ) সুস্থস্বাভাবিক জীবনযাপনে উদ্দীপ্ত করা।

৩.৪ সমাপিকা

সমস্যা কবলিত মানুষের সংখ্যা ধারাবাহিকভাবে বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে সমকালীন সমাজে। কোন সন্দেহ নেই যে ভবিষ্যতে এই ধরনের সমস্যা গ্রাস করবে আরো বহুতর মানুষকে। স্বভাবতঃই পেশাগত ব্যক্তি কর্মের পরিধী বা সম্ভাবনা বৃদ্ধি পাবে লক্ষ্যনীয়ভাবে। ব্যক্তির সমস্যা যত বৃদ্ধি পাবে সমাজের উপর তার প্রভাব পড়বে তত বেশী। তাই ব্যক্তিকর্মের লক্ষ্য হলো ব্যক্তিকেন্দ্রীক সহায়তা প্রদান করা যা একজন অসহায় মানুষকে বা সমস্যা কবলিত ব্যক্তিকে তার পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে চলতে বা সমস্যামুক্ত হতে সাহায্য করবে। কিন্তু সেজন্য দরকার উপরোক্ত দক্ষতাগুলির প্রয়োগ এবং তা করতে হলে ব্যক্তি কর্মীকে ঐসব দক্ষতাগুলি অর্জন করতে হবে প্রশিক্ষণ ও নিরলস চেষ্টার মধ্য দিয়ে।

৩.৫ প্রশ্নাবলী

(১) ব্যক্তি সমস্যার কয়েকটি ক্ষেত্র এবং তার কারন সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

(২) ব্যক্তি সমস্যা নিরসনে কোন্ কোন্ ব্যক্তি কর্ম দক্ষতার প্রয়োগ করা দরকার এবং কিভাবে প্রয়োগ করা দরকার তা বর্ণনা কর।

(৩) সামাজিক ব্যক্তি কর্ম দক্ষতার লক্ষ্যগুলির উল্লেখ কর।

একক ৪ ❑ সামাজিক ব্যক্তি কর্মে সাক্ষাৎকারের অর্থ, উদ্দেশ্য ও কৌশল

গঠন ঃ

৪.১ প্রস্তাবনা
৪.২ সাক্ষাৎকারের অর্থ
৪.৩ সাক্ষাৎকারের উদ্দেশ্য
৪.৪ একক ব্যক্তির সঙ্গে কাজের ক্ষেত্রে সাক্ষাৎকার গ্রহনের কৌশল
৪.৫ সকল সাক্ষাৎকারের নির্ণায়ক বা বিহারের মান
৪.৬ প্রশ্নাবলী

৪.১ প্রস্তাবনা

আমাদের সমাজে প্রায় প্রতিটি মানুষকে দৈনন্দিন জীবনে কিছু না কিছু জটিলতার মুখোমুখি হতে হয়। বর্তমানকালে পরিবর্তিত সমাজ ব্যবস্থায় মানুষ ছোট পরিবারে (Nuclear family) বাস করতে অভ্যস্থ হয়েছে যৌথ (Joint) বা সম্প্রসারিত (Extended) পরিবারের সংস্কৃতিকে দুরে সরিয়ে দিয়ে। এই ধরনের পরিবারের সদস্যরা পারিবারিক কাঠামোর কারণেই নানা সমস্যার কবলে পড়ে এবং সে সব সমস্যার সমাধানে তারা অসমথ থাকে। সমস্যাগুলির অধিকাংশই সামাজিক ও মানসিক। সমস্যার ব্যাপ্তি যেহেতু ক্রমবর্দ্ধমান এবং সেগুলির সমাধান যেহেতু নিজেদের সামর্থে সম্ভব হয় না তাই সমস্যা সমাধানে সাহায্য করার জন্য সরকারী অনুদান পুষ্ট এবং বেসরকারী প্রতিষ্ঠান দক্ষ ও প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত কর্মীদের সাহায্যে নির্দিষ্ট ভূমিকা পালন করে চলেছে। এই প্রেক্ষিতেই ব্যক্তি কর্মীর (case worker) প্রয়োজন ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। এতে সমাজের যেমন উপকার হয় তেমনি প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত যুবক যুবতীরাও পেশার সন্ধান পায়। এ কাজে দক্ষতা ও জ্ঞান অর্জনের স্বার্থেই অন্য কয়েকটি বিষয়ের সঙ্গে সঙ্গে সাক্ষাৎকার গ্রহণ সংক্রান্ত বিষয়টিও পাঠ করা আবশ্যক।

৪.২ সাক্ষাৎকারের অর্থ

সাক্ষাৎকারের অর্থ হলো নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে প্রশ্নোত্তর বিনিময়ের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করার জন্য মুখোমুখি আলাপ আলোচনা করা। সমাজবিজ্ঞানী কাহান এবং কনেল (Kahn and Connel)-এর মতে 'এটি একটি মৌখিক মিতক্রিয়া (verbal interaction) যা একটি বিশেষ উদ্দেশ্যের জন্য কেন্দ্রীভূত করা হয়।'

৪.৩ ব্যক্তিকর্মে সাক্ষাৎকারের উদ্দেশ্য

একক ব্যক্তির সমস্যা সম্পর্কে কাজ করতে হলে সাক্ষাৎকার বিষয়টির উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া দরকার। ফলপ্রসূ ভাব বিনিময় করার ক্ষেত্রে বা তথ্য সংগ্রহের জন্য সঠিকভাবে সাক্ষাৎকার গ্রহণ হলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। সাক্ষাৎকারের কিছু বিশেষ উদ্দেশ্য রয়েছে। এখানে সেগুলির উল্লেখ করা যেতে পারে।

(ক) বিশেষ অবস্থায় সাধারণভাবেই মানুষের ব্যবহারে কিছু পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। সমস্যাগ্রস্ত একক ব্যক্তি স্বাভাবিকভাবেই কোন কোন বিশেষ অবস্থায় কেমন ব্যবহার করে, কি রকম প্রতিক্রিয়া হয় ব্যক্তি কর্ম পরিচালনার স্বার্থে তা জানা দরকার। তাই সাক্ষাৎকারের অন্যতম উদ্দেশ্য হলো কোন বিশেষ অবস্থায় client-এর ব্যবহার বা প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে জানা।

(খ) প্রতি ব্যক্তির একটি সামাজিক অবস্থান আছে। একক ব্যক্তি ও এর ব্যতিক্রম নয়। এই সামাজিক অবস্থানটিও মানুষের সমস্যা সৃষ্টি ও বৃদ্ধিতে কিছু ভূমিকা পালন করে। তাই client-এর সামাজিক অবস্থান জেনে নেওয়া সাক্ষাৎকারের আর এক উদ্দেশ্য।

(গ) সমস্যা সমাধানে সাহায্য করার স্বার্থে কিছু বিশেষ বিষয়ে client-এর দৃষ্টিভঙ্গী বা মতামত জানাও জরুরী। সাক্ষাৎকারের তৃতীয় উদ্দেশ্য হলো সেই বিষয়ে অবহিত হওয়া বা মতামত সংগ্রহ করা।

(ঘ) কোন বিশেষ সমস্যা হলে তার সমাধানের পথ কি হতে পারে সে সম্পর্কে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের তাগিদে client বা সংশ্লিষ্ট অন্যান্য ব্যক্তিদের কাছ থেকে সূত্র পাওয়া সাক্ষাৎকারের চতুর্থ উদ্দেশ্য।

(ঙ) একক ব্যক্তির সমস্যার উদ্ভব কিভাবে হলো, সমস্যা সমাধানের কাজে হাত দিতে হলে তা জানা খুবই জরুরী। সমস্যার কারণ জানার নানা উপায়ের মধ্যে সাক্ষাৎকার হলো অন্যতম। সেজন্য সাক্ষাৎকারের আর এক উদ্দেশ্য হলো সমস্যা সৃষ্টির পিছনে যে সব সম্ভাব্য কারণ রয়েছে তা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে জানা।

৪.৪ একক ব্যক্তির সঙ্গে কাজের ক্ষেত্রে সাক্ষাৎকার গ্রহণের কৌশল

আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে সাক্ষাৎকারের উদ্দেশ্য হলো 'সচেতন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য যোগাযোগ।' তাই যিনি সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেন তিনি অবশ্যই কোন প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি এবং সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে তাকে একজন সাহায্যকারী হিসাবে গণ্য করা হয়।

সাক্ষাৎকারের ক্ষেত্রে সঠিক প্রয়োগ কৌশলের জন্য মূলতঃ নিম্নলিখিত চারটি বিষয়ের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন।

(ক) ব্যক্তিগত সততা (individual honesty)

(খ) অন্যের কষ্টানুভবের শক্তি (Empathy)

(গ) অধিকার বোধহীন ভালবাসার উত্তাপ (Non-possessive warmth)

(ঘ) শর্তহীনভাবে গ্রহণ (Unconditional acceptance)

সাক্ষাৎকারের পদ্ধতি সংক্রান্ত ব্যাপারে কয়েকটি সাধারণ কথার পর এখন সাক্ষাৎকারের পদ্ধতি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে, যা একক ব্যক্তির সাথে কাজ করার ক্ষেত্রে সহায়ক।

(ক) **পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধানে (Exploration) :** Client-এর অনুভূতি, অভিজ্ঞতা ইত্যাদি সম্পর্কে ধারণা লাভের জন্য সোজাসুজি প্রশ্ন তালিকার সাহায্য নেওয়া হয়। প্রশ্ন তালিকাটি এমনভাবে তৈরী করতে হবে যাতে তার মাধ্যমে একক ব্যক্তির অনুভূতি বিস্তারিতভাবে জানা সম্ভব হয়। Client-এর কাছ থেকে সঠিক উত্তর সংগ্রহ করতে হলে প্রশ্নের মধ্যে যেমন ব্যাপকতা ও গভীরত্ব থাকবে তেমনি প্রশ্ন করার ক্ষেত্রেও মুন্সিয়ানা দেখাতে হবে। এভাবে প্রশ্ন না করা হলে client-এর সমস্যার বিভিন্ন দিক নির্ণয় করা কঠিন হয়। তাই ব্যক্তি কর্মীকে এ কাজে দক্ষ হতে হয়। সাক্ষাৎকারের সময় যে ধরনের বা যেভাবে প্রশ্ন রাখা যেতে পারে তার কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে।

— আপনি কি কিছু মনে করবেন যদি এই বিষয়টি আরো একটু ব্যাখ্যা করতে অনুরোধ করি?
— আপনি কি আমাকে বলবেন আপনার বৃত্তি কি?
— কোন্ ধরনের চিন্তা আপনাকে পীড়া দেয় এবং কেন?
— আপনি কি আমাকে উদাহরণ দিয়ে বলতে পারেন আপনি কি ধরনের আচরনের সম্মুখীন হচ্ছেন।
— আপনার নিশ্চয় মনে আছে কিভাবে ঘটনাটি ঘটলো।
— আপনি অবশ্যই জানেন যে আপনার কিছু শক্তি আছে। সেই শক্তির ক্ষেত্রগুলি কি কি?
— আপনার পরিবারের সকলেই আপনার পাশে আছেন। তাই না?

উপরোক্ত প্রশ্নগুলি নমুনামাত্র। একক ব্যক্তির বয়স, শিক্ষাগত যোগ্যতা, সামাজিক অবস্থা, মানসিকতা, বোধশক্তি ইত্যাদি বিচার করে প্রশ্নের গঠন, ভাষা এবং উপস্থাপনের ধরন ঠিক করতে হবে। এক্ষেত্রে দুটি বিষয় বিশেষভাবে মনে রাখতে হবে। প্রথমতঃ সাক্ষাৎকারের উদ্দেশ্য মাথায় রেখে যত বেশী সম্ভব তথ্য সং গ্রহের লক্ষ্যে প্রশ্ন করতে হবে। দ্বিতীয়তঃ প্রশ্নের ধরন এমন হবে না যাতে উত্তরদাতা (respondent) আহত বোধ করে বা প্রশ্নের অর্থ বুঝতে তার অসুবিধা হয়।

(খ) **প্রকাশ্যে পূর্ণ আলোচনা (Ventilation) :** যখন কোন উত্তরদাতা বক্তব্য বিশ্লেষণ করতে বা প্রশ্নের উত্তর দিতে ইতঃস্তত বা দ্বিধা করছে তখন তাকে খোলাখুলিভাবে বোঝাতে হবে যে, এরকম ইতস্ততভাবে দেখালে তার না বলা অনুভূতি বোধগম্য হবে না। কিম্বা যদি সেই ব্যক্তি ভাব প্রকাশ বা বক্তব্য বুঝিয়ে বলার জন্য সঠিক শব্দ বা বাক্য প্রয়োগ করতে অক্ষম হয় তবে সেই অক্ষমতা কাটিয়ে উঠতে ঐ ব্যক্তিকে সাহায্য করতে হবে আলোচনার ভিত্তিতে। এইভাবে যখন উত্তরদাতা উত্তরদানে সাবলীল হবে তখন সে উত্তর দেওয়ার ব্যাপারে আরও সহযোগিতা করবে এবং সেক্ষেত্রে তার বক্তব্য, পারিপার্শ্বিকতা এবং অতীতে না দেওয়া তথ্য যার দ্বারা সমস্যার সমাধান করা সহজ হবে, তা পেতে সাহায্য করে যদি খোলাখুলি আলোচনার মাধ্যমে client বা respondent-কে সাহায্য করা হয়।

(গ) **বিষয় সম্ধানীয় পরিবর্তন (Topical Shift) :** একজন দক্ষ ব্যক্তি কর্মী সাক্ষাৎকারের সময় প্রয়োজন বোধে আলোচনার বিষয় পরিবর্তন করতে পারেন, যদি দেখা যায় যে আলোচনা নিষ্ফল হচ্ছে বা উত্তরদাতা স্বচ্ছন্দবোধ করছে না। সেক্ষেত্রে প্রশ্নকর্তা ব্যক্তি কর্মীকে কৌশলে সাময়িকভাবে বিষয়ান্তরে চলে যেতে হবে।

তারপর সুযোগমত পুনরায় আগের প্রশ্নে ফিরে যেতে হবে।

(ঘ) **যুক্তিসঙ্গত বিচারশক্তি (Logical Reasoning) ঃ** সাক্ষাৎকার সংঘটকের (এক্ষেত্রে ব্যক্তি কর্মী) যুক্তি সঙ্গত বিচারশক্তি থাকা প্রয়োজন। সাক্ষাৎকারের সময় তাকে সচেষ্ট থাকতে হবে যাতে উত্তরদাতার কাছ থেকে পদ্ধতিগতভাবে এবং যুক্তিযুক্তভাবে (Systematic and rational) তথ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়। উত্তরদাতাকে সর্বদা উদ্বুদ্ধ করতে হবে যাতে তার উত্তর থেকে যথেষ্ট যুক্তিসঙ্গত তথ্য পাওয়া যায়। প্রশ্ন যাতে অযৌক্তিক না হয় তাও বিবেচনায় রাখতে হবে। প্রশ্ন করার সময় যুক্তিসঙ্গত বিচার শক্তির প্রয়োগে দক্ষতা দেখাতে হবে। উত্তরদাতা যাতে প্রশ্নকর্তাকে বিব্রত করতে না পারে সে ব্যাপারেও সজাগ থাকতে হবে।

(ঙ) **অনুপ্রাণিত করা (Encouraging) ঃ** যে বিষয়ে অনুসন্ধান করার জন্য সাক্ষাৎকার নেওয়া হয় সে বিষয়ে যত বেশী সম্ভব তথ্য সংগ্রহ করার লক্ষ্যে স্থির থাকতে হবে। উত্তরদাতাকে নানাভাবে অনুপ্রাণিত করতে হয় যাতে সংশ্লিষ্ট বিষয়কে কেন্দ্র করে সব প্রশ্নের উত্তর সে আগ্রহের সঙ্গে দেয়। প্রতারণাপূর্ণ বা মিথ্যা তথ্য যাতে না সংগৃহীত হয় সে বিষয়েও সতর্ক থাকতে হয়। প্রকৃত উদ্দেশ্য সাধনে সহায়ক হবে এমন তথ্য যাতে সংগ্রহ করা সহজ হয় সেজন্য client-কে অনুপ্রাণিত করার ব্যাপারে ব্যক্তি কর্মীকে সজাগ থাকতে হয়।

(চ) **জ্ঞাত করা (Informing) ঃ** ব্যক্তির সমস্যা উপলব্ধি করা এবং তা সমাধানের জন্য কোন্ ধরনের তথ্যের প্রয়োজন এবং কোন্গুলিই বা অপ্রয়োজনীয় তা উত্তরদাতাকে ভালভাবে জানাতে হবে। এভাবে অপ্রয়োজনীয় তথ্য পরিবেশন এড়ানো যেতে পারে। সাথে সাথে প্রয়োজনীয় তথ্যগুলি সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে লিপিবদ্ধ করা যেতে পারে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যদি কোন অভিভাবক তার বয়ঃসন্ধির সমস্যায় আক্রান্ত সন্তানের সমস্যাগুলি সম্পর্কে অবহিত হয়ে ব্যক্তি কর্মীকে তা সঠিকভাবে জ্ঞাত করে তাহলে ব্যক্তি কর্মী সেই সন্তানকে সেই সংক্রান্ত মোকাবিলায় সক্ষম করে তুলে তার সমস্যা দূর করতে সফলভাবে সাহায্য করতে পারে।

(ছ) **সাধারণ শ্রেণীভুক্তিকরণ (Generalization) প্রতিরোধ ঃ** অধিকাংশ সময়ই আমরা আমাদের বক্তব্যকে সাধারণ শ্রেণীভুক্তি করণ করে বসি। যেমন বাসে খুব ভীড়, হাসপাতালের ব্যবস্থা খুব খারাপ, এখনকার ছেলেমেয়েরা বড় উন্নাসিক, শাশুড়ি-বৌমায় কখনো বনিবনা হয় না ইত্যাদি। এইসব বক্তব্যে যেমন সত্যতা আছে তেমনি নেইও। তাই এগুলি সর্বাংশে সত্য নয়। উত্তরদাতা যাতে এধরনের উত্তরদানের প্রবণতা না দেখায় সে ব্যাপারে লক্ষ্য রাখা দরকার।

(জ) **পক্ষপাতহীনতা (Impartiality) ঃ** কোন বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করতে গিয়ে পক্ষপাতপূর্ণ তথ্য সংগ্রহ করা এবং তার ভিত্তিতে সমস্যার সমাধানে উদ্যোগী হওয়া উচিত নয়। অনুসন্ধানের সমস্ত বিষয়গুলিকে সমান গুরুত্ব দিয়ে তথ্য সংগ্রহ করতে হয় এবং সাথে সাথে সমাধানের পথ খুঁজতে হয়। প্রশ্নকর্তা এবং উত্তরদাতার মধ্যে এমন সম্পর্ক তৈরী হবে যাতে উভয়ে উভয়ের আস্থা ও শ্রদ্ধা অর্জন করে। পক্ষপাতমূলক আচরণ করলে তা সম্ভব নয়।

(ঝ) **বোধগম্যতার জন্য ব্যাখ্যা করা (Explaining for understanding) ঃ** অনেক সময় কোন কোন প্রশ্ন উত্তরদাতার মনে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে। যে মুহূর্তে ব্যক্তিকর্মী অনুভব করবেন যে client-এরকম অবস্থায় পড়েছে তখনই বিষয়টি বোধগম্য করার জন্য ব্যক্তি কর্মীকে তা ব্যাখ্যা করতে হবে। যতক্ষণ পর্যন্ত না মনে

হয় যে সে বিষয়টি সঠিকভাবে বুঝেছে ততক্ষণ নানাভাবে তা ব্যাখ্যা করা দরকার। তাছাড়া আরো একটি বিষয় তাকে ব্যাখ্যা করে বুঝানো দরকার যে, তার সমস্যার সমাধানের ব্যাপারে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ নির্ভর করছে তার উত্তরের গুণগত মানের উপর। বিভ্রান্তি মূলক তথ্য পরিবেশন করলে যে তার স্বার্থই বিঘ্নিত হবে তাও ব্যাখ্যা করে দেওয়া দরকার।

(ঞ) **আশ্বাস প্রদান করা (Assuring) ঃ** অমূলক ভাবনা বা দুঃশ্চিন্তার জন্য অনেক সময় একক ব্যক্তি নিরাপত্তার অভাব বোধ করতে থাকে। সেরক ক্ষেত্রে একজন ব্যক্তি কর্মী (case worker) উত্তরদাতাকে আশ্বাস দিতে পারে যে উদ্বেগের কোন কারণ নেই, সংগৃহীত তথ্য গোপন থাকবে এবং শুধুমাত্র তার কল্যানেই ব্যবহৃত হবে। সমস্যার সমাধান ঘটবে কি না তা নিয়েও কোন কোন client-এর মনে সন্দেহ থাকতে পারে। এক্ষেত্রেও তাকে নিশ্চয়তা দানের চেষ্টা করতে হবে। তাকে বোঝাতে হবে যে, কোন সমস্যার সমাধানই সহজভাবে হয় না। কিন্তু নিরলস চেষ্টায় তার সমাধান সম্ভব। সাক্ষাৎকারের সময় এই ধরনের আশ্বাস বা নিশ্চয়তা দান করলে client বা respondent অনেক স্বাভাবিকভাবে এবং আগ্রহের সঙ্গে উত্তরদান প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করবে।

৪.৫ সফল সাক্ষাৎকারের বিচারের মান ও নীতি

সাধারণভাবে দেখা যায় সাক্ষাৎকারে কিছু কিছু ত্রুটি থেকে যাওয়ার জন্য সব তথ্য সঠিকভাবে সংগৃহীত হয় না। কিছু কিছু নীতি অবলম্বন করে সঠিকভাবে সাক্ষাৎকার নিলে তা অনেক বেশী ফলপ্রসূ হয়। সেই নীতি বা বিচারের মান (criteria)-গুলি হলো ঃ

(ক) **তড়িঘড়ি বা মাত্রাতিরিক্ত আশ্বাস দান নয় (Avoiding giving assurance too soon and too much) ঃ** একক ব্যক্তি সমস্যার প্রভাবে হতাশাগ্রস্ত হবে সইনা স্বাভাবিক ধীরে ধীরে তার মনে বিশ্বাসের জমি তৈরী করে তাকে আশ্বস্ত করতে হবে যে সমস্যার সমাধান করা অসম্ভব নয়। কিন্তু তার বিশ্বাসের পাত্র হয়ে উঠার আগেই তার সমস্যার গভীরতা ও মনের গঠন বুঝে উঠার আগেই 'কিছু ভেবো না, তোমার সমস্যার তাড়াতাড়ি সমাধান হয়ে যাবে'—এ ধরনের মন্তব্য করা উচিত নয়। এ ধরনের আশ্বাস বাণী শুনাতে গেলে client ব্যক্তি কর্মীকে (case worker) অবিশ্বাস করতে পারে। আর অবিশ্বাসের পরিবেশ তৈরী হলে সমস্যার উর্দ্ধে ওঠা অসম্ভব হবে।

(খ) **দ্রুত ব্যাখ্যা না করা (Not explaining rapidly) ঃ** তাড়াতাড়ি তথ্য সংগ্রহের তাগিদে প্রশ্নকর্তা অনেক সময় দ্রুততার সঙ্গে প্রশ্নটি বা তার প্রয়োজন ব্যাখ্যা করে থাকে। প্রশ্নকর্তা এবং উত্তরদাতার মানসিক অবস্থা এবং বোধশক্তি একরকম না হতে পারে। সেকথা বিবেচনায় রেখে ধীরস্থিরভাবে সবকিছু ব্যাখ্যা করলে উত্তরদাতার পূর্ণ সহযোগিতা পাওয়ার যেমন সম্ভাবনা থাকে তেমনি প্রকৃত উত্তর পাওয়ার সুযোগ বৃদ্ধি হয়। তাছাড়া দ্রুততার সঙ্গে ব্যাখ্যা করলে তা ত্রুটিপূর্ণও হতে পারে।

(গ) **মনিব সুলভ আচরণ নয় (No bossing over) ঃ** ব্যক্তি কর্মী কখনো একক ব্যক্তি বা client-এর সঙ্গে মনিব সুলভ আচরণ করবে না। এই ধরনের মানসিকতা ও আচরণ কোন client পছন্দ করবে না এবং সেক্ষেত্রে সে নিজেকে গুটিয়ে নেবে বা ব্যক্তি কর্মীকে এড়িয়ে চলবে। তার প্রতি আস্থা স্থাপনের

পরিবর্তে অনাস্থা জন্ম নেবে। তেমন কিছু হলে সাক্ষাৎকারের উদ্দেশ্যই ব্যাহত হবে।

(ঘ) **ঝটিতি প্রতিক্রিয়া নয় (No quick response)** ঃ ব্যক্তি কর্মী সাক্ষাৎকারের সময় যদি উত্তরদাতার কোন বক্তব্যের প্রেক্ষিতে ঝটিতি প্রতিক্রিয়া করে বসে তাহলে পরিস্থিতি বা পরিবেশ জটিল হয়ে পড়ে। 'আমি জানি তুমি কি বলতে চাইছো। এসব অবান্তর ভাবনা চিন্তা বন্ধ কর।' যদি প্রশ্নকর্তা উত্তরদাতাকে এভাবে প্রতিক্রিয়া জানিয়ে বসে তাহলে সংশ্লিষ্ট সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তির সমস্যা সমাধানের পরিবর্তে তা বাড়িয়ে তুলবে।

(ঙ) **দ্রুত পরামর্শদান নয় (No quick advice)** ঃ একক ব্যক্তিকে সমস্যা কাটিয়ে উঠতে সাহায্য করার ক্ষেত্রে কখনো কখনো কিছু পরামর্শদানের প্রয়োজন দেখা দিতে পারে। কিন্তু মনে রাখতে হবে, পরামর্শ দানের উপযুক্ত পরিস্থিতি সৃষ্টি হওয়ার পরই তা দেওয়া দরকার। পরামর্শদানের প্রবল আগ্রহের বশবর্তী হয়ে যেন অনাবশ্যক দ্রুততায় পরামর্শদান না করা হয়।

সঠিক সাক্ষাৎকারের নীতি বা বিচারের মান হবে উত্তরদাতার অনুভূতিকে উপলব্ধি করা, অনুভূতি প্রকাশে যথাযোগ্য সাহায্য করা, client-এর আচার ব্যবহার খতিয়ে দেখা ইত্যাদি। সেখানে ব্যক্তি কর্মীকে (case worker) চেষ্টা করতে হবে একক ব্যক্তির সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে এগিয়ে যাওয়ার জন্য সমস্ত রকম প্ররোচনামূলক ও বিভ্রান্তিমূলক আচরনের উর্দ্ধে থাকা।

৪.৬ প্রশ্নাবলী

(১) সাক্ষাৎকার বলতে কি বোঝ এবং তার প্রয়োজন কি?

(২) একক ব্যক্তির সঙ্গে কাজের ক্ষেত্রে একজন ব্যক্তি কর্মী কি কি কৌশল অবলম্বন করবেন?

(৩) সফল সাক্ষাৎকারের নির্ণায়কগুলির উল্লেখ কর।

একক ৫ ❑ সমস্যাগ্রস্ত একক ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তিকর্মীর সম্পর্কের বৈশিষ্ট, সামাজিক ব্যক্তিকর্মীর পেশা সত্ত্বা এবং সামাজিক ব্যক্তি কর্মের উপর তার প্রভাব

গঠন ঃ

৫.১ একক ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তি কর্মীর সম্পর্কের বৈশিষ্ট্য

৫.২ সামাজিক ব্যক্তিকর্মীর পেশা সত্ত্বা এবং ব্যক্তি কর্মের উপর তার প্রভাব।

৫.৩ প্রশ্নাবলী

৫.১ একক ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তি কর্মীর সম্পর্কের বৈশিষ্ট্য

সম্পর্ক স্থাপন এমনই এক শর্ত যা দুই বা ততোধিক ব্যক্তির একই বিষয়ে অনুরাগী (interested) হওয়ার মাধ্যমে পরস্পরের উপর ক্রিয়া করে। এটি কিছুটা কঠিন কিন্তু অতি প্রয়োজনীয় প্রক্রিয়া।

কোন সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তিকে সমস্যার উর্ধ্বে উঠার জন্য সঠিক সাহায্য প্রদান করতে হলে তার ও ব্যক্তি কর্মীর মধ্যে একটা স্পষ্ট সম্পর্ক স্থাপন হওয়া জরুরী। এটি যে কোন সমাজ বা সমষ্টির ক্ষেত্রেও সমভাবে সত্য। যে কোন সমাজই একটা সম্পর্কের জালের মধ্যে জড়িয়ে থাকে। প্রত্যেক মানুষের জীবনধারার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম্ হলো বিভিন্ন মানুষের সাথে সম্পর্কে যুক্ত হওয়া। সাধারণ দিন যাপন থেকে শুরু করে যখন আমরা বিশেষ কিছু করতে যাই তখন বন্ধুবান্ধব, পরিবারের সদস্য, আত্মীয় স্বজন, পাড়া প্রতিবেশী ইত্যাদিদের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করার মাধ্যমেই তা করতে পারি। যে কোন লক্ষ্য পূরণ ও কার্যসিদ্ধির জন্য পরস্পরের মধ্যে বোঝা পড়া তৈরী করার এই ব্যবস্থাকেই বলা হয় সম্পর্ক স্থাপন করা।

যে কোন পরিবর্তন ও উন্নয়নের জন্য ব্যক্তির সাথে ব্যক্তির সম্পর্কযুক্ত হওয়ার প্রশ্নটি কেউই অস্বীকার করতে পারবে না। তেমনি ব্যক্তি কর্মীর (case worker) সঙ্গে client-এর সম্পর্ক স্থাপনের বিষয়টিও কেউ অস্বীকার করতে পারবে না। যখনই এদের দুজনের মধ্যে সুদৃঢ়ভাবে সম্পর্ক স্থাপন সম্ভব হয়, তখনই সামাজিক ব্যক্তি কর্মীর কাছে মক্কেলকে (client) সাহায্য করার ব্যাপারটি সহজ হয়ে আসে।

কিছু নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই পেশাকেন্দ্রিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়। সচেতন, উদ্দেশ্যমূলক এবং সুবিবেচনা প্রসূত (conscious, purposive and deliberate) প্রচেষ্টাই অবস্থায় উন্নতি ঘটাতে সাহায্য করে। ব্যক্তি কর্মের (case work) ক্ষেত্রে সম্পর্ক স্থাপন হয় নিম্নলিখিত উপাদানগুলিকে নিয়ে।

(ক) **মক্কেল প্রথার প্রতি আন্তরিক উদ্বেগ ও লক্ষ্য (Purpose and concern for the client System)** ঃ একক ব্যক্তি বা মক্কেল (client) এবং সামাজিক ব্যক্তি কর্মীর (social case worker) এমনভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে যেখানে মক্কেল অনুভব করবে যে তার সমস্যা সম্পর্কে সামাজিক ব্যক্তি কর্মী যথেষ্ট ওয়াকিবহাল

বা সচেতন রয়েছেন। সমাজবিজ্ঞানী ফ্রম্ম (Fromm) এর মতে, সামাজিক ব্যক্তি কর্মীর উদ্দেশ্য হবে যত্নবোধ, দায়িত্ববোধ, সমাজ সম্পর্কিত গভীর জ্ঞান ইত্যাদির সাহায্যে মক্কেলকে সেই পথের সন্ধানে সাহায্য করা যাতে তার পক্ষে স্বচ্ছ জীবন যাপন করা সম্ভব নয়। তার কাজের উদ্দেশ্য বা একক ব্যক্তির সঙ্গে সম্পর্ক এমন হবে না যেখানে কোন আবেশ (Obsession) তৈরী হয়। সংশ্রব বা সম্পর্ক বলতে বোঝায় পারস্পরিক বোঝাপড়া এবং আন্তরিক ও নিঃশর্ত শ্রদ্ধা এবং ভালোবাসা যা client ও ব্যক্তি কর্মীর মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা করবে। সময়ানুবর্তিতা, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির দৃষ্টি সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা, client-এর বাড়ী খাওয়া ইত্যাদি ব্যক্তি কর্মীকে একক ব্যক্তির সমস্যা ও অনুভূতিকে অনুভব করতে সাহায্য করে। এক্ষেত্রে ব্যক্তি কর্মীকে তার অভিজ্ঞতাকে এমনভাবে ব্যবহার করতে হবে যাতে উদ্দেশ্যপূরণে সফলকাম হওয়া যায়। সামাজিক ব্যক্তি কর্মী client-এর সাথে এমনভাবে পেশাভিত্তিক সম্পর্ক স্থাপন করবেন যাতে তিনি দক্ষতার সঙ্গে client-কে তার সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে সাহায্য করতে পারবেন। পেশাকে বিবেচনায় রেখে সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমেই তৈরী হয় এক গ্রহনযোগ্য পরিস্থিতি যা মক্কেলের সমস্যা সমাধানে সহায়ক হয়।

(খ) **ভবিষ্যৎ মঙ্গলের আশা (Hope for better future) ঃ** তার ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হোক এ কামনা প্রতিটি মানুষের। কিন্তু ভবিষ্যতের মঙ্গল নির্ভর করে কতগুলি বিষয়ের উপর। ভবিষ্যৎ সত্যি সত্যিই মঙ্গলময় হবে কিনা সে বিষয়ে অনিশ্চয়তার শিকার হতে হয় অনেককে। কারো কারো মনে এই অনিশ্চয়তা প্রবল উদ্বেগের জন্ম দেয়। অন্য নানা ভাবেও মানুষের মনে অত্যন্ত চাপ পড়ার জন্য সে সমস্যাগ্রস্ত হয়।

ব্যক্তি কর্মীকে মনে রাখতে হবে যে এইসব মানসিক সমস্যা কাটিয়ে উঠতে সাহায্য করে client-কে মঙ্গলের পথে নিয়ে যাওয়া যায়। আশাহত হওয়ায় সে কি ধরনের ব্যবহার করছে তা লক্ষ্য রাখতে হবে এবং এবং বিশ্লেষণ করতে হবে। তার সঙ্গে পেশাভিত্তিক সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমেই তা করা সম্ভব। মক্কেলের (client) ইচ্ছাশক্তি এবং মনের জোর বৃদ্ধি ঘটানোর প্রচেষ্টাতেও কতখানি ফল পাওয়া যাচ্ছে সে বিষয়েও জানা সম্ভব সম্পর্ক রক্ষার ভিতর দিয়েই। একক ব্যক্তি বা মক্কেলকে (client) নিজের সমস্যা মেটানোর ব্যাপারে নিজেকে উদ্যোগী করে তোলার ক্ষেত্রেও ব্যক্তি কর্মীকে client-এর সঙ্গে তার যে সুসম্পর্ক তাকে কাজে লাগাতে হবে।

দ্বিতীয়তঃ ব্যক্তি কর্মীকে এটিও মনে রাখতে হবে যে মক্কেল বা সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তি যেন তার উপর নির্ভরশীল হয়ে না থাকে। একক ব্যক্তির এ ধরনের প্রবনতা শুরু থেকেই রোধ করতে হবে। সেক্ষেত্রে কিছুটা ভুল বোঝাবুঝির অবকাশ থাকে। সম্পর্কের উত্তাপ এবং বুদ্ধিমত্তা দিয়েই তা কাটিয়ে উঠতে হবে। তাকে সুস্থ মানসিকতার অধিকারী করে তুলতে সুদৃঢ় সম্পর্ক স্থাপন ও বক্ষা করা জরুরী। এর ভিতর দিয়েই তাকে ভবিষ্যৎ মঙ্গলের পথে নিয়ে যাওয়া সম্ভব। প্রকৃতপক্ষে এটিই সাহায্যকারী পদ্ধতি হিসাবে গণ্য হয়ে থাকে।

(গ) **হৃদয় দিয়ে হৃদয় অনুভব করার ব্যক্তি (Empathy) ঃ** একজন ব্যক্তি কর্মীকে সচেষ্ট হতে হবে client-এর অনুভূতি এবং তৃপ্ত ও অতৃপ্ত বাসনাগুলি সম্পর্কে জানতে। হৃদয় দিয়ে তাকে বুঝাবার শক্তির মাধ্যমেই তৈরী করে নিতে হয় তার সম্পর্কে ধারনা, কার্যকরী সম্পর্ক এবং প্রয়োজনীয় যোগাযোগ ব্যবস্থা। এর মধ্য দিয়েই client-এর মনের এবং পারিপার্শ্বিক বিষয়ের গভীরে প্রবেশ করে এবং (client)-এর আস্থা অর্জন করে ব্যক্তি কর্মী (case worker) তার ভূমিকা পালন করবে। client-এর সঙ্গে যোগাযোগের ক্ষেত্রে তাকে কোন

প্ররোচনা মূলক (Provocative) মন্তব্য করা থেকে বিরত থাকতে হবে। যেমন—আমি বুঝতে পারছি তুমি অনেক কথা গোপন করছো—এ ধরনের মন্তব্য করা কাম্য নয়। ব্যক্তি কর্মীকে client-এর অভিব্যক্তি গলার স্বর (tone), বিশেষ কোন বিষয় এড়িয়ে যাওয়ার প্রবণতা, বিশেষ কারো উপর প্রবল ক্ষোভ, কোন অবাস্তব ভাবনাকে সুদৃঢ় করার চেষ্টা, অভিমান বা রাগের পরিমাণ, হতাশার স্তর ইত্যাদি বিষয়গুলি হৃদয় দিয়ে অনুভব করতে হবে।

(ঘ) **অকৃত্রিমতা এবং গ্রহণযোগ্যতা (Genuineness and acceptance) ঃ** একক ব্যক্তি এবং ব্যক্তি কর্মী (client and case worker) পরস্পরের কাছে গ্রহনযোগ্য হয়ে উঠবে এবং অকৃত্রিম ব্যবহার করবে এটিও এক কাম্য অবস্থা। উভয়ের কাজে এবং ভাবভাবনা ও আচরণে তা প্রতিফলিত হওয়াও প্রয়োজন। ব্যক্তি কর্মী সর্বদা client-এর সাথে সঙ্গতিপূর্ণ ব্যবহার ও যোগাযোগ রক্ষা করবে। সৌহার্দপূর্ণ ব্যবহার রক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তি কর্মী তার সংস্থার উদ্দেশ্যগুলিও client-কে বুঝিয়ে বলবে। পরস্পর পরস্পরের কাছে গ্রহনযোগ্য হয়ে উঠার ব্যাপারটিও যেহেতু ব্যক্তি কর্মে (case work) বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ তাই সে ব্যাপারেও বিশেষভাবে ব্যক্তি কর্মীকে উদ্যোগী হতে হবে।

(ঙ) **অধিকার বা বিধিসঙ্গত ক্ষমতা (Authority) ঃ** একজন ব্যক্তি কর্মীর (case worker) কিছু বিধিসঙ্গত-ক্ষমতা থাকাও জরুরী। সেই ক্ষমতা হলো কর্মপদ্ধতি স্থির করা, প্রয়োজনমত বিভিন্ন ব্যক্তি ও সংগঠনের সঙ্গে যোগাযোগ করা, বিভিন্ন বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ইত্যাদি। অধিকার বা বিধিসঙ্গত ক্ষমতা তখনই প্রতিষ্ঠিত হয় যখন ব্যক্তি কর্মী তার জ্ঞান, অভিজ্ঞতা ও আন্তরিকতাকে কাজে লাগিয়ে client-এর সমস্যা সমাধানে কার্যকরী ভূমিকা নেয় এবং নিজের প্রতিষ্ঠানে সততা, কর্মনিষ্ঠা ও দক্ষতার গুণে প্রতিষ্ঠা অর্জন করে। অধিকারকে সঠিকভাবে কাজে লাগাতে না পারলে বা অপব্যবহার করলে সাহায্য করার পদ্ধতিতে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হতে পারে। তাই অবশ্যই এ ব্যাপারে অবশ্যই সতর্ক হতে হবে।

৫.২ সামাজিক ব্যক্তি কর্মীর পেশা সত্ত্বা এবং সামাজিক ব্যক্তি কর্মের উপর তার প্রভাব

সামাজিক ব্যক্তি কর্মের (social case work) উদ্দেশ্য পূর্ণ করার ক্ষেত্রে একজন ব্যক্তিকর্মীর দায়িত্বই প্রধান। এই পেশার মূল্যবোধকে সামনে রেখে দক্ষতার সঙ্গে কাজ করে তাকে উদ্দেশ্য সাধনে ব্রতী থাকতে হয়। ব্যক্তি কর্মের ক্ষেত্রে সাফল্যের লক্ষ্যে এগিয়ে যেতে হলে নিম্নলিখিত ভিত্তির উপর ভর করা আবশ্যক।

(ক) **একক ব্যক্তির সঙ্গে সম্পর্ক ঃ**

— Client-এর সহযোগিতার মাত্রা বাড়িয়ে তোলা,

— গোপনীয়তা রক্ষা করা,

— হতাশা দ্রবীকরণ।

(খ) **পরিবার ও সমাজের সঙ্গে সম্পর্ক ঃ**

— ব্যক্তি ও সমাজকে মূল্য দিয়ে চলতে হবে,

— ন্যায্য আচরণ করা ও তার শারীরিক এবং মানসিক উন্নয়নে প্রয়োজন মাফিক সাহায্য করা,

— সমাজ / পরিবার স্বীকৃত চাহিদা পূরণ করার মাধ্যমে সামাজিক পরিবর্তনে সহায়ক হওয়া।

(গ) বৃত্তিকেন্দ্রিক ব্যবহারিক নির্দেশ (Professional behavior mandates) ঃ

— জ্ঞান ও দক্ষতার আদান প্রদান,

— ব্যক্তির প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া,

— অনুভূতি ও প্রয়োজনকে পৃথকভাবে দেখা,

— উচ্চমানের বৃত্তিধারা পরিচালনা করা।

পেশাগত জ্ঞান ও দক্ষতা গঠিত হয়ে থাকে client-এর সমস্যাকালে মধ্যস্থতা করা বা তাতে হস্তক্ষেপের মাধ্যমে। নিষ্ঠার সঙ্গে ব্যক্তি কর্মে (case work) জড়িত থাকলে ব্যক্তি কর্মী (case worker) ক্রমাগত সেই কাজের উপযোগী জ্ঞান ও দক্ষতা বাড়িয়ে চলতে পারে। এক্ষেত্রে নিম্নলিখিত বৃত্তিমূলক মতবাদগুলিকে মাথায় রেখে চলা যেতে পারে।

— উন্নয়নের জন্য সহযোগীতামূলক নিবিড় সম্পর্ক স্থাপন করা,

— ব্যক্তির সামাজিক ও অর্থনৈতিক দিকের উন্নয়নে নজর দেওয়া,

— ব্যক্তি ও সমাজের সাথে সম্পর্ক রক্ষার ক্ষেত্রে একটা ধারাবাহিকতা বজায় রাখা,

— সামাজিক ন্যায় নীতিকে প্রতিষ্ঠিত করা,

— পরস্পরের মধ্যে ভাব বিনিময়ে উৎসাহ দান করা।

সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তিকে সমস্যা থেকে উত্তরণে প্রকৃত সাহার্য্য করার ক্ষেত্রে ব্যক্তি কর্মীকে এক চাপের মধ্য থেকেই নিজের জ্ঞান, বুদ্ধি, পেশাভিত্তিক সততা ও নিষ্ঠা, দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা দিয়ে সমাধানের কাজে নিবিষ্ট থাকতে হবে। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকেও (client) এই প্রক্রিয়ায় সঠিকভাবে জড়িত করতে হবে। সেজন্য ব্যক্তির সামাজিক আর্থিক এবং মানসিক অবস্থা সঠিকভাবে বুঝতে এবং বিশ্লেষণ করতে হবে। একক ব্যক্তির সাথে কাজের যে নীতিগুলি রয়েছে সেগুলিকে অবশ্যই মেনে চলতে হবে। যেমন গ্রহণ করা, যোগাযোগ করা, অংশগ্রহণ করা, ব্যক্তিত্ব করন করা, গোপনীয়তা রক্ষা করা এবং নিজস্ব সচেতনতা বৃদ্ধি করা ইত্যাদি। এইসব মেনে কাজ করলে দেখা যাবে যে সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তি তার অনুভূতিগুলি প্রকাশ করতে শুরু করেছে এবং ব্যক্তি কর্মীর উপর আস্থা বৃদ্ধি ঘটছে। এভাবে সমস্যাগুলি এবং তার পিছনের কারণগুলি যত প্রকাশিত হতে থাকবে এবং ব্যক্তি কর্মীর উপর একক ব্যক্তির (client) আস্থা যত বৃদ্ধি হতে থাকবে ততই সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে তার সমস্যা সমাধানে সাহায্য করা সম্ভব হবে। এও মনে রাখতে হবে যে, সমস্যা সমাধান সংক্রান্ত সব সিদ্ধান্ত গ্রহণে client-কে শরিক করে নিতে হবে। একক ব্যক্তিকে যত বেশী সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় যুক্ত করে নেওয়া যাবে ততই তার সমস্যার উর্দ্ধে উঠার সম্ভাবনা বৃদ্ধি পাবে।

৫.৩ প্রশ্নাবলী

(১) ব্যক্তি কর্মীর সঙ্গে সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তির সম্পর্ক স্থাপনের উদ্দেশ্য কি?

(২) ব্যক্তি কর্মের ক্ষেত্রে কোন্ কোন্ উপাদান নিয়ে সম্পর্ক স্থাপন হয়?

(৩) ব্যক্তি কর্মে সাফল্য পেতে গেলে কোন্ ভিত্তির উপর ভর করা আবশ্যক?

(৪) ব্যক্তি কর্মের ক্ষেত্রে বৃত্তিমূলক মতবাদগুলি কি?

একক ৬ ❑ একক ব্যক্তির সাথে কাজের তথ্য নথিভুক্ত করণের ধারনা ও গুরুত্ব

গঠন ঃ

৬.১ ধারণা

৬.২ ব্যক্তি কর্মে নথিভূক্ত করনের গুরুত্ব

৬.৩ নথিভূক্তকরণের ধরন

৬.৪ সমাপ্তিকেন্দ্রিক মন্তব্য

৬.৫ প্রশ্নাবলী

৬.১ ধারণা (concept) ঃ

একক ব্যক্তির সাথে কাজের জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা তার পরিবার সম্পর্কিত তথ্য নথিভূক্তকরণ একটি অত্যন্ত জরুরী পদ্ধতি। কারণ ব্যক্তির সমস্যার পিছনে রয়েছে অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে তার নিজের এবং পরিবারের ভূমিকা। সেজন্য ঐ ব্যক্তি এবং তার পরিবার সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ এবং নথিভূক্ত না করা হলে একক ব্যক্তির সমস্যার প্রকৃত রূপ ও কারণ বিশ্লেষণ করা বা জানা সম্ভব হবে না। ফলে একক ব্যক্তির সমস্যার গভীরে প্রবেশ না করতে পেরে সমস্যার প্রকৃত সমাধান খোঁজা দুরুহ হয়ে পড়বে। রেকর্ডটি তৈরী করতে প্রয়োজনমত তথ্য সংগ্রহ করতে হয় অভিভাবকদের কাছ থেকে, প্রতিবেশী এবং শিক্ষকদের কাছ থেকে, দিনপঞ্জী থেকে এবং সংশ্লিষ্ট একক ব্যক্তির কাছ থেকে। পরীক্ষার মার্কসিট, ডাক্তারের দেওয়া প্রেসক্রিপসন, কার্ডকে লেখা বা কারো কাছ থেকে পাওয়া চিঠি ইত্যাদি থেকেও তথ্য সংগ্রহ করা যায়। নিকট বন্ধুবান্ধবরাও (Peer Group) বিভিন্ন ধরনের তথ্য সরবরাহ করতে পারে। এভাবে সংগৃহীত তথ্য পদ্ধতি মোতাবেক রক্ষা করাই হলো তথ্য নথিভুক্তকরণ (Record Keeping)।

৬.২ ব্যক্তি কর্মে নথিভুক্ত করণের গুরুত্ব

ব্যক্তি কর্মে তথ্য ভিত্তিক নথির প্রয়োজন সীমাহীন। নথি ব্যক্তি কর্মীকে (case worker) সাহায্য করে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির সমস্যার গভীরতা ও ব্যাপকতা বুঝতে, সম্ভাব্য কারণ অনুসন্ধান করতে, সমাধানের পথ খুঁজে পেতে। এর দ্বারা সুযোগ ঘটে একক ব্যক্তিটির সাথে উপযুক্তভাবে ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া করার। স্বভাবতই তথ্য নথিভুক্তকরণ পদ্ধতি সাহায্য করে থাকে পদ্ধতিগত দিক দিয়ে সঠিকভাবে একক ব্যক্তিকে সহায়তা করতে। এই পদ্ধতি ব্যক্তি কর্মীকে শিখতে সাহায্য করে। এতে ব্যক্তিকর্মীর পর্যবেক্ষনের গতি ও প্রকৃতি বৃদ্ধি পায়। নথিভুক্ত তথ্য একক ব্যক্তি সম্পর্কে পরিষ্কার ধারনা পেতে সাহায্য করে। এই পদ্ধতি সাহায্য করে ব্যক্তি কর্মীকে তার কাজের ধারা উপযুক্তভাবে পরিচালনা করতে এবং সংশ্লিষ্ট সংস্থা (agency)-কে ব্যক্তি কর্ম পরিচালনার

ব্যাপারে সঠিকভাবে সাহায্য করতে। এর ফলে সংস্তাও তার ব্যক্তিকর্ম পরিষেবা পরিচালনার ক্ষেত্রে গতি ও গুণগত উৎকর্ষতা রক্ষা করতে পারবে। সর্বোপরি সংগৃহীত তথ্য, যা ঠিকভাবে নথিভুক্ত থাকে, পরবর্তীকালে কোন গবেষণামূলক কাজেও লাগানো যেতে পারে।

তথ্য নথিভুক্ত করণের ফলে একজন ব্যক্তি কর্মীর বুঝতে সুবিধা হয় কিভাবে বিভিন্ন পদ্ধতির মাধ্যমে ব্যক্তির বিভিন্ন ধরনের সমস্যা দূরীকরণ করা সম্ভব। ব্যক্তি কর্মীর পেশা ভিত্তিক সেবা তখনই সহায়ক হবে যখন একক ব্যক্তি উপলব্ধি করতে পারবে যে সে সহায়িত হচ্ছে। সেই অবস্থায় ব্যক্তি কর্মীর উপর একক ব্যক্তি অনেক বেশী আস্থা রাখবে এবং যোগাযোগ রাখার ব্যাপারে আরও বেশী ইচ্ছা প্রকাশ করবে। ফলাফল প্রাপ্তির, সম্ভাবনায় ব্যক্তি কর্মীকে একক ব্যক্তি ক্রমবর্ধমান পরিমানে বা মাত্রায় সহযোগিতা করবে।

বিভিন্নভাবে সংগৃহীত তথ্য নথিভুক্ত করণের পদক্ষেপ পরবর্তী পর্যায়ে মূল্যায়নের (evaluation) পথ প্রশস্ত করে এবং মূল্যায়ন ব্যক্তি কর্মীকে উদ্বুদ্ধ করে তার কাজে যথেষ্ট যত্নবান হতে, প্রয়োজনীয় পরিবর্তন সাধনে। তাছাড়া তথ্য নথিভুক্তকরণ পদ্ধতি সাহায্য করে বা সুযোগ করে দেয় পরবর্তী পদক্ষেপ বা কর্মধারাকে আরও উন্নত করতে। ব্যক্তি কর্মীকে নিজের ব্যক্তিত্ব, দক্ষতা, কৌশল এবং আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধিতে সহায়ক হয় মূল্যায়ন প্রক্রিয়া। দক্ষ কর্মী নিজের অবস্থান মজবুত করে নেওয়ার ব্যাপারেও তথ্য নথিভুক্তকরণ প্রক্রিয়া ব্যক্তি কর্মীকে (case worker) সাহায্য করে।

৬.৩ নথিভুক্ত করণের ধরন

মোটামুটিভাবে নথিভুক্ত করণের চারটি ধরন রয়েছে। সেগুলি হলো ঃ

(ক) **বর্ণনা মূলক (Explanatory) ঃ** একজন ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে তার এবং তার পরিবার পরিবেশের সমূহ বিষয়গুলি পদ্ধতিগত ও বিস্তারিতভাবে লিপিবদ্ধ করে রাখাই হলো বর্ণনামূলক তথ্য নথিভুক্তকরণ। যেমন একক ব্যক্তির ব্যক্তিগত পরিচিতি (নাম, বাসস্থান, বয়স, লিঙ্গ, শিক্ষা, পেশা, আয়, ব্যয়ের ধরন ইত্যাদি), পারিবারিক তথ্য (সদস্য সংখ্যা, তাদের বয়স, শিক্ষা, কর্ম, আয়-ব্যয়, আয়ের সূত্র, পারিবারিক সম্পর্ক ও পরিবেশ ইত্যাদি), সমস্যার ধরন (সামাজিক, মানসিক, পারিবারিক, দৈহিক ও অন্যান্য)। উপরোক্ত বিষয়গুলির তথ্য একদিনে বা এক সময়ে সংগৃহীত হয় না। পর্যায়ক্রমে তা সংগ্রহ ও লিপিবদ্ধ করতে হয় সঠিক সম্পর্ক গড়ে তোলার মাধ্যমে।

(খ) **নির্দিষ্ট কর্মের নথিভুক্তকরণ (Record Keeping of Specific Work) ঃ** এই প্রক্রিয়ায় সব চেয়ে প্রথমে যা জরুরী তা হলো সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তির সঙ্গে সঠিক সম্পর্ক তৈরী করা এবং তার মধ্য দিয়ে সমস্যার ধরনটি বুঝে নেওয়া। সঠিকভাবে সম্পর্ক তৈরী ও যোগাযোগ হওয়ার পর সমস্যার ধরনটি নির্দিষ্টকরণ করতে হবে এবং তারই ভিত্তিতে সমাধান সংক্রান্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে যদি বোঝা যায় সেটির উৎস কোন সামাজিক কারণ তাহলে ব্যক্তি কর্মী সেই সমস্যা সমাধানে সরাসরি সাহায্য করবে। অন্যথায় মনোবিদের সাহায্য নেওয়া যেতে পারে। সমস্যা সমাধানের প্রয়োজনে যখন যা পদক্ষেপ নেওয়া হবে তা নথিভুক্তকরণই হলো নির্দিষ্ট কর্মের নথিভুক্ত করণ।

(গ) **সংক্ষিপ্ত নথিভুক্তকরণ (Brief Record Keeping) ঃ** এই প্রক্রিয়ায় সমস্যার খুব পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ নথিভূক্তকরণের প্রয়োজন হয় না যদি দেখা যায় যে একক ব্যক্তি (client) উপযুক্ত সহযোগিতাপূর্ণ সম্পর্ক রেখে চলেছেন এবং সমস্যার সহজ সমাধানে তারও আগ্রহ রয়েছে। এক্ষেত্রে একক ব্যক্তির সঙ্গে কথোপকথন এবং তার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে খুব সংক্ষিপ্তভাবে বা টীকা আকারে তথ্য নথিভুক্ত করা যেতে পারে।

(ঘ) **সারাংশ মূলক নথিভুক্ত করণ (Summary Record Keeping) ঃ** সারাংশমূলক নথিভুক্তকরণ বলতে বোঝায় যে কোন তথ্যের সার সংক্ষেপ রচনা করে তা রক্ষা করা। সংগৃহীত তথ্যগুলি থেকে একটি ধারণা নিয়ে তার সার সংক্ষেপ রচনা করে তা নথিভূক্ত করতে হয়। যখন বর্ণনামূলক নথি নাড়াচাড়া করার সময় বা প্রয়োজন থাকে না তখন এই সারাংশ মূলক নথিই কার্যকরীভাবে ব্যবহার করা যায়।

একক কর্মের বা ব্যক্তি কর্মের কর্মীর জ্ঞান, অভিজ্ঞতা, বুদ্ধিমত্তা ও আগ্রহকে কাজে লাগিয়ে উপরোক্ত চার ধরনের তথ্য নথিভুক্তকরণ প্রক্রিয়া ব্যবহারের মাধ্যমে ব্যক্তি কর্মে সাফল্য প্রাপ্তি ঘটানোর লক্ষ্যে তৎপর থাকা দরকার।

৬.৪ সমাপ্তিকেন্দ্রিক মন্তব্য

নথিভুক্তকরণ কি, কেন এবং কিভাবে—সে সম্পর্কিত আলোচনা করা হলো উপরোক্ত অনুচ্ছেদগুলিতে। এই আলোচনা যেমন এ সম্পর্কে ধারণা তৈরীতে সহায়ক হয়েছে তেমনি তার প্রয়োজন এবং ধরন সম্পর্কেও স্বচ্ছ ধারণার অধিকারী হতে সাহায্য করেছে। কিন্তু এই সঙ্গে আরো কয়েকটি কথা জেনে রাখা দরকার। সেগুলি হলো ঃ

(ক) তথ্য সংগ্রহ এবং তা নথিভুক্ত করণের ক্ষেত্রে কোন ঢিলেমী বা দায়সারাভাব কাম্য নয় কারণ ব্যক্তির সমস্যা দূরীকরণের ক্ষেত্রে এই নথিগুলিই অন্যতম প্রধান সহায়ক বস্তু হিসাবে কাজ করে।

(খ) নানা কারণে এক ব্যক্তি কর্মীর জায়গায় আর এক ব্যক্তি কর্মী একক ব্যক্তির সমস্যা সমাধানের কাজে যুক্ত হতে পারে। তথ্য যদি উপযুক্তভাবে নথিভুক্ত ও রক্ষিত না হয় তা হলে নতুন দায়িত্ব নেওয়া ব্যক্তিকর্মীকে আবার প্রথম থেকে প্রক্রিয়া শুরু করতে। এই পরিস্থিতি অনর্থক সময় নষ্ট করে এবং সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তি ও তার পরিবারের কাছে বিরক্তিকর মনে হয়। সংশ্লিষ্ট সংস্থার (agency) সুনাম ও এতে বিঘ্নিত হয়।

(গ) একক ব্যক্তির সমস্যার ধরন ও গভীরতা, সমস্যাকে একক ব্যক্তি ও তার পরিবার কিভাবে দেখছে, সমাজে সে কেমন ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া করে থাকে, সমস্যা সমাধানে কি কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে এবং কোন পর্যায়ে এ সমস্ত তথ্য সঠিকভাবে নথিভূক্ত থাকলে সমস্যা সমাধানের জন্য গৃহীত বিভিন্ন ব্যবস্থা কতটা ফলদায়ী হচ্ছে, ব্যক্তি ও তার পরিবারের সদস্যদের দৃষ্টিভঙ্গীতে কতটা পরিবর্তন আসছে তা নির্ণয় করা সহজ হয়। নথিভুক্ত করণের বিভিন্ন পর্যায়ে যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপিত হলে সমাধান ব্যবস্থা পরিচালনা করা সহজসাধ্য ও বিধিসম্মত হয়।

(ঘ) ম্যারি রিচমণ্ড (Marry Richmond) একক ব্যক্তির সমস্যা কেন্দ্রিক সংগৃহীত সমস্ত তথ্যকে ব্যক্তি (Person) এবং ব্যক্তির পরিবেশ (Person) এবং ব্যক্তির পরিবেশ (Person's environment) এই দু'টি বিষয়কেই

গুরুত্ব দিয়েছেন। তাই উপরোক্ত দুই বিষয়েরই তথ্য নথিভুক্তকরণে সমানভাবে আগ্রহী হতে হবে।

(৬) নথিভুক্ত করণের ক্ষেত্রে যে সমস্যাই থাকুক না কেন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির সমস্তত্ব বিশ্লেষণ করে সেই সংক্রান্ত তথ্য লিপিবদ্ধ করাও জরুরী। কারণ প্রতিটি ব্যক্তিরই জীবনধারা মূলতঃ নির্ভর করে থাকে তার মনস্তত্ত্বের উপর। বস্তুতঃপক্ষে মানুষের সমস্ত ধরনের ব্যবহারই এই সমস্তত্ত্বের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে থাকে।

উপরোক্ত বিষয়গুলির প্রতি উপযুক্ত গুরুত্ব আরোপের বিষয়টি বিবেচনায় রেখে ব্যক্তি কর্মী যদি কাজ করেন তাহলে তা সাফল্য প্রাপ্তিতে সহায়ক হয়।

৬.৫ প্রশ্নাবলী

(১) তথ্য নথিভুক্ত করণ কথাটির তাৎপর্য বা অর্থ কি?

(২) কেন তথ্য নথিভুক্ত করনের প্রয়োজন হয়।

(৩) ব্যক্তি কর্মের প্রেক্ষিতে কি ধরনের নথিভুক্তকরণ করা হয়?

(৪) এই পদ্ধতি অবলম্বনের ক্ষেত্রে কোন্ কোন্ বিষয়গুলি গুরুত্ব সহকারে মনে রাখতে হয়?

একক ৭ ❑ সামাজিক ব্যক্তি কর্মে সমস্তত্ব বিশ্লেষণের ধারণা এবং ওরিয়েন্টেশন

ফ্রয়েড, এডলার এবং এরিকসনের অবদান

গঠন ঃ

৭.১ ব্যক্তি কর্মে সমস্তত্ব বিশ্লেষণের ধারণা এবং ওরিয়েন্টেশান
৭.২ এ-বিষয়ে আলোচনার প্রয়োজনীয়তা
৭.৩ একক ব্যক্তির সমস্তত্ব জানার উপায়
৭.৪ সমস্তত্ব বিশ্লেষণের প্রকার
৭.৫ ফ্রয়েডের অবদান
৭.৬ এডলারের অবদান
৭.৭ এরিকসনের অবদান
৭.৮ প্রশ্নাবলী

৭.১ ব্যক্তি কর্মে মনস্তত্ব বিশ্লেষণের ধারণা এবং ওরিয়েন্টেশন

ব্যক্তিকে মনুষ্যোচিত ব্যবহার করতে সহায়তা করে তার মনস্তত্ব যা তাকে পারিপার্শ্বিক পরিবেশের মধ্যে নিয়ন্ত্রিত করে রাখে। চাহিদা এবং প্রয়োজন (wants and needs)-এ দুটি মানুষের জীবনে চির সত্য। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যেমন খাদ্য একজন ব্যক্তিকে শরীরের ক্ষুধা নিবৃত্তি, আবেগ ও মানসিক শান্তি বজায় রাখতে সাহায্য করে। আবার নিশ্চিত নিরাপত্তার জন্য এবং সামাজিক প্রতিষ্ঠার জন্য তার বিশেষ প্রয়োজন অর্থের। এই চাহিদা এবং প্রয়োজন মেটানোর স্বার্থেই মানুষ যুক্ত থাকে নানা কাজে।

ম্যারী রীচমন্ডের (Marry Richmond) মতানুযায়ী সাহায্যকারী ব্যক্তি কর্মী (case worker) অবশ্যই সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তির (client) সমুহ ঘটনা বিশদভাবে জানবার চেষ্টা করবে। জানবার চেষ্টা করবে তার বিকাশের ধারাগুলিও। ঐ সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তি যে পরিবার ও পরিবেশে বাস করে সেই পরিবার ও পরিপার্শ্বিক পরিবেশের ব্যবহারিক দিকটি সম্পর্কেও অবহিত হতে হবে। কারণ তার ব্যবহারিক ধরন ও ব্যক্তিত্ব গঠনকে প্রভাবিত করে তার ব্যবহারকে।

৭.২ এ-বিষয়ে আলোচনায় প্রয়োজনীয়তা

একক ব্যক্তির মনো-সামাজিক বিষয়ে বিশ্লেষণ করার প্রয়োজন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির সমস্যা সমাধানের জন্যই। কারো কারো ব্যবহার client-এর কাছে অত্যন্ত পীড়াদায়ক বলে মনে হতে পারে। যার ফলে অনেক সময় সহজতম কাজও তার কাছে কঠিন হয়ে দাঁড়ায় এবং উদ্বিগ্ন অবস্থার মধ্য দিয়ে জীবন যাপন করতে হয়। এজন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি পরিবারে, শিক্ষাক্ষেত্রে, কর্মক্ষেত্রে, বন্ধুমহলে বা সমাজে স্বাভাবিকতা বজায় রেখে চলতে পারে না। দীর্ঘ দিন মনের মধ্যে এই উদ্বেগ ও চাপ থাকলে সেই ব্যক্তি মনরোগের বা স্নায়বিক দুর্বলতার শিকার হয়। একটি জনপ্রিয় গানের একটি কলি আমরা এখানে উল্লেখ করতে পারি—"Every little movemen has a meaning of its own" অর্থাৎ মানুষের জীবনের প্রতিটি ছোট ছোট ঘটনার মধ্যে তার নিজস্ব অর্থ লুকিয়ে থাকে। গানের এই বাক্যটি হয়তো এইভাবে ব্যক্ত করতে চেয়েছে যে আমাদের প্রতিটি ব্যবহারের মধ্যেই লুকিয়ে থাকে আমাদের প্রকৃত মনোভাব যা অন্যকে আনন্দ বা যন্ত্রণা দিতে সক্ষম। একজন সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তি একজন সাহায্যকারী ব্যক্তি কর্মীর কাছে আসে সাধারণতঃ একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে তার সমস্যা সমাধানে সাহায্য পাওয়ার বাসনায়। সেই একক ব্যক্তি (client) তার জীবনে ঘটে যাওয়া নানান ঘটনা বা ছোট ছোট মুহূর্তগুলো বলার চেষ্টা করে। এলোমেলোভাবে বলে যাওয়া সেই সব বক্তব্যের মধ্যেও লুকিয়ে থাকে তার মানসিক যন্ত্রণা। এই সব যন্ত্রণাগুলিই তাকে মানসিকভাবে বারবার বিব্রত করে। কখনো কখনো তা চরম পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছয়। এর প্রভাবে অনেক সময় সে নিজেকে কাল্পনিক সমস্যার মধ্যেও ডুবিয়ে রাখে। পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছয় যে তাকে একটা দোদুল্যমান পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে দিন যাপন করতে হয়। এই রকম পরিস্থিতির মধ্যে থাকা ব্যক্তির (client) ঐ সমস্ত যন্ত্রণা প্রকাশ পেয়ে থাকে তার সামগ্রিক ব্যবহারে।

৭.৩ একক ব্যক্তির সমস্তত্ত্ব জানার উপায়

একক ব্যক্তির সঙ্গে কাজ করতে হলে সমস্যা সম্পর্কিত তথ্য প্রাপ্তির প্রাথমিক উৎস হবে client তাই ব্যক্তি কর্মীকে (case worker) সমস্যাটিকে গভীরভাবে জানার জন্য ভাবা উচিত ঠিক কখন, কোথায়, কিভাবে client-এর কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা যেতে পারে। জানার চেষ্টার মধ্যে অবশ্যই এই উদ্দেশ্যটি মাথায় থাকবে যে client-এর সমস্তত্ত্ব কিভাবে বোঝা যায়। সেক্ষেত্রে ব্যক্তি কর্মীকে বিশেষভাবে নজর দিতে হবে client-এর সঙ্গে সুসম্পর্ক রক্ষা করা এবং সংগৃহীত তথ্যের গোপনীয়তা রক্ষার ব্যাপারে। ব্যক্তি কর্মী এবং client উভয়কেই তথ্য লেনদেনের ক্ষেত্রে পারস্পরিক সহযোগীতা দানে প্রতিশ্রুত ও যত্নবান হতে হবে। এর ফলে ব্যক্তি কর্মীর পক্ষে তার client-এর মানসিক ব্যাপারগুলি বিশেষভাবে বুঝে উঠার ক্ষেত্রে যেমন সহায়ক হবে তেমনি সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তি (client) খোলামেলাভাবে তার বক্তব্য জানাবার সুযোগ পারে।

সমস্যা কবলিত ব্যক্তির বিষয়ে আরও বিশদে জানার জন্য তার মানসিক ও সামাজিক অবস্থান বিশ্লেষণের প্রয়োজন যার জন্য ব্যক্তি কর্মীকে সেই ব্যক্তির সামাজিক বা পারিবারিক কাঠামো এবং তার কাজের ধরন ইত্যাদি অনুধাবন করতে হয়। আরও পরিষ্কার ভাবে বলতে গেলে বলতে হয় সেই একক ব্যক্তি সাধারণ পরিবেশে

কেমন ব্যবহার করে বা অন্যের কাছ থেকে কেমন ব্যবহার পেয়ে থাকে সে সম্পর্কে ধারণা পাওয়া জরুরী। এও বলা যেতে পারে যে ব্যক্তির অহংভাব (Ego) অবশ্যই উপলব্ধিতে আনা প্রয়োজন। তবেই ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের ধরনটি বুঝে উঠতে সহায়ক হয়। সামাজিক ব্যক্তি কর্মী নিজের জ্ঞান বা অভিজ্ঞতাকে ভিত্তি করে client-এর অহংভাবকে প্রত্যক্ষকরণের মাধ্যমে অনুভব করার চেষ্টা করে। এই প্রক্রিয়াটিও সাফল্যের সঙ্গে করা তখনই সম্ভব যখন client এবং ব্যক্তি কর্মীর মধ্যে এক সহযোগীতামূলক পরিবেশ বজায় রাখা সম্ভব হয়।

এভাবে সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক তথ্য সংগ্রহের পরে সঠিক বিশ্লেষণের ভিতর দিয়ে ব্যক্তির সমস্যাগুলিকে চিহ্নিত করে নিতে হবে। ঐ সমস্যাগুলি কি কারণে ঘটছে, client-কে কিভাবে বিব্রত করছে এবং কিভাবে তার সমাধান সম্ভব সে ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও করতে হবে। যে পদ্ধতিতে সমাধানের কথা ভাবা হচ্ছে তাতে client-এর খারাপ কিছু হওয়ার সম্ভাবনা আছে কি না তাও তলিয়ে দেখতে হবে। সমাধানের পরিকল্পনা রচনার সময় অবশ্যই মাথায় রাখতে হবে যে গৃহীত পদক্ষেপের জন্য সেই ব্যক্তির মনের উপর যেন কোন বিরূপ মানসিক প্রতিক্রিয়া (negative mental reaction) সৃষ্টি না হয়। কারণ তেমন কিছু হলে সমস্যা হ্রাস পাওয়ার পরিবর্তে বৃদ্ধি পেতে পারে।

ব্যক্তি কর্মীকে সতর্ক থাকতে হবে যে সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে client যেন সম্পূর্ণভাবে তার উপর নির্ভরশীল হয়ে না উঠে। এতে client পরম্বৈপদী হয়ে উঠবে এবং নিজে উদ্যোগ গ্রহণে আগ্রহী হয়ে উঠবে না।

৭.৪ সমস্তত্ত্ব বিশ্লেষণের প্রকার

সমস্তত্ত্ব বিশ্লেষণকে মূলতঃ দুটি ভাগে ভাগ করা যায়। সেগুলি হলো ঃ

(ক) মনের নির্দিষ্ট অঞ্চলের বিবরণ,

(খ) মনের বিন্যাস, গঠন, সচেতন অভিজ্ঞতাদি।

এগুলি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনায় যাওয়া যেতে পারে।

(ক) **মনের নির্দিষ্ট অঞ্চলের বিববরণ (Topographic) ঃ** মানুষের মনে বিভিন্ন ঘটনা সাধারণতঃ দু'রকম ভাবে ঘটে থাকে—সচেতনভাবে এবং অচেতনভাবে। ব্যক্তির মনের মধ্যে কোন উদ্বেগ দেখা দিলে তার শরীর ও মন বিভিন্ন প্রতিক্রিয়া করতে চায়—সেটি পরিবারে বা সমাজে গ্রহণযোগ্য হোক বা না হোক। ব্যক্তির ভাবনা প্রবাহ নানা খাতে বয়ে যায়, কিন্তু সে প্রতিটি ভাবনার প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে পারে না তার গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে সন্দেহ থাকায়। স্বভাবতঃই প্রতিক্রিয়াহীন চিন্তাভাবনাগুলি তার মনের মধ্যে অবচেতনভাবে বাসা বাঁধে। সেই সব অতৃপ্ত বাসনা বা অপ্রকাশিত ভাবনা মাঝে মাঝে মনের উপর চাপ সৃষ্টি করে। যখন সেই ব্যক্তি অনুভব করে যে কিছু কিছু আকাঙ্খা বাস্তবে পূরণ করা সম্ভব নয় তখন সেই ব্যক্তি ঐ বিষয়গুলিকে নিয়ে নানা রকম স্বপ্ন দেখতে বা কল্পনা করতে শুরু করে যার অবশ্যম্ভাবী ফলশ্রুতি হলো ধীরে ধীরে নানা মানসিক সমস্যার শিকার হওয়া। সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তির এই ধরনের ভাবনাগুলি অনুভব এবং বিশ্লেষণ করলে তার অচেতনাতার প্রকৃতি

বুঝতে সহায়ক হবে। তারই ভিত্তিতে client-কে নানাভাবে এবং ক্রমাগত বোঝানো প্রয়োজন যে আমরা যা কিছু কল্পনা করি (Fantasi) ও স্বপ্ন দেখি (dreams) বা পেতে চাই তার সবকিছু কখনোই বাস্তবে পাওয়া সম্ভব নয়।

(খ) **মনের বিন্যাস, গঠন, সচেতন অভিজ্ঞতা (Structural) ঃ** অবচেতন মনের বিবিধ গতি প্রকৃতির ব্যাপারে জানতে হলে সমস্তত্ত্ব বিশ্লেষণের প্রয়োজন। সে জন্য তার ব্যক্তিত্বের গতিপ্রকৃতি কেমন তাও জানতে হবে। ইদ্, ইগো এবং সুপারইগো এই বিষয়গুলি সম্পর্কে অবহিত হতে হবে। ইদ্ (Id)-এর কাজ হলো ব্যক্তির ক্ষুধা, তৃষ্ণা, যৌনতা সমেত মনের বিভিন্ন কামনাগুলিকে চালিত করা এবং অনুপ্রাণিত করা। মনের আকাঙ্খা পূরণের মাধ্যমে আনন্দ প্রাপ্তিতে আগ্রহী করে তোলাই ইদের কাজ। উগ্র ব্যবহার, অসামাজিক কাজ, নীতি নিয়মকে অগ্রাহ্য করে জীবন যাপন—এ সবের মধ্যেই থাকে ইদ্-এর প্রভাব। কোন কোন আচরণ কি ক্ষতি করতে পারে তা জেনেও ইদ্-এর তাড়নায় সেই আচরণবৃত্তের বাইরে আসতে পারে না অনেকে।

অন্যদিকে ইগোর (Ego) কাজ হলো একজন ব্যক্তির সমস্ত ধরনের ব্যক্তিত্বকে ধারণ করে রাখা—তা ভাল বা মন্দ যাই হোক। ইগো মানুষকে ভাবতে উদ্বুদ্ধ করে যে কোন একটি কাজ করা ঠিক হবে কি হবে না, সমান বা পরিবার কিভাবে তা গ্রহণ করবে ইত্যাদি। ইগো হলো মানুষের অহংভাব অথবা বলা যেতে পারে ইদ্ ও সুপার ইগোর মধ্যবর্তী অবস্থা। প্রতিটি ব্যক্তির মন উচিত অনুচিতের মধ্যে ঘুর পাক খেতে থাকে। এ এক ধরনের মনের খেলা। এই খেলায় ইদের ইচ্ছেকে ইগো যদি মেনে নেয় তবে ইদের পাল্লা ভারী হয়। সেক্ষেত্রে ইদ্ ইগোর সহায়তায় তার আকাঙ্খা পূর্ণ করে, ব্যক্তি এবং তার পরিবার ও সমাজের মন্দ হলেও।

সুপার ইগো (Super Ego) মানুষের মন ও কর্মধারাকে নিয়ন্ত্রণে রাখার চেষ্টা করে। ব্যক্তির আচার আচরণে যেন নৈতিকতা বজায় থাকতে সে ব্যাপারে সুপার ইগো নির্দিষ্ট ভূমিকা পালন করে। মানুষের ইচ্ছার প্রকাশের প্রতিফলন এমন হতে সাহায্য করে যা সকলের কাছে গ্রহনযোগ্য হয়।

৭.৫ ফ্রয়েডের অবদান

ইদ্, ইগো এবং সুপার ইগো—মানুষের মন এবং আচরণকে প্রভাবিত করার এই তিন শক্তির আবিষ্কর্তা হলেন সিগমণ্ড ফ্রয়েড। এই তিনটির একত্র কার্যরূপকে তিনি বলেছেন মানুষের ব্যক্তিত্বের বিষয়। এই তিনটি সম্পর্কে সঠিক ধারণার অধিকারী হওয়া ব্যক্তি কর্মের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় একটি দিক। এগুলির সঠিক বিশ্লেষণ করতে পারলে ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণার অধিকারী হওয়া যায়। ১৯৬৪ সালে ফ্রয়েড ইদ্, ইগো এবং সুপার ইগোর ব্যক্তিগত চারিত্রিক দিক নিয়ে আলোকপাত করেন। মানুষের ব্যবহারের মধ্যে এই তিনটি বিষয় অবশ্যই সর্বদা জড়িয়ে থাকবে। ইদ্ প্রভাবিত ব্যক্তির ক্ষেত্রে তিনি লক্ষ্য করেছেন উগ্র ভাবনা চিন্তা এবং যৌন সংক্রান্ত ভাবনা চিন্তা প্রাধান্য পেয়ে থাকে। আবার ইগো প্রভাবিত ব্যক্তিত্বের মধ্যে তিনি লক্ষ্য করেছেন, কি করা উচিত এবং কি করা উচিত নয় সে বিষয়ে একটা দ্বন্দ্ব থেকে যায়। অন্যদিকে সুপার ইগো প্রভাবিত ব্যক্তি সামাজিক পরিস্থিতি অনুযায়ী ব্যবহার করায় আগ্রহী থাকে।

ফ্রয়েডের মতে মানুষের ব্যক্তিত্বের বিকাশের জন্য যে defence mechanism-কে বেশী ব্যবহার করে

থাকে যাতে ইগো একটা স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারে। এই সিদ্ধান্ত নেওয়ার ব্যাপারগুলি ব্যক্তির মনের মধ্যেই অবচেতনভাবে তৈরী হতে থাকে। যখন তা তৈরী হয় তখন সে অবশ্যই একটা পারিপার্শ্বিক অবস্থার কথা ভেবে নেয়। কিন্তু সেই পারিপার্শ্বিক পরিবেশের অবস্থানের বিষয়টিকে খুব একটা বা একেবারেই গুরুত্ব দিতে চায় না।

ব্যক্তি কর্মের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় এই বিষয়টির উপর উপরোক্ত বিজ্ঞানভিত্তিক চিন্তার প্রকাশ ঘটানোই হলো ফ্রয়োডের অবদান।

৭.৬ এডলারের অবদান

মনস্তত্ত্ববিদ এডলার ছিলেন সিগমন্ড ফ্রয়েডের একজন ছাত্র। ফ্রয়েড তাঁর গুরু হলেও এডলার তাঁর নিজের পদ্ধতিতে মমস্তত্ত্বের বিশ্লেষণ করেছেন। তাঁর ধারণা মানুষের ব্যবহার এবং তার গতিপ্রকৃতি প্রাথমিকভাবে পরিবেশের উপর নির্ভর করে। তাঁর মতে নিরাপত্তার প্রয়োজনে মানুষ এক একটি পরিবেশে এক এক রকম ব্যবহার করে থাকে। মূলতঃ পারিবারিক ও সামাজিক পরিবেশের উপরই একজন ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব বিকাশ নির্ভর করে। সমাজে কোন মানুষই হীন মনোভাব নিয়ে জন্মায় না। সে পরিশ্রম করে, বাঁচতে চায়, বড় হতে চায়। এই বড় হতে চাওয়া থেকেই কোন কিছু লক্ষ্য বস্তুর দিকে এগিয়ে যেতে থাকে। তাই এডলার-এর ভাবনার বা মতামতের বিষয়টি মূলতঃ সমাজ ব্যবস্থা কেন্দ্রিক। মানুষ জন্ম থেকেই ভাল বা খারাপ হয়ে যায় না। শিশু ধীরে ধীরে বড় হতে থাকে পরিবেশ ও পরিবারের মধ্যে। সুতরাং কোন্ শিশু বড় হয়ে কি রকম হবে তা অনেকটাই নির্ধারিত হয় সে পরিবার ও পরিবেশের মধ্যে কিভাবে বেড়ে উঠছে তার উপর। সেজন্য প্রত্যেকের যত্নবান হওয়া দরকার তার পরিবার। প্রতিবেশী, শিক্ষাক্ষেত্রে সর্বত্র সুস্থ পরিবেশ গড়ে তুলতে যাতে সামগ্রিক পরিবেশটি শিশুর গড়ে উঠার পক্ষে অনুকূল হয়।

৭.৭ এরিকসনের অবদান

এরিকসনের মতানুসারে একজন ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব শিশুকাল থেকে প্রৌঢ়ত্ব পর্য্যন্ত বিভিন্ন পর্যায়ে তার জীবনকালে প্রবাহিত হয়। তিনি এগুলিকে মোটামুটি আটটি পর্যায়ে ভাগ করেছেন। প্রতিটি পর্যায়ের (Stage) এক একটি চারিত্রিক বৈশিষ্ট রয়েছে। ঐ বৈশিষ্টগুলির সাথে অবশ্যই ব্যক্তির ও পরিবেশের একটা ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া হয়ে থাকে। কয়েকটি পর্যায়ের কথা এখানে সংক্ষেপে উল্লেখ করা যেতে পারে।

(ক) বাচনিক স্তর (Oral Stage) ঃ এই স্তরটি শিশুর জন্মের পর থেকে ১৮ মাস বয়স পর্য্যন্ত বিস্তৃত। এই স্তরে তার মানসিক বিকাশ, দৈহিক আনন্দ এবং মায়ের সাথে বিশ্বাস-অবিশ্বাসের বিষয়টি জড়িয়ে থাকে। এখানে মায়ের সাথে শিশুর একটা প্রাথমিক সম্পর্ক তৈরী হয়।

(খ) এনাল স্তর (Anal Stage) ঃ দেড় থেকে তিন বছর বয়সকে এনাল স্তর বলা হয়েছে। এই সময়

শিশুটি হাঁটতে শেখে, কথা বলতে শেখে ও নিজেই খেতে শেখে। জীবনের প্রথম ১৮ মাসে সব কিছু মুখে দেওয়ার ভেতর দিয়ে তার আনন্দ প্রাপ্তি ঘটতো কিন্তু এই দ্বিতীয় স্তরে তার শরীরের অন্য অংশ থেকেও সে আনন্দ পাওয়ার চেষ্টা করতে থাকে। এ সময় শিশুটি যেমন হাসতে শেখে তেমনি রাগ করতেও শেখে। এ সময় হাত পায়ের ব্যবহারও করে বেশী করে।

(গ) জনম-ক্রিয়া সংক্রান্ত স্তর (Genital Stage) ঃ এই সময় একটি শিশু লিঙ্গ বৈষম্য বুঝতে শেখে। এই স্তর মোটামুটি তিন থেকে ছয় বছর বয়স পর্য্যন্ত বিস্তৃত। এই স্তরে শিশুটি নজর রাখার বা উপলব্ধি করার চেষ্টা করে বাবা ও মায়ের শারীরিক পার্থক্যটি এবং সে ভাবেই সে লিঙ্গ বৈষম্যের বা পার্থক্যের বিষয়টি উপলব্ধি করতে শেখে।

(ঘ) সুপ্তাবস্থার স্তর (Latency Stage) ঃ এই স্তরটি ছয় বছর থেকে এগারো বছর বয়স পর্য্যন্ত বিস্তৃত যা তার বিদ্যালয়ে যাওয়ারও বয়স। এই স্তরে যৌনতা বোধ নিয়ে তার কৌতূহল দেখা দেয়।

(ঙ) বয়ঃসন্ধি স্তর (Adolescence Stage) ঃ এই স্তরটি বারো তেরো বছর বয়স থেকে ১৮—১৯ বছর বয়স পর্য্যন্ত। এই স্তরে শিশুর শারীরিক ও মানসিক গঠন কৈশোরত্ব থেকে যৌবনত্বের দিকে প্রসারিত হয়। এই স্তরে থাকা ছেলে মেয়েরা তাদের অভিভাবক, বন্ধু, সমবয়স্কদের কাছ থেকে মানসিক দিক থেকে সাহায্য পেতে চায়। এই স্তরটি যে কোন ব্যক্তির জীবনেই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ শারীরিক ও মানসিকভাবে যে ব্যাপক পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে এই স্তরটি তাদের অতিবাহিত করতে হয়, যে পরিমান আবেগ ও চঞ্চলতার ছোঁয়া লাগে তার মনে তার সঙ্গে যুদ্ধ করে যুদ্ধ করে ব্যবহারিক ভারসাম্য বজায় রাখার কঠিন চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করতে হয় এই স্তরে।

এভাবে উঠতি যুবক যুবতীরা অন্তরন পর্য্যায়ে থাকে, বয়ঃপ্রাপ্তরা জন্মদাতার ভূমিকা নেয় এবং বয়স্করা ক্রমশঃ নিশ্চল হতে থাকে। এই স্তরগুলি সম্পর্কে একটি বিজ্ঞান ভিত্তিক ধারণা দেওয়াই হলো এরিকসনের অবদান। এগুলি সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা থাকলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির মানসিক ও সামাজিক দিকগুলি বিশ্লেষণ করতে সুবিধা হয়।

৭.৮ প্রশ্নাবলী

(১) ব্যক্তি কর্মে মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণের প্রয়োজনীয়তা কি?

(২) একক ব্যক্তির মনস্তত্ত্ব জানার উপায় সম্পর্কে লেখ।

(৩) মমস্তত্ত্ব বিশ্লেষণের প্রকার সম্পর্কে আলোকপাত কর।

(৪) মমস্তত্ত্ব বিশ্লেষণে এরিকসনের অবদান সম্পর্কে লেখ।

দ্বিতীয় খণ্ড

একক ৮ ❑ গোষ্ঠীর সংজ্ঞা, বৈশিষ্ট্য এবং ধরন, ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব গঠনে গোষ্ঠীর প্রভাব

গঠন ঃ

৮.১ গোষ্ঠীর সংজ্ঞা
৮.২ গোষ্ঠীর বৈশিষ্ট্য
৮.৩ গোষ্ঠীর ধরন
৮.৪ বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে পার্থক্য
৮.৫ ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব বিকাশে গোষ্ঠীর প্রভাব
৮.৬ ব্যক্তির আচরণের উপর গোষ্ঠীর প্রভাব
৮.৭ প্রশ্নাবলী

৮.১ গোষ্ঠীর সংজ্ঞা

'গোষ্ঠী' শব্দটিকে বিভিন্ন দিক থেকে দেখে নানা সময়ে বিভিন্ন সমাজ বিজ্ঞানী এর বিভিন্ন সংজ্ঞা দিয়েছেন। বিশিষ্ট সমাজবিদ্ ইউব্যাঙ্ক (Eubank) বলেছেন—মানসিক ঘাত-প্রতিঘাতের-সম্পর্কে আবদ্ধ দুই বা ততোধিক মানুষকে একত্রে আমরা গোষ্ঠী বলতে পারি যখন ঐ বিশেষ মানুষগুলির একে অপরের সাথে সম্পর্ককে সমাজের অন্য সবার সাথে সম্পর্কের থেকে পৃথকরূপে ধারণা করা যায়। যার ফলে ঐ বিশেষ মানুষগুলি একটি দলরূপে চিহ্নিত হয়। [A group is two or more persons in a relationship of psychic interaction, whose relationship with one another may be abstracted and distinguished from their relationships with all others so that they must be thought of as an entity.]

এর বহুবছর পরে সমাজবিদ্ বোগার্ডাস্ (Bogardus) সামাজিক গোষ্ঠীর একটি সংজ্ঞা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন,—সামাজিক গোষ্ঠী হল একটি কাঠামো যার মধ্যে ব্যক্তিত্বের বিকাশ হয়, পরিণতি লাভ করে, এমনকি ব্যক্তিত্বের ভাঙনও ধরে; একত্রে কিছু সংখ্যক মানুষ যাদের আনুগত্য, কাজকর্মে অংশগ্রহণ একটি মাত্র দিক নির্দেশ করে এবং একে অপরকে উদ্বুদ্ধ করে ...... অন্তরীণ-উদ্দীপনা সমৃদ্ধ মানুষদের নিয়েই তৈরী হয় সামাজিক গোষ্ঠী। [A social group which is the frame work within which personalties develop and mature, or also become disorganized, may be thought of as a number of persons who have some common

loyalty, and who participate in common activities, and who are stimulating to each other ...... a social group consists of human beings in inter-stimulation.]

সমাজবিদ্ দৎস্ক (Deutsch) আবার মনস্তাত্ত্বিক দিক থেকে গোষ্ঠীর সংজ্ঞা নির্ধারণ করতে চেয়েছেন। তিনি বলেছেন, গোষ্ঠী নির্মাণকারী ব্যক্তি বা অংশগুলি পারস্পরিক নির্ভরশীল উদ্দেশ্য সাধনের জন্য কতখানি সক্রিয় তার উপরই নির্ভর করে একটি সমাজতাত্ত্বিক গোষ্ঠীর অস্তিত্ব। গোষ্ঠী নির্মাণকারী ব্যক্তিগণ পারস্পরিক নির্ভরশীল উদ্দেশ্য সাধনের জন্য নিজেদেরকে কতখানি সক্রিয় মনে করে তার উপরই নির্ভর করে একটি মনস্তাত্ত্বিক গোষ্ঠীর অস্তিত্ব। [A sociological group exists (has entity) to the extent that the individuals or subparts composing it are pursuing promotively interdependent goals. A psychological group exists (has entity) to the extent that the individuals composing it perceive themselves as pursing promotively interdependent goals.]

সমাজবিদ্ লিউইন (Lewin) আবার গোষ্ঠীর গতিশীল সম্পূর্ণতার উপর জোর দিয়ে বলেছেন,—গোষ্ঠী তার সদস্যদের যোগফল ছাড়া আরও কিছু এবং আরও পৃথক। গোষ্ঠীর নিজস্ব কাঠামো, নিজস্ব উদ্দেশ্য এবং অন্যান্য গোষ্ঠীর সাথে নিজস্ব সম্পর্ক থাকে। সদস্যদের মধ্যেকার সাদৃশ্য বা বৈসাদৃশ্য নয়, সদস্যদের অন্তরীন পারস্পরিক নির্ভরশীলতাই গোষ্ঠীর মজ্জারস।

উপরের সমস্ত সংজ্ঞা বিশ্লেষণের ভিত্তিতে আমরা বলতে পারি, গোষ্ঠী হল—

(ক) সদস্যদের মধ্যে নিয়মিত ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া,

(খ) গোষ্ঠী সম্পর্কে ব্যক্তির সচেতনতা,

(গ) সদস্যদের একই নিয়মনীতি মূল্যবোধ অনুসরণ,

(ঘ) অন্তরীণ পারস্পরিক নির্ভরশীলতা।

ইত্যাদির ভিত্তিতে কিছু সংখ্যক ব্যক্তির একত্রিত হওয়া এবং একই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য অস্তিত্ব বজায় রাখা।

৮.২ গোষ্ঠীর বৈশিষ্ট্য

বিভিন্ন গোষ্ঠীর গঠন-ইতিহাস, কাঠামো, কার্যপ্রণালী বিশ্লেষণ করলে গোষ্ঠীর কতকগুলি সাধারণ বৈশিষ্ট্যের সন্ধান পাওয়া যায়। যেমন—

(ক) একই বয়স, একই বুদ্ধিমত্তা, একই সামাজিক পশ্চাদপট বা একই ইতিহাস বহনকারী মানুষেরা এক জায়গায় হয়ে গোষ্ঠী গঠন করে থাকে। সমলিঙ্গের মানুষেরাই সাধারণতঃ গোষ্ঠীবদ্ধ হয়ে থাকে। একই স্বার্থ, একই মনোভাব ও অনুভূতি সাধারণত মানুষকে একত্রিত করে।

(খ) একই মানসিকতার সঙ্গে অবশ্যই থাকে গোষ্ঠীবদ্ধ আনুগত্য। আবেগের বন্ধন হল এই আনুগত্য যা মানুষকে একসূত্রে আবদ্ধ রাখে। দলীয় আনুগত্য গোষ্ঠীর মধ্যে দায়বদ্ধতার চেতনা জাগায়, গোষ্ঠীর জন্য স্বার্থত্যাগে প্রস্তুত করে।

(গ) গোষ্ঠীর অন্যান্য সদস্যদের কাছ থেকে পরিচিতি সুনিশ্চিত করার জন্য এবং তাদের সঙ্গে সহযোগিতা করার জন্য গোষ্ঠীর প্রতিটি সদস্যের মধ্যে আগ্রহ থাকে।

(ঘ) অন্যান্য গোষ্ঠীর সাথে নিজেদের ভিন্ন অনুভূতি গোষ্ঠীর মধ্যে একতা এবং আনুগত্যকে জোরদার করে। তাই অন্যগোষ্ঠীর প্রতি কিছুটা পৃথক মনোভাব থাকা জরুরী।

(ঙ) পরিশেষে, গোষ্ঠী নেতৃত্বের কথা। একজন নেতা তার ব্যক্তিগত ক্ষমতায় গোষ্ঠীর একতা বজায় রাখতে সমর্থ হতে পারে।

এছাড়া গতিশীল সম্পূর্ণতাকে সমস্ত গোষ্ঠীরই একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য বলে মনে করা হয়। তার কারণ, গোষ্ঠীর যে কোন অংশের অবস্থার পরিবর্তন গোষ্ঠীর অন্যান্য অংশের অবস্থার পরিবর্তনকে সূচীত করে। গোষ্ঠীর অন্তরীন পারস্পরিক নির্ভরশীলতার বৈশিষ্ট্যই এর মূল কারণ।

৮.৩ গোষ্ঠীর ধরন (Type of Groups) ঃ

বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পদ্ধতিতে গোষ্ঠীর শ্রেণিবিভাগ করা হয়ে থাকে। যথা—

(ক) মুখ্য গোষ্ঠী এবং গৌণ গোষ্ঠী,

(খ) বুদ্ধিমূলক গোষ্ঠী এবং কর্মমূলক গোষ্ঠী,

(গ) নিয়মমাফিক, আধানিয়মমাফিক এবং নিয়ম-বহির্ভূত গোষ্ঠী,

(ঘ) স্বেচ্ছা মূলক গোষ্ঠী এবং স্বেচ্ছা-বহির্ভূত গোষ্ঠী,

(ঙ) অন্তগোষ্ঠী এবং বহিগোষ্ঠী,

(চ) প্রাকৃতিক গোষ্ঠী এবং উদ্ভূত গোষ্ঠী।

৮.৪ বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে পার্থক্য

(ক) মুখ্য গোষ্ঠী এবং গৌণগোষ্ঠীর মধ্যে পার্থক্য (Difference between Principal and Secondary Group) ঃ

— মুখ্য গোষ্ঠীর সদস্যদের মধ্যে থাকে প্রত্যক্ষ সম্পর্ক। আকারে ছোট এবং ব্যক্তিগত বন্ধন ব্যক্তি স্বার্থকে সীমিত করে থাকে। অপরদিকে পরোক্ষভাবে সম্পর্কিত ব্যক্তিদের নিয়ে নিয়মমাফিকভাবে তৈরী হয় গৌণ গোষ্ঠী। গৌণ গোষ্ঠীর আকার হয় বড় এবং প্রত্যেক সদস্য ব্যক্তি স্বার্থ বজায় রাখতে সচেষ্ট থাকে।

— মুখ্য গোষ্ঠীর মধ্যে পছন্দ অপছন্দের প্রকাশ ঘটে স্বতঃস্ফূর্তভাবে। অপরপক্ষে গৌণ গোষ্ঠীর মধ্যে পছন্দ-অপছন্দের প্রকাশ আসে সচেতন বিচারবোধের মাধ্যমে।

— গৌণ গোষ্ঠীর সদস্যপদ পরিতৃপ্তি প্রদানকারী কারণ। বিশেষ স্বার্থ এবং চাহিদা পূরণের জন্যই

ব্যক্তি গৌণ গোষ্ঠীর সদস্য হয়ে থাকে। সেইদিক থেকে গৌণগোষ্ঠীকে অনেক সময় বিশেষ স্বার্থ গোষ্ঠীও বলা হয়ে থাকে। অপরদিকে অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থানের ব্যবস্থা করে প্রাথমিক স্বার্থ পূরণ করে সাফলেও মুখ্য গোষ্ঠীর মধ্যে পরিতৃপ্তি প্রদানের ক্ষমতার থেকেও মানুষে মানুষে সম্পর্ককেই বেশী গুরুত্ব দেওয়া হয়।

— বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তৈরী হওয়ায় গৌণ গোষ্ঠী যেকোন কার্য সম্পাদনের ক্ষেত্রে অতিমাত্রায় যান্ত্রিক। কেবলমাত্র তার জন্য নির্দিষ্ট কর্মই গৌণ গোষ্ঠী সম্পাদন করে থাকে। অপরদিকে, প্রাত্যহিক চাহিদা পূরণের উপর অথবা বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে সুন্দর সম্পর্ক বজায় রাখার উপর জোর দেওয়ার কারণে মুখ্য গোষ্ঠী ততটা যান্ত্রিক হয় না।

— সম্পর্ক নির্দেশক মুখ্য গোষ্ঠী, লক্ষ্য নিদের্শক গৌণগোষ্ঠীর ভিত্তি প্রস্তুত করে। কারণ, মুখ্যগোষ্ঠীর মধ্যে সম্পর্কের মাধ্যমে যেমন স্বভাব, মনোভাব, ভূমিকা সদস্যদের মধ্যে বিকাশ লাভ করে তেমনভাবেই পরবর্তীকালে গৌণ গোষ্ঠীতে সদস্যপদ পেয়ে ব্যক্তি উপযুক্ত আচরণ করে থাকে। আবার গৌণ গোষ্ঠীর মধ্যেকার সম্পর্ক ও ব্যক্তির মুখ্য গোষ্ঠীর আচরণের উপর প্রভাব ফেলে থাকে। অতএব বলা যায়, মুখ্য গোষ্ঠী এবং গৌণ গোষ্ঠী পরস্পর ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া শীল।

(খ) বৃদ্ধিমূলক গোষ্ঠী এবং কর্মমূলক গোষ্ঠীর মধ্যে পার্থক্য (Difference between development related and work related Group) :

বৃদ্ধিমূলক গোষ্ঠী সাধারণত আকারে ছোট হয় এবং বিকাশ ও উন্নয়নমূলক কাজ করার জন্যই কেবলমাত্র দায়িত্বশীল থাকে। কর্মমূলক গোষ্ঠীগুলি বিশেষ কোন একটি কর্ম সম্পাদনের জন্য তৈরী হয়ে থাকে। কর্মের প্রকৃতির উপর নির্ভর করে এই গোষ্ঠী বড়-ছোট সব আকারেরই হতে পারে।

(গ) নিয়মমাফিক, আধানিয়মমাফিক এবং নিয়ম-বহির্ভূত গোষ্ঠীর মধ্যে পার্থক্য (Difference among formal semiformal and non-formal Group) :

নিয়মমাফিক গোষ্ঠীর সদস্যপদ আংশিকভাবে ঐচ্ছিক হয়ে থাকে। আইনের শর্ত অনুযায়ী নিয়মমাফিক কর্তৃপক্ষের অধীনে থেকেই এইরকম গোষ্ঠীর প্রতিষ্ঠা হয়ে থাকে। এইরকম গোষ্ঠীর গঠন কাঠামো, পরিচালন পদসমূহ, সদস্যদের ভূমিকা মোটামুটি নির্দিষ্ট ও স্থিতিশীল হয়। অপরদিকে প্রথার বাইরে স্বতঃস্ফূর্তভাবে যেসব গোষ্ঠীর জন্ম হয় সেগুলিকে বলা যায় নিয়ম বহির্ভূত গোষ্ঠী। এইরকম গোষ্ঠীর গঠনকাঠামো এবং অস্তিত্ব স্থিতিশীল নাও হতে পারে। গোষ্ঠীর সদস্যদের মধ্যে প্রতিনিয়ত চলমান ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমেই জন্ম হয় এইরকম নিয়ম-বহির্ভূত গোষ্ঠী। এই দুইরকম চরম পদ্ধতিতে গঠনের মাঝামাঝি অবস্থায় পাওয়া যায় আধা-নিয়ম মাফিক গোষ্ঠী যেগুলির সদস্যপদ পুরোপুরি ঐচ্ছিক হয়ে থাকে। যেমন সামাজিক ক্লাব বা বিনোদন ক্লাবের সদস্য হওয়া।

(ঘ) স্বেচ্ছা-মূলক গোষ্ঠী এবং স্বেচ্ছা-বহির্ভূত গোষ্ঠীর মধ্যে পার্থক্য (Difference between Voluntary and non-Voluntary Group) :

স্বেচ্ছা-মূলক গোষ্ঠীর সদস্যপদ পুরোপুরি ব্যক্তির ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। ব্যক্তি তার ইচ্ছামত গোষ্ঠীতে যোগ দিতে বা যোগদানে বিরত থাকতে পারে। স্বেচ্ছাবহির্ভূত গোষ্ঠী ব্যক্তিকে এরকম কোন সুযোগ দেয় না। সেখানকার সদস্যপদ ব্যক্তির পক্ষে বাধ্যতামূলক। যেমন—পরিবার, জাতি, ধর্ম ইত্যাদি। একজন নবজাতক

সংশ্লিষ্ট পরিবারের অবশ্য সদস্য, এর অন্যথা হতে পারে না। কিন্তু স্বেচ্ছাবহির্ভূত গোষ্ঠী যেমন লাফিং ক্লাব, ট্রেড ইউনিয়ন সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের সদস্য হওয়া না হওয়া সম্পূর্ণত ব্যক্তির ইচ্ছাধীন।

(ঙ) অর্ন্তগোষ্ঠী এবং বর্হিগোষ্ঠীর মধ্যে পার্থক্য (Difference between internal and external Group) :

যে গোষ্ঠীর প্রতি ব্যক্তির আনুগত্য, ভক্তি, বন্ধুত্ব ও সহযোগিতার মনোভাব থাকে সেই গোষ্ঠী ঐ ব্যক্তির নিকট অর্ন্তগোষ্ঠী। এইরকম গোষ্ঠীর নাম, লক্ষ্য, কর্মপদ্ধতির সাথে ব্যক্তি একাত্ম অনুভব করে। সেজন্য এসব গোষ্ঠীর সদস্যদের মধ্যে we feeling বা আমরা বোধ কাজ করে। অপরদিকে, অন্তগোষ্ঠীর সদস্য নয় এমন ব্যক্তিদের দ্বারা গঠিত সমস্ত গোষ্ঠীই অন্তগোষ্ঠীর সদস্যদের নিকট বহিগোষ্ঠী বলে পরিগণিত। বহিগোষ্ঠীর প্রতি ব্যক্তি হয় উদাসীন থাকবে, নয়তো নিবোধী, প্রতিযোগিতামূলক, মনোভাব দেখাবে। বহিগোষ্ঠীর সদস্যদের সাধারণত 'তারা' বলে উল্লেখ করে হয়ে থাকে।

(চ) প্রাকৃতিক গোষ্ঠী এবং উদ্ভূত গোষ্ঠীর মধ্যে পার্থক্য (Difference between natural and created Group) :

ব্যক্তির পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে স্বতঃস্ফূর্তভাবে গঠন হওয়া গোষ্ঠীকে বলা যায় প্রাকৃতিক গোষ্ঠী। এইরকম গোষ্ঠীর সদস্যপদ ব্যক্তির ইচ্ছার উপর নির্ভর করে না। অপরদিকে, কিছু প্রয়োজন মেটানোর উদ্দেশ্যে সচেতনভাবে কিছু সংখ্যক ব্যক্তি একত্রিত হলে যে গোষ্ঠীর জন্ম হয় তাকে বলা যায় উদ্ভূত গোষ্ঠী। ব্যক্তি সচেতনভাবে স্বইচ্ছায় এইরকম গোষ্ঠীর সদস্যপদ গ্রহণ করে থাকে।

৮.৫ ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব বিকাশে গোষ্ঠীর প্রভাব

(ক) ব্যক্তিত্বের গঠন (Personality formation) :

প্রতিটি মানুষের মধ্যে তিনটি মৌলিক শক্তি থাকে—আত্ম বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণ, জাতির বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণ এবং সামাজিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ করার ক্ষমতা। আত্মবৈশিষ্ট্য সংরক্ষণ হল গ্রহীতার কাজ এবং জাতির বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণ হল দাতার কাজ। সামাজিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ নির্ভর করে ব্যক্তির এই দুই ভূমিকা দাতা ও গ্রহীতার সঠিক সমন্বয় সাধনের ক্ষমতার উপর। জন্মের পরে মানবশিশু প্রথম শক্তির দ্বারা পরিচালিত হতে থাকে। তখন তার ভূমিকা শুধুই গ্রহীতার। খাদ্য, উষ্ণতা, স্বাচ্ছন্দ্য ইত্যাদি গ্রহণ করে সে বেড়ে উঠতে থাকে। এইসময় সে থাকে আত্মকেন্দ্রিক। কিন্তু চারপাশের মানুষের ভালোবাসা স্নেহের ছোঁয়ায় সে ক্রমশঃ গোষ্ঠী সম্পর্কের মধ্যে প্রবেশ করে। ফলে তার ব্যক্তিত্ব স্বতঃস্ফূর্তভাবে বিকাশ লাভ করে। কারণ, এই বিকাশের চালিকা শক্তির অস্তিত্ব জীবের মধ্যে অন্তর্নিহিত। মানবশিশুর মধ্যেকার চাহিদা-শক্তি বা 'ইদ্' ক্রমশঃ সমাজের নীতি, নিয়ম-কানুনের দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হলে তার মধ্যে নির্দেশ চেতনা জাগে, যাকে 'ইগো' বলা হয়। পাশাপাশি তার মধ্যে তৈরী হয় বিবেক, একে মনোবিজ্ঞানের ভাষায় বলা হয় 'সুপার ইগো'। এরপর ক্রমশঃ 'ইদ্', 'ইগো' এবং 'সুপার ইগো'— এই তিন শক্তির ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে ব্যক্তি শুধু সেই আচরণগুলিই আত্মস্থ করতে থাকে সেগুলি তাকে চাহিদা মিটিয়ে সবচেয়ে বেশী পরিতৃপ্তি এনে দেয় এবং তার সাথে সামাজিক বাধার যন্ত্রণা এড়াতে সাহায্য করে। নিজের সুরক্ষা সুনিশ্চিত করার জন্য ও নানারকম আচরণ সে অবশ্যই শিখতে থাকে। ব্যক্তির নিজস্ব

চাহিদা এবং সমাজের চাহিদা এই দুই বিপরীত শক্তির ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমেই কোন ব্যক্তির বিশেষ ধরনের ব্যক্তিত্ব বিকাশ লাভ করে।

(খ) ব্যক্তিত্ব বিকাশে গোষ্ঠী অভিজ্ঞতার ভূমিকা (Role of Group expsience in personality development) :

ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব বিকাশে গোষ্ঠী অভিজ্ঞতার ভূমিকাকে আমরা নিম্নলিখিতভাবে বর্ণনা করতে পারি ঃ—

— প্রতিটি ব্যক্তির জীবনে বন্ধুত্ব এবং সহযোগীর প্রয়োজন। সে চায় অপরের ভালবাসার, আকাঙ্ক্ষার পাত্র হতে। সে চায় অপরের কাজে লাগতে, তাদের দ্বারা আহুত হতে। এদিক থেকে বিচার করলে, ব্যক্তির অন্তরঙ্গ বন্ধুত্ব বিকাশে গোষ্ঠীর ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ।

— লাভজনক যৌথ সংস্থায় যোগদানের সুযোগ ও ব্যক্তির একটি চাহিদা, যেখানে ব্যক্তি বিশেষ দায়িত্ব নিতে পারে এবং ভাবতে পারে যে, তার ব্যক্তিগত লক্ষ্য ছাড়াও আরও কিছু লক্ষ্য পূরণের কাজে সে অংশ নিতে পারে। ব্যক্তির এইরকম ইচ্ছা বা চাহিদা মেটানোর একমাত্র মাধ্যম হল গোষ্ঠী।

— ব্যক্তির নিজেকে প্রকাশ করার পথ এবং পরিস্থিতির প্রয়োজন। এভাবেই ব্যক্তি সামাজিকভাবেই সৃজনশীল হয়ে উঠতে পারে। বেঁচে থাকার উপযোগী সর্বজন গ্রাহ্য উপায়গুলিতে দক্ষতা অর্জন করার জন্য মানুষের বিশেষ বিশেষ আচরণের অভ্যাস, তার ফলাফল নিরীক্ষণ এবং প্রাসঙ্গিক পরিবর্তনের প্রয়োজন। এইসব ক্রিয়াকলাপের বা পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য যেমন গবেষণাকারের প্রয়োজন হয়, গোষ্ঠীকেও সেইরকমভাবে ব্যবহার করা যায়।

— সচেতন ও পরিকল্পিত গোষ্ঠী অভিজ্ঞতার মাধ্যমে ব্যক্তির আগ্রহ, দক্ষতা, ক্ষমতার মাত্রাকে প্রসারিত করা সম্ভব। গোষ্ঠীর মধ্যে থেকে ব্যক্তি অহরহ নিজের দক্ষতা, ক্ষমতা ইত্যাদি নিয়ে গোষ্ঠীর অন্যান্য সদস্যদের সঙ্গে তুলনা করে চলে এবং অন্যান্য সদস্যদের কাছ থেকে শিখতে থাকে। গোষ্ঠী ব্যক্তিকে নতুন অভিজ্ঞতা দেয়, নতুন আচরণ অভ্যাস করায়। এইসব নতুন অভিজ্ঞতা এবং আচরণের মাধ্যমেই ব্যক্তির সামাজিকীকরণ হতে থাকে।

— ব্যক্তিকে বিভিন্নগোষ্ঠীর সদস্য হিসাবে বিভিন্ন ভূমিকা পালন করতে হয়। বিভিন্ন ভূমিকা পালনের সুযোগ ব্যক্তিকে বিভিন্নভাবে দক্ষ করে তোলে। সমাজের অন্যান্য মানুষের সঙ্গে ব্যক্তির যোগাযোগ হয় গোষ্ঠীর মাধ্যমে। ব্যক্তি দেখে প্রতিটি মানুষ আলাদা এবং মৌলিক। প্রত্যেকেই নিজের মতো করে সামাজিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করতে চায়। এইরকম প্রেক্ষাপটে ব্যক্তি যদি সক্রিয়ভাবে সামাজিক কর্মকাণ্ডে সামিল হতে চায় তবে সমাজের অন্যান্য মানুষের কাজকর্মের সাথে তার নিজের কাজকর্মের শুধু সমন্বয় প্রয়োজন। এই সমন্বয় একমাত্র গোষ্ঠীর মাধ্যমেই সম্ভব।

৮.৬ ব্যক্তির আচরণের উপর গোষ্ঠীর প্রভাব

ব্যক্তির আচরণের উপর গোষ্ঠীর প্রভাবকে আমরা নিম্নলিখিতভাবে বর্ণনা করতে পারি ঃ—

(ক) ব্যক্তির শিক্ষণ পদ্ধতি, শিক্ষণের গতি, অধীত বিদ্যার স্থিতিশীলতা এবং অধীত বিদ্যা প্রয়োগ করে বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের পদ্ধতি—সবগুলিই ব্যক্তি যে গোষ্ঠীর সদস্য বা যে গোষ্ঠীতে অংশগ্রহণ করে তার দ্বারা প্রভাবিত হয়।

(খ) গোষ্ঠী ব্যক্তির মানসিকতা গঠনে প্রভাব ফেলে। কোন পরিস্থিতির মোকাবিলায় ব্যক্তি কেমন আচরণ করবে তার নির্ধারণে কাজ করে। পারিপার্শ্বিক অবস্থা যখন কোন বিশেষ প্রতিক্রিয়ায় ফলদায়ক হয় তখন সেই আচরণ গোষ্ঠীর অন্যান্য সদস্যদের কাছেও অনুকরণযোগ্য এবং সর্বজনগ্রাহ্য হয়ে ওঠে। ফলে গোষ্ঠীর অন্যান্য সদস্যরাও ঐ একই পরিস্থিতিতে একইরকম আচরণ এবং প্রতিক্রিয়া দেখায়।

(গ) গোষ্ঠী অভিজ্ঞতা মানুষের ধ্যান-ধারণা পরিবর্তনে কাজ করে। গোষ্ঠীর মানের উপর নির্ভর করেই ব্যক্তি তার লক্ষ্য স্থির করে। সেই লক্ষ্যে পৌঁছান আবার নির্ভর করে সম্পূর্ণ গোষ্ঠীর সহযোগিতার উপর। গোষ্ঠীর প্রত্যেক সদস্যই একে অপরের লক্ষ্য পূরণের পথে প্রভাব ফেলে থাকে।

(ঘ) ব্যক্তির জৈবিক ক্রিয়াকলাপ, আচার-আচরণ, অভ্যাস সবই পরিমার্জিত হয় গোষ্ঠী অভিজ্ঞতার দ্বারা। গোষ্ঠীর পূর্বতন সদস্যরা তাদের পূর্ব অভিজ্ঞতার বলে নিয়ন্ত্রকের ভূমিকা পালন করে থাকে। নতুন সদস্যদের আচরণ তাদের দ্বারা প্রবলভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়। ক্রমে পরিমার্জন ও পরিণমন হয়ে ব্যক্তি এক সময় নিয়ন্ত্রকের পদে আসীন হয়। এইরকম গতিশীল প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই সামাজিকীকরণের কাজ চলতে থাকে গোষ্ঠীর মধ্যে।

(ঙ) ব্যক্তির আত্মদর্শন, আত্মবোধ ব্যক্তিকে বুঝতে সাহায্য করে তার কোথায় কি ভূমিকা। এই ভূমিকা যথাযথভাবে পালনের জন্যও প্রয়োজন পরিস্থিতির সঠিক পর্যালোচনা। আবার আত্মদর্শন, আত্মবোধ এবং পরিস্থিতি পর্যালোচনার ক্ষমতা সবই গোষ্ঠী অভিজ্ঞতার দ্বারা প্রভাবিত।

(চ) গোষ্ঠী ব্যক্তিকে মানসিক বল জোগায় এবং স্বপক্ষে বা বিপক্ষে সবরকমের মতামত প্রকাশে সাহায্য করে।

(ছ) ব্যক্তিকে প্রতি মুহূর্তে নির্বাচনের সম্মুখীন হতে হয়। একই লক্ষ্যে পৌঁছবার বিভিন্ন উপায় তার সামনে থাকে। নির্বাচন সঠিক না হলে লক্ষ্যে পৌঁছানো বিলম্বিত বা অনেক সময় অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। যেহেতু প্রতিটি ব্যক্তি একে অপরের থেকে আলাদা তাই সঠিক নির্বাচন ও প্রতিটি ব্যক্তির ক্ষেত্রে মৌলিক। এইরকম ক্ষেত্রে গোষ্ঠীর গুরুত্ব অপরিসীম। ব্যক্তি তথা সমাজের মূল্যবোধের সঙ্গে সাযুজ্য রেখে গোষ্ঠী ব্যক্তিকে সঠিক নির্বাচনে সাহায্য করে থাকে।

(জ) যে কোন কাজের ক্ষেত্রে ব্যক্তি কতটা উৎপাদিকা শক্তির অধিকারী হবে, তার উৎপাদনের গতি কতটা ত্বরাণ্বিত হবে বা উপাদনের গুণমান কেমন হবে সবই গোষ্ঠী দ্বারা নির্ধারিত হয়। বস্তুত, উৎপাদিকা শক্তি গোষ্ঠী-সূত্র দ্বারা নির্ধারণ করা হয়।

(ঝ) ব্যক্তির মধ্যে ভয়-ভীতি, অবসাদের জন্ম, তার স্থিতি, আবার এসবের মধ্য থেকে ব্যক্তির মুক্তিলাভ এবং মুক্তিলাভের গতিকে ত্বরাণ্বিত করা। এসবই গোষ্ঠীর দ্বারা প্রবলভাবে প্রভাবিত। কারণ ব্যক্তিকে নিরাপত্তার আশ্বাস দেওয়া গোষ্ঠীর অন্যতম প্রধান কাজ।

(ঞ) ব্যক্তির সীমাহীন ইচ্ছা এবং ক্ষমতার সীমা নির্ধারণ করে দেয় গোষ্ঠী। প্রতিটি ব্যক্তিই অধিকতর

ক্ষমতার অধিকারী ব্যক্তির উপর নির্ভর করতে চায় এবং একই সঙ্গে তার থেকে কম ক্ষমতার অধিকারী ব্যক্তির উপর কর্তৃত্ব করতে চায়। একই ব্যক্তির এই দুই বিপরীত (কর্তৃত্ব ও নির্ভরতার) চাহিদার মধ্যে সুষ্ঠু সমন্বয় সাধনের কাজ করতে পারে একমাত্র গোষ্ঠী।

জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে মানুষের মধ্যে এইরকম প্রভাব বিস্তার করতে করতে গোষ্ঠী তার অন্তর্ভূক্ত ব্যক্তির মধ্যে 'ইদ্', 'ইগো' এবং 'সুপার-ইগোর' সমন্বয় ঘটায় যা ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব বিকাশের সোপান।

৮.৭ প্রশ্নাবলী

(১) গোষ্ঠী বলতে কি বোঝ? গোষ্ঠীর বৈশিষ্টগুলি কি কি?

(২) মুখ্য গোষ্ঠী ও গৌন গোষ্ঠী এবং নিয়মমাফিক ও নিয়মবহির্ভূত গোষ্ঠীর মধ্যে পার্থক্য কি?

(৩) ব্যক্তিত্ব বিকাশে গোষ্ঠী অভিজ্ঞতার ভূমিকা বিশ্লেষণ কর।

(৪) ব্যক্তির আচরণের উপর গোষ্ঠীর প্রভাব বর্ণনা কর।

একক ৯ ❑ সামাজিক গোষ্ঠী ক্রিয়া

গঠন ঃ

৯.১ সংজ্ঞা

৯.২ সামাজিক গোষ্ঠী কর্মের নীতিসমূহ

৯.৩ গোষ্ঠীক্রিয়ার আদর্শ প্রতিরূপ

৯.৪ সামাজিক গোষ্ঠীক্রিয়া বা গোষ্ঠীকর্ম বিকাশের ইতিহাস

৯.৫ প্রশ্নাবলী

৯.১ সংজ্ঞা (Definition) ঃ

বিভিন্ন সমাজবিদ্ বিভিন্নভাবে সামাজিক গোষ্ঠী ক্রিয়ার বা গোষ্ঠী কর্মের সংজ্ঞা দিয়েছেন। যেমন—গিসেলা কানোপকা (Giesela Kanoplca) বলেছেন,—সামাজিক গোষ্ঠী কর্ম হল সামাজিক কর্মের একটি পদ্ধতি যা ব্যক্তিকে সামাজিক কাজকর্মে অংশগ্রহণ করার ক্ষমতা বাড়াতে সাহায্য করে এবং গোষ্ঠী অভিজ্ঞতার মাধ্যমে তাদের ব্যক্তিগত, গোষ্ঠীগত এবং সমাজগত সমস্যাগুলির মোকাবিলায় আরও দক্ষ করে তোলে। [Social Group Work is a method of Social Work which helps person to enhance their social functioning through purposeful group experiences and to cope more effectively with their personal, group or community problem.]

আবার এইচ্. পি. ট্রেকার (H.P. Trecker)-এর মতে,—সামাজিক গোষ্ঠী কর্ম হল একটি উপায় বা পদ্ধতি যার মাধ্যমে সামাজিক সংগঠনের প্রেক্ষাপটে গোষ্ঠীর মধ্যে থেকে ব্যক্তি একজন সমাজকর্মীর সাহায্যে নিজের সাথে অন্যদের সম্পর্ক স্থাপন করে এবং নিজের প্রয়োজন ও ক্ষমতা অনুযায়ী সুযোগের সদ্ব্যবহার করে বেড়ে ওঠে। ট্রেকার আরও বলেছেন যে, সামাজিক গোষ্ঠী ক্রিয়ায়, ব্যক্তি, সমাজকর্মীর সাহায্যে, তার নিজের বৃদ্ধি, পরিবর্তন এবং বিকাশের প্রাথমিক উপায় হিসাবে গোষ্ঠীকে ব্যবহার করে থাকে। সমাজকর্মী চায় নির্দেশিত গোষ্ঠী কর্ম প্রতিক্রিয়ার ফলাফল হিসাবে ব্যক্তির তথা গোষ্ঠীর তথা সমাজের উন্নতিতে সহায়তা করতে। [Social group work is a method through which individuals in groups in social agency settings are helped by a worker who guides their interaction in programme activities so that they may relate themselves to others and experience growth, opportunities in accordance with their needs and capacities. In social group work, the group itself is utilised by the individual with the help of the worker as primary means of personality growth, change, and development. The worker is interested in helping to bring about individual growth and social development for the group as a whole and for the

community as a result of guided group interaction.]

ব্যাপক অর্থে আমরা বলতে পারি যে, সামাজিক গোষ্ঠীটি একইসঙ্গে একটি পরিষেবা, অভিজ্ঞতা এবং পদ্ধতি। যে কোন সমাজ কর্মী সংস্থা তার মক্কেলকে ধারাবাহিক গোষ্ঠী কার্যাবলীর মাধ্যমে এই পরিষেবা দিয়ে থাকে। উপভোক্তাদের কাছে এই পরিষেবা এক অভিজ্ঞতা স্বরূপ, সামাজিক সম্পর্ক এবং সামাজিক কার্যক্রমের মধ্যে যে সব সমস্যাগুলি সমাধানের জন্য তারা সাহায্য পায় তারই এক সুন্দর এবং লাভজনক অভিজ্ঞতা। আবার সমাজকর্মীর কাছে, গোষ্ঠীর সদস্য হিসাবে, গোষ্ঠী জীবন যাপনের মাধ্যমে ব্যক্তিকে সাহায্য করার প্রথম পদ্ধতি। পদ্ধতিগতভাবে, সামাজিক গোষ্ঠী ক্রিয়া হল। গোষ্ঠীবদ্ধ মানুষের সাথে কাজ করার একটি সুসংবদ্ধভাবে বিন্যস্ত এবং পরিকল্পিত পথ।

৯.২ সামাজিক গোষ্ঠী কর্মের নীতিসমূহ (Basic Principle of social Group work) ঃ

সামাজিক গোষ্ঠী কর্ম কতগুলি নীতির দ্বারা পরিচালিত। ট্রেকারের (Tracker) মতে সেগুলি হল ঃ

(ক) **পরিকল্পিত গোষ্ঠী গঠনের নীতি (Principle of Planned group formation)** ঃ সামাজিক গোষ্ঠী ক্রিয়া বা গোষ্ঠী কর্মে গোষ্ঠী-ই হল মূল একক যার মাধ্যমে ব্যক্তিকে পরিষেবা দেওয়া হয়। এই গোষ্ঠী গঠনের দায়িত্ব থাকে সংস্থা এবং কর্মীর উপর। কোন গোষ্ঠী ব্যক্তির পক্ষে মঙ্গলজনক হবে কিনা বা তার চাহিদাগুলি সঠিক মাত্রায় পূরণ করতে পারবে কিনা তা নির্ণয় করে বর্তমান গোষ্ঠীটির পরিস্থিতি এবং কার্যকরী শক্তিগুলির উপর। এই কার্যকরী শক্তিগুলিও তখনই সক্রিয় হবে যখন ব্যক্তিকে ঐ গোষ্ঠী ভালোভাবে গ্রহণ করবে। গোষ্ঠী ক্রিয়ার মূলকথা হোল ব্যক্তির জীবনে গোষ্ঠীর প্রভাব অসীম। কিন্তু এই প্রভাব সবসময়ই মঙ্গলজনক বা ধনাত্মক হয় না। সেইসব ক্ষেত্রে গোষ্ঠীর প্রভাব ব্যক্তির জীবনে অবশ্য মঙ্গলজনক করে তোলার জন্যই সচেতন বিন্যাস এবং পরিকল্পনার প্রয়োজন। পরিকল্পিত এবং বিন্যস্ত গোষ্ঠীতে অবশ্যই তার সদস্যদের সামাজিক উন্নয়নের উপযোগী উপাদান থাকবে।

এই নীতি গ্রহণ করে যে কোন গোষ্ঠীকর্মী কোন গোষ্ঠী গঠনের কাজে অগ্রসর হবে বা কোন গঠিত গোষ্ঠীর বৈশিষ্ট্য নিরীক্ষণ করবে। গঠিত গোষ্ঠীকে সে যথেষ্ট সংঘবদ্ধ হয়ে উঠতে সাহায্য করবে অবশ্য যদি সে দেখে যে গঠিত গোষ্ঠীটির মধ্যে ব্যক্তির সামাজিক উন্নয়নের উপযোগী উপাদান যথেষ্ট পরিমাণে আছে।

বিভিন্নভাবে গোষ্ঠী গঠন হতে পারে। কোন সামাজিক সমস্যা বা চাহিদার উপস্থিতিতে সেগুলি সমাধানের জন্য প্রায় স্বতঃস্ফূর্তভাবেই গোষ্ঠী গঠন হয়ে যায়। চিকিৎসা কেন্দ্রগুলিতে সমাজ কর্মীরা তাদের কাজের মধ্যেই গোষ্ঠী তৈরী করে। নিঃসঙ্গ মানুষেরা বন্ধুত্বের আশায় গোষ্ঠীর সদস্য হয়। শিশুদের অভিভাবকেরা গোষ্ঠী তৈরী করতে পারে আবার শরীরচর্চার জন্যও অনেকে গোষ্ঠীর সদস্য হয়। যেমনভাবেই হোক। গোষ্ঠী তৈরী হওয়ার পেছনে মূল উপাদানগুলি হোল—বয়স, মূল্যবোধ। সাধারণ সমস্যা, উপভোগের ধরন, বুদ্ধিমত্তার স্তর, পরিকাঠামোগত সহনশীলতা, লিঙ্গ এবং 'ইগো'-শক্তি।

(খ) **বিশেষ উদ্দেশ্যের নীতি (Principle of Special objective) ঃ** সংস্থার কার্যক্ষমতা, গোষ্ঠীর ইচ্ছা-অনিচ্ছা, ব্যক্তি উন্নয়ন এই তিনের ভারসাম্য বজায় রেখে সমাজ কর্মী গোষ্ঠীর বিশেষ উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যমাত্রা স্থির করবে। গোষ্ঠীর প্রতিটি ব্যক্তি সদস্য কর্মী তথা সংস্থার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। প্রতিটি ব্যক্তি তার নিজের প্রয়োজন পূরণে গোষ্ঠীকে কাজে লাগাতে চায়। কাজেই কর্মীগণ প্রতিটি ব্যক্তি সদস্যের চাহিদা এবং প্রয়োজন সম্পর্কে অবশ্যই ওয়াকিবহাল থাকবে। প্রতিমুহূর্তে এই বিভিন্নমুখী চাহিদাগুলির সমন্বয় ঘটাতে থাকবে। গোষ্ঠীর বিশেষ উদ্দেশ্যই এক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রক শক্তি হিসাবে কাজ করবে।

গোষ্ঠীকর্মী যখন কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর জন্য কোন বিশেষ উদ্দেশ্য বা লক্ষ্যমাত্রা স্থির করবে তখন তার পেছনে অবশ্যই যুক্তি থাকবে। কর্মী কখনই নিজের চাহিদা মেটানোর জন্য গোষ্ঠীকে ব্যবহার করে তার উদ্দেশ্য স্থির করবে না। উদ্দেশ্য স্থির করার সময় কর্মী গোষ্ঠীর প্রতিটি সদস্যের শক্তি এবং সীমাবদ্ধতা বিবেচনা করে দেখবে। কর্মী আসলে গোষ্ঠীক্রিয়ার মাধ্যমে অবিন্যস্ত মানব শক্তিকে সুগঠিত এবং শক্তিশালী ব্যক্তিসম্পদে পরিণত করতে থাকে। এই কাজ করার জন্য কর্মীর সংস্থার উদ্দেশ্য, বিশ্বাস ও কর্মপদ্ধতি অনুধাবন করার দক্ষতা প্রয়োজন। তবেই সে সংস্থার উপযুক্ত প্রতিনিধি হিসাবে গোষ্ঠীর উদ্দেশ্য, বিশ্বাস ও কর্মপদ্ধতি নির্ণয় করতে পারবে এবং উদ্দেশ্য পূরণের পথে গোষ্ঠীকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবে।

(গ) **কর্মী এবং গোষ্ঠীর মধ্যে যুক্তিপূর্ণ সম্পর্কের নীতি (Principle of retinal relationship between group and worker) ঃ** সামাজিক গোষ্ঠী ক্রিয়ার সাফল্যের জন্য গোষ্ঠীর প্রতিটি সদস্যের সাথে কর্মীর যুক্তিপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করতে হবে। এই সম্পর্ক তৈরীর কাজ তখনই সহজ হবে যখন গোষ্ঠী কোন সমাজ কর্মীকে স্বইচ্ছায় গ্রহণ করবে। আবার কোন গোষ্ঠী তখনই কোন সমাজকর্মীকে গ্রহণ করবে যখন তার প্রতি গোষ্ঠীর প্রতিটি সদস্যের আস্থা থাকবে এবং কর্মী সে সংস্থার প্রতিনিধি সেই সংস্থার প্রতি ও গোষ্ঠী সদস্যদের আস্থা থাকবে।

যে কোন গোষ্ঠীকে সাহায্য করতে গেলেই সেই গোষ্ঠীর সাথে আগে একটি কার্যকরী সম্পর্ক তৈরী করা অবশ্য প্রয়োজন। এই সম্পর্কই গোষ্ঠীকে সাহায্য করার পথে সমাজকর্মীর প্রধান হাতিয়ার। এই হাতিয়ারের শক্তি এবং ধারের উপরই নির্ভর করছে কর্মী কোন গোষ্ঠীর অন্তর্নিহিত শক্তিকে কতখানি উন্নয়নশীল কাজে লাগাতে পারবে।

(ঘ) **ক্রমাগত স্বাতন্ত্র্যবাদের নীতি (Principle of continuous difference) ঃ** সামাজিক গোষ্ঠী কর্মের বা গোষ্ঠী ক্রিয়ার ক্ষেত্রে এটা প্রমাণিত সে প্রতিটি গোষ্ঠী স্বতন্ত্র এবং প্রতিটি ব্যক্তি গোষ্ঠী-অভিজ্ঞতাকে তার নিজের বিশেষ উদ্দেশ্য পূরণের জন্য স্বতন্ত্রভাবে ব্যবহার করে থাকে। আবার সময়ের সঙ্গে সঙ্গে প্রতিটি গোষ্ঠীর পরিবর্তন হতে থাকে। সেই কারণেই সমাজকর্মীকে ক্রমাগত স্বাতন্ত্রবাদের নীতি অনুসরণ করে বলতে হয়। গোষ্ঠীর সঙ্গে কাজ করার সময় কর্মীকে সর্বদা সচেতন থাকতে হয় যে—গোষ্ঠীর মধ্যে সদস্যদের কোন্ কোন্ বিষয়ে মিল আছে এবং কোন কোন্ বিষয়ে অমিল আছে। আবার গোষ্ঠীর বাইরে অন্যান্য গোষ্ঠীর সাথে এই বিশেষ গোষ্ঠীটির কোন্ কোন্ বিষয়ে মিল আছে বা কোন্ কোন্ বিষয়ে অমিল আছে। কর্মীকে বুঝতে হবে গোষ্ঠীর এই স্বতন্ত্রতা স্বাভাবিক। কর্মী কখনও গোষ্ঠীর কাছ থেকে তার নিজের ইচ্ছামত সময়সীমার মধ্যে ফলাফল আশা করবে না। কারণ, প্রতিটি গোষ্ঠীর ক্ষমতাও স্বতন্ত্র, তাই অন্যান্য সব ক্ষেত্রে মিল থাকলেও কোন পদ্ধতি

ঠিক কত সময় পড়ে ঈপ্সিত ফলাফল দেবে সেই সময়সীমা বিভিন্ন হয়ে যায়। গোষ্ঠীর সাথে কাজ করার সময় কর্মীকে যথেষ্ট ও যুক্তিপূর্ণ নমনীয় থাকতে হয়।

নিজের উন্নতি অনুধাবনের জন্য কর্মী কোন গোষ্ঠীকে ক্রমাগত সাহায্য করে যাবে। গোষ্ঠী সদস্যদের আরও উন্নয়নমূলক দায়িত্ব নিতে প্রস্তুত করে তুলবে। পরিবর্তনকে স্বাভাবিক এবং নিশ্চিত ধরে নিয়েই কর্মী সেই পরিবর্তনকে উন্নয়নমুখী করে তুলবে ক্রমাগত সতর্কতায়।

(ঙ) **নির্দেশিত গোষ্ঠী আন্তঃক্রিয়ার নীতি (Principle of directed group interaction) ঃ** আন্তঃ ক্রিয়া বা সদস্যদের মধ্যে পারস্পরিক সক্রিয়তাই ব্যক্তির পরিবর্তন সূচীত করে, সামাজিক গোষ্ঠী ক্রিয়ার ক্ষেত্রে গোষ্ঠীর প্রধান চালিকা শক্তি হিসাবে কাজ করে। গোষ্ঠী কর্মী নিজের অংশগ্রহণের গুণে এই আন্তঃক্রিয়াকে প্রভাবিত করে থাকে। প্রকল্পরূপায়নের জন্য গোষ্ঠীকর্মী গোষ্ঠী সদস্যদের মধ্যে এই আন্তঃক্রিয়ার শক্তিকে সঠিকপথে চালিত করবে।

আন্তঃক্রিয়া বলতে গোষ্ঠীক্রিয়ার ক্ষেত্রে আমরা বুঝে থাকি গোষ্ঠী সদস্যদের মধ্যে পরস্পর অভিমুখী সক্রিয় আচরণ, যা ব্যক্তির দেওয়া-নেওয়ার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার উপর নির্ভরশীল। এই দেওয়া-নেওয়ার স্রোত একমাত্র গোষ্ঠীর মধ্যেই চলতে পারে। কর্মী এই স্রোতকে উভয়মুখী করে তোলার জন্যই দায়িত্বশীল। লক্ষ্য পূরণের জন্য সে প্রতিটি সদস্যের কর্মকে সঠিক দিকে নির্দেশ করবে। আন্তঃক্রিয়া গোষ্ঠীকর্মীর সাফল্যের ফল নয়, তার সাফল্যের চাবিকাঠি। অন্তঃক্রিয়া গোষ্ঠীর লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য নয়, লক্ষ্যে পৌঁছানোর প্রধান উপায়।

গোষ্ঠীসদস্যরা যখন কোন ভাব বা তথ্যের উপস্থাপনা করে, যখন কোন কিছু জানতে চায়, যখন কোন কার্যপদ্ধতি বর্ণনা করে, যখন তারা স্ব-ইচ্ছায় দায়িত্ব তুলে নেয়, তখনই বলা হয় গোষ্ঠীর মধ্যে আন্তঃক্রিয়া চলছে। গোষ্ঠীকর্মী ক্রিয়া এবং প্রতিক্রিয়া প্রতিটির দিকেই সমান সতর্ক থাকবে। প্রতিক্রিয়া ধনাত্মক, ঋণাত্মক এবং মধ্যবর্তী বা উদাসীন সবই হতে পারে। সবরকম প্রতিক্রিয়াকেই একজন দক্ষ গোষ্ঠীকর্মী উন্নয়ন অভিমুখে নির্দেশ করতে পারে। আন্তক্রিয়ার সূচনা, পরিমাণ, গুণমান এবং অভিমুখ নির্ভর করে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উপর ঃ—

— অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে বন্টনব্যবস্থা ঃ- একটি গোষ্ঠীর মধ্যে সকল সদস্য সমানভাবে অংশগ্রহণ করে না। আবার সকল সদস্য একই সময়েও অংশগ্রহণ করে না। কাজেই কোন্ কোন্ সদস্য কোন্ কোন্ বিশেষ সময়ে বেশী সক্রিয় হবে এবং অংশগ্রহণে আগ্রহী হবে সে বিষয়ে সমাজ কর্মীকে সতর্ক থাকতে হয়।

— অংশগ্রহণের সংখ্যা ঃ- অংশগ্রহণকারী সদস্যরা ঠিক কতবার এবং কোন্ কোন্ বিশেষ বিষয়ে অংশগ্রহণে তৎপর সেটা জানা অত্যন্ত প্রয়োজন। কারণ, কিছু সদস্যকে প্রতিব্যাপারেই পাওয়া যায় আবার কিছু সদস্যকে কোন্ ব্যাপারেই সহজে পাওয়া যায় না। কোন্ গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজনে কোন্ বিশেষ সদস্যকে পাওয়া যেতে পারে সে ব্যাপারে সমাজকর্মীকে ওয়াকিবহাল থাকতে হয়।

— সময় দানের সীমা ঃ- অংশগ্রহণের পারদর্শীতা এবং ইচ্ছা থাকার পরেও অনেক সদস্য অংশগ্রহণে অপারগ হতে পারে। সদস্যের ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনের অন্যান্য বন্ধনগুলি এক্ষেত্রে ভেবে দেখার জরুরী। দেখা যায়। কোন কোন্ সদস্য গোষ্ঠীর কাজে অনেকটা সময় দিতে পারছেন কারণ তার আর কোন জোরালো

বন্ধন নেই। আবার কেউ কেউ তেমন সময় দিতে পারেন না নানা বন্ধনের কারণে। সেক্ষেত্রে ঐসব পারদর্শী অথচ ব্যস্ত ব্যক্তি বা সদস্যকে বাদ দিয়েই কোন বিশেষ পরিকল্পনা করার প্রয়োজন হয়ে পড়ে।

— অংশগ্রহণের দিক নির্দেশ ঃ- এক্ষেত্রে সাধারণতঃ দুটি দিকের উপস্থিতি নজরে পড়ে। একটি দিক ব্যক্তি অভিমুখী অপরটি কর্ম অভিমুখী। অনেকসময়ে দেখা যায় কোন বিশেষ সদস্য গোষ্ঠীর অন্য সদস্যের সঙ্গে যথাযথ সহযোগিতা করছে কিন্তু সমাজকর্মীর সঙ্গে করছে না। অনেক সময়ে গোষ্ঠীর আন্তঃক্রিয়া বিশেষ কর্মঅভিমুখী হয়। এমনও হতে পারে যে ঐ বিশেষ কর্মটি গোষ্ঠী দায়িত্ব কর্তব্যের সঙ্গে কোনভাবেই সম্পর্কিত নয়। তাই প্রতিটি সদস্যের প্রতিটি অংশগ্রহণের সঠিক দিক নির্দেশ করা অত্যন্ত প্রয়োজন।

— আন্তঃক্রিয়ার বিষয়সূচী ঃ- প্রকল্প এবং প্রকল্প-জড়িত ব্যক্তিবর্গ এই দুয়েরই বিষয়সূচী নির্ধারণ করা অত্যন্ত প্রয়োজন। গোষ্ঠী সদস্যরা যেমন আসন্ন প্রকল্পের বিষয়ে আলোচনা করবে তেমনি ঐ প্রকল্পের বিভিন্ন অংশের কাজের দায়িত্ব দেবার জন্য বিশেষ দক্ষ ব্যক্তির নির্বাচন ও করে রাখবে।

সাধারণভাবে গোষ্ঠীর অন্তঃক্রিয়ার দক্ষতা নির্ধারণকারী পাঁচটি প্রধান উপাদন হল—

(i) গোষ্ঠী সদস্যদের মধ্যে আন্তঃসম্পর্ক।

(ii) গোষ্ঠী সদস্যদের সাথে গোষ্ঠী কর্মীর সম্পর্ক।

(iii) প্রয়োজন এবং স্বার্থের সচেতন বন্ধন, যা গোষ্ঠীকে আবদ্ধ রাখে।

(iv) যে বিশেষ লক্ষ্য পূরণের জন্য গোষ্ঠী কর্মরত, এবং

(v) যে সামাজিক পরিস্থিতির মধ্যে গোষ্ঠীকে কাজ করতে হয়।

(চ) গণতান্ত্রিক গোষ্ঠী আত্ম-নির্দেশনার নীতি (Principle of democratic selfdirection of group) ঃ সামাজিক গোষ্ঠীকর্মে গোষ্ঠীকে তার লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নেবার জন্য এবং সেই অনুযায়ী কাজকর্মের নীতি নির্দেশনায় সাহায্য করা হয়ে থাকে। গোষ্ঠী তার ক্ষমতা এবং দক্ষতা অনুযায়ী এ ব্যাপারে বেশীর ভাগ দায়িত্ব নিজেরাই বহন করবে। গোষ্ঠীগুলি নিজস্ব নিয়ন্ত্রণাধীন থাকবে।

গোষ্ঠীকর্মের এই আত্ম-নির্দেশনার নীতি অনুযায়ী প্রতিটি গোষ্ঠীর নির্বাচনের এবং কার্যকরী সিদ্ধান্ত নেওয়ার মতো যথেষ্ট ক্ষমতা আছে। এই নীতি আরও বলে যে, প্রতিটি মানুষ এবং গোষ্ঠীর সিদ্ধান্ত নেওয়ার এবং সঠিক নির্বাচনের এই ক্ষমতা বাড়ানো যায় একমাত্র সামাজিক পটভূমিকায় দায়িত্ব অর্পন এবং সে দায়িত্ব পালনের সুযোগ দিয়ে।

গোষ্ঠীকর্মীর কাজ হল তার ক্ষমতা অনুযায়ী গোষ্ঠীর সঙ্গে তার অভিজ্ঞতা, পারদর্শিতা ভাগ করে নেওয়া, হয়ত প্রথমদিকে কর্মীকে সাময়িকভাবে আদেশমূলক সিদ্ধান্তের পথে চলতে হবে, কিন্তু গোষ্ঠীকর্মীর কাজ হবে এই আদেশ মূলক পথ থেকে গোষ্ঠীকে ধীরে ধীরে আত্ম-নির্দেশনার পথে নিয়ে যাওয়া। তাই কর্মী গোষ্ঠীর আত্ম-নির্দেশনার ক্ষমতা বাড়াবে গোষ্ঠীর ওপর ক্রমশঃ আরও বেশী দায়িত্ব অর্পন করে।

(ছ) নমনীয় কার্য সংগঠনের নীতি (Principle of flexible) ঃ সামাজিক গোষ্ঠীক্রিয়ার বা গোষ্ঠীকর্মের ক্ষেত্রে সংগঠনের গঠনতন্ত্রের গুরুত্ব যতখানি, ঠিক ততখানিই গুরুত্বপূর্ণ হল যে পদ্ধতিতে গোষ্ঠীকর্মী গোষ্ঠীকে রীতিসিদ্ধভাবে সংগঠিত হতে পরিচালিত করে। রীতিটি সংগঠনটি হবে নমনীয় এবং অবশ্যই সময় মতো এবং

প্রয়োজন মতো সঠিকভাবে কাজ করার জন্য পরিবর্তিত হবে। গোষ্ঠীটি সর্বদা অভিযোজন ক্ষমতা সম্পন্ন থাকবে যাতে পরিবর্তিত পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে পারে।

সামাজিক গোষ্ঠী কর্মের ক্ষেত্রে রীতিসিদ্ধ সংগঠন অত্যন্ত জরুরী। কারণ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পূরণের জন্য সঠিক পথে অগ্রসর হওয়া প্রয়োজন। একমাত্র রীতিসিদ্ধ সংগঠনের মাধ্যমেই সেটা সম্ভব হয়। রীতিসিদ্ধ সংগঠনের প্রতিটি সদস্যের মধ্যে থাকে ক্ষমতা অনুযায়ী পদ এবং দায়িত্বের বন্টন। প্রতিটি সদস্য তার কর্তব্য পালনের এবং মতামত প্রকাশের সুযোগ পায়। এমনকি গোষ্ঠী তার নিজস্ব কর্মের পদ্ধতি এবং নীতি নির্ধারণ করে এবং নিজেদের নেতা নির্বাচন করে। এইসব ব্যবস্থার উপর গোষ্ঠীর স্থায়িত্ব ও সাফল্য অনেকাংশে নির্ভরশীল।

কিন্তু একটি গোষ্ঠীকে সংগঠিত করা এবং কোন গোষ্ঠীকে তার নিজের মতো করে সংগঠিত হতে সাহায্য করার মধ্যে অনেক পার্থক্য আছে। গোষ্ঠীকর্মী কখনই তার নিজের পছন্দ-অপছন্দ, ইচ্ছা-অনিচ্ছা গোষ্ঠীর উপর চাপিয়ে দেবে না। বরং গোষ্ঠীকে সাহায্য করবে গোষ্ঠীর নিজের পছন্দ এবং নির্বাচনের দ্বারা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে। সময় মতো এবং প্রয়োজন মতো গোষ্ঠী সদস্যরাই পরিবর্তনের কথা ভাববে এবং সেই অনুযায়ী কার্যনীতি নির্ধারণ করবে।

(জ) **প্রগতিশীল কর্মসূচীমূলক অভিজ্ঞতার নীতি ঃ** সামাজিক গোষ্ঠী ক্রিয়ার ক্ষেত্রে যেসব কর্মসূচীমূলক অভিজ্ঞতা অর্জনে গোষ্ঠীকে নিয়োজিত করা হবে সেসব কর্মসূচী অবশ্যই গোষ্ঠীর আগ্রহ, প্রয়োজন, বর্তমান অভিজ্ঞতার স্তর এবং গোষ্ঠীর দক্ষতার উপর নির্ভর করে তৈরী হবে এবং ঐ স্তর থেকে গোষ্ঠীর প্রগতিতে অবশ্যই সাহায্য করবে।

প্রগতিশীল কর্মসূচীমূলক অভিজ্ঞতার নীতি বলে যে গোষ্ঠী কর্মের প্রগতির একটি প্রারম্ভিক বিন্দু আছে এবং সেই প্রারম্ভিক বিন্দুর সঠিক সংজ্ঞা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ঘটনাচক্রে সে প্রগতি দেখা যায়, গোষ্ঠীর বাইরের কারও কাছে সেটা কৃত্রিম মনে হলেও গোষ্ঠীর কাছে সেটা যথেষ্ট বাস্তব এবং অর্থপূর্ণ। গোষ্ঠীকর্মী সম্ভাব্য কর্মসূচীর প্রস্তাব দিতে পারে কিন্তু পছন্দের তালিকা প্রসারিত করার সময় সে অত্যন্ত সতর্ক থাকবে যাতে সম্ভাব্য পছন্দগুলি গোষ্ঠীর বর্তমান স্তরের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হয়। প্রথমদিকে কম সময়সীমার ছোট ছোট কর্ম অভিজ্ঞতার মধ্যেই পরিতৃপ্তি খোঁজা প্রয়োজন। এই সব কর্মের মূল্যায়ণের পরই পরবর্তী এবং অপেক্ষাকৃত বড় কর্ম অভিজ্ঞতার জন্য পরিকল্পনা করা এবং তা রূপায়ণে গোষ্ঠীকে উদ্বুদ্ধ করা প্রয়োজন। তবে সমস্ত কর্মসূচীর স্তরই নির্ভর করবে গোষ্ঠীর গোষ্ঠীকর্মীর সাহায্য গ্রহণ করার আগ্রহ এবং ক্ষমতার উপর।

(ঝ) **সম্পদ সদ্ব্যবহারের নীতি (Principle of Resource utilisation) ঃ** আমাদের সমাজ এবং পরিবেশের মধ্যে প্রচুর সম্পদ রয়েছে সেগুলি সদ্ব্যবহারের মাধ্যমে গোষ্ঠী অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার বাড়ানোই সামাজিক গোষ্ঠী ক্রিয়ার উদ্দেশ্য।

গোষ্ঠীকে একটি বড় প্রতিষ্ঠানের অংশ বিশেষ হিসাবে গণ্য করা হয়। সমগ্র সমাজ এবং সংগঠনগুলি এই বড় প্রতিষ্ঠানের অন্তর্গত। সুতরাং গোষ্ঠী এই প্রতিষ্ঠানের দ্বারা প্রভাবিত। গোষ্ঠী এবং প্রতিষ্ঠানের মধ্যে পারস্পরিক আদান-প্রদানের সম্পর্ক বিদ্যমান। এই বৃহত্তর পরিবেশে যেসব সম্পদ পাওয়া যায় তার সদ্ব্যবহারে গোষ্ঠীকে সাহায্য করাই গোষ্ঠীকর্মীর কাজ।

গোষ্ঠীর বাইরে এবং অভ্যন্তরে উভয় জায়গাতেই গোষ্ঠীকর্মীর ভূমিকা আছে। গোষ্ঠীকর্মী নিজে বিভিন্ন সমাজ সম্পর্কে বিভিন্ন জ্ঞান অর্জন করবে এবং গোষ্ঠীর প্রয়োজনে তার সেই জ্ঞান দান করবে। সে গোষ্ঠী এবং সমাজের মাঝখানে যোগাযোগ রক্ষাকারী সেতু হিসাবে কাজ করবে।

(ঞ) **মূল্যায়নের নীতি (Principle of Evaluation)** ঃ সামাজিক গোষ্ঠীক্রিয়ায় সমস্ত কর্মসূচী এবং পদ্ধতির ফলাফলের ভিত্তিতে অবিরত মূল্যায়ন অত্যন্ত প্রয়োজন। প্রত্যেকের স্বার্থ সঠিকভাবে যতদূর সম্ভব পূরণ করার জন্য কর্মী, গোষ্ঠী এবং সংগঠন এই মূল্যায়নে সমানভাবে অংশগ্রহণ করবে।

৯.৩ গোষ্ঠীক্রিয়ার আদর্শ প্রতিরূপ (Models)

গোষ্ঠীটির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সমূহ গোষ্ঠী কর্মের আদর্শ প্রতিরূপ নির্দেশ করে। সমাজতাত্ত্বিক পাপেল (Papell) এবং রথম্যান (Rathman) এইরকম তিনটি প্রতিরূপের সন্ধান পেয়েছেন—

(ক) সামাজিক উদ্দেশ্যমূলক প্রতিরূপ, (খ) সংশোধনমূলক প্রতিরূপ এবং (গ) পারস্পরিক ক্রিয়ামূলক প্রতিরূপ।

(ক) **সামাজিক উদ্দেশ্যমূলক প্রতিরূপ** ঃ সামাজিক উদ্দেশ্যমূলক প্রতিরূপের ছাঁচে তৈরী গোষ্ঠী বিশেষ সামাজিক মঙ্গল সাধনের নির্ধারণকারী সামাজিক স্বার্থের উপর ভিত্তি করে তাদের কর্মসূচী নির্দেশ করে। তবে তার জন্য চাই গোষ্ঠীর প্রতিটি সদস্যের সমর্থন ও সহযোগিতা। এই সমর্থন ও সহযোগিতা তখনই সম্ভব যখন গোষ্ঠী স্বার্থ এবং সমাজ স্বার্থ একই হয়। সমাজের মধ্যে সে সব বিশেষ সমস্যাগুলি রয়েছে সেগুলির সমাধানের জন্যই এই প্রতিরূপ কার্যকরী। যেমন, গৃহসমস্যা, দারিদ্র্য সমস্যা ইত্যাদি। সমস্যা সমাধান করে সামাজিক বৃদ্ধি ও উন্নয়নের জন্যই এই ধরনের প্রতিরূপ বেছে নেওয়া হয়।

(খ) **সংশোধনমূলক প্রতিরূপ** ঃ সংশোধনমূলক প্রতিরূপকে বলা যায় চিকিৎসামূলক প্রতিরূপ। পরিবর্তনের মাধ্যম হিসাবে এখানে গোষ্ঠীকে ব্যবহার করা হয়। ব্যক্তির মধ্যে ঈপ্সিত পরিবর্তন আনার জন্য গোষ্ঠীকর্মী গোষ্ঠীসদস্যদের মধ্যে আন্তক্রিয়াকে প্রাধান্য দেয়। ব্যক্তিকে আত্মসচেতনতা লাভ করে তার সামাজিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার মাত্রাকে যথাযথ করার জন্য গোষ্ঠীধর্মী তার জ্ঞান এবং দক্ষতা প্রয়োগ করে ব্যক্তিকে সাহায্য করার চেষ্টা করে। গোষ্ঠী নতুন এবং আরও সঠিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ধরণকে উৎসাহিত করে সদস্যদের উন্নতির চেষ্টা করে। ব্যক্তির পারস্পরিক সম্পর্কের মধ্যে সম্পূর্ণতার অভাব ঘটলে অথবা গোষ্ঠীর মধ্যে স্বাভাবিক আন্তঃক্রিয়ার বিঘ্ন ঘটলেই বিশেষ ব্যবস্থার প্রয়োজন হয়ে পড়ে, সে ব্যবস্থা হাসপাতাল, সংশোধনাগার, পরিবার পরিষেবা সংস্থা, উপদেশমূলক পরিষেবা, বিদ্যালয়, স্বাস্থ্যপরিষেবা সংস্থার মতো প্রতিষ্ঠাগুলিতে ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

(গ) **পারস্পরিক ক্রিয়ামূলক প্রতিরূপ** ঃ পারস্পরিক ক্রিয়ামূলক প্রতিরূপ তৈরী হয় ব্যক্তি এবং সমাজ উভয়ের সেবা করার জন্য। বহু তন্ত্র এবং উপতন্ত্রের অংশবিশেষ হিসাবে ব্যক্তিকে বিচার করেই এই ধরনের প্রতিরূপে ব্যক্তিকে বোঝা এবং ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এই প্রতিরূপে ধরে নেওয়া হয়। যে, ব্যক্তি তার বিভিন্ন সম্পর্কের দ্বারা সৃষ্ট, প্রভাবিত এবং পরিমার্জিত হয়। প্রতিদানে বিভিন্ন সম্পর্ক তথা সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহ

ব্যক্তি এবং ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে পরস্পর নির্ভরশীলতার দ্বারা সৃষ্ট, প্রভাবিত ও পরিমার্জিত হয়।

৯.৪ সামাজিক গোষ্ঠীক্রিয়া বা গোষ্ঠীকর্ম বিকাশের ইতিহাস (History of development of Social Group Work)

সামাজিক গোষ্ঠীক্রিয়া প্রথমে শুধুমাত্র গোষ্ঠীক্রিয়া হিসাবেই শুরু হয়েছিল, সামাজিক ক্রিয়া নাম জীবিকার অংশবিশেষ হিসাবে নয়। সেইসময় সামাজিক ক্রিয়ার পদ্ধতি হিসাবে শুধুমাত্র ব্যক্তি ক্রিয়াকেই ধরা হত। সামাজিক গোষ্ঠীক্রিয়ার আদর্শগত উৎস্য ছিল YMCA, YCA, Scouting, ইউ. এস. এ.-র ইহুদী কেন্দ্র ইত্যাদির মতো আত্ম-সহায়ক এবং প্রাক্‌রীতিসিদ্ধ বিনোদনমূলক সংগঠনগুলি এবং এর সঙ্গে ছিল শিল্পবিপ্লবের সুফল সমাজের সর্বস্তরে ভাগাভাগি করে নেওয়ার মতো গণতান্ত্রিক আদর্শ। ইউরোপে যে প্রগতিশীল শিক্ষার-বিকাশ ঘটেছিল। সামাজিক গোষ্ঠীক্রিয়া তার দ্বারাও প্রভাবিত হয়েছিল এবং গোষ্ঠী শিক্ষার আধুনিক এবং মুক্ত প্রযুক্তিগুলির ব্যবহারের উপরই জোর দেওয়া হয়েছিল।

প্রথমদিকের গোষ্ঠী সেবা মূলক সংস্থাগুলির বেশীরভাগ কাজই ছিল স্বাভাবিক মানুষ যারা অবসর সময়ের জন্যই তাদের কাছে আসত তাদেরকে ঘিরে। কোন অস্বাভাবিক মানুষ যারা সমাজে বা কোন অবস্থার সঙ্গে খাপ খাওয়াতে ব্যর্থ তাদের নিয়ে নয়। স্বাভাবিক মানুষ এখানে আসত বিনোদন, শিক্ষা, উপভোগ এবং বিশেষ দক্ষতার উন্নতি সাধনের আগ্রহে। বিশেষ সমস্যায় পীড়িত কোন ব্যক্তির জন্য গোষ্ঠী ক্রিয়ার ব্যবস্থা ছিল না। গুরুতর সমস্যায় ভুগছে এরকম মানুষদের সাধারণত ব্যক্তিক্রিয়ার সংস্থা বা মানসিক চিকিৎসালয়ে পাঠানো হত।

ত্রিশের দশকের প্রথমদিকে গোষ্ঠী ক্রিয়ার বা গোষ্ঠীকর্মের অবতারণা করে ইউ. এস. এ-র Western Reserve University গোষ্ঠীর কর্মসূচী এবং কার্যাবলীর উপরই তখন বেশী আলোকপাত করা হত। এই সময়টা ছিল সামাজিক ক্রিয়ার বলিষ্ঠ পদ্ধতি হিসাবে গোষ্ঠী ক্রিয়ার বিকাশলাভ করার বহু আগে। ১৯৩৫ সালে সামাজিক ক্রিয়ার জাতীয় সম্মেলনের (National Center of Social Work) নব প্রতিষ্ঠিত অংশ সামাজিক গোষ্ঠীক্রিয়ার চেয়ারম্যান হিসাবে গ্রেস্ কোইলি (Crace Coyle) বোঝাতে শুরু করলেন যে গোষ্ঠীক্রিয়া সমাজক্রিয়ার একটি পদ্ধতি এবং বিনোদন, শিক্ষা এগুলি এক একটি পৃথক জীবিকার ক্ষেত্রে যেখানে গোষ্ঠীক্রিয়া পদ্ধতি হিসাবে ব্যবহৃত হতে পারে।

আত্ম উপলব্ধি, আত্ম-দর্শন এবং ব্যবহার পরিবর্তনের পথে বেশী তাড়াতাড়ি এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে বলে মনে করেই তখন থেকে গোষ্ঠীকর্মীদের নিজেদের কাজ করার থেকে গোষ্ঠীর সদস্যদের মাধ্যমে কাজ করার উপর গুরুত্ব বৃদ্ধি পেতে থাকে। চল্লিশের দশকে গ্রেস কোইলি (Grace Coyle), ক্লারা কাইজার (Clora Kaiser), উইলবার নিউসেটার (Wilber Newsetter), গ্রেট্রাজ উইলসন (Gertrude Wilson) এবং হেলেন ফিলিপস (Helen Phillips)-এর মতো ব্যক্তিদের তৎপরতায় সামাজিক ক্রিয়া (বা কর্ম) জীবিকার মধ্যে গোষ্ঠীক্রিয়া (বা কর্ম) পুরোপুরি স্থান লাভ করে। ইউ. এস. এ.-র অনেক বিদ্যালয়ে শেখানো শুরু হয়ে গেল গোষ্ঠী কর্ম সংক্রান্ত বিষয় অবিলম্বে গোষ্ঠী কর্মীদের আমেরিকান সংঘ দৈরী হয় এবং 'The Group' নামে একটি জীবিকামূলক পত্রিকার নিয়মিত প্রকাশ শুরু হয়। বিভিন্ন নতুন পাঠ্যপুস্তক প্রকাশ হতে থাকল এবং সেগুলি সেদিনের চিন্তা ভাবনাকে আরও রীতিসম্মত হতে সাহায্য করল।

পঞ্চাশের দশকের প্রথমদিকে গোষ্ঠীক্রিয়া পদ্ধতি হিসাবে বিশেষত্ব পায় এবং ইউ. এস. এ., গ্রেট ব্রিটেন, কানাডা এবং পৃথিবীর অন্যান্য সামাজিক ক্রিয়ার বিদ্যালয়গুলিতে চালু হয়। সামাজিক গোষ্ঠী ক্রিয়া তখন থেকে সামাজিক মনোবিজ্ঞান নির্ভরশীল হলেও গোষ্ঠীগত মানসিক চিকিৎসা পদ্ধতির থেকে স্বতন্ত্র হয়। সমস্যা আক্রান্ত মানুষকে সাহায্য করার জন্য যেসব ক্ষেত্রগুলিতে পূর্বে ব্যক্তি ক্রিয়া (case work) পদ্ধতিরই কেবলমাত্র প্রয়োগ করা হত সেসব ক্ষেত্রগুলিতেও বিশেষরূপে গোষ্ঠীক্রিয়ার প্রয়োগ শুরু হয়। সমাজকর্মীদের জাতীয় সংঘ (National Association of Social Workers) এবং সমাজ ক্রিয়া শিক্ষাপর্ষৎ (Councial of Social Work Education) যেমন গোষ্ঠী ক্রিয়ার নতুন নতুন নথি এবং তত্ত্বের প্রকাশ করার ফলে সংশোধিত এবং উন্নত প্রযুক্তি বিকাশ লাভ করতে থাকে। নতুন গোষ্ঠী কর্মের লেখকরা ছিলেন গিসেলা কনোপকা (Gisella Konopka), উইলিয়াম স্বার্ট্জ (Willam Schwartz) এবং ডরোথি স্পেলম্যান (Dorothea Spellman)। ব্যক্তি কর্ম বিকাশের পথ ছেড়ে গোষ্ঠী ক্রিয়ার বা গোষ্ঠীকর্মের নিজস্ব পরিচিতি এবং পদ্ধতিতে চিকিৎসা এবং চর্চা শুরু করার প্রয়োজনীয়তা তারা অনুভব করলেন। গোষ্ঠী ক্রিয়া তখন থেকে নতুনভাবে তার জায়গা করে নিল। ষাটের দশকের শেষের দিকে, রুথ স্মালি (Ruth Smalley) তার নতুন পাঠ্য পুস্তক "Theory for Social Work Practice"-এ ব্যক্তি ক্রিয়া, গোষ্ঠী ক্রিয়া এবং সমাজ সংগঠন—এই তিন পদ্ধতির ক্ষেত্রে প্রয়োগ সম্ভব এমন যুক্ত তত্ত্বের উপস্থাপন করলেন প্রথম এবং মৌলিকভাবে এবং এই তিন পদ্ধতির মধ্যে সাধারণগুলির উপরই গুরুত্ব আরোপ করে সামাজে ক্রিয়া শিক্ষার ক্ষেত্রে এবং নতুন দিগন্তের উন্মেষ ঘটালেন। সত্তর এবং আশির দশকে গোষ্ঠী ক্রিয়া পদ্ধতিটি গবেষণাগার পদ্ধতি, সচেতনতা প্রশিক্ষণ, প্রতিবাদী গোষ্ঠীর মতো নতুন উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে এবং লেনদেন বিশ্লেষণ, গেস্টাল্ট চিকিৎসা পদ্ধতির মতো বহু আন্দোলনমূলক পদ্ধতির জন্য ব্যবহার হতে থাকল।

শুরু থেকে আজ পর্যন্ত পশ্চিম গোলার্ধে বিশেষতঃ আমেরিকা এবং ইউরোপে বিকাশ লাভ করে সে সব তত্ত্ব বা তথ্যমূলক চিন্তাভাবনা সামাজিক গোষ্ঠীক্রিয়ার কাঠামোগত ধারণা এবং বিষয়সূচীর দিক নির্দেশ করেছে সেগুলি হল ঃ

(১) ইহুদী-খ্রীষ্টান ধর্মের অঙ্গীভূত নীতিগত, সামাজিক এবং ঐশ্বরিক বিশ্বাস; (২) উনবিংশ শতকের শেষের দিকে উদ্ভূত মানবতাবাদী চিন্তাভাবনা, প্রথমে ইংল্যাণ্ড এবং পরে আমেরিকার সামাজিক স্থায়িত্ব আন্দোলনে যা প্রকাশ পেয়েছিল; (৩) প্রগতিশীল শিক্ষাতত্ত্বের নির্মাতা জন ডিউই এবং তার অনুগামীদের শিক্ষাদর্শন; (৪) কিছু আদি সমাজতাত্ত্বিকের তত্ত্ব বিশেষত, দুরখেইম, সিমেল, কুলি এবং সিড যাঁরা ব্যক্তি এবং সমাজের সম্পর্ক নিরীক্ষণ করতে ছোট ছোট গোষ্ঠী নির্বাচন করেছিলেন, (৫) কার্ট লিউইন (Kurt Lewin), মোরেনো (Moreno), এলটন মেয়ো (Elton Mayo) এবং মার্টন (Merton)-এর মতো সমাজ বিজ্ঞানীদের করা ক্ষুদ্র গোষ্ঠীতত্ত্বের উপর সাম্প্রতিক গবেষণাসমূহ; (৬) আন্তঃক্রিয়ার তত্ত্ব, তন্ত্রমূলক, তত্ত্ব ইত্যাদির মতো কিছু প্রাসঙ্গিক তত্ত্বের বিকাশ কারণ প্রথম তত্ত্বটি গোষ্ঠীকে একটি আন্তঃক্রিয়া সম্পন্ন ব্যক্তি নিয়ে তৈরী বিশেষ তন্ত্র হিসাবে গণ্য করে এবং পরের তত্ত্বটি গোষ্ঠীকে বিভিন্ন সামাজিক ক্রিয়ার মধ্যে ভারসাম্য রক্ষাকারী এবং যোগাযোগ রক্ষাকারী তন্ত্রহিসাবে গণ্য করে; (৭) গণতান্ত্রিক নীতি, কারণ এটা শুধু রাজনীতি তন্ত্রে প্রয়োগ করার জন্য নয় কিন্তু মেরি ফলেট (Mary Follet) এবং এডওয়ার্ড সি. লিন্ডম্যান (Edward C. Lindeman)-এর লেখকদের লেখায় প্রকাশিত যে এটি সবরকম সামাজিক সম্পর্কের ক্ষেত্রেই প্রয়োগসম্ভব; (৮) সাধারণ মনোবিজ্ঞানের মধ্যে প্রধান প্রধান তত্ত্বগুলি যেমন—প্রেরণা (Motivation), শিক্ষণ (Learning), বোধ (Perception) গোষ্ঠী নিরীক্ষণে

এই সব তত্ত্বগুলির অবদান এ্যাশ (Asch), ফেষ্টিঙ্গার (Festinger), হিডার (Heider), ক্রেচ (Krech) এবং ক্রাচ্‌ফিল্ড (Crutchfield)-এর দ্বারা নির্মিত; (৯) বায়ন (Bion), সিডলিঙ্গার (Schiedlinger), স্টক (Stock) এবং থেলেন (Thelen)-এর মতো লেখকদের দ্বারা বিকশিত গোষ্ঠী চিকিৎসা পদ্ধতির প্রতি বর্ধিষ্ণু আগ্রহ সমন্বিত ফ্রয়েড মনোরোগসমস্যার এবং মনোবিশ্লেষণের বিদ্যালয়; (১০) পাওলা ফ্রেইরি (Paulo Freire)-র মতো বিশেষ ব্যক্তির দেওয়া মুক্ততত্ত্ব এবং লাটিন আমেরিকার নীরবতার সংস্কৃতি; (১১) গতদশকের মুক্ততত্ত্বের বিদ্যালয় (চলতি সামাজিক অর্থনৈতিক গঠনতন্ত্রের আলোকে বাইবেল ও খ্রীষ্টান ধর্মের নতুন ব্যাখ্যা দেওয়া) যা খ্রীষ্টান মিশনারীদের মধ্যে ক্রিয়ামূলক আন্দোলনে উদ্বুদ্ধ ও লালন করেছিল; (১২) জীবিকা হিসাবে সামাজিক ক্রিয়ার মধ্যে মূল্য, নীতি ও পদ্ধতি অন্তর্ভুক্তিকরণ যার মধ্যে সামাজিক গোষ্ঠীক্রিয়া একটি পদ্ধতি হিসাবে বিকাশলাভ করে।

ভারতবর্ষে সামাজিক ক্রিয়া বা সমাজকর্ম এবং সামাজিক কল্যাণের ইতিহাস বেশ দীর্ঘ। এখানে গোষ্ঠীগত কাজকর্মের উদাহরণ পাওয়া যায় দাক্ষিণ্যমূলক কাজকর্মে, মৌখিক ধর্মীয় শিক্ষা দানে, ব্রিটিশের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা সংগ্রামে জনসংগঠনে, সমাজ সংস্কারমূলক কাজকর্মে এবং তারও পরে সর্বোদয় এবং ভূদান আন্দোলনের মতো আভ্যন্তরীন মঙ্গলীকরণের চিরাচরিত উপায়গুলিতে। তবে সামাজিক ক্রিয়া চর্চার একটি পদ্ধতি হিসাবে ভারতে গোষ্ঠীক্রিয়ার অস্তিত্ব কেবলমাত্র দেখা যায় সামাজিক ক্রিয়া শিক্ষার ক্ষেত্রে।

ভারতে গোষ্ঠীক্রিয়ার সূচনা ১৯৩৬ সালে প্রথম সামাজিক ক্রিয়া শিক্ষার স্কুল Sir Derabji Tata Graduate School of Social Work স্থাপিত হবার সঙ্গে সঙ্গে। ১৯৪৭—৪৮ সালে দিল্লীতে প্রতিষ্ঠিত হয় দ্বিতীয় স্কুলটি এবং সেটি হয় পূর্বপ্রতিষ্ঠিত একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের অংশ বিশেষ হিসাবে। এই ঘটনাটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ, সামাজিক ক্রিয়া শিক্ষা এবং এর পাঠ্যক্রমের একটি অংশ হিসাবে গোষ্ঠীক্রিয়া এই ঘটনার মাধ্যমেই বিশেষ শিক্ষা রীতির স্তরের স্বীকৃতি পেল। এর দুবছর পূর্ণ হবার আগেই বরোদা বিশ্ববিদ্যালয়ের অংশবিশেষ হিসাবে সামাজিক ক্রিয়া শিক্ষার তৃতীয় স্কুলটি প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেল এবং এই স্কুলের গোষ্ঠীক্রিয়ার বেশ শক্তিশালী ধারাবাহিকতা ছিল। এই স্কুল ১৯৬০ সালে ভারতে গোষ্ঠীক্রিয়া চর্চার প্রথম নথিগুলি তৈরী করে প্রকাশ করেছিল।

ভারতে সামাজিক কর্ম (Social Work) শিক্ষার বিদ্যানিকেতনগুলির সংগঠন (The Association of Schools of Social Work in India) আমেরিকার Technical Cooperation Mission-এর সঙ্গে একযোগে গোষ্ঠী কর্মের ন্যূনতম স্তর নির্দিষ্ট করে ঐ একই সময়ে পরিণতি হিসাবে এর পর দ্রুত বৃদ্ধি ঘটতে লাগলো সামাজিক কর্ম শিক্ষার প্রতিষ্ঠানের সংখ্যায় এবং এর সবগুলিতেই ব্যক্তিকর্ম এবং সমান সংগঠনের পাশাপাশি গোষ্ঠীকর্মও পাঠ্য বিষয় হিসাবে তার জায়গা করে নিল। আমেরিকার সামাজিক কর্ম শিক্ষার অনুসরণে ভারতেও পদ্ধতি গত বিষয়াংশের উপর কোন বিশেষীকরণের ব্যবস্থা হয়নি। তাত্ত্বিক কাঠামো এবং চর্চাগত প্রতিরূপ (model) প্রধানতঃ আমেরিকার ধাঁচেই তৈরী হল এবং এখনো পর্যন্ত সেগুলিকে ভারতীয় করনের জন্য খুব কমই চেষ্টা করা হয়েছে। যেহেতু সামাজিক কর্ম শিক্ষা এবং সমাজ উন্নয়নমূলক কর্মসূচীর মধ্যে সম্পর্ক এবং সমন্বয়করণের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করা হয়েছে অতি সাম্প্রতিক কালে, সেহেতু পূর্বে রূপায়িত কর্মসূচীগুলি প্রায় নিষ্ক্রিয় থেকে গেছে। তাছাড়া বেশীরভাগ সামাজিক কর্ম শিক্ষার প্রতিষ্ঠানগুলি শহরে প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় জীবিকা বা পেশামূলক গোষ্ঠীকর্মের চর্চা এখনও পর্যন্ত শহর কেন্দ্রিকই রয়ে গেছে।

৯.৫ প্রশ্নাবলী

(১) সামাজিক গোষ্ঠী কর্ম বলতে কি বোঝ?

(২) সামাজিক গোষ্ঠীকর্মের নীতিগুলি ব্যাখ্যা কর।

(৩) গোষ্ঠীকর্ম বা গোষ্ঠীক্রিয়ার আদর্শ প্রতিরূপ কি?

(৪) ভারতবর্ষে সামাজিক গোষ্ঠীকর্মের ইতিহাস ব্যাখ্যা কর।

একক ১০ ❑ গোষ্ঠী সম্পর্ক ব্যবহার করতে গোষ্ঠীকে সাহায্য করার ক্ষেত্রে পেশাদার সমাজকর্মীর ভূমিকা

গঠন ঃ

১০.১ গোষ্ঠীক্রিয়ার গোষ্ঠীকর্মী

১০.২ সামাজিক গোষ্ঠীক্রিয়ার ক্ষেত্রে নেতৃত্ব

১০.২.১ নেতার প্রকার ভেদ

১০.২.২ নেতার ভূমিকা এবং কার্যাবলী

১০.৩ নেতৃত্বদানের বিভিন্ন তত্ত্ব

১০.৩.১ বংশধারা তত্ত্ব

১০.৩.২ বিশেষ দক্ষতার তত্ত্ব

১০.৩.৩ পরিস্থিতি মূলক তত্ত্ব

১০.৩.৪ পরিস্থিতি-তথা-ব্যক্তিত্বমূলক তত্ত্ব

১০.৪ প্রশ্নাবলী

১০.১ গোষ্ঠীক্রিয়ায় গোষ্ঠীকর্মী (Group Worker in Group Work)

গোষ্ঠীক্রিয়ার গোষ্ঠীকর্মী কোন গোষ্ঠী নেতা নয়, সে একজন সাহায্যকারী ব্যক্তিমাত্র। গোষ্ঠীর জন্য কাজ করার পরিবর্তে সে গোষ্ঠীর সাথে কাজ করে গোষ্ঠীর সমস্ত কাজে সহায়ক বা সফলকারীর ভূমিকা পালন করে থাকে। এ ব্যাপারে গোষ্ঠীর উপর গোষ্ঠীকর্মীর প্রভাব পরোক্ষভাবে পড়ে। গোষ্ঠী সদস্যদের মাধ্যমে কাজ করে। তাছাড়া গোষ্ঠী এবং সংস্থার মধ্যে যোগাযোগ রক্ষাকারীর ভূমিকা পালন করে।

গোষ্ঠীর যেসব গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপগুলিতে দক্ষ গোষ্ঠীকর্মীর সাহায্যের প্রয়োজন হয় সেগুলি হল ঃ—

গোষ্ঠীর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য স্থির করার ক্ষেত্রে গোষ্ঠীকর্মীর সাহায্যের প্রয়োজন। সঙ্গে সঙ্গে সংস্থার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য বোঝার ক্ষমতা অর্জনে সাহায্য করে যাতে গোষ্ঠীসদস্যরা উপলব্ধি করতে পারে যে তাদের নিজেদের লক্ষ্য পূরণে সংস্থা তাদের কি দিতে পারে। গোষ্ঠী সদস্যদের মধ্যে পারস্পরিক অনুভূতি এবং সচেতনতা বাড়াতে গোষ্ঠীকর্মী সাহায্য করে। গোষ্ঠীকে নিজেদের ক্ষমতা, সীমাবদ্ধতা বুঝতে গোষ্ঠীকর্মী সাহায্য করে যাতে গোষ্ঠী সেই অনুযায়ী তার উন্নয়নের স্তর স্থির করতে পারে। গোষ্ঠীর সম্পূর্ণ ক্ষমতার বিকাশে বাধাদানকারী আভ্যন্তরীন সমস্যাগুলিকে নির্দিষ্ট করতে গোষ্ঠীকর্মী সাহায্য করে এবং সেইসব সমস্যাগুলিকে সমাধান করার উপায় এবং সম্পদগুলিকে চিহ্নিতকরণ করতেও গোষ্ঠীকর্মী গোষ্ঠীকে সাহায্য করে থাকে। গোষ্ঠীর নিজস্ব

সাংগঠনিক রূপকে ত্রুটিমুক্ত করে তাদের নির্বাচিত নেতাকে তা বুঝতে এবং তার কর্তব্য পালন করতেও গোষ্ঠীকর্মী সাহায্য করে। সামাজিক নিয়ন্ত্রণের উপায়গুলিকে চিহ্নিত করে গোষ্ঠীকে তার কাজকর্মে উন্নতি ঘটাতে গোষ্ঠীকর্মী সাহায্য করে। সংস্থার কাছ থেকে অথবা সমাজের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় সম্পদ সংগ্রহ করতেও গোষ্ঠীকর্মী গোষ্ঠীকে সাহায্য করতে পারে এবং সঙ্গে সঙ্গে সে কোন বিষয়ভিত্তিক ক্ষেত্রে বিভিন্নসময় উপদেশ দিয়েও গোষ্ঠীকে সাহায্য করে থাকে। এই গোষ্ঠীকে তার থেকে সম্পূর্ণ আলাদা ধরণের অন্য কোন গোষ্ঠীকে বুঝতে সাহায্য করার জন্য এবং তারপর ঐ দুই গোষ্ঠীর মধ্যে আন্তঃগোষ্ঠী সম্পর্ক গড়ে সহযোগিতা মূলকভাবে কাজ করার অবস্থায় নিয়ে যাওয়ার জন্যেও গোষ্ঠীকর্মীর সচেষ্ট থাকে। এইসব গোষ্ঠী-নির্দেশিত প্রয়াসগুলি ছাড়াও গোষ্ঠীকর্মী ব্যক্তিকে তার গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করতে এবং গোষ্ঠীর অন্যান্য সদস্যদের সঙ্গে দায়িত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করতেও সাহায্য করে।

গোষ্ঠীকর্মী কিভাবে গোষ্ঠীকে সাহায্য করবে সেটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। গোষ্ঠীর বর্তমান অবস্থান থেকে অভিজ্ঞতা, জ্ঞান, উপলব্ধি এবং দক্ষতার পথে গোষ্ঠীকে নিয়ে যেতে গোষ্ঠীকর্মী যা যা নিয়ে গোষ্ঠীর কাছে আসে, গোষ্ঠীকর্মীর কাজের মান তার দ্বারা প্রভাবিত হয়। যেমন—সে নিয়ে আসে মানুষের প্রতি তার গভীর আগ্রহ এবং গোষ্ঠীর বর্তমান অবস্থায় তাকে গ্রহণ করার ক্ষমতা এবং সে বস্তুগত জিনিস না এনে নিয়ে আসে তার ভাবনা, সচেতনতা, এবং দৃষ্টিভঙ্গী কারণ সে গোষ্ঠীর সাথে কাজ করার জন্যই আসে, গোষ্ঠীর জন্য কাজ করতে নয়। সে চায় গোষ্ঠীসদস্যরা একযোগে কাজ করার ক্ষমতা বাড়িয়ে তুলুক এবং নিজেদের প্রচেষ্টায় বা একতাবব্ধ হয়ে প্রয়োজনীয় উন্নতি ঘটাতে সমর্থ হয়। স্বভাবতঃই গোষ্ঠীকর্মী গোষ্ঠীর কাছে আসে তার সমস্ত অতীত অভিজ্ঞতা নিয়ে। সে গোষ্ঠীর একজন সদস্য হয়ে থাকে এবং গোষ্ঠীসদস্যদের সাথে কাজ করে গোষ্ঠী কিভাবে প্রতিক্রিয়া দেখায় এবং কখন গোষ্ঠীর সাহায্যের প্রয়োজন এসব ব্যাপারে অভিজ্ঞতা অর্জন করে। সুতরাং তার গোষ্ঠী সম্পর্কে এবং গোষ্ঠীর চাহিদা ও প্রয়োজন সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকে। গোষ্ঠীসদস্যদের নিজেদের মধ্যে বিভিন্ন ব্যাপার আলোচনায় সাহায্য করার দক্ষতা নিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে গোষ্ঠীকর্মী গোষ্ঠী সদস্যদের ব্যক্ত অনুভূতির কথা শোনার মতো ইচ্ছা নিয়ে আসে এবং এই ধরণের অনুভূতি প্রকাশে গোষ্ঠীসদস্যদের উৎসাহিত করে কারণ একমাত্র এই পথেই সে গোষ্ঠীর সাথে পুরোপুরি পরিচিত হতে পারে।

একথা মনে রাখা প্রয়োজন যে গোষ্ঠীকর্মী গোষ্ঠীকে সাহায্য করার ইচ্ছা নিয়ে আসবে বিনিময়ে কিছু আশা বা দাবী না করে, যদিও অন্যমানুষের মতো গোষ্ঠীকর্মীর ও গুরুত্ব পাওয়া বা প্রশংসা পাওয়ার চাহিদা থাকে। সে গোষ্ঠীর সাফল্য থেকেই তার সেই পরিতৃপ্তি নেবে। যাদের সাথে কাজ করছে তাদের কাজ থেকে প্রশংসা প্রাপ্তির মাধ্যমে নয়।

গোষ্ঠীকর্মীর একটি মূল অবদান হল নিজেদের পরিকল্পনায় সুযোগ দিলে গোষ্ঠীর বুদ্ধিযুক্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার এবং বিচারবোধের ক্ষমতা আছে এই ব্যাপারে তার (গোষ্ঠীকর্মীর) বিশ্বাস। সে তার সংস্থা এবং সমাজের সম্পদ সম্পর্কে জ্ঞান দান করে, সেগুলিকে গোষ্ঠীর কাছে পরিচিত করে তোলে যাতে তাদের সাহায্য নেওয়ার মতো বিশেষ বিশেষ চাহিদা গোষ্ঠীর মধ্যে দেখা দেয়। সে সময়ের সম্পর্কে এবং গোষ্ঠীর প্রস্তুতিকরণ সম্পর্কে চেতনা নিয়ে আসে কারণ এই কাজটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে কোন্ মুহূর্তে একটা গোষ্ঠী এগিয়ে যেতে প্রস্তুত থাকে সেই সময়টি নির্দিষ্ট করতে পারা। পরিকল্পনা রচনায় তার দক্ষতা গোষ্ঠীর কাছে সুলভ হয় যাতে কোন

পরিতৃপ্তিদায়ক বা উন্নতিসাধক কর্মসূচীর বিকাশের ব্যাপারে সঠিকভাবে এগিয়ে যাওয়া যায়। গোষ্ঠীকর্মী তার মূল্যবোধ, নীতিশিক্ষা, আদর্শ ইত্যাদি নিয়ে তার ব্যক্তিগত সমন্বয় ক্ষমতা দিয়ে সামাজিক পরিণতিকে চিহ্নিত করে, কিন্তু গোষ্ঠী যে বৃদ্ধিমূলক সুযোগের অভিজ্ঞতা ছাড়া উন্নত মানে পৌঁছাতে পারে না সেই সত্যকেও সহজেই গ্রহণ করে।

মানুষের আচরণ সম্পর্কে গোষ্ঠীকর্মীর চাই যথেষ্ট জ্ঞান এবং উপলব্ধি। সে শুধু গোষ্ঠী সদস্যদের বুঝবে তা নয় সঙ্গে সঙ্গে সে তার নিজের আচরণ সম্পর্কেও সচেতন থাকবে। গোষ্ঠীসম্পর্কের পরিবর্তনশীলতাকে উপলব্ধি করে তার সঠিক ব্যবহারের মাধ্যমে ব্যক্তির উন্নতি তথা গোষ্ঠীর উদ্দেশ্য পূরণে গোষ্ঠীকর্মী তৎপর হবে। গোষ্ঠীকর্মী গোষ্ঠীসদস্যদের পক্ষে এবং বিপক্ষে উভয় প্রকার অনুভূতি প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করবে এবং কোন সদস্যের বিক্ষোভ প্রকাশ করাকে তার নিজের উপর ব্যক্তিগত আক্রমণ হিসাবে না ধরে বিক্ষোভের সঠিক কারণ নির্ণয় করার চেষ্টা করবে। গোষ্ঠী ক্রিয়াকে ফলপ্রসূ করতে গেলে গোষ্ঠী সদস্যদের মধ্যে তথা গোষ্ঠীর সাথে গোষ্ঠীকর্মীর কার্যকরী কর্মসম্পর্ক প্রতিষ্ঠা ও লালনের জন্য প্রয়োজনীয় উপাদানগুলিকে গোষ্ঠীকর্মী অবশ্যই চিহ্নিত করবে এবং প্রাধান্য দেবে।

গোষ্ঠীকর্মী ব্যক্তিকে গোষ্ঠীর মধ্যে থেকে অন্যান্য ব্যক্তির সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন এবং বহন করার জন্য সাহায্য করে যে সম্পর্ক ক্রমশ তৃপ্তিদায়ক, গঠনমূলক এবং সৃজনমূলক হতে পারে। সমাজকে সুস্থভাবে টিকিয়ে রাখতে হলে চাই প্রতিটি মানুষের মধ্যে অন্যান্য মানুষের সাথে একসঙ্গে কাজ করার মানসিকতা, অন্য মানুষকে বোঝার ক্ষমতা এবং বিভিন্ন অভিজ্ঞতা অর্জনের ক্ষেত্রে সহযোগিতা করার সদিচ্ছা। গোষ্ঠীসদস্যদের যাতে সামাজিকীকরণের পথে নিয়ে যায় এরকম এক আন্তঃসম্পর্ক তৈরী করতে হলে গোষ্ঠীকর্মী প্রথমেই গোষ্ঠী এবং তার নিজের মধ্যে উপযুক্ত, প্রয়োজনীয় এবং দৃঢ় সম্পর্ক স্থাপন করবে।

'সম্পর্ক' বলতে আমরা বুঝি গোষ্ঠীসদস্যদের নিজেদের মধ্যে এবং গোষ্ঠীর সঙ্গে গোষ্ঠীকর্মীর এক অনুভূতির বন্ধনের উপস্থিতি। মানুষের আচরণ দ্বারা বিভিন্ন প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে প্রক্ষোভমূলক সাড়া দেওয়া থেকে সম্পর্কের শুরু। তারপর যেমন যেমন অবস্থার পরিবর্তন হয় এবং প্রয়োজন অনুভূত হয় তেমন তেমন ভাবেই এই প্রক্ষোভমূলক সাড়া দেওয়ার মাত্রা এবং স্থায়িত্বের সময় সীমার মধ্যে পরিবর্তন আসতে থাকে। সম্পর্ক তাই একটি মনোবৈজ্ঞানিক ধারণা বা ব্যক্তিদের আন্তঃমানসিক পরিস্থিতি, গোষ্ঠীর কাছ থেকে কাঙ্ক্ষিত সাড়া পাওয়ার এটি একটি পথ বা উপায় ও বটে। গোষ্ঠী এবং গোষ্ঠীকর্মীর মধ্যে সম্পর্ক গড়ে তোলা একটি সময় সাপেক্ষ ব্যাপার। উভয়পক্ষের একই সঙ্গে নানা অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের মাধ্যমে এই সম্পর্ক গড়ে ওঠে এবং পরিবর্তিত হতে থাকে। গোষ্ঠীর সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতের সময় থেকে এবং পরবর্তীকালের সমস্ত সাক্ষাতের মাধ্যমে গোষ্ঠীর সঙ্গে কর্মমূলক সম্পর্ক স্থাপনেই গোষ্ঠীকর্মীর সচেতনভাবে ব্যস্ত থাকা উচিত।

সম্পর্ক স্থাপনের প্রথম সোপানের ক্ষেত্রে বৃহত্তম একমাত্র উপাদান হিসাবে বলা যেতে পারে গোষ্ঠীর ক্ষমতা এবং সুবিধাজনক এবং অসুবিধাজনক সবরকমের সীমাবদ্ধতা নিয়েই গোষ্ঠী যেমন অবস্থায় আছে ঠিক তেমন অবস্থায়ই গোষ্ঠীকর্মীর গোষ্ঠীকে গ্রহণ করার ক্ষমতা। গোষ্ঠীর কথা মন দিয়ে শুনতে এবং গোষ্ঠীর প্রাথমিক ভাবে নির্দিষ্ট লক্ষ্য এবং ধারণাগুলো যখনই গোষ্ঠীকর্মী গ্রহণ করতে সক্ষম হবে তখনই গোষ্ঠীকে তার নিজের ধারনার অনুগামী করা বা নিজের পদ্ধতিতে গোষ্ঠীকে কাজ করতে বাধ্য করার প্রবণতাকে সে নিয়ন্ত্রণ

করবে। গোষ্ঠীকে যথার্থভাবে গ্রহণ করতে গোষ্ঠীকর্মী গোষ্ঠীসদস্যদের অনুভূতিগুলো ও গ্রহণ করবে। এই অনুভূতিগুলো হতে পারে সদস্যদের নিজেদের ব্যাপারে অথবা গোষ্ঠীকর্মীর ব্যাপারে অথবা সংস্থাটির প্রতি। গোষ্ঠীসদস্যদের অন্যান্য গোষ্ঠীর প্রতিও অনুভূতি থাকতে পারে অথবা পূর্বেকার গোষ্ঠীকর্মীর প্রতিও থাকতে পারে। গোষ্ঠীকর্মী নিজে গ্রহণশীল হয়ে গোষ্ঠীকে সাহায্য করবে তার নিজের প্রতি এবং সংস্থার প্রতিনিধি হিসাবে যে সাহায্য সে দিতে এসেছে সেই সাহায্যের প্রতি গ্রহণশীল হতে।

প্রথমেই গোষ্ঠীর গঠন পরিকল্পনার চেষ্টা না করে গোষ্ঠীকর্মী গোষ্ঠীর সঙ্গে উষ্ম বন্ধুত্বের সম্পর্কের উপর গুরুত্ব দিয়ে শুরু করার চেষ্টা করবে। সে গোষ্ঠীর প্রতিটি সদস্যের সাথে পরিচিত হতে চেষ্টা করবে। কিন্তু তাদের প্রশ্নবাণে জর্জরিত না করে। যখনই কোন নতুন গোষ্ঠীকর্মী এবং নতুন গোষ্ঠী একসঙ্গে কাজ করতে যাবে তখনই উভয়ের সম্পর্ক উভয়ের মনে অনেক প্রশ্ন থাকবে। কিন্তু এইসব প্রশ্নগুলি কদাচিৎ মৌখিকভাবে সরাসরি জিজ্ঞাসা করা হয়ে থাকে। প্রতিটি নতুন পরিস্থিতির মধ্যেই কিছু অজানা বিষয় থাকে। ব্যক্তিগত সম্পর্কের ক্ষেত্রে পরস্পরকে না জানা কাম্য অবস্থা নয়, কারণ, একে অপরের সম্পর্কে সঠিকভাবে না জানলে আমরা কখনই পরস্পর পরস্পরের কাছে সুরক্ষিত নই। তাই গোষ্ঠী এবং গোষ্ঠীকর্মীর মধ্যে ফলপ্রসূ সম্পর্ক স্থাপন করতে হলে একে অপরকে ভালভাবে জানতেই হবে।

একথা মনে রাখা প্রয়োজন যে গোষ্ঠীর সঙ্গে কার্যকরী কর্মমূলক সম্পর্ক স্থাপনই গোষ্ঠীক্রিয়ার শেষ উদ্দেশ্য নয়, উদ্দেশ্য পূরণের একটি উপায় মাত্র, যে উপায় গোষ্ঠী সদস্যদের নিজেদের উন্নতির জন্যে সাহায্য করে। কারণ, গোষ্ঠীকর্মী নিজে গোষ্ঠীর সঙ্গে সফল সম্পর্ক স্থাপনে সক্ষম হলেই সেই সম্পর্ককে কাজে লাগিয়ে সে গোষ্ঠী সদস্যদের মধ্যে মানিয়ে চলার ক্ষমতা বাড়াতে পারবে এবং সম্পূর্ণ গোষ্ঠীকে প্রগতির পথে নিয়ে যাবে। গোষ্ঠীকর্মী প্রথম থেকেই যথেষ্ট মুক্ত মানসিকতা (open mindedness) নিয়ে খেলাখুলি আলোচনার পথে এগোবে এবং চেষ্টা করবে গোষ্ঠীসদস্যরাও যেন তার সঙ্গে একই আচরণ করে তার জন্য উপযুক্ত পরিবেশ তৈরী করতে যদি প্রয়োজন হয়, তবে যতক্ষণ পর্যন্ত না গোষ্ঠী গোষ্ঠীকর্মীর কাছে নিরাপত্তা অনুভব করতে পারছে ততক্ষণ পর্যন্ত পরিবেশ রাখতে হবে গোপনীয়। তবেই কর্মী দেখতে পাবে গোষ্ঠীও ক্রমশঃ মুক্ত মনের হচ্ছে এবং নিজেদের উত্তেজনামুক্ত অবস্থায় নিয়ে যেতে সক্ষম হচ্ছে। স্বাধীন চিন্তার পথে উন্নতি এবং স্বতঃস্ফূর্ততা তাদের আচরণ-এ প্রকাশ পাচ্ছে, সদস্যদের অংশগ্রহণের মাত্রা বাড়ছে এবং সদস্যদের মধ্যে আলোচনার বিষয়বস্তু গোষ্ঠীর কাছে গোষ্ঠীকর্মীর গ্রহণযোগ্যতার মাত্রা নির্দেশ করছে। এইভাবে ধীরে ধীরে গোষ্ঠীকর্মী তথা সংস্থার দ্বারা গোষ্ঠীর উপর আরোপিত কিছু সীমা গোষ্ঠী গ্রহণ করতে সক্ষম হলেই প্রমাণিত হবে যে কাঙ্ক্ষিত সম্পর্কের সূচনা হতে চলেছে। পরবর্তী পর্যায়ে গোষ্ঠী যখনই উন্নতির পথে এগোবে এবং নতুন সদস্যদের গ্রহণ করবে তখনই বোঝা যাবে যে গোষ্ঠী আন্তঃনিরাপত্তার এক নতুন মাত্রায় পৌঁছে গেছে। এর সবগুলিই সম্পর্ক স্থাপন এবং তার প্রগতির কিছু সূচক। প্রগতি যে সর্বদাই এমন অব্যাহতভাবে হবে তা নয়, কখনও মনে হতে পারে সম্পর্কের অবনতি ঘটছে, কিন্তু তার পরেও আবার কাঙ্ক্ষিত উন্নতির পথে যাওয়া সম্ভব যদি প্রতিটি অবনতির মুহূর্তে সতর্ক থেকে প্রতিটি ব্যর্থতা থেকে গোষ্ঠীকর্মী প্রয়োজনীয় অভিজ্ঞতা অর্জন করে নিতে পারে।

১০.২ সামাজিক গোষ্ঠীক্রিয়ার ক্ষেত্রে নেতৃত্ব (Leadership in Social Group work)

(ক) নেতার / নেতৃত্বের সংজ্ঞা (Definition of Leadaship) ঃ নেতৃত্বদান হোল এক বিশেষ প্রকারের সামাজিক আন্তঃক্রিয়া ঃ এক পারস্পরিক দেওয়া-নেওয়ার এবং কখনও রূপান্তরের পদ্ধতি যেখানে সহযোগী ব্যক্তিরা ব্যক্তিগত এবং গোষ্ঠীর লক্ষ্য পূরণের জন্য পরস্পর পরস্পরকে প্রভাবিত এবং প্রণোদিত করায় সচেষ্ট হয়। এই সংজ্ঞা থেকে নেতৃত্বদানের নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যের সন্ধান পাওয়া যায় ঃ—

(১) নেতৃত্বদান একটি পারস্পরিক পদ্ধতি যেখানে নেতা, অনুগামীরা এবং গোষ্ঠী-পরিস্থিতি জড়িত থাকে। শুধু নেতা গোষ্ঠী সদস্যদের প্রভাবিত করে তা নয়, বরং নেতা এবং অনুগামীদের মধ্যেকার সম্পর্কটি উভয়মুখী।

(২) নেতৃত্বদান একটি দেওয়া নেওয়ার, সামাজিক বিনিময়ের পদ্ধতি, যেখানে নেতা এবং অন্যান্য সদস্যরা সময়, শক্তি এবং দক্ষতার ভাগাভাগি করে একইসাথে কাজ করে তাদের যুগ্ম পুরস্কার হিসাবে গোষ্ঠী লক্ষ্য পূরণের জন্য।

(৩) নেতৃত্বদান সাধারণতঃ একটি রূপান্তরের পদ্ধতি যেখানে রূপান্তরকারী নেতারা গোষ্ঠীসদস্যদের ঐক্যবদ্ধ করে এবং তাদের মূল্যবোধ, বিশ্বাস এবং চাহিদার পরিবর্তন ঘটিয়ে তাদের অনুপ্রেরণা, আত্মবিশ্বাস এবং পরিতৃপ্তির মাত্রা বাড়াতে সক্ষম হয়।

(৪) নেতৃত্বদান একটি সহযোগিতামূলক পদ্ধতি যেখানে নিছক ক্ষমতার প্রকাশ নয়, বৈধপথে অনুগামীদের প্রভাবিত করার চেষ্টা করা হয়।

(৫) নেতৃত্বদান একটি অভিযোজনমূলক লক্ষ্যপূরণ পদ্ধতি যার দ্বারা ব্যক্তিগত এবং গোষ্ঠী লক্ষ্য পূরণের জন্য গোষ্ঠী সদস্যদের প্রচেষ্টাগুলিকে সংগঠিত করে অনুপ্রেরণা পথে চালিত করা হয়।

১০.২.১ নেতার প্রকার ভেদ ঃ

নেতৃত্বে আসার বা নেতৃত্ব পাওয়ার পদ্ধতি হিসাবে বিচার করলে আমরা তিনধরনের নেতার সন্ধান পাই। যথা—

(১) নিযুক্ত নেতা (Appointed leader)—গোষ্ঠীর বহির্ভূত কোন সংস্থা বা ব্যক্তি দ্বারা নিয়োজিত হয়ে একজন মানুষ নেতা হতে পারে। সরকারী দপ্তরে, শিল্পক্ষেত্রে, বাণিজ্যিক সংস্থাগুলিতে, ব্যাঙ্ক, সামরিক কেন্দ্র ইত্যাদি জায়গার প্রশাসনিক অংশের উর্ধ্বতন কর্তাব্যক্তিরা সকলেই নিযুক্ত বা নিয়োজিত নেতা। এক্ষেত্রে নিয়োগ কর্তৃপক্ষকে বিশেষ রীতিসম্মত নিয়োগ পদ্ধতি অনুসরণ করতে হয়। সংস্থার প্রধান হিসাবে নিয়োজিত এই পদগুলির সঙ্গে বিশেষ সম্মান এবং দায়িত্ব জড়িত থাকে এবং এই সম্মান বা মর্যাদা এবং দায়িত্ব নেতাকে গোষ্ঠীর অন্যান্য সদস্যদের উপর কর্তৃত্ব স্থাপন এবং প্রয়োগ করার ক্ষমতা দান করে।

(২) নির্বাচিত নেতা (Elected Leader)—নেতা হওয়ার আর একটি পদ্ধতি হোল নির্বাচন। গোষ্ঠীসদস্যরা নিজেরাই নিজেদের নেতা নির্বাচন করে নেয়। এক্ষেত্রেও একটি রীতিসম্মত পদ্ধতি অনুসরণ করতে

হয় যার দ্বারা সংখ্যাগরিষ্ঠের পছন্দ প্রকাশ পায়।

(৩) মতভিত্তিক নেতা (Opinion Leader)—নেতা হওয়ার তৃতীয় পদ্ধতিটি হোল মতামতের উপর নির্ভরশীলতা। এক্ষেত্রে কোন রীতিসম্মত পদ্ধতি অনুসরণের প্রয়োজন পড়ে না। যেমন সামাজিক নেতারা সমাজ গতিশীলতার পথে সংখ্যাগরিষ্ঠের দ্বারা পছন্দ হওয়ায় নেতা বলে মান্য হতে থাকেন। তাদের কেউ নিয়োগও করেন না, বা তারা নির্বাচিত হয়েও আসেন না। শহর বা গ্রাম সব জায়গার গোষ্ঠীতেই কিছু ব্যক্তি থাকেন, বিভিন্ন ক্ষেত্রে যাঁদের মতামতকে গোষ্ঠীসদস্যদের সকলেই মূল্য দেয় এবং শ্রদ্ধা করে। যেকোন কৃষিগত, আইনগত বা ব্যবসাগত ইত্যাদি সমস্যায় পড়লেই তারা এই ধরণের মানুষের পরামর্শ এবং উপদেশ গ্রহণ করে থাকে। এঁরা মতভিত্তিক নেতার পর্যায়ভুক্ত।

১০.২.২ নেতার ভূমিকা এবং কার্যাবলী (Role and Activities of Leader) ঃ

গোষ্ঠীর নেতা হিসাবে বিভিন্ন ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে বিভিন্ন সময়ে তাঁকে বহুমুখী কাজ করতে হয়। যেমন—

(১) প্রশাসন আধিকারিক (Executive) হিসাবে ঃ নীতি নির্ধারণে নেতার কোন প্রত্যক্ষ ভূমিকা নাও থাকতে পারে কিন্তু নীতির সঠিক রূপায়ণের জন্য প্রশাসনিক দায়িত্ব সর্বদা নেতার উপর থাকে। প্রশাসন আধিকারিক হিসাবে নেতা সব কাজ নিজে করেন না, .তিনি অন্যান্য গোষ্ঠীসদস্যদেরও কাজের নির্দেশ দিয়ে থাকেন।

(২) পরিকল্পনাকারী হিসাবে (Planner) ঃ পরিকল্পনা হল নীতি নির্ধারণ এবং নীতি রূপায়ণের মধ্যবর্তী পর্যায়। গোষ্ঠী কি কি উপায়ে বা পথে তার নির্দিষ্ট লক্ষ্য পূরণে এগিয়ে যাবে সেগুলো পরিকল্পনাকারী হিসাবে নেতাই স্থির করে থাকেন। সুষ্ঠু পরিকল্পনার উপরই নির্ভর করে গোষ্ঠীর সাফল্য।

(৩) নীতি নির্ধারক হিসাবে (Decision tosser regmding principles) ঃ প্রায় সব নেতারই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল গোষ্ঠীর লক্ষ্য, উদ্দেশ্য এবং নীতি নির্ধারণ করা। এই কাজ নেতা অবশ্যই প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত থাকেন।

(৪) বিশেষজ্ঞের ভূমিকা ঃ গোষ্ঠী সদ্রস্যপদ পাওয়ার জন্য সবরকমের তথ্য এবং দক্ষতার প্রস্তুত উৎস হিসাবে নেতাকে সবসময় পাওয়া যাবে। তার অর্থ হল, গোষ্ঠীকার্যের প্রযুক্তি গত প্রয়োজনীয়তার জন্য নেতা পূর্ণ জ্ঞানসম্পন্ন মানুষ হবেন।

(৫) গোষ্ঠী প্রতিনিধির ভূমিকা (Representative of Group) ঃ একটি গোষ্ঠীর সকল সদস্যদের পক্ষে অন্য একটি গোষ্ঠীর সঙ্গে আমরা নিজের গোষ্ঠীর বাইরের মানুষদের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যোগাযোগ রক্ষা করা সম্ভব হয় না। সেই কারণেই নেতা হলেন গোষ্ঠীর প্রতিনিধি। বহিরাগত এবং বহির্মুখী সবরকম চাহিদা ও যোগাযোগই নেতার মাধ্যমে প্রবাহিত হয়। সেইকারণে লিউইন নেতাকে 'দ্বাররক্ষী' হিসাবে বর্ণনা করেছেন।

(৬) আভ্যন্তরীন সম্পর্কের নিয়ন্ত্রক (Regulator of intemal relatrors) ঃ গোষ্ঠীর মধ্যে আভ্যন্তরীন এবং গোষ্ঠী সদস্যদের মধ্যে আন্তঃব্যক্তিগত সম্পর্কের নিয়ন্ত্রক হলো গোষ্ঠী নেতা। গোষ্ঠীর কাঠামো সম্পর্কে অন্যান্য যে কোন গোষ্ঠী সদস্যের থেকে গোষ্ঠী নেতা আরও বেশী এবং ভালভাবে জানেন, যার ফলে আন্তঃ গোষ্ঠী সম্পর্কের প্রকৃতিকে তিনি অতি সহজেই প্রভাবিত করতে পারেন।

(৭) দণ্ডমুণ্ডের কর্তা (The Chief) ঃ গোষ্ঠীসদস্যদের পুরস্কৃত করা এবং শাস্তি দেওয়া উভয়প্রকার ক্ষমতাই গোষ্ঠীনেতার থাকে, যার ফলে গোষ্ঠীসদস্যদের উপর গোষ্ঠীনেতার শক্তিশালী শৃঙ্খলাপূর্ণ এবং উৎসাহমূলক নিয়ন্ত্রণ রাখা সম্ভব হয়। নেতা একজন গোষ্ঠীসদস্যকে উচ্চতর সম্মানের পদে উন্নীত করতে পারেন, কোন সদস্যকে বিশেষ সম্মান প্রদর্শন করতে পারেন, আবার কোন সদস্যের বিরুধে শাস্তিমূলক পদক্ষেপ নিতে পারেন।

(৮) মধ্যস্থতাকারী (Mediator) ঃ নেতা শুধু নিরপেক্ষ বিচারকই নন বা সিধান্ত চাপানোর যন্ত্র নন। প্রয়োজনে গোষ্ঠীর আন্তঃ সম্পর্ক পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য তিনি বিবাদমান দুই শক্তি সদস্যের মাঝখানে মধ্যস্থতাকারী হিসাবে কাজ করে থাকেন। নেতাকে এই সময় অত্যন্ত সতর্ক থাকতে হয়। এই ব্যাপারে যে কোন সদস্যের স্বার্থ যেন না ক্ষুন্ন হয় বা কোন সদস্যের যেন কোন অমঙ্গল না হয়।

(৯) দৃষ্টান্ত হিসাবে ঃ গোষ্ঠীসদস্যদের জন্য নেতা হবেন আচার আচরণে আদর্শ, একজন সামরিক পদাধিকারী বা নেতা যুধক্ষেত্রে তার বাহিনীকে সাহসের সঙ্গে দৃঢ়ভাবে নেতৃত্ব দিয়ে তার অনুগামীদের কাছে দৃষ্টান্ত হতে পারে না। সমষ্টি বা গোষ্ঠীর ক্ষেত্রেও নেতাকে তেমনই আদর্শস্থানীয় হতে হবে।

(১০) গোষ্ঠী নিশান হিসাবে (Group legend) ঃ সঠিক সময় সঠিকভাবে গোষ্ঠীর জন্য কাজ করে নেতা গোষ্ঠীর মধ্যে ঐক্যবোধ-বাড়িয়ে তুলতে পারেন। নেতার ব্যক্তিগত গুণাবলী, চারিত্রিক দক্ষতা এবং দৃঢ়তা এক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সেগুলির জন্য নেতা বিশেষভাবে খ্যাত হন এবং গোষ্ঠীর নাম এবং নেতার নাম একাত্ম হয়ে যায় অপরাপর গোষ্ঠী বা গোষ্ঠী বহির্ভূত ব্যক্তিদের কাছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় ইংল্যাণ্ডের রাজার কথা।

(১১) ব্যক্তিদায়িত্ব অর্পনকারী হিসাবে (Individual responsibility flxer) ঃ যেসব দায়িত্ব থেকে নেতা মুক্তি চান সেইসব দায়িত্বভার তিনি গোষ্ঠীর অন্যান্য সদস্যের উপর ন্যস্ত করতে পারেন। এইরকম কাজের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির মানসিক স্তরের পর্যালোচনা করা দরকার। প্রতিটি ব্যক্তি সদস্যের দক্ষতা এবং সীমাবধতা সম্পর্কে নেতার সম্যক জ্ঞান থাকা দরকার।

(১২) আদর্শ অনুসরণকারী হিসাবে (Follower ideals/objective) ঃ গোষ্ঠীসদস্যের আদর্শগুলিকে নেতা পরিপূর্ণতা দান করেন এবং ব্যক্তি সদস্যদের দৃঢ় বিশ্বাসের উৎস্য হিসাবে কাজ করে থাকেন। যেমন মহাত্মা গান্ধী লক্ষ লক্ষ মানুষের নীতি এবং বিবেককে চালিত করতে সমর্থ হয়েছিলেন বলে তিনি তাদের অনুসরণযোগ্য হতে পেরেছিলেন। এসবই সম্ভব হয়েছিলো কারণ গান্ধীজী নিজে এক মহান আদর্শ অনুসরণ করে চলতেন।

(১৩) অভিভাবকের ভূমিকায় (Guardian) ঃ ব্যক্তি সদস্যদের অনুকূল প্রক্ষোভমূলক অনুভূতিগুলির উপর সঠিক আলোকপাত করতে পারেন একমাত্র নেতা। সেগুলিকে চিহ্নিতকরণের জন্য, তাদের রূপান্তর ঘটাবার জন্য এবং অবদমিত অনুভূতিগুলি উপলব্ধি করার জন্য নেতাই হলেন আদর্শ ব্যক্তি। এক্ষেত্রে উদাহরণ হতে পারে হিটলার।

(১৪) অন্যের কৃতদোষের ফলভোগী হিসাবে (Suffer for mistakes made by others) ঃ পূর্বে গোষ্ঠীসদস্যরা ভালোবাসত এইরকম একজন নেতা আবার গোষ্ঠীর দ্বারা ধিকৃত বা নিন্দিতও হতে পারেন।

কারণ, নেতা যেমন অনুকূল প্রক্ষোভমূলক অনুভূমি প্রকাশের আদর্শমাধ্যম তেমনি আবার আশাহত, বিষাদগ্রস্থ, বিপথচালিত গোষ্ঠীর আক্রমণেরও লক্ষ্য হতে পারেন। এইসব ক্ষেত্রে আক্রান্ত বা আক্রমণের লক্ষ্য ব্যক্তি দোষী নাও হতে পারে। তা স্বত্ত্বেও পূর্বসূরীদের কৃতকর্মের ফল নেতাকে ভোগ করতে হতে পারে।

১০.৩ নেতৃত্বদানের বিভিন্ন তত্ত্ব

নেতৃত্বদানের তত্ত্বগুলিকে সময়ের ভিত্তিতে দুইভাগে ভাগ করা যেতে পারে, যথা চিরাচরিত তত্ত্ব (Traditional Theory) এবং আধুনিক তত্ত্ব (Modern Theory) ক্ষমতালাভের উৎস বা ভিত্তি অনুসারে আবার চিরাচরিত তত্ত্বকে বংশধারার তত্ত্ব এবং বিশেষ দক্ষতার তত্ত্ব এই দুইভাবে ভাগ করা যায় এবং আধুনিক তত্ত্বকে পরিস্থিতি মূলক তত্ত্ব এবং পরিস্থিতি-তথা ব্যক্তিত্বমূলক তত্ত্ব এই দুইভাগে ভাগ করা যায়।

১০.৩.১ বংশধারা তত্ত্ব ঃ

এই তত্ত্ব অনুযায়ী বলা হয় কিছু ব্যক্তি নেতা হবার জন্যই জন্মগ্রহণ করেন। অন্যভাবে বলা যায় ব্যক্তির চারিত্রিক ব্যক্তিত্বের কিছু বৈশিষ্ট স্বাভাবিকভাবেই তাকে নেতৃত্বের পদে নিয়ে যায়। বূপান্তর দক্ষ এইসব ব্যক্তি অন্যান্য মানুষকে তাদের নিকট স্বার্থের উর্ধ্বে তুলে আরও বেশী কিছুর দিকে দৃষ্টি দিতে এবং সুন্দরতর ভবিষ্যদের স্বপ্ন দেখতে উৎসাহ দিয়ে অনুপ্রাণিত করেন। এই ধরণের নেতাদের ব্যক্তিত্বে থাকে আশ্চর্যজনক উজ্জ্বলতা এবং চৌম্বকত্ব যাতে তারা সকলের বিশ্বাস অর্জন করতে এবং সকলের কাছে সম্মান পেতে সক্ষম হন। সমস্ত মহান ধর্মগুলির প্রতিষ্ঠাতাগণ এই ধরণের নেতার পর্যায়ভুক্ত। কিছু রাজনৈতিক নেতারও এই ধরণের গুণাবলী থাকে। তাদের স্বাভাবিক আকর্ষণী ক্ষমতা অন্যদের বাধ্য করে বিশ্বাস করতে যে তাদের ব্যক্তিস্বার্থ সহজে পূরণ হবে এই ব্যক্তির নেতৃত্বে এবং তারা অবিলম্বে ঐ ব্যক্তিকে নেতা বলে মেনে নেয়।

১০.৩.২ বিশেষ দক্ষতার তত্ত্ব ঃ

প্রত্যেক নেতার কিছু না কিছু বিশেষ দক্ষতা থাকে যা তার অনুগামীদের থাকে না। এই বিশেষ দক্ষতাকে দুভাবে আলোচনা করা যেতে পারে।

প্রথমটি, একক দক্ষতার তত্ত্ব সমস্ত রকমের নেতাদের সমস্ত রকম পরিস্থিতি এবং সংস্কৃতিতে এমন কতকগুলি বৈশিষ্ট্য প্রকাশে পায় সেগুলি শুধু নেতাদেরই থাকে। কারণ এই সকল বৈশিষ্ট্যের উৎস হল তাদের বুদ্ধিমত্তা, বিশেষ জ্ঞান, ক্ষমতা এবং ব্যক্তিত্ব যার অধিকারী একমাত্র নেতারাই। মনোবিজ্ঞানী ও সমাজতাত্ত্বিক গিব্‌স্-এর মতে সকল নেতাই পরিস্থিতির মোকাবিলায় একই ধরণের কতকগুলি বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দেন, যেমন আত্মবিশ্বাস, বুদ্ধিমত্তা, বাগ্মীতা, স্থিতিশীলতা, মানবপ্রকৃতির অন্তদৃষ্টি পরিশ্রমের ক্ষমতা ইত্যাদি। এগুলির সবই সকল নেতার সাধারণ বৈশিষ্ট্য।

দ্বিতীয়টি, পৃথক দক্ষতার তত্ত্ব প্রত্যেক নেতাকে চেনা যায় কতকগুলি বিশেষ বৈশিষ্টের দ্বারা যা অন্যান্য নেতাদেরও থাকে না। যে বিশেষ দক্ষতার ফলে এই বৈশিষ্ট্যের প্রকাশ সেই পৃথক দক্ষতার উৎসে রয়েছে ঐ পূর্বোক্ত একক দক্ষতাগুলি। গিব্‌স এইরকম কিছু বৈশিষ্ট্যের বর্ণনা দিতে বলেছেন যে

(১) কিছু ব্যক্তি নেতৃত্ব দেবার সুযোগ পেলেও নেতৃত্ব দিতে ব্যর্থ হন।

(২) কিছু ব্যক্তি সুযোগের অপেক্ষা না করেই বিশেষ দক্ষতার গুণে আগেই নেতা হয়ে যান এবং ক্ষমতা ও অধিকারের প্রয়োগ করতে থাকেন।

(৩) এক পরিস্থিতির সফল নেতা অন্য এক পরিস্থিতিতে সাফল্যের সঙ্গে নেতৃত্ব না দিতেও পারেন।

১০.৩.৩ পরিস্থিতিমূলক তত্ত্ব ঃ

এই তত্ত্ব-অনুযায়ী নেতৃত্বদান প্রক্রিয়াটি তিনটি বিশেষ উপাদানের সমাহারের উপর নির্ভর করে। সেগু্ হোল— (১) সামাজিক পরিস্থিতি, (২) ব্যক্তির ক্ষমতা এবং (৩) ব্যক্তির নিকট নেতৃত্বদানের সুযোগ।

এই তত্ত্ব অনুযায়ী বিশেষ পরিস্থিতির মোকাবিলায় মানুষ ব্যক্তি নেতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয় এই দৃষ্টিতে নেতাদের সাধারণভাবে কোন বিশেষ ব্যক্তিত্ব বা দক্ষতা থাকে না। পরিবর্তে পরিস্থিতি কিছু বৈশিষ্ট্যের দাবী করে যেগুলি ব্যক্তিকে 'নেতা' তৈরী করে। একই মানুষ একরকমের পরিস্থিতিতে নেতৃত্ব দিতে পারে কিন্তু আর একরকম পরিস্থিতিতে পারে না এর কারণই হোল ব্যক্তির গুণাবলী নয়, পরিস্থিতিগত বৈশিষ্ট্যই নির্দিষ্ট করে যে কে নেতা হবে। চরম পর্যায়ে এই তত্ত্ব বিশ্বাস করে, যে কোন ব্যক্তি নেতা হতে পারে যদি সে এমন পরিস্থিতির সম্মুখীন হয় যেখানে তার নেতৃত্বের প্রয়োজন।

১০.৩.৪ পরিস্থিতি-তথা-ব্যক্তিত্বমূলক তত্ত্ব (Sitnation and Personality theory) ঃ

এই তত্ত্ব-অনুযায়ী বিভিন্ন পরিস্থিতি বিভিন্ন ধরণের নেতার জন্ম দেয়। এই দৃষ্টিকোন থেকে বলা যায় যে, এক বিশেষ ধরনের পরিস্থিতিতে কোন এক বিশেষ ধরণের নেতার জন্ম হয় এবং তার নেতৃত্বই সবচেয়ে কার্যকরী হয়। আবার অন্য এক ধরণের পরিস্থিতিতে অন্য এক বিশেষ ধরণের নেতার জন্ম হয় এবং তার নেতৃত্বই তখন সবচেয়ে সফল হয়।

ফ্রিড্লার (Friedler)-এর ছাঁচ অনুসারে বলা যায় যে, নেতার কার্যকারীতা নির্ভর করে তার অনুপ্রাণিত করার ক্ষমতার উপর এবং পরিস্থিতি মোকাবিলার ক্ষমতার উপর, যার দ্বারা বোঝা যায় নেতা প্রাথমিকভাবে কর্মের দিকে ঝোঁক সম্পন্ন নাকি সম্পর্কের দিকে ঝোঁক সম্পন্ন।

ফ্রিড্লার-এর মতে তিনটি প্রধান পরিস্থিতিমূলক উপাদান হোল— (১) নেতা এবং গোষ্ঠীসদস্যদের মধ্যে সম্পর্ক যা অনুকূল প্রতিকূল দুই-ই হতে পারে; (২) গোষ্ঠী যেসব কার্য সমাধা করতে চায় সেগুলির কাঠামোগত মাত্রা যা পরিষ্কার অপরিষ্কার দুই-ই হতে পারে এবং গোষ্ঠীসদস্যদের ওপর প্রয়োগ করার যে ক্ষমতা নেতার থাকে তার পরিমাণ এবং তার নিয়ন্ত্রণ।

এই তিন উপাদানকে একত্রে মেনে নিয়েই আমরা একজন নেতার পক্ষে কোন্ পরিস্থিতি কতটা অনুকূল তা মাপতে পারি। কিন্তু ফ্রিডলার বলেছেন যে শুধু পরিস্থিতিই এক্ষেত্রে সব নয়, নেতার ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্যের দিকেও দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। কারণ ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যের উপর নির্ভর করেই কিছু নেতা কোন কোন পরিস্থিতিতে চরমভাবে সফল হতে পারে যখন অন্য নেতারা ব্যর্থ হন। কাজেই পরিস্থিতি তথা ব্যক্তিত্ব এই দুই বিষয়কে একসঙ্গে নেতৃত্ব অর্জন এবং সফল নেতৃত্বদানের নির্ধারক বলা যায়।

১০.৪ প্রশ্নাবলী ঃ

(১) গোষ্ঠীক্রিয়ায় গোষ্ঠীকর্মীর কি করণীয়?

(২) নেতৃত্বের অর্থ কি?

(৩) নেতার প্রকারভেদ উদাহরণ সহযোগে বিশ্লেষণ কর।

(৪) নেতৃত্ব দানের মূল তত্ত্বগুলি ব্যাখ্যা কর।

একক ১১ ❑ সামাজিক গোষ্ঠীকর্মের নথি সংরক্ষণ, তদারকি ও মূল্যায়ন

গঠন ঃ

১১.১ গোষ্ঠীকর্মের নথি সংরক্ষণ
১১.২ গোষ্ঠীকর্মে তত্ত্বাবধান
১১.৩ গোষ্ঠীকর্মে মূল্যায়ন
১১.৪ প্রশ্নাবলী

১১.১ গোষ্ঠীকর্মের নথি সংরক্ষণ

● নথির সংজ্ঞা (Definition of documents/records) ঃ গোষ্ঠীকর্মের নথি বলতে বুঝায় গোষ্ঠীর পটভূমিকায় পরিকল্পনা ও কর্মসূচী সংলগ্ন বিভিন্ন আন্তকর্মের জন্য গৃহীত পদ্ধতিগুলিকে এবং সেই সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য সাজিয়ে বিশ্বাসযোগ্য উপস্থাপনা।

● নথির গুরুত্ব (Importance of documents/records) ঃ

নথি সর্বক্ষেত্রেই গুরুত্বপূর্ণ। গোষ্ঠীকর্মের ক্ষেত্রেও নথির প্রয়োজন সীমাহীন। গোষ্ঠীকর্মের প্রেক্ষিতে নথি নিম্নলিখিত কাজগুলি সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার।

— যা যা ঘটেছে নথি তার একটা হিসাব দেয় বা চিত্র তুলে ধরে।

— নথি যেমন প্রকৃত ঘটনার বর্ণনা দেয়, তেমনি দেয় আদেশ, মতামত, মন্তব্য, প্রস্তাব ইত্যাদি।

— নথি ভবিষ্যতের জন্য পরিকল্পনা তৈরীতে সাহায্য করে।

● নথিভুক্তির নীতিসমূহ (Principles of documenting) ঃ

নথিভুক্তির সময় গোষ্ঠীকর্মীকে কতগুলি বিশেষ নীতি মেনে চলতে হয়। সেগুলি হলো ঃ

— নমনীয় তার নীতি (Principle of flexibility) ঃ গোষ্ঠীকর্মী যে সংস্থার অধীনে কাজ করে সেই সংস্থার উদ্দেশ্যগুলি সম্পর্কে ভালভাবে অবহিত হবে। সেইসঙ্গে তাকে সচেতন থাকতে হবে যাতে সংশ্লিষ্ট সংস্থার উদ্দেশ্য পূরণের প্রয়োজন অনুযায়ী নথিভুক্তিকরণ সম্ভব হয়। কোন বদ্ধমূল ধারণার অনুবর্তী না হয়ে এক্ষেত্রে তাকে নমনীয় মনোভাবের অধিকারী হতে হবে।

— নির্বাচনের নীতি (Principle of selection) ঃ গোষ্ঠীসংক্রান্ত সমস্ত ঘটনা ও তথ্যের নথিভুক্তির প্রয়োজন নেই। অনেক ঘটনা এবং তথ্যের মধ্যে যেগুলি গুরুত্বপূর্ণ সেগুলিকে

চিহ্নিত করন বা নির্বাচন করে নেওয়া প্রয়োজন। এক্ষেত্রে তাকে বিবেচনাবোধের পরিচয় দিতে হবে এবং এই নীতির প্রতি আস্থা রাখতে হবে।

— স্বচ্ছভাবে লিপিবদ্ধ করার নীতি (Principle of lucidity) ঃ নথি অত্যন্ত স্বচ্ছ ও সরল ভাষায় লিপিবদ্ধ করা উচিত। তাছাড়া ঘটনাগুলি বা তথ্যগুলি পারস্পরিকভাবে সূত্রবদ্ধ রাখা দরকার। সেইসঙ্গে ঘটনার বা তথ্যের প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যাও সংযোজিত করে রাখা দরকার।

— গোপনীয়তার নীতি (Principle of confidentiality) ঃ নথি হল বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণপত্র। পেশাকেন্দ্রিক নীতির চেতনা অনুযায়ী নথির বিষয়বস্তু রক্ষার ক্ষেত্রে গোপনীয়তা বজায় রাখতে হবে। কোনভাবেই তা সকলের কাছে প্রকাশ করা চলবে না।

কর্মীদের দায়িত্বগ্রহণের নীতি (Principle of responsibility taking by workers) ঃ নথিভুক্তিকরণ বা নথিরক্ষার প্রক্রিয়ায় কর্মী আন্তরিকভাবে দায়িত্ব গ্রহণ করবে। পেশাদায়ীত্বের উৎকর্ষতার ভিতর দিয়ে কর্মীকে সে দায়িত্ব নিষ্ঠার সঙ্গে বহন করে চলতে হবে।

● **নথির প্রকারভেদ (Type of documents/records)** ঃ গোষ্ঠীকর্মীর দায়িত্বের এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ হল নথি প্রস্তুতকরণ। সামাজিক গোষ্ঠীক্রিয়ায় সাধারণতঃ তিন ধরনের নথির ব্যবহার দেখা যায়।

— রাশিভিত্তিক নথি (Statistical document) ঃ এই ধরনের নথিতে সংস্থা বা গোষ্ঠী সম্পর্কে বিভিন্ন ধরনের রাশীগত তথ্য যেমন গোষ্ঠী বা সংস্থার সদস্য সংখ্যা, তাদের বয়স ও শিক্ষাগত যোগ্যতা ইত্যাদি, বৃত্তি, নারী পুরুষের হার, বিভিন্ন কর্মসূচীর সংখ্যা, উপকৃতের সংখ্যা, বিভিন্ন আলোচনাচক্রে উপস্থিতির হার, আর্থিক লেনদেন ইত্যাদির পরিমাণ। এইসব তথ্য বিভিন্ন সূত্র থেকে সংগ্রহ করে উপযুক্তভাবে লিপিবদ্ধ করে রাখতে হয়। এইসব তথ্যগুলি আমরা সাধারণতঃ ব্যক্তি নিবন্ধিকরণ পত্র, গোষ্ঠীর পরিচয় পত্র ইত্যাদি থেকে পেয়ে থাকি।

— পদ্ধতিভিত্তিক নথি (Process record) ঃ গোষ্ঠী কর্মে যেমন যেমন বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়ে থাকে তারই পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা থাকে এই ধরনের নথিতে। গোষ্ঠীর বিভিন্ন ব্যাপারে সদস্যদের ভূমিকা সংক্রান্ত আন্তঃক্রিয়া এবং অংশগ্রহণের উপরই বিশেষ নজর দিয়ে এই ধরনের নথি তৈরী করা হয়। পদ্ধতিভিত্তিক নথিতে শুধুমাত্র কি ঘটে তার উপরই গুরুত্ব দেওয়া হয় এমন হয়, কিভাবে তা ঘটল এবং ব্যক্তির উপর সেই ঘটনার কি প্রভাব পড়ল তার উপরও গুরুত্ব দেওয়া হয়। এইভাবে পদ্ধতি ভিত্তিক নথি পরিস্থিতির ক্রম পরিবর্তনকে বুঝতে সাহায্য করে। পদ্ধতিভিত্তিক নথির অন্তর্গত বিষয়গুলি হল ঃ

— পরিস্থিতি সম্পর্কে প্রাথমিক তথ্যগুলি।

— পরিস্থিতি অনুযায়ী ব্যক্তির অবদান, গোষ্ঠীসদস্যদের অংশ গ্রহণের দ্বারা প্রতিফলিত গোষ্ঠীসদস্যদের মধ্যেকার সম্পর্ক ইত্যাদির নথি।

— গোষ্ঠীর মধ্যে গোষ্ঠী আন্তঃক্রিয়ার স্বরূপ সংক্রান্ত নথি।

— নথির শেষে বিশ্লেষণাত্মক এবং মূল্যায়ন মূলক মন্তব্য। উপরোক্ত সব কয়টি ধরনের নথিই কাজের পদ্ধতি সম্পর্কে আলোকপাত করে।

— কর্মসূচিভিত্তিক নথি (Programme related document) ঃ এই ধরনের নথিতে বিশদ বর্ণনা দেওয়া থাকে গোষ্ঠী কোন কোন্ কাজে নিযুক্ত সে সম্পর্কে। নিয়মমাফিক অনুসন্ধানের মাধ্যমে এ সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্যগুলি পরবর্তী পর্যায়ে নথিভুক্ত করা হয়। সেই সঙ্গে এ সম্পর্কিত বিভিন্ন সভা সম্মেলনের সমস্ত বর্ণনাও বিশদভাবে সংরক্ষণ করা হয়। পরবর্তী কাজের পরিকল্পনা তৈরী করার সময় অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য গোষ্ঠী এই তথ্যগুলির ব্যবহার করে থাকে।

● নথিভুক্তিকরণের গুরুত্ব (Importance of documentation) ঃ সমাজ কর্ম পদ্ধতির এক অবিচ্ছেদ্য অংশ হল নথি লিখন। যেহেতু সামাজিক গোষ্ঠীকর্ম মানুষের সাথে কাজ করার একটি পদ্ধতি বিশেষ, সেহেতু নিয়মমাফিক এবং সঠিকভাবে গোষ্ঠী কার্যাবলী সম্পন্ন করার জন্য নথি সংরক্ষণ অত্যন্ত প্রয়োজন। সেজন্য নথি হলো গোষ্ঠী সম্পর্কিত বিভিন্ন কার্যাবলীর গুণমান উন্নয়নের হাতিয়ার বিশেষ। নথি সংরক্ষণের উপযোগিতাগুলি নিম্নরূপ ঃ

— নথি সমাজ কর্মীকে সমাজ কর্মের দক্ষতা বাড়াতে সাহায্য করে, গোষ্ঠীভুক্ত সদস্যদের ভাল করে বুঝতে এবং কাজকর্মের বিশ্লেষণ ও মূল্যায়নে সাহায্য করে।

— নথি গোষ্ঠীকে এক সম্পূর্ণ শক্তির সমাহার হিসাবে বুঝতে গোষ্ঠীকর্মীকে সাহায্য করে কারণ নথিলিখনের পদ্ধতিকে ভিত্তি করে সে সংশ্লিষ্ট গোষ্ঠী সম্পর্কে সম্পূর্ণভাবে অবহিত হয়।

— নথি গোষ্ঠীকর্মীকে তার নিজের উন্নতির এবং গোষ্ঠীসদস্যদের পরিবর্তন এবং উন্নতির প্রমাণ দাখিল করে। তাই নথিকে বলা যায় গোষ্ঠী এবং তার কাজের মূল্যায়নের ক্ষেত্রে সাহায্যকারী হাতিয়ার।

— গোষ্ঠীকর্মী এবং সংস্থা বা গোষ্ঠী উভয়ের দিক থেকেই নথি তত্ত্বাবধানের জন্য প্রয়োজনীয় বিষয়বস্তুর যোগান দেয়। সামাজিক গোষ্ঠী কর্মী এর দ্বারাই নিজের দক্ষতা বৃদ্ধি ঘটায় এবং সংস্থা বা গোষ্ঠীকে আরও উন্নত সেবাদানে সক্ষম হয়। নথি ভবিষ্যৎ কর্মসূচী পরিকল্পনার প্রয়োজনীয় উৎসের যোগান দেয় কারণ নথি হল প্রকাশিত বা অপ্রকাশিত সব রকমের পূর্ণ ও অপূর্ণ সব ধরনের স্বার্থ এবং চাহিদার হিসাবের প্রতিফলন নবনিযুক্ত সমাজ কর্মী যাতে গোষ্ঠীর কাজের ধারাবাহিকতা রক্ষা করতে পারে সে জন্য নথি অতীতের নানা গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের যোগান দেয়।

— বিভিন্ন সংস্থার কাছ থেকে অর্থনৈতিক সহায়তা বা সুযোগ লাভের জন্য গোষ্ঠীর উপযোগিতা ও সক্ষমতার পরিচয় দেওয়ার ক্ষেত্রেও নথিগুলি সাহায্য করে।

— গোষ্ঠীকার্য রূপায়নের ক্ষেত্রে নানা ধরনের অসুবিধার সম্মুখীন হওয়া এক স্বাভাবিক ঘটনা। সেগুলিকে দূর করার ক্ষেত্রেও নথি নানাসময় নানাভাবে সাহায্য করে থাকে।

— বিভিন্ন আলোচনা সভায় অনুপস্থিত সদস্যদের সেইসব সভায় আলোচিত বিষয়সমূহ এবং গৃহীত সিদ্ধান্তগুলি সম্পর্কে তথ্যের যোগান দিয়ে পরবর্তী সভার জন্য তাদের প্রস্তুতিকরণে সাহায্য করে থাকে।

— সামাজিক গবেষণার ক্ষেত্রেও নথির মূল্য অপরিসীম।

১১.২ গোষ্ঠী কর্মে তত্ত্বাবধানে ঃ

(ক) সংজ্ঞা (Definition) ঃ তত্ত্বাবধান এক সক্ষমকারী পদ্ধতি (enabling process) যেখানে তত্ত্বাবধায়ক (supervisor) যাদের তত্ত্বাবধান করে তাদের সঙ্গে নিজের সম্পর্কের মাধ্যমে গোষ্ঠীর কাজের ক্ষেত্রে উন্নতি সাধন করে থাকে। কর্মসূচীর উদ্দেশ্য সাধনের জন্য উপযুক্তভাবে এবং দক্ষতার সঙ্গে কার্যাবলী সম্পাদন করার জন্য গোষ্ঠীর কাজের তত্ত্বাবধান প্রয়োজন। যাদের তত্ত্বাবধান করা হয় তাদের আচরণকে তত্ত্বাবধানের দ্বারা পরিমার্জিত করা হয় এবং এভাবে তাদের গুণমানে বৃদ্ধি ঘটানো হয়।

(খ) তত্ত্বাবধানের পদ্ধতি (Methods of Supervision) ঃ তত্ত্বাবধান কার্যক্ষেত্রে প্রত্যক্ষভাবেও হতে পারে আবার একটি সম্মেলন, গোষ্ঠী সভা, গোষ্ঠী আলোচনা, প্রতিবেদন এবং নথির নিরীক্ষন, উপভোক্তাদের প্রতিনিধিত্ব যারা করেন তাদের কাছ থেকে সংগ্রহ করা মতামত ইত্যাদির মাধ্যমে পরোক্ষভাবেও হতে পারে। যেমন ভাবেই হোক তত্ত্বাবধায়ক এবং যাদের তত্ত্বাবধান করা হয় এই উভয়পক্ষই এই ব্যাপারে জড়িত থাকে।

(গ) তত্ত্বাবধায়কের প্রকারভেদ (Type of supervisor) ঃ তত্ত্বাবধানের প্রকৃতির উপর নির্ভর করে তত্ত্বাবধায়কদের তিন ভাগে ভাগ করা যায়। সেই ভাগগুলি হল ঃ

— স্বৈরতান্ত্রিক তত্ত্বাবধায়ক (Antocrativ supervisor) ঃ গোষ্ঠী পরিচালনার ব্যাপারে সমস্ত রকম সিদ্ধান্ত যিনি নিজেই নেন তিনি স্বৈরতান্ত্রিক তত্ত্বাবধায়ক। এই ধরনের তত্ত্বাবধায়ক অধিকার ও কর্তৃত্ব কারও সাথে ভাগ করে নিতে রাজী নয়। তারা সবসময় অধস্তন সদস্যদের সব সময় আদেশ নিয়ে কাজ করিয়ে নিতে চায়। এইরকম তত্ত্বাবধানের ফলাফল দাঁড়ায় যে, কোন কর্মী তার নিজের ইচ্ছায় বা স্বতঃস্ফুর্তভাবে কাজ করে না, তারা সর্বদা আদেশ পালন করতে অভ্যস্থ হয়ে পড়ে। আবার সৃজনশীল কর্মীরা এইরকম অবস্থায় ক্লান্ত ও বিরক্ত বোধ করে। কর্মীরা ভীতির শিকার হয়, সুরক্ষার অভাব বোধ করে এবং হতাশা ও হীনমন্যতায় ভোগে।

— অবাধ স্বাধীনতায় বিশ্বাসী তত্ত্বাবধায়ক (Enormus freedom giving superior) ঃ স্বৈরতান্ত্রিক তত্ত্বাবধায়কের ঠিক বিপরীত মেরুতে অবস্থান এই ধরনের তত্ত্বাবধায়কের। এক্ষেত্রে কর্মীদের ক্ষমতার উপর মাত্রাতিরিক্ত আস্থা রাখার জন্য তারা কাজের ক্ষেত্রে

অগাধ স্বাধীনতা ভোগ করে। এই রকম তত্ত্বাবধানের দুর্বলতা হলো যে, কর্মবিমুখ কর্মীসদস্য কাজে ফাঁকি দেওয়ার সুযোগ পায় এবং স্বভাবতঃই প্রগতি বাধাপ্রাপ্ত হয়। কর্মীদের মধ্যে কোন নীতিবোধ জাগ্রত হয় না, দায়িত্ব জ্ঞান ও আসে না। এই দায়িত্বশীলতার অভাব উৎপাদনশীলতার হারকে বৃদ্ধি পেতে দেয় না।

গণতান্ত্রিক তত্ত্বাবধায়কে (Democratic supervisor) ঃ উপরোক্ত দুই ধরনের তত্ত্বাবধায়কের মাঝামাঝি অবস্থায় থাকেন গণতান্ত্রিক তত্ত্বাবধায়ক। কর্মসূচী পরিকল্পনায়, বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহনে তিনি তার অধস্তন কর্মীদের যোগদান করার দেন। পরিকল্পিত কর্মসূচী রূপায়নের প্রতিটি স্তরে তিনি কর্মীদের সাথে উপস্থিত থেকে তাদের উৎসাহ দেন এবং সঠিক পথের সন্ধান দেন। এইরকম তত্ত্বাবধানের ফলাফল দাঁড়ায় যে, কর্মীসদস্যরা নিজেদের ইচ্ছায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে কাজ করে। কারণ তাদের মধ্যে উচ্চ নীতিজ্ঞান এবং দায়িত্বশীলতার বোধ জাগ্রত হয়। কর্মীরা সকলেই নিজ নিজ ক্ষমতা অনুযায়ী দায়িত্ব নিতে আগ্রহী হয়। ফলে আরও বেশী উৎপাদনশীলতা এবং অবশেষে ব্যক্তি ও গোষ্ঠীস্বার্থ পূরণের পথে অগ্রসর হওয়া সহজ হয়।

(ঘ) তত্ত্বাবধায়কের দায়দায়িত্ব (Role and Responsitilities of Supervisor) ঃ গোষ্ঠীর কার্যাবলী বিশ্লেষণ করলে কতগুলি সাধারণ কার্যাবলীর সন্ধান পাওয়া যায় যেগুলি সকল রকমের গোষ্ঠীতেই তত্ত্বাবধায়ককে করতে হয়। সেগুলি হল ঃ

— প্রশাসনমূলক কাজ (Administrative work) ঃ অধস্তন কর্মীদের মধ্যে তত্ত্বাবধায়ক কাজের দায়িত্ব ভাগ করে দেন এবং কাজের জন্য প্রয়োজনীয় সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা করে দিয়ে কাজটি সম্পূর্ণ করে নেন।

— শিক্ষামূলক কাজ (Educational work) ঃ তত্ত্বাবধায়ক জ্ঞান, দক্ষতা এবং অভিজ্ঞতা সবদিক থেকে তার অধস্তন কর্মীদের তুলনায় বেশী ক্ষমতার অধিকারী হয়ে থাকেন। তাই তিনি প্রয়োজনে নিজের জ্ঞান, অভিজ্ঞতা, দক্ষতার সাহায্যে সহকর্মীদের গুণগত উৎকর্ষতা বৃদ্ধিতে সহায়ক হবেন।

— সহায়তামূলক কাজ (Assistance giving) ঃ কাজের জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান, দক্ষতা, অভিজ্ঞতার অভাব ছাড়া আরও অনেক রকম বাধাবিঘ্ন বা সমস্যার মুখোমুখি হতে হয় গোষ্ঠী বা গোষ্ঠীর সদস্যদের। অধস্তন কর্মীদের বা সদস্যদের সেই সব বাধা দূর করার ব্যাপারে তত্ত্বাবধায়ক সহায়তা দেবেন এবং সেই সঙ্গে প্রতিমুহূর্তে তাদের নীতিবোধকে উদ্দীপ্ত করবেন।

— সংযোগমূলক কাজ (Maintaing contact) ঃ তত্ত্বাবধায়কের অধীনে যেমন অধস্তন কর্মীরা থাকেন ঠিক তেমনি তত্ত্বাবধায়ক যাদের অধীনে কাজ করেন সেই সব উর্ধ্বতন ব্যক্তিরাও থাকেন। সুতরাং কোন কাজের ক্ষেত্রেই তত্ত্বাবধায়ক শেষ কথা নয়। সেজন্য কর্মীদের সঙ্গে উর্ধ্বতন ব্যক্তিদের একটা যোগাযোগ রক্ষা করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তত্ত্বাবধায়ক এখানে

যোগাযোগ রক্ষার দায়িত্ব পালন করেন।

— মূল্যায়ন মূলক কাজ (Evaluation) ঃ তত্ত্বাবধায়ক তার অধীনে কর্মরত প্রতিটি ব্যক্তিসদস্যের সম্পূর্ণ কাজের উদ্দেশ্যের হিসাব রাখেন। সেই হিসাবের উপর নির্ভর করে তার বর্তমান কাজের মূল্যায়ন করেন এবং ভবিষ্যৎ উন্নতির পথ প্রদর্শন করেন।

(ঙ) তত্ত্বাবধায়কের প্রয়োজনীয় গুণাবলী (Necessary qualities of Supervisor) ঃ **ব্যক্তি লক্ষ্য ও গোষ্ঠী লক্ষ্যের মধ্যে সমন্বয়ের মাধ্যমে সুষ্ঠুভাবে কর্মসম্পাদন করতে হলে তত্ত্বাবধায়ককে নিম্নলিখিত গুণাবলীর অধিকারী হতে হবে।**

— তত্ত্বাবধায়কের পক্ষপাতশূন্য হওয়া উচিত। সেই সঙ্গে স্থির লক্ষ্যযুক্ত এবং সুস্থ মানসিকতা সম্পন্ন হতে হবে।

— তত্ত্বাবধায়কের মধ্যে পথ প্রদর্শনের সহায়তা দানের ইচ্ছাসদাজাগ্রত থাকা উচিত।

— তত্ত্বধায়কের সমস্ত আচার আচরণে মানবিক স্পর্শ থাকবে। মানবিক স্পর্শ বা Human touch-এর অন্তর্নিহিত অর্থ হল ঃ

H— Hear him out (অধীনস্ত কর্মী বা সদস্যদের কথা মনযোগ সহকারে শুনতে হবে)

U— Understand his feeling (তার অনুভূতিগুলি বুঝতে হবে)

M— Motivate him (তাকে কাজে অনুপ্রেরণা দিতে হবে)

A— Acknowledge his effects (তার প্রচেষ্টাকে স্বীকৃতি ও মূল্যদিতে হবে)

N— New—keep him informed(তাকে সমস্তরকম তথ্য জানাতে হবে)

T— Tain him (তাকে তৈরী করে নেওয়ার জন্য প্রশিক্ষণ দাও)

O— Open his eyes (তাকে সচেতন কর)

U— Uniqueness (তার মৌলিক গুণ ও বৈশিষ্ট্যের মূল্য দাও)

C— Contact him regularly (নিয়মিত যোগাযোগ রাখতে হবে)

H— Honour him as a person (ব্যাক্তি হিসাবে তাকে সম্মান দিতে হবে)

(চ) তত্ত্বাবধানের নীতিসমূহ (Principles of supervision) ঃ

প্রকৃত ও সুষ্ঠুভাবে কাজের তত্ত্বাবধান করতে গেলে কতগুলি নীতি মেনে চলতে হয়। সেগুলি হল ঃ

— **তত্ত্বাবধান উৎপাদন-কেন্দ্রিক না হয়ে ব্যক্তি-কেন্দ্রিক হওয়া উচিত।**

— **কোন্ কাজ কিভাবে করা হয়েছে তার উপরই তত্ত্বাবধায়কের গুরুত্ব দেওয়া উচিত। কতটা পরিমাণ কাজ করা হয়েছে তা যেন প্রাধান্য না পায়।**

— **কোন্ কর্মী কতটা ভাল কাজ করতে পারল তার হিসাব না করে তত্ত্বাবধায়কের উচিত**

কোন্ কর্মী কতটা ভাল হয়ে উঠতে পারল তার হিসাব রাখা।

— কর্মসূচীর মধ্যে গতিশীলতা থাকলে ভুলের সম্ভাবনা বাড়ে। শিকার পথে অনুকূল ভুলগুলিকে চিনে নিতে হবে এবং মেনে নিতে হবে।

— তত্ত্বাবধায়ক অধস্তন কর্মীদের কখনই ভয় দেখিয়ে কাজ আদায় করবেন না। কাজের লক্ষ্যে, কাজ না করার ফলাফল বুঝিয়ে দিয়ে কাজ তাদের কাজে অংশগ্রহণে আগ্রহী করে তোলা উচিত।

— প্রয়োজনের অতিরিক্ত তত্ত্বাবধান কর্মীদের উন্নতির পথে বাধাস্বরূপ।

১১.৩ গোষ্ঠীকর্মে মূল্যায়ন ঃ

(ক) মূল্যায়নের সংজ্ঞা (Definition of evaluation) ঃ মূল্যায়ন সামাজিক গোষ্ঠীকর্মের সেই অংশ যেখানে কর্মী সংস্থার উদ্দেশ্য এবং কার্যাবলী অনুযায়ী গোষ্ঠী অভিজ্ঞতার গুণমান পরিমাপে তৎপর হয়। ব্যক্তির বিকাশ, কর্মসূচীর বিষয়বস্তু এবং কর্মীর ভূমিকা এই তিন উপাদানের উপর নির্ভর করেই মূল্যায়ন হতে পারে কারণ এই তিনটি বিষয়ই গোষ্ঠীর সাফল্যকে প্রভাবিত করে।

(খ) মূল্যায়নের স্তর বা পর্যায় (Stages of evaluation) ঃ

ব্যক্তি এবং গোষ্ঠীর মুল উদ্দেশ্য নির্ধারনের মধ্য দিয়ে শুরু হয় মূল্যায়ন। ব্যক্তি আচরণ এবং গোষ্ঠী আচরণ চিহ্নিত করে গোষ্ঠীর উদ্দেশ্যগুলির বিশ্লেষণ করা অত্যন্ত জরুরী। কারণ যে সব সদস্য এর সাথে জড়িত রয়েছে তাদের সুস্থ বিকাশের পরিচায়ক হয় তাদের আচরণসমূহ।

এর পরবর্তী পর্যায় হল কর্মসূচীগত অভিজ্ঞতাগুলির বিন্যাসের ব্যবস্থা করা কারণ সেগুলি বিকাশের সুযোগ করে দেয়। এইসব অভিজ্ঞতার সময়সীমা স্বল্পকাল বা দীর্ঘকাল দুইই হতে পারে কারণ এর স্থায়িত্ব নির্ভর করে অন্তর্নিহিত নিকট এবং সুদূর উদ্দেশ্যগুলির প্রকৃতির উপর।

পরবর্তী পর্যায়ে আসে নথিভুক্তিকরণ। কর্মী সমস্ত সদস্যদের আচরণের এবং এক সদস্যের সঙ্গে অন্য সদস্যের পারস্পরিক সম্পর্ক কি রকম সে সম্পূর্ণ নথি সংরক্ষণ করা হয়। এই ধরনের মূল্যায়নহাত নিরিক্ষণে কর্মী বিকাশ এবং উন্নয়নের নিয়মাবলীর প্রয়োগ করে থাকে এবং ঐ বিশিষ্ট আচরণগুলি ব্যক্তি এবং গোষ্ঠীর পক্ষে সঠিক পরিস্থিতি সঙ্গত কিনা তার বিচার করে থাকে।

সাধারণভাবে মূল্যায়নের পরে গোষ্ঠী এবং ব্যক্তি উভয় প্রকার উদ্দেশ্যই পরিমার্জনের ব্যবস্থা করা হয়। যদি সমস্ত প্রমাণপত্র ব্যাখ্যা দেয় যে চলতি কর্মসূচী জনগণের চাহিদা এবং কর্মসূচীর উদ্দেশ্য পূর্ণ করতে পারছে তবে সেই কর্মসূচী চলতে থাকবে। কিন্তু যদি দেখা যায় যে গোষ্ঠী পরিস্থিতির পরিবর্তন করা প্রয়োজন তখন

অবশ্যই সেই পরিবর্তন আনতে উদ্যোগী হতে হবে।

(গ) মূল্যায়নের গুরুত্ব (Importance of evaluation) ঃ মূল্যায়নের গুরুত্ব অপরিসীম কারণ এর দ্বারাই কর্মী জানতে পারে যে ব্যক্তি তথা গোষ্ঠী উদ্দেশ্য কি পরিমাণে সিদ্ধ হচ্ছে। ক্রমাগত মূল্যায়ন ছাড়া, স্থিরিকৃত সিদ্ধান্ত অচল হয়ে যায়, যুগোপযোগিতা হারিয়ে ফেলে। কর্মসূচীও হারায় তার গতিশীলতা এবং গোষ্ঠী ব্যর্থ হয় তার চাহিদা পূরণে।

প্রত্যেক গোষ্ঠী বা সংস্থা এবং প্রত্যেক কর্মীর প্রাথমিক দায়িত্ব হলো চিন্তাশীল মূল্যায়নের আলোকে কোথায় কখন মূল্যায়নের প্রয়োগ হবে সেগুলি চিহ্নিত করা এবং পুনর্ভাবনার বিষয়ে অন্তর্ভুক্ত করা।

(ঘ) মূল্যায়নের আধার বা ভিতরের বস্তু (Content of evaluation) ঃ গোষ্ঠীকর্মী মূল্যায়ক হিসাবে দুটি বিষয়ের মূল্যায়ন করবে। সেগুলি হলো ঃ

(১) ব্যক্তির উন্নতির মূল্যায়ন (Evaluation of individual growth) ঃ ব্যক্তিকে নিয়েই গোষ্ঠী গঠিত হয়। কিছু প্রয়োজন বা ইচ্ছা পূরণের তাগিদে ব্যক্তি গোষ্ঠীভূক্ত হয়। সেজন্য সামাজিক গোষ্ঠীকর্মের মূল উদ্দেশ্যই হলো নিয়মের ভিতরে থেকে ঐ সব ইচ্ছা পূরণে সহায়ক হওয়া। কিন্তু গোষ্ঠীভূক্ত ব্যক্তির প্রয়োজন বা ইচ্ছা কতটা সাধিত হলো তা বুঝতে হলে ব্যক্তির উন্নতির মূল্যায়ন করা দরকার। ব্যক্তির দক্ষতা বৃদ্ধি, সমস্যা সমাধানে গৃহীত পদ্ধতি, ব্যবহার জনিত কৌশল, গোষ্ঠী অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে জ্ঞানার্জন ইত্যাদি মূল্যায়ন করা হয়। নিম্নলিখিত সারণী থেকে ব্যক্তির উন্নতি জনিত মূল্যায়নের বিষয়গুলি আরো স্পষ্টভাবে বোঝা যাবে।

সারণী

ব্যক্তির গুণ	কতখানি উন্নতি বা পরিবর্তন ঘটেছে		
	উন্নতি হয়নি	মোটামুটি হয়েছে	যথেষ্ট হয়েছে
● গোষ্ঠীতে উপস্থিতি			
● গোষ্ঠীকর্মে অংশগ্রহনের মাত্রা			
● গোষ্ঠীর সঙ্গে যোগাযোগ			
● ধৈর্য বা সহ্য ক্ষমতা			
● নেতৃত্ব গুণ			
● বিশ্বাসযোগ্যতা			
● আত্মসমান			
● ভাবাবেগ নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা			
● সংবেদনশীলতা			
● নতুন জ্ঞানার্জন			

ব্যক্তির গুণ	কতখানি উন্নতি বা পরিবর্তন ঘটেছে		
	উন্নতি হয়নি	মোটামুটি হয়েছে	যথেষ্ট হয়েছে
● অন্ধবিশ্বাসের উর্ধ্বে উঠা			
● আলোচনা করার ক্ষমতা বৃদ্ধি			
● গোষ্ঠীতে অবস্থান			
● গোষ্ঠীর প্রতি আনুগত্য			
● কাজ করার ধরন			
● সমস্যা সমাধানের ক্ষমতা			

উপরোক্ত ক্ষেত্রগুলিতে ব্যক্তির কতখানি উন্নতি হয়েছে তা মূল্যায়নের মাধ্যমেই তার সার্বিক মূল্যায়ন করা সম্ভব। গোষ্ঠী কর্মীকে এই কাজটি তাই আন্তরিকতা, নিরপেক্ষতা এবং দক্ষতার সঙ্গে করতে হয়।

(১) গোষ্ঠীর মূল্যায়ন (Evaluation of the Group) ঃ

ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব গঠন এবং তার ব্যক্তিজীবনের ইচ্ছা পূরণের অন্যতম প্রধান মাধ্যমে হলো গোষ্ঠী। সেজন্য গোষ্ঠীকর্মীর অন্যতম কাজ হলো গোষ্ঠীর উন্নতি ও প্রভাবের বিষয়টিকে মূল্যায়ন করা। ডগলাস (Douglas) এই ধরনের মূল্যায়নের একটি মাপকাঠি দিয়েছেন। সেটি এরকম ঃ

বিষয়	মাপকাঠি
● গোষ্ঠীর লক্ষ্য কতটা পরিষ্কার	— তেমন লক্ষ্য নেই
	— লক্ষ্য নিয়ে ধোঁয়াশা রয়েছে
	— সাধারণভাবে লক্ষ্য সম্পর্কে ধারণা রয়েছে
	— লক্ষ্য পরিষ্কার
	— লক্ষ্য খুবই পরিষ্কার
● গোষ্ঠীতে কতখানি খোলামেলা ভাব বা বিশ্বাসের পরিবেশ রয়েছে	— নেই
	— সামান্য রয়েছে
	— মোটামুটি রয়েছে
	— ভাল পরিমাণে রয়েছে
	— যথেষ্ট রয়েছে
● গোষ্ঠী সদস্যেরা কতটা সংবেদনশীল	— চেতনা নেই
	— অধিকাংশ সদস্যই নিজের মধ্যে নিমজ্জিত

	— মোটামুটি রয়েছে
	— ভাল পরিমাণেই সংবেদনশীলতা রয়েছে
	— লক্ষ্যণীয় সংবেদনশীলতা রয়েছে
• পদ্ধতিতে কতটা গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে	— দেওয়া হয়নি
	— সামান্য গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে
	— কিছুটা গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে
	— বিষয় এবং পদ্ধতি দুটিতেই যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।
	— পদ্ধতির ব্যাপারে অত্যন্ত সচেতন।
• গোষ্ঠী নেতৃত্বের প্রয়োজন কিভাবে মেটানো হয়েছে	— মেটানো হয়নি
	— এক ব্যক্তি কেন্দ্রিক নেতৃত্ব
	— কিছুটা নেতৃত্ব প্রশিক্ষণ রয়েছে
	— নেতৃত্বের দায়িত্ব বর্ণিত হয়েছে
	— নমনীয়তা এবং সৃষ্টিধর্মীতার ভিত্তিতে নেতৃত্বের প্রয়োজন মেটানো হয়েছে।
• গোষ্ঠী সিদ্ধান্ত কিভাবে গৃহীত হয়েছে	— কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছনো যায়নি।
	— কয়েকজনে মিলে সিদ্ধান্ত নিয়েছে
	— অধিকাংশের সম্মতিতে গৃহীত হয়েছে
	— সকলকে সিদ্ধান্ত গ্রহণে সামিল করার চেষ্টা হয়েছে
	— পূর্ণ অংশগ্রহণের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ।
গোষ্ঠী সম্পদ কত ভালভাবে ব্যবহৃত হয়েছে	— প্রায় হয়নি।
	—সামান্য হয়েছে।
	— মোটামুটি হয়েছে।
	— ভালভাবে হয়েছে।
	— সম্পূর্ণ ও কার্যকরীভাবে হয়েছে।
গোষ্ঠীর প্রতি আনুগত্যের মাত্রা এবং যুক্ত থাকার অনুভূতি	— নেই
	— সামান্য পরিমাণে বিদ্যমান
	— মোটামুটি রয়েছে
	— ভালভাবেই রয়েছে।
	— প্রবলভাবে রয়েছে।

উপরোক্ত আটটি বিষয়ে গোষ্ঠীর অবস্থান কোথায় তার মূল্যায়নের ভিত্তিতে গোষ্ঠীর সার্বিক মূল্যায়নের কাজে গোষ্ঠী কর্মী নিজেকে যুক্ত করবেন।

(৩) গোষ্ঠীতে সদস্যদের অবদানের মূল্যায়ন (Evaluation of members group contribution) ঃ গোষ্ঠী গঠন, পরিচালন, কর্মসূচী গ্রহণ ও রূপায়ন ইত্যাদি ক্ষেত্রে এক একজন সদস্যের এক একরকম অবদান থাকে। ব্যক্তির মধ্যে উৎসাহ ও দক্ষতায় পার্থক্য থাকার জন্য গোষ্ঠীতে অবদানের ক্ষেত্রেও পার্থক্য থাকে। গোষ্ঠীকর্মীর তাই মূল্যায়নের তৃতীয় ক্ষেত্রটি হলো গোষ্ঠী সদস্যদের গোষ্ঠীর প্রতি অবদানের ক্ষেত্রটি। বার্ণস্টেন (Bernstein) -এর দেওয়া নিম্নলিখিত সারনীটি এজন্য ব্যবহার করা যেতে পারে।

সারণী

(ক)	গঠনমূলক অংশগ্রহণ	সদস্যের নাম
—	আগ্রহ আছে কিন্তু অসাধারণ অংশগ্রহণ নয়	
—	সামান্য অবদান যেমন কিছু গোছগাছ করে দেওয়া	
—	আরো বেশী প্রয়োজনীয় অবদান নতুন সদস্যের চিন্তাপ্রসূত অন্তর্ভূক্তি	
—	যথেষ্ট গুরুত্বপুর্ণ কাজের দায়িত্ব গ্রহণ	
—	অসাধারণ ভূমিকা গ্রহণ যেমন বিবাদ মেটানো, সঠিকভাবে আলোচনা চালানো	
(ক)	ধ্বংসাত্মক অংশগ্রহণ	সদস্যের নাম
—	অমনযোগীতা, অনাগ্রহী, অংশগ্রহণের অভাব	
—	উপহাস করা, অধৈর্যভাব	
—	পরিকল্পনা গ্রহণ ও রূপায়নে খোলাখুলিভাবে বিরোধীতা	
—	গালাগালি দেওয়া, আক্রমণাত্মক হওয়া	
—	চরম ধ্বংসাত্মক বা হিংসার পথ নেওয়া	

উপরোক্ত মূল্যায়নের তিনটি ক্ষেত্রই গুরুত্বপূর্ণ। এর মধ্যে কোন একটির মূল্যায়ন পৃথকভাবে করা অর্থহীন। **সব** কয়টি মূল্যায়নকেই সমগুরুত্ব দিয়ে একই সঙ্গে করতে হবে। কারণ এগুলি একটির সঙ্গে আরেকটি অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। গোষ্ঠী কর্মী মূল্যায়নের কাজে উপরোক্ত সারণিগুলির ব্যবহার করতে পারেন অথবা সেগুলিকে প্রয়োজনমত পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করতে পারেন।

১১.৪ প্রশ্নাবলী ঃ

(১) সামাজিক গোষ্ঠী কর্মে নথির মূল্য কতখানি? তার নীতিসমূহের উল্লেখ কর।

(২) ভালভাবে নথি তৈরীর জন্য কি কি গুণের দরকার?

(৩) একজন তত্ত্বাবধায়কের প্রয়োজনীয় গুণাবলী কি?

(৪) মূল্যায়নের সংজ্ঞা ও তার গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর।

(৫) গোষ্ঠীর মূল্যায়ন করতে কি ধরনের সারণী ব্যবহার করতে পারি?

একক ১২ ❑ কর্মসূচী পরিকল্পনার ধারনা

গঠন ঃ

১২.১ সামাজিক গোষ্ঠী কর্মের অর্থ

১২.২ কর্মসূচীর অর্থ

১২.৩ কর্মসূচীর বৈশিষ্ট্য

১২.৪ কর্মসূচী রূপায়নের ক্ষেত্রে মৌলিক অবদান

১২.৫ কর্মসূচী পরিকল্পনার গুরুত্ব

১২.৬ প্রশ্নাবলী

১২.১ সামাজিক গোষ্ঠীকর্মের অর্থ

প্রথম এককে এই বিষয়টি বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। তবুও কর্মসূচী পরিকল্পনা বিষয়টির উপর আলোচনার আগে সামাজিক গোষ্ঠীকর্মের অর্থের উপর আরো কিছুটা আলোকপাত করা যেতে পারে। সমাজ কর্মের (Social work) একটি গুরুত্বপূর্ণ পন্থা বা পদ্ধতি হচ্ছে গোষ্ঠী সমাজ কর্ম (Social Group work)। এই পদ্ধতি গোষ্ঠীর মধ্যে কাজ করার এক শৃঙ্খলাবদ্ধ, পদ্ধতিগত এবং পরিকল্পিত উপায়। এটি এটি সক্ষমকারী পন্থা (enabling process) যার দ্বারা একক সদস্যদের (individual members) নতুন ধারণা (ideas) এবং নতুন দক্ষতার (skills) বিকাশ ঘটাতে, দৃষ্টিভঙ্গীর (outlook/attitude) পরিবর্তন ঘটাতে এবং ব্যক্তিত্বকে গভীরতর করতে সামাজিক গোষ্ঠীকর্ম সাহায্য করে।

১২.২ কর্মসূচীর অর্থ

কর্মসূচী বলতে আমরা সাধারণতঃ বুঝি সন্তোষজনকভাবে সংস্থার প্রয়োজন পূরণ এবং স্বার্থসিদ্ধির জন্য যে কাজ সম্পন্ন করা হয়। গোষ্ঠী সমাজ কর্মে কর্মসূচীর আধুনিক ধারণা হচ্ছে গোষ্ঠীর স্বার্থ সন্তোষজনকভাবে পূরণের জন্য যা কিছু কর্ম সম্পন্ন করা হয় তাই কর্মসূচী। কর্মসূচী ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর সমগ্র ক্রিয়া (activities) সম্পর্ক (relations), পারস্পরিক ক্রিয়া (interactions) এবং অভিজ্ঞতাকে (experience) যুক্ত করে। গোষ্ঠীর কর্মসূচী হচ্ছে পরিকাঠামো বা ক্রিয়ার আকার (frame work) যার মধ্যে গোষ্ঠীগত বা দলগত অভিজ্ঞতা অর্জিত হয়। কর্মসূচী সুচিন্তিতভাবে বা উদ্দেশ্যপূর্ণভাবে (deliberately) পরিকল্পিত হয়ে থাকে এবং কর্মীর সাহায্যে সেই কর্মসূচী রূপায়নে উদ্যোগী হয়ে ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর প্রয়োজন পূরণ করা হয়। সেজন্য কর্মসূচী হলো একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া (continnous process)। কর্মসূচীর শেষ নেই বা তা কখনো শেষ হয়ে যায় না। যেহেতু এটি লক্ষ্যের শীর্ষে পৌঁছনোর একটি উপায় তাই তা সমাপ্ত হওয়ার নয়।

কর্মসূচী প্রধানতঃ গোষ্ঠীসদস্যদের উন্নতি, তাদের কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ এবং কর্মের সুযোগ প্রদানের উদ্দেশ্যে রচনা করা হয়। কর্মসূচী পরিকল্পনা ও বূপায়ন হচ্ছে তারও চেয়ে জরুরী হচ্ছে কিভাবে তা করা হচ্ছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় একটি গোষ্ঠীর দ্বারা কোন একটি নাটক মঞ্চস্থ হওয়া যতটা গুরুত্বপূর্ণ তারও চেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ হলো কিভাবে তা মঞ্চস্থ হবে। কি করা হবে সেটি হলো কর্মসূচী কখন করা হবে, কিভাবে করা হবে সে সম্পর্কিত সিদ্ধান্তই হলো পরিকল্পনা। কর্মসূচী হচ্ছে উপাদান বা হাতিয়ার (tools) গোষ্ঠীর ব্যক্তিগত ও সামাজিক লক্ষ্য অর্জনের জন্য গোষ্ঠীকে সক্ষম করে তুলতে ব্যবহার করে।

১২.৩ কর্মসূচীর বৈশিষ্ট্য

কর্মসূচীর কিছু চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য আছে যা পর্যবেক্ষণ করলে বা যে বিষয়ে যত্ন নিলে গোষ্ঠী সমাজ কর্ম সাফল্য লাভ করতে পারে। সেগুলি হলো ঃ

(ক) গোষ্ঠীর সদস্যদের প্রয়োজন (need) এবং আগ্রহের (interest) উপর ভিত্তি করে রচিত হওয়া উচিত।

(খ) কর্মসূচী গ্রহণের ক্ষেত্রে গোষ্ঠীর সদস্যদের বয়স সাংস্কৃতিক পটভূমি এবং অর্থনৈতিক বৈষম্যের বিষয়টি অবশ্যই বিবেচনায় রাখা দরকার।

(গ) কর্মসূচী অবশ্যই নমনীয় (flexible) হবে এবং গোষ্ঠীর সদস্যদের বিভিন্ন রকমের বা বিভিন্ন ধরনের আগ্রহ এবং প্রয়োজন পূরণের জন্য প্রয়োজনে তা পরিবর্তিত হবে। কর্মসূচিতে সর্বাধিক সংখ্যক মানুষের বা গোষ্ঠী সদস্যের অংশগ্রহনের সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে।

(ঘ) কর্মসূচী গোষ্ঠীগত সিদ্ধান্ত ও পছন্দের উপর ভিত্তি করে রচিত হবে। কোনভাবেই তা চাপিয়ে দেওয়া হবে না।

(ঙ) কর্মসূচী সহজ ও সরলভাবে শুরু হয়ে ক্রমশঃ জটিল আকারে যাবে, যেহেতু গোষ্ঠীর সামর্থ ধীরে ধীরে বৃদ্ধি হওয়ার ফলে কঠিন কর্মসূচী গ্রহণেও সক্ষম হয়ে উঠে।

১২.৪ কর্মসূচী রূপায়নের ক্ষেত্রে মৌলিক উপাদান

গোষ্ঠীগত কর্মসূচী রূপায়নের ক্ষেত্রে তিনটি মৌলিক উপাদান যথা কর্মী, সদস্য এবং কর্মসূচী পরিকল্পনার বিষয়বস্তুর সঠিক সংহতির (integration) প্রয়োজন এবং গোষ্ঠীর সদস্যদের মধ্যে পারস্পরিক ক্রিয়ার আবশ্যকতা রয়েছে। প্রতিটি উপাদানের সঙ্গে আবার অনেকগুলি বিষয় জড়িয়ে আছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, দলের সদস্যদের আগ্রহ ও প্রয়োজন আছে, বিশেষ সামর্থ আছে, তাদের মধ্যে একে অপরের সঙ্গে সম্পর্ক আছে এবং সর্বোপরি কর্মীর সাথে সম্পর্ক আছে। অন্যদিকে গোষ্ঠী কর্মীর পেশাগত জ্ঞান ও দক্ষতা আছে, বিশেষ সামর্থ আছে, সদস্যদের সাথে সম্পর্ক আছে এবং গোষ্ঠীর প্রতিনিধি ও মূল্যবোধের বাহক হিসাবে তার ভূমিকা

আছে। আবার কর্মসূচীর ক্ষেত্রে তার বিষয়বস্তুর সহজাত ক্ষমতা আছে সদস্যদের রীতিনীতি ও মূল্যবোধ বজায় রাখার এবং পরিবর্তন করার। সদস্যদের পরিপূর্ণ অভিজ্ঞতার জন্য এই তিনটি উপাদানের পারস্পরিক ক্রিয়া খুবই প্রয়োজনীয়।

১২.৫ কর্মসূচী পরিকল্পনার গুরুত্ব

গোষ্ঠী, সমাজ কর্মে (Social Group work) কর্মসূচী হচ্ছে একটি ক্রিয়ার বা কাজের আকার (frame work) যার মাধ্যমে দলগত অভিজ্ঞতা অর্জিত হয়। কর্মসূচীর মাধ্যমে দলগত বা গোষ্ঠীগত পারস্পরিক ক্রিয়া (group interaction) সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হবার সুযোগ সৃষ্টি হয় এবং সেজন্য গোষ্ঠীর সদস্যদের মধ্যে সম্পর্ক শক্তিশালী হবার সম্ভাবনা থাকে। গোষ্ঠী সমাজ কর্ম প্রক্রিয়ায় এর বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। গুরুত্বের কারণগুলি হলো ঃ

(ক) কর্মসূচীর ক্রিয়া একক সদস্যকে নতুন দক্ষতা অর্জন করায় এবং তার মধ্যে আত্মমর্যাদা ও আত্মপ্রত্যয়ের মানসিকতা সৃষ্টি করে।

(খ) প্রত্যেক সদস্যকে তার ইচ্ছা এবং আকাঙ্ক্ষা (will and desire) প্রকাশের সুযোগ দেয়।

(গ) কর্মসূচী প্রচারের মাধ্যমে দলের কর্মী সদস্যদের প্রয়োজন পূরণে সাহায্য করে।

(ঘ) কর্মসূচীর ক্রিয়া দলের সদস্যদের অন্যের প্রতি বন্ধুত্বপূর্ণ ব্যবহার ও আন্তরিকতা প্রকাশের সুযোগ দেয় এবং নিরপেক্ষ থাকতে সাহায্য করে। তারা তাদের কাজ সম্পর্কে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করতে পারে, জনহিতকর কাজে অংশগ্রহণ করতে পারে এবং গোষ্ঠীগত শক্তির বৃদ্ধি ঘটাতে পারে।

(ঙ) কর্মসূচীর ক্রিয়া গোষ্ঠীর সদস্যদের একত্রিত হবার সুযোগ দেয় এবং তাদের মধ্যে নতুন ধরনের সম্পর্ক স্থাপনে সাহায্য করে।

(চ) কর্মসূচীর পরিকল্পনা গোষ্ঠীর সদস্যদের, রূপায়নের এবং দায়িত্বগ্রহণের সুযোগ দেয়। কিছু কিছু সময় কর্মসূচী দ্বন্দ্ব (conflict) মেটাতে এবং গোষ্ঠীর উপর নিয়ন্ত্রণ আনতে সাহায্য করে।

(ছ) কর্মসূচীর পরিকল্পনা এবং তা রূপায়নের বিধিযুক্ত বা বিধিবহির্ভূত (formal or informal) আলোচনা থেকে (দলের বা গোষ্ঠীর সদস্যদের মধ্যে) যে ফল পাওয়া যায়, সদস্যদের কাছে তার এক বিশেষমূল্য থাকে। সদস্যদের মধ্যে এই সব বিধিযুক্ত ও বিধিবহির্ভূত আলোচনা এবং গোষ্ঠী কর্মীর সাথে বিধিসম্মত কথোপকথন (conversation) -এর দ্বারা গোষ্ঠী কর্মী অনুভব করতে পারে এবং চিহ্নিত করতে পারে সদস্যদের কি ধরনের সহায়তা প্রয়োজন।

(জ) যে কোন গোষ্ঠীগত পরিস্থিতি সম্পর্কে সত্যকার মনোভাব প্রকাশ হয় তাদের গোষ্ঠীগত ক্রিয়ায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে। যখন এই মনোভাব প্রকাশিত হয় তখন গোষ্ঠীকর্মীর পক্ষে গোষ্ঠীভুক্ত একক সদস্যের সাথেও কাজ করার সুযোগ সৃষ্টি হয়।

১২.৬ প্রশ্নাবলী ঃ

(১) সামাজিক গোষ্ঠী কর্মের অর্থ কি?

(২) কর্মসূচীর কোন্ বৈশিষ্টগুলির ব্যাপারে সতর্ক থাকা উচিত?

(৩) কর্মসূচী পরিকল্পনার গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর।

একক ১৩ ❑ সমাজ কর্মের বিভিন্ন প্রয়োগ ক্ষেত্রে গোষ্ঠীকর্ম

গঠন ঃ

১৩.১ দলগত/গোষ্ঠীগত কাজ—প্রাক্‌কথন

১৩.২ গোষ্ঠীগত/দলগত কাজের মূল ক্ষেত্র

১৩.৩ প্রশ্নাবলী

১৩.১ দলগত/গোষ্ঠীগত কাজ প্রাক্‌কথন

বর্তমান কালে বিভিন্ন সমষ্টি বিভিন্ন সময় যে সব সমস্যার সম্মুখীন হয় তার সমাধান করা যেতে পারে নানাভাবে যার মধ্যে গোষ্ঠীকর্ম অন্যতম। আমাদের দেশে গোষ্ঠীকর্মের মাধ্যমে অনেক গোষ্ঠী ও সমষ্টির সমস্যার সমাধান করা হয়েছে। কারণ সামাজিক গোষ্ঠীকর্ম এমন একটি পন্থা বা পদ্ধতি (method) যা ব্যক্তিকে তার সামাজিক ক্রিয়া (social functioning) উদ্দেশ্যপূর্ণ গোষ্ঠীগত অভিজ্ঞতার মাধ্যমে বৃদ্ধি (enhance) করতে সাহায্য করে এবং আরও সক্রিয়ভাবে তাদের ব্যক্তিগত, গোষ্ঠীগত এবং সম্প্রদায়গত সমস্যার মোকাবিলা (cope) করে। সমাজের সর্বাঙ্গীন (all round) উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন উন্নয়নের দ্বারা গোষ্ঠীগত কর্মসূচী (group work programme) সঠিকভাবে ব্যবহার বা প্রয়োগ করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে সতর্ক থাকতে হবে যাতে কর্মসূচী বিনোদনমূলক পরিষেবায় পরিণত না হয়। এই ব্যাপারটি নিশ্চিত করতে উপযুক্ত যত্ন (care) নেওয়া উচিত। গোষ্ঠীগত কর্মের গুরুত্ব কেবলমাত্র শরীর শিক্ষায় (Physical education), খেলাধুলা (Sports), হস্তশিল্প (Crafts), আলোচনা (discnssion) ইত্যাদির মধ্যে গণ্ডীবদ্ধ করে না রেখে ব্যক্তি সদস্যের (individual member's) ব্যক্তিগত বৃদ্ধি (personal growth) এবং গোষ্ঠীর সংঘবদ্ধ জীবনের উন্নতির উপর গুরুত্ব দেওয়া উচিত।

১৩.২ গোষ্ঠীগত/দলগত কাজের মূল ক্ষেত্র

দলগত বা গোষ্ঠীগত কাজের নানা ক্ষেত্রে আছে যার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্যগুলি হলো ঃ

(ক) সংশোধনমূলক পরিষেবা (correctional service) ঃ সংশোধনের ক্ষেত্রে গোষ্ঠীকর্ম করার সুযোগ রয়েছে জেল (Prison) সংশোধনাগার (Refomatories), সমস্যাগ্রস্ত শিশু কিশোর আবাস (Destitute Homes) অনাথ আশ্রম (Orphanage) ইত্যাদিতে। তাছাড়া শর্তাধীনে মুক্ত (Parole) আইনসম্মত পরীক্ষাকালে (Probation) থাকা ব্যক্তি, বিদ্যালয় এবং প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ইত্যাদিতে। সংশোধন কর্মের দুটি উদ্দেশ্য রয়েছে। সেগুলি হলোঃ

— **অন্যায়কারী বা অপরাধীদের বিপদমুক্ত হেপাজতে (Secured custody) রাখার ব্যবস্থা করা।**

— অন্যায় আচারণকারীকে আইনসম্মত ও বিধিসম্মত পথে পরিচালিত করতে সাহায্য করা।

উপরোক্ত উদ্দেশ্যগুলি পূর্ণ করতে হলে সামাজিক গোষ্ঠীকর্ম প্রক্রিয়ার (Social Group work process) ব্যাপারে প্রাথমিক দক্ষতা (basic skills) থাকা অবশ্য প্রয়োজন।

(খ) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সমাজ কর্ম (School Social work) ঃ

কিছু শিশু কিশোর-কিশোরীর সামাজিক (social) এবং আবেগজনিত (emotional) সমস্যা থাকে যা তাদের বিদ্যালয়ের কাজে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে এবং সংশ্লিষ্ট শিশু কিশোরের উন্নতিও ব্যাহত হয়। ঐ সব সমস্যা দুর করার জন্য সংশ্লিষ্ট ছাত্র-ছাত্রী বা শিক্ষক মণ্ডলীকে সক্ষম করে তুলতে সাহায্য করে সামাজিক গোষ্ঠী ক্রিয়া (Social Group work)। এই পরিষেবা তাদের শেখার অসুবিধা (learning difficulties) দূর করতে সাহায্য করে। এই পদ্ধতি বা পন্থা ব্যবহার করা যেতে পারে ছাত্রদের মধ্যে সহযোগীতার সম্পর্ক গড়ে তুলতে এবং নিয়মানুবর্তী হওয়ার ব্যাপারে সাহায্য করতে। বিদ্যালয়ে গোষ্ঠীকর্ম সাধারণতঃ এভাবে সম্পন্ন করা হয় ঃ

— যারা বিদ্যালয়ের পঠন পাঠন, নিয়মকানুন, সহপাঠী এবং শিক্ষকদের সঙ্গে মানিয়ে নিতে না পেরে বিভিন্ন ধরনের সমস্যার মুখোমুখি হয় বা সমস্যা সৃষ্টি করে সেই সব ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে নির্দিষ্ট বা প্রয়োজনীয় গোষ্ঠীকর্ম করা।

— ঐ ধরনের সমস্যাযুক্ত ছাত্র-ছাত্রীদের সাহায্য করতে শিক্ষকদের সাথে প্রয়োজনীয় পরামর্শ করা।

(গ) চিকিৎসা ও মনরোগ সংক্রান্ত পরিষেবা (Medical and Psychiatric Services) ঃ

সমাজ কর্ম (Social work) দীর্ঘদিন ধরে স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে (health field) প্রয়োগ বা ব্যবহৃত হয়ে আসছে। এর দুটি বিশেষায়িত (specialized) ক্ষেত্র হচ্ছে স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সমাজ কর্ম (Medical Social work) এবং মনরোগ সংক্রান্ত সমাজ কর্ম (Psychiatric Social work)। এই দুটিই প্রাথমিক পর্বে বা আদিতে (originally) একক ব্যক্তির সাথে কাজের পরিষেবা (case work service) হিসাবে ধারণা করা হতো এবং তা বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে রোগীর আত্মীয়দের মধ্যে প্রয়োগ করা হতো।

গোষ্ঠীর সাথে কাজের (Group work) সূচনা হয় তার অনেক পরবর্তী পর্যায়ে। দলগত বা গোষ্ঠীগত কর্মসূচী (Group programme) বিশেষভাবে ব্যবহার করা হয় রোগীর সামাজিক সম্পর্ক উন্নত করার জন্য যাতে তারা তাদের সতীর্থ (fellow)-দের সহযোগিতা সমর্থন ও গ্রহনীয়তা লাভ করে। বিভিন্ন কর্মসূচীর মাধ্যমে গোষ্ঠীগত পরিবেশ (Group environment) তৈরী করে নিরাময় সংক্রান্ত (therapeutic) কাজে গোষ্ঠী কর্ম পদ্ধতি কার্যকরী ভূমিকা নিতে পারে। চিকিৎসা কেন্দ্রে বা হাসপাতালে গোষ্ঠীগত পরিষেবা (Group Services) তাদের জন্য বিশেষভাবে প্রয়োজন যারা দীর্ঘদিন নানা প্রতিবন্ধকতার শিকার হয়ে রয়েছে।

(ঘ) যুব ও শিশু কল্যাণ পরিষেবা (Youth and child welfare services) ঃ

শিশু এবং যুবকদের বিভিন্ন শিবিরে গোষ্ঠীগত কর্মসূচীকে ব্যবহার করা হয় অংশগ্রহণকারীদের (participants) জীবনকে সমৃদ্ধশালী (enrich) করতে। একটি গোষ্ঠীর সাথে যুক্ত সদস্যদের মধ্যে মেলামেশা

এবং পারস্পরিক ক্রিয়ার (interaction) মাধ্যমে এক গোষ্ঠীগত সম্পর্ক (Group relationship) তৈরী হয়। নির্দেশিত পারস্পরিক গোষ্ঠীগত ক্রিয়ার মাধ্যমে তারা মানবিক ও সামাজিক মূল্যবোধ অর্জন করে, যা তাদের ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটায় এবং সম্প্রদায়ের দায়িত্বশীল সদস্য হিসাবে গড়ে তুলতে গোষ্ঠী কর্ম সহায়ক হয়। গোষ্ঠী কর্মের বিশেষ অবদান রয়েছে প্রতিষ্ঠান কেন্দ্রিক পরিচর্যার (institutional care) ক্ষেত্রে।

(ঙ) শিশুর পথ প্রদর্শন পরামর্শদান কেন্দ্র (Child Guidance Centre) ঃ গোষ্ঠী কর্ম পরিষেবা (Group work service) শিশুর পরামর্শদান কেন্দ্রে অত্যন্ত কার্যকরীভাবে প্রয়োগ করা যায়। সঠিকভাবে শিশুদের আচরণ কেন্দ্রিক সমস্যা নির্ণয় (disgnosis) করতে বিশেষজ্ঞরা (experts) একমত যে শিশুর সতীর্থ বা সমবয়সীদের সাথে পারস্পরিক ক্রিয়া এবং সেই সঙ্গে তুলনায় বয়স্কদের সঙ্গে পারস্পরিক ক্রিয়া (interaction) পর্যবেক্ষণ (observation) করতে হয়। ছোট শিশুরা সাক্ষাৎকারে (interview) তাদের সমস্যার কথা ঠিকভাবে প্রকাশ করতে পারে না। গোষ্ঠীগত পরিস্থিতিতে পর্যবেক্ষনের উপর নির্ভর করে নির্দিষ্ট শিশুর সমস্যা নির্ণয় (diagnosis) করাই উপযুক্ত পন্থা। সঠিকভাবে নিজের অনুভূতি প্রকাশে অক্ষম এবং বয়সের তুলনায় বিবেচনাবোধের প্রয়োগে অপারগ শিশু কিশোরদের গোষ্ঠী পরিবেশে রাখার ফলে যেমন আচরণ নির্ণয়ে সহায়তা পাওয়া যায় তেমনি পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার সুযোগ দিয়ে তাদের মানসিক বিকাশে ভূমিকা পালন করা যায়।

(চ) বয়স্কদের জন্য পরিষেবা (Services to the elderly persons) ঃ বর্তমান কালে অনেক বয়স্ক মানুষ তাদের পরিবারের মধ্যেই অবাঞ্ছিত (unwanted) হয়ে পড়ে এবং অবহেলার শিকার হয়। পরিবারে গুরুত্বহীন হয়ে পড়ার যন্ত্রণার সঙ্গে ধীরে ধীরে একাকীত্বের জ্বালার শিকার হতে হয়। বন্ধু ও সমবয়সীরা একে একে মৃত্যুর মধ্য দিয়ে সংসার থেকে সরে যায়। জীবনের কোন এক সময় নিজের জীবন সাথীকেও হারাতে হয়। এভাবেই অসহায়ত্ব গ্রাস করতে থাকে। এই মানসিক যন্ত্রণা, একাকীত্ব এবং অসহায়ত্ব থেকে মুক্তি দিতে বা তার পরিমাণ কিছুটা লাঘব করতে গোষ্ঠী কর্ম সহায়ক ভূমিকা নিতে পারে। গোষ্ঠী কর্ম হচ্ছে একটি উপায় (means) যার মাধ্যমে সমস্যা কবলিত বয়স্ক ব্যক্তি মানসিক খাদ্য (mental food) পায়। গোষ্ঠী কর্মের প্রভাবে তারা মর্যাদা পায়, একাকীত্ব বোধ থেকে কিছুটা নিষ্কৃতি পায়, হতাশা কাটিয়ে উঠার মত মনের জোর পায়।

(ছ) পরিবার সংক্রান্ত পরিষেবা (Family Service) ঃ

সমস্ত মানুষের ক্ষেত্রেই পরিবার হলো প্রাথমিক প্রতিষ্ঠান। পরিবার পরিষেবার উদ্দেশ্য হলো পারিবারিক জীবনে উন্নতিসাধন। পারিবারিক সম্পর্কের নির্দিষ্ট সমস্যায় ব্যক্তি এবং পরিবারকে সাহায্য করা অথবা সামাজিকভাবে মানিয়ে চলতে (Social adjustment) সাহায্য করার মাধ্যমে গোষ্ঠী কর্ম পরিবারকে সাহায্য করতে পারে। বিভিন্ন সমাজ কল্যাণ সংস্থা (social welfare organisation) দাম্পত্য কলহে বা পারিবারিক জীবনে মানিয়ে চলার সমস্যার (maladjustment) ক্ষেত্রে পরিবারকে সাহায্য প্রদান করে। শিশুপালন ও পরিচর্যা এবং অন্যান্য সমস্যাযুক্ত পরিস্থিতিতেও গোষ্ঠী কর্মের মাধ্যমে সাহায্য করে এমন সংস্থারও অভাব নেই। পরিবার পরিষেবার কাজকে এভাবে ভাগ করা যায় ঃ

— দম্পতিদের দ্বারা গঠিত গোষ্ঠী যারা দাম্পত্য কলহ জনিত সমস্যার শিকার।

— মূলতঃ মায়েদের নিয়ে গোষ্ঠী যারা শিশুপালন সমস্যার সমাধানে আগ্রহী।

— শিশু এবং কিশোরদের গোষ্ঠী যাদের দলবদ্ধ করে তাদের বিভিন্ন ধরনের সমস্যার নিরসনে কাজ করা হয়। তারা যাতে অস্বস্তিকর (uncomfortable) অবস্থার মধ্য থেকে উত্তীর্ণ হয় গোষ্ঠী কর্ম সে কাজে কার্যকরী ভূমিকা নেয়।

— অসহায় বৃদ্ধ-বৃদ্ধার গোষ্ঠী-যারা নৈরাশ্য ও হতাশা থেকে মুক্তি চায়।

(জ) প্রতিবন্ধীদের জন্য পরিষেবা (Services for the Handicapped) ঃ প্রতিবন্ধীদের সাথে গোষ্ঠীকর্মের কর্মসূচী প্রয়োগ করা হয় তাদের জীবনকে ফলপ্রসূভাবে উন্নত করার জন্য। অন্ধ (blind), মূক ও বধির (deaf & dumb) এবং মানসিক প্রতিবন্ধীরা (Mentally Landicapped) সাধারণতঃ মানসিকভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। সমাজ কর্ম পরিষেবা এইসব প্রতিবন্ধীদের পুনঃসামাজিকীকরন (re-socialisation) করার উদ্দেশ্যে কাজ করে। তাদের দক্ষতা বৃদ্ধি এবং আভ্যন্তরীন সামর্থের ব্যবহার করে থাকে দেশের সামগ্রিক কল্যাণের জন্য।

(ঝ) শ্রমিক কল্যাণ (Labour Welfare) ঃ

শ্রমিক কল্যাণের ক্ষেত্রে গোষ্ঠী গোষ্ঠী কর্মসূচীর দ্বারা শ্রমিকদের নৈতিক (moral) আচরণ উন্নত হয়, পরস্পরের মধ্যে সহযোগিতার মনোভাব বিস্তৃত হয়, নিয়মশৃঙ্খলা জনিত পরিস্থিতি উন্নত হয় এবং যৌথ বা সমবেতভাবে অংশগ্রহণের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক উপায়ে সিদ্ধান্ত গ্রহনের সামর্থ বৃদ্ধি পায়।

(ঞ) স্বয়ম্ভর গোষ্ঠী (Self help group) ঃ

স্বয়ম্ভর গোষ্ঠী হচ্ছে দরিদ্র মানুষের বিধিবদ্ধ বা অবিধিবদ্ধ সংস্থা যার সদস্যেরা কোন নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য সাধনের জন্য জোটবদ্ধ হয়। সমান আর্থিক, সামাজিক অবস্থার মানুষই সাধারণতঃ গোষ্ঠী গঠন করে জোটবদ্ধ হয়ে নিজেদের সীমিত আর্থিক ও অন্য শক্তিকে একত্রিত করে এবং তার যথাযথ ব্যবহারের দ্বারা নিজেদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটায়। সুতরাং স্বয়ম্ভর গোষ্ঠী সার্বিকভাবে একটি পদ্ধতি যা শহর বা গ্রামের গরীব মানুষের মধ্যে সঞ্চয়ের প্রবণতা সৃষ্টি করে, ঋণগ্রহণ ও তার সফল ব্যবহার শেখায়, তাদের আর্থিক অবস্থার উন্নতি ঘটায়, সামাজিক সম্মানপ্রাপ্তিতে সহায়ক হয়, সদস্যদের আত্মবিশ্বাসের স্তরবৃদ্ধি ঘটায় এবং সর্বোপরি তাদের প্রথাগত ঋণ সংস্থাগুলির আর্থিক পরিষেবার আওতায় আসার উপযুক্ততা প্রদান করে।

১৩.৩ প্রশ্নাবলী ঃ

(১) গোষ্ঠীগত কাজ বলতে কি বোঝ?

(২) গোষ্ঠীকাজের মূল ক্ষেত্রগুলির উল্লেখ ও ব্যাখ্যা কর।

একক ১৪ ❑ দলগঠন বা গোষ্ঠীগঠন

গঠন ঃ

১৪.১ গোষ্ঠীর সংজ্ঞা বা অর্থ

১৪.২ গোষ্ঠী গঠনের কারণ

১৪.৩ সদস্য নির্বাচনের নীতিসমূহ

১৪.৪ উপগোষ্ঠী এবং পারস্পরিক ক্রিয়া

১৪.৫ গোষ্ঠীর মধ্যে পারস্পরিক ক্রিয়া

১৪.৬ গোষ্ঠীর কাজে কর্মীর হস্তক্ষেপ বা মধ্যস্থতা।

১৪.৭ প্রশ্নাবলী

১৪.১ গোষ্ঠীর সংজ্ঞা বা অর্থ

গোষ্ঠী কতগুলি ব্যক্তিকে নিয়ে গঠিত এমন একটি সময়ভিত্তিক স্থায়ী সামাজিক একক যেখানে প্রত্যেক ব্যক্তি তার নিজস্ব মর্যাদা ও ভূমিকার মধ্য দিয়ে পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত এবং যার এমন কিছু আচরণগত মূল্যবোধ বা আদর্শ বর্তমান যার দ্বারা ব্যক্তির গোষ্ঠীস্বার্থ সংশ্লিষ্ট আচরণগুলি নিয়ন্ত্রিত হয়।

আবার গোষ্ঠী বলতে বিশেষ উদ্দেশ্যযুক্ত এমন দুই বা ততোধিক ব্যক্তির সুবিন্যস্ত সমষ্টিকে বুঝায়, যার মধ্যে প্রত্যেক ব্যক্তির নির্দিষ্ট কিছু ভূমিকা থাকে এবং যার এমন কতগুলি আচরণগত আদর্শমান থাকে যার দ্বারা গোষ্ঠীভুক্ত ব্যক্তি এবং সমষ্টি উভয়েই নিয়ন্ত্রিত হয়।

১৪.২ গোষ্ঠী গঠনের কারণ

গোষ্ঠী বিভিন্ন কারণে গঠিত হয়। সমাজের মধ্যে নানা ধরনের যে সব সামাজিক সমস্যা থাকে তা সমাধানের জন্য গোষ্ঠী গঠিত হয়। এমনকি বিনোদন বা সৃষ্টিধর্মী কোন কাজের আগ্রহেও গোষ্ঠী গঠিত হতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, কোন একটি এলাকার মানুষের সম্পত্তি হানির ঘটনা ঘটে চুরি ডাকাতির প্রকোপে। এই সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে এলাকার যুবকদের নিয়ে একটি গোষ্ঠী গঠন হতে পারে, যাদের কাজ হবে উপযুক্ত প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তোলা। অনুরূপভাবে এলাকার কিশোর-কিশোরীদের ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক পরিষেবা দানের জন্য একটি গোষ্ঠী গঠিত হতে পারে।

১৪.৩ সদস্য নির্বাচনের নীতি সমূহ

গোষ্ঠীর সদস্য নির্বাচনের জন্য নিম্নলিখিত নীতিগুলি মেনে চলা প্রয়োজন।

(ক) বয়স (Age) ঃ অল্পবয়সীদের গোষ্ঠীতে কালানুক্রমিক বয়স (chronological age) খুব বেশী গুরুত্বপূর্ণ নয়। কিন্তু প্রাপ্ত বয়স্কদের নিয়ে গঠিত গোষ্ঠীর ক্ষেত্রে বয়স বিবেচনা করা গুরুত্বপূর্ণ। কৈশোর-যৌবনেও যারা গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হয় তাদের ক্ষেত্রেও বয়সের ব্যাপারে ভারসাম্য বজায় রাখা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

(খ) মূল্যবোধ (Value) ঃ একটি গোষ্ঠীর সদস্যদের মধ্যে একই ধরনের মূল্যবোধ থাকলে গোষ্ঠীগঠন করা সহজ হয় বা গঠিত গোষ্ঠীর কার্যকারিতা বৃদ্ধি পায়। সদস্যদের মধ্যে মূল্যবোধের ক্ষেত্রে কিছুটা পরিবর্তন মেনে নেওয়া যায়। কিন্তু এক্ষেত্রে বড় ধরনের পার্থক্য থাকলে গোষ্ঠীর কাজ বাধাপ্রাপ্ত হয়। তাই গোষ্ঠী গঠনের ক্ষেত্রে এই বিষয়টিও বিশেষ বিবেচনা দাবী করে।

(গ) একই ধরনের সমস্যা (Same kind of problems) ঃ একই ধরনের সমস্যাযুক্ত মানুষের সংযুক্তিতে গোষ্ঠী গঠন করা উচিত। তেমনি একই ধরনের স্বার্থ বা আগ্রহ রয়েছে এমন ব্যক্তিত্বের সমন্বয়ে গোষ্ঠী গঠিত হতে পারে। এভাবে গোষ্ঠী গঠন হলে তা দীর্ঘজীবি ও কার্যকরী হয়।

(ঘ) আনন্দের ধরন (Enjoyment pattern) ঃ সব মানুষের জীবনেই আনন্দ তৃষ্মা বর্তমান। কিন্তু সেই আনন্দ গ্রহনের ধরনে মানুষে মানুষে পার্থক্য দেখা যায় অনেক। আনন্দগ্রহণের ধরনের ক্ষেত্রে সাযুজ্য বা মিল আছে এমন ব্যক্তিদের নিয়ে গোষ্ঠী গঠন করা দরকার।

(ঙ) বুদ্ধিস্তরে মিল (Similarity in intelligence) ঃ বুদ্ধি এবং বিবেচনাবোধের ক্ষেত্রেও মানুষে মানুষে পার্থক্য থাকে লক্ষ্যনীয় মাত্রায়। এক্ষেত্রে কোন গোষ্ঠীর সদস্যদের মধ্যে পার্থক্যের মাত্রা অতিরিক্ত হলে গোষ্ঠী গঠনের উদ্দেশ্য সফল হয় না। তাই মোটামুটি একই ধরনের বুদ্ধি ও বিবেচনাবোধ সম্পন্ন সদস্য থাকলে গোষ্ঠী মজবুত হয়।

(চ) কাঠামোর সঙ্গে মানিয়ে চলা (Showing tolerance to structure) ঃ অনেক সময় গোষ্ঠীর সদস্যদের মধ্যে বিরোধ দেখা দেয় কারণ গোষ্ঠীর পরিকাঠামোকে সকলে সমানভাবে গ্রহণ করতে বা সহ্য করতে পারে না। কেউ পরিকাঠামোগত সামান্য ত্রুটি বিচ্যুতি বা দুর্বলতাকে কেন্দ্র করেও অসন্তোষ প্রকাশ করে। সেজন্য গোষ্ঠী গঠনের ক্ষেত্রে যে নীতিটি মেনে চলা উচিত তা হলো গোষ্ঠীর পরিকাঠামোর সঙ্গে মানিয়ে চলার মানসিকতা বিচার করে সদস্য নির্বাচন করা।

(ছ) সমমানের অহম্ শক্তি (Same egostrength) ঃ একটি গোষ্ঠীকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য সমপর্যায়ের অহম্ শক্তি সম্পন্ন মানুষকে নিয়ে গোষ্ঠীটি গঠন করা উচিত। অন্যথায় সংঘাতের পরিবেশ সৃষ্টি হতে পারে, যা গোষ্ঠীকে দুর্বল করবে এবং স্থায়ীত্বদানে অক্ষম থাকবে।

(জ) লিঙ্গ (Sex) ঃ কোন কোন ক্ষেত্রে লিঙ্গের পার্থক্যের ভিত্তিতেও গোষ্ঠী গঠন করার নীতি মেনে চলা হয়। তবে সমষ্টির মানসিকতা বিচার করেই এক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত নেওয়া যেতে পারে।

১৪.৪ উপগোষ্ঠী এবং পারস্পরিক ক্রিয়া

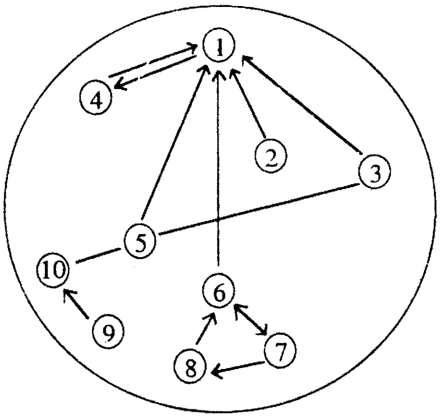

গোষ্ঠী বা দলের আচরণগত পরিবর্তনের উপর তার দলীয় প্রভাবের যে ভূমিকা রয়েছে বর্তমানকালে তা সকলেই স্বীকার করেন। কিন্তু গোষ্ঠীর এই গতীয় প্রভাব (dynamic influence) গোষ্ঠীর মধ্যে তার সদস্যদের পারস্পরিক সম্পর্ক (mutual relation) এবং তাদের ভূমিকার উপর (role) নির্ভর করে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের দলীয় প্রকৃতি বিশ্লেষণের মাধ্যমে উপগোষ্ঠী বা তার পারস্পরিক ক্রিয়ার সম্পর্কে এক সম্যক ধারণা করা যেতে পারে। এই পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষার্থীদের কয়েকটি প্রশ্নের মাধ্যমে তারা কোন্ কোন্ সতীর্থকে পছন্দ করে তা জানতে চাওয়া হয়। উপরের চিত্রে শ্রেণির বিভিন্ন শিক্ষার্থীর সঙ্গে পারস্পরিক সম্পর্কের একটি লেখচিত্র পরিবেশন করা হয়েছে। তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে যে (১) শ্রেণিতে কয়েকজন শিক্ষার্থী আছে যাদেরকে শ্রেণির বেশীরভাগ শিক্ষার্থী পছন্দ করে বা তাদের সঙ্গ লাভ করতে তাদের ভাল লাগে। আবার শ্রেণিগোষ্ঠীতে কয়েকজন সদস্য আছে (২) যাদের কেউ পছন্দ করে না। উপরের ছবিতে আমরা আরও দেখছি ৭ নম্বর শিক্ষার্থীকে কেউ পছন্দ করছে না। স্বভাবতঃই সে অন্যদের থেকে বিচ্ছিন্ন। আবার (৩) নম্বর ছবিতে দেখা যাচ্ছে শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের (২) জনের মধ্যে পারস্পরিক পছন্দ দেখা যাচ্ছে। শ্রেণি বা শ্রেণির বাইরে এরা একসঙ্গে থাকে। শ্রেণির মধ্যে এই ধরনের গোষ্ঠীকে বলা হয় Dyad বা ২ জনের গোষ্ঠী। ছবিতে দেখানো ১ এবং ৪ নম্বর শিক্ষার্থীরা ঐ ধরনের দু'জনের দল গঠন করে আছে। অন্যদিকে ৬, ৭ এবং ৮ নম্বর ছবিতে চোখ রাখলে আমরা অনুভব করবো যে এখানে ৬ নম্বর শিক্ষার্থী ৭ নম্বর শিক্ষার্থীকে পছন্দ করে, ৭ নম্বর শিক্ষার্থী ৮ নম্বর শিক্ষার্থীকে পছন্দ করে এবং ৮ নম্বর শিক্ষার্থী ৬ নম্বর শিক্ষার্থীকে পছন্দ করে। এইভাবে সম্পর্কটি তিনজনের মধ্যে আবদ্ধ রয়েছে। একে বলে clique বা ঘোঁট পাকানোর মনোবৃত্তি নিয়ে গঠিত ক্ষুদ্র গোষ্ঠী। অর্থাৎ এই শিক্ষার্থীরা শ্রেণি গোষ্ঠীর মধ্যে এক একটি উপগোষ্ঠী (sub group) গঠন করে। এই ধরনের উপগোষ্ঠীগুলি অনেক বেশী দৃঢ় হয়। বৃহত্তর গোষ্ঠীর মধ্যে এই clique-গুলি তাদের নিজেদের জন্য অপেক্ষাকৃত সংকীর্ণ লক্ষ্য নির্ধারণ করে। আর সেই লক্ষ্য clique-এর অন্তর্গত শিক্ষার্থীদের আচরণে প্রেষণা (motivation) যোগায়।

শ্রেণিকক্ষে যে সব শিক্ষার্থী Dyad গঠন করে সেই সমস্ত শিক্ষার্থীকে কোন কাজের ক্ষেত্রে পৃথক না করাই ভাল। কারণ এই ধরনের সম্পর্কযুক্ত শিক্ষার্থীরা উভয়ে পরস্পরের দ্বারা উপকৃত হয়। তবে শ্রেণিকক্ষে এদের দিকে বিশেষ নজর দেওয়ার প্রয়োজন আছে। অন্যথায় এরা শ্রেণির মধ্যে বিশৃঙ্খল পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারে।

শ্রেণির গোষ্ঠীর মধ্যে শিক্ষার্থীদের যে clique-গুলি তৈরী হয় সেগুলির উপকারিতা যেমন আছে তেমনি অপকারিতাও আছে। সাধারণতঃ সম মনোভাবাপন্ন শিক্ষার্থীদের দ্বারা এই clique বা উপগোষ্ঠীগুলি গঠিত হয়। এদের প্রত্যেকটির কিছু কিছু সংকীর্ণ লক্ষ্য থাকে। সেই লক্ষ্যগুলি যদি সামগ্রিক শ্রেণীগোষ্ঠীর লক্ষ্যের অন্তর্ভুক্ত হয় তবে সেক্ষেত্রে এগুলি শিক্ষণে সহায়তা করে। কিন্তু এই উপদলের লক্ষ্য যদি শ্রেণির লক্ষ্যের বাইরে হয় তবে তারা সমস্যার সৃষ্টি করে।

১৪.৫ গোষ্ঠীর মধ্যে পারস্পরিক ক্রিয়া

প্রতিটি গোষ্ঠীর মধ্যেই যাবতীয় ধর্ম (Dynamics) বর্তমান। কারণ তার মধ্যে সব সময় বিভিন্ন সদস্য পারস্পরিক ক্রিয়ায় আবদ্ধ। প্রতি মুহুর্তে চলছে এই পারস্পরিক ক্রিয়া। এই পারস্পরিক ক্রিয়ার ফলে গোষ্ঠীর মধ্যে যেমন সাংগঠনিক পরিবর্তন ঘটে অন্যদিকে তেমনি প্রত্যেক সদস্যের অবস্থান (status) এবং আচরণের গুণগত মানে ও পরিবর্তন ঘটে। অর্থাৎ প্রতি মুহুর্তে গোষ্ঠীর সঙ্গে যুক্ত প্রতিটি সদস্যের ব্যক্তিত্বের (Personality) এবং আচরণের পরিবর্তন গোষ্ঠির এই পারস্পরিক ক্রিয়াজনিত গতি ধর্মিতার জন্য হয়ে চলেছে। এই যে দলীয় প্রভাবে ব্যক্তির আচরণ ও ব্যক্তিত্বের ঘটমান পরিবর্তন তাকেই বলা হয় দলীয় বা গোষ্ঠীয় গতিধর্মীতা (Group dynamics)। দলের বা গোষ্ঠীর মধ্যে যদি পারস্পরিক ক্রিয়ার শক্তিকে উন্নত করা যায় এবং গোষ্ঠীর অন্তর্গত ব্যক্তিদের পরস্পরের মধ্যে সংযোগের (communication) সুযোগ বৃদ্ধি করা যায় তবেই গোষ্ঠীর সদস্যদের মধ্যে পারস্পরিক আকর্ষণ বা বন্ধন দৃঢ় হয়। গোষ্ঠীর সঙ্গে সদস্যদের বন্ধন যত দৃঢ় হবে, ততই ব্যক্তির উপর গোষ্ঠীর প্রভাব বৃদ্ধি পায়।

১৪.৬ গোষ্ঠীর কাজে কর্মীর হস্তক্ষেপ বা মধ্যস্থতা

গোষ্ঠীর সঙ্গে কাজ করার সময় কর্মীকে সব সময় মনে রাখতে হবে যে দল বা গোষ্ঠীতে সমস্ত ব্যক্তির ভাবনা চিন্তা বা মতামত এক হয় না। দ্বিতীয়তঃ গোষ্ঠীর বিভিন্ন ধাপে উন্নয়নের ব্যাপারটি তাকে ভালভাবে বুঝতে হবে এবং তার ভূমিকা উপরোক্ত পরিস্থিতি মাথায় রেখে মানানসই হতে হবে।

গোষ্ঠীর প্রাথমিক পর্যায়ে গোষ্ঠী সদস্যেরা একে অন্যের সাথে পরিচিত থাকে না এবং কর্মীর সাথেও তাদের কোন পরিচিতি থাকে না। সেইজন্য এই পর্যায়ে গোষ্ঠীর সদস্যরা নিরাপত্তাহীনতা, উদ্বেগ, স্নায়ুদুর্বলতা ইত্যাদিতে ভুগতে পারে। এই পর্যায়ে গোষ্ঠীর কাঠামোর মধ্যেও কিছু দুর্বলতা ও অসঙ্গতি থাকে। গোষ্ঠীর

লক্ষ্য কি, সেখানে করি কি ভূমিকা তাও স্পষ্ট থাকে না। সাধারণতঃ এই সময় গোষ্ঠীর সদস্যরা অকৃতকার্য হবার আশঙ্কা পোষণ করে। এই সময় কর্মীকে উদ্যোগী হতে হবে গোষ্ঠী সদস্যদের সঙ্গে সম্পর্ক সহজ করে তুলে গোষ্ঠীর মধ্যে স্বচ্ছন্দ (comfortable) বোধ করার ব্যাপারে সাহায্য করতে। পরিকল্পনামাফিক ধীরে ধীরে পেশাভিত্তিক সম্পর্ক গড়ে তোলার ক্ষেত্রে তাকে আগ্রহী হতে হবে।

মধ্যবর্তী পর্যায়ে বিভিন্ন কাজে নৈপুন্য দেখিয়ে বা বিভিন্ন কার্যপ্রণালীতে স্বার্থকভাবে অংশগ্রহণের মাধ্যমে গোষ্ঠী স্বীকৃতি লাভ করে। এই সময় গোষ্ঠী সদস্যেরা গোষ্ঠী কাজে নির্দিষ্ট ভূমিকা নিতে পারে। গোষ্ঠীর পরিকল্পনা রচনা এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণে বেশীর ভাগ সদস্যের অংশগ্রহণ পরিলক্ষিত হয়। উপগোষ্ঠীর আচরণও একটি আকার ধারণ করে। গোষ্ঠীর লক্ষ্য স্পষ্ট হয়, সদস্যেরা আরও বেশী স্বাচ্ছন্দবোধ করে এবং গোষ্ঠীর কাজে মনযোগী হয়। গোষ্ঠীর মধ্যে নির্দিষ্ট রীতিনীতি, নিয়মকানুন পরিলক্ষিত হয় এবং গোষ্ঠীর সদস্যেরাও নিয়ন্ত্রণের মধ্যে থাকে। এই সময় গোষ্ঠী কর্মকেন্দ্রিক থেকে উন্নয়ন কেন্দ্রিক হয়ে উঠে।

এই সময় কর্মীকে সতর্ক থাকতে হয়। কারণ এই পর্যায়ে সে যদি গোষ্ঠীকে ঠিকমতো পরিচালনা করতে না পারে তাহলে গোষ্ঠীর মধ্যে বিশৃঙ্খলা বা ভাঙন দেখা দিতে পারে। কর্মীর সঠিক ভূমিকা পালনের মধ্য দিয়ে এই ধরনের সম্ভাবনাকে নির্মূল করা সম্ভব হয়।

একইভাবে শেষ পর্যায়ে গোষ্ঠী সদস্যদের উৎসাহিত করতে হবে যাতে গোষ্ঠীর উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়ে গেলে বা তাদের কাজ শেষ হয়ে গেলে গোষ্ঠী ছেড়ে যেতে দ্বিধা না করে। পেশা ভিত্তিক মনোভাব নিয়ে সমাজকর্মী দক্ষতা ও বুদ্ধিদীপ্ততার সঙ্গে গোষ্ঠীকে পরিচালনা করার মনোভাবে উদ্দীপ্ত হয়ে কাজ করবে।

১৪.৭ প্রশ্নাবলী ঃ

(১) গোষ্ঠী কি এবং গোষ্ঠী গঠনের প্রয়োজনীয়তা কি?

(২) গোষ্ঠীতে সদস্য অন্তর্ভুক্তির মূল নীতি কি হওয়া উচিত?

(৩) গোষ্ঠীর মধ্যে পারস্পরিক ক্রিয়া ব্যাখ্যা কর।

(৪) গোষ্ঠীর কাজে গোষ্ঠীকর্মী কেন এবং কিভাবে মধ্যস্থতা করবে?

একক ১৫ ❑ সামাজিক গোষ্ঠী কর্মের কলাকৌশল বা প্রয়োগ কৌশল

গঠন ঃ

১৫.১ প্রস্তাবনা

১৫.২ গোষ্ঠী কর্মের কলাকৌশলের বিষয়সমূহ

১৫.৩ গোষ্ঠী সমাজ কর্মে প্রয়োজনীয় প্রাথমিক দক্ষতা

১৫.৪ প্রশ্নাবলী

১৫.১ প্রস্তাবনা (Introduction)

গোষ্ঠী হলো দুই বা তার অধিক ব্যক্তির সমন্বয়ে গঠিত একটি গতিশীল সামাজিক অস্তিত্ব। গোষ্ঠী তার সদস্যদের দ্বারা বিবেচিত ও নির্দ্ধারিত এক বা একাধিক প্রচলিত লক্ষ্যের সাথে সম্পর্ক রেখে পরস্পর-নির্ভর পারস্পরিক ক্রিয়া সম্পন্ন করে, যাতে গোষ্ঠীর প্রতিটি সদস্য প্রভাবিত হয় এবং কথোপকথনের মাধ্যমে অন্যকে কিছুটা প্রভাবিত করতে পারে।

Herney J. Bertcher-এর অভিমত অনুযায়ী একটি সফল গোষ্ঠী হবে সেখানে, যেখানে গোষ্ঠীর ধারণা ইতিবাচকভাবে প্রয়োগ হবে। অর্থাৎ গোষ্ঠী তার নির্দ্ধারিত লক্ষ্যের সাথে সম্পর্কিত বিষয়ে নির্দিষ্ট সময় ধরে পারস্পরিক ক্রিয়া এমনভাবে সম্পন্ন করে যাতে তারা প্রত্যেকে একে অন্যের উপর কিছুটা হয়। এভাবেই তারা তাদের সাধারণ লক্ষ্য অর্জন করতে পারে এবং প্রত্যেকে অনুভব করতে পারে যে তারা অন্যকে প্রভাবিত করার কিছুটা সামর্থ অর্জন করেছে।

১৫.২ গোষ্ঠীকর্মের কলাকৌশলের বিষয়সমূহ

গোষ্ঠীকর্মের কলাকৌশল বা প্রয়োগকৌশলের বিভিন্ন বিষয়গুলি হলো ঃ

(ক) গোষ্ঠীকর্মে উপস্থিত থাকা (Attending group programmes) ঃ গোষ্ঠীর বিভিন্ন কাজে উপস্থিত থাকা বা অংশগ্রহন করা হলো অন্যতম কলাকৌশল। গোষ্ঠীর কাজে উপস্থিত থাকার ফলে একজন সদস্য কর্মসূচী সম্পর্কে সম্যক ধারণার অধিকারী হতে পারে, অন্য সদস্যদের সঙ্গে কাজের মাধ্যমে আরো বেশী করে পরিচিত হতে পারে, ব্যক্তিত্ব বৃদ্ধি ঘটে, অন্যের শ্রদ্ধা-ভালবাসা অর্জন করা যায়, আত্মবিশ্বাস ও দায়িত্বশীলতা বাড়ে, দক্ষতা বৃদ্ধি হয়।

(খ) নিপুণভাবে তথ্যের ব্যবহার (Information Management) ঃ গোষ্ঠী কর্মেও নানা তথ্যের ব্যবহার প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে। যেহেতু পরিকল্পিতভাবে গোষ্ঠীকর্ম পরিচালনা করা আবশ্যক গোষ্ঠীর লক্ষ্য পূরণের জন্য, তাই নানা ধরনের তথ্যের ব্যবহার করা অপরিহার্য। সেগুলি ব্যবহারের ক্ষেত্রে মুন্সিয়ানা দেখানো দরকার।

(গ) আপোষ মীমাংসাচুক্তি (Contract Negotiation) ঃ গোষ্ঠীর কাজ সহমতের ভিত্তিতে, গোষ্ঠীর উদ্দেশ্যের ব্যাপারে সকলে একমত হয়ে পরিচালনা করা দরকার। দলের লক্ষ্য পূরণের উদ্দেশ্য সকলকে সংঘবদ্ধভাবে কাজ করার জন্য কিছু নিয়মকানুন মেনে চলতে হয়। সেইমত সহমতের ভিত্তিগুলি বর্ণনা করে এক ধরনের আলোচনা করা দরকার যার দ্বারা দলের বা গোষ্ঠীর সদস্য এবং গোষ্ঠীকর্মী একে অন্যের এবং সামগ্রিকভাবে দলের গোষ্ঠীর আশা-আকাঙ্খার কথা মাথায় রেখে সেই সম্পর্কে যা করণীয় সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে।

(ঘ) গোষ্ঠীর ব্যাপারে আলোকপাত করা (Focusing on group) ঃ গোষ্ঠীর মধ্যে নানা বিষয় সংঘটিত হয়, গোষ্ঠীর অবস্থানগত নানা পরিবর্তন ঘটে, নানা বিষয় আলোচনা হয়, নানা সমস্যা উত্থিত হয় নানা সাফল্য প্রাপ্তি ঘটে। এই সমস্ত বিষয়গুলির উপর সদস্যদের জ্ঞান বা ধারণা যাতে স্পষ্ট থাকে সেজন্য উপযুক্তভাবে তার উপর আলোকপাত করা দরকার। গোষ্ঠী কর্মী (Group work) প্রয়োজনীয় নানা বিষয়ে আলোকপাত করার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে।

(ঙ) অনুভূতির প্রতি সাড়া দেওয়া (Responding to feeling) ঃ প্রতিটি মানুষই অনুভূতি সম্পন্ন। অনুভূতির মাত্রায় ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে কিছু পার্থক্য থাকে সত্য কিন্তু অনুভূতিহীন মানুষের কথা ভাবা যায় না। গোষ্ঠীর সদস্যদের সেই অনুভূতিকে যত বেশী সম্ভব কার্যকরী করে তুলে সমস্যাগুলিকে সঠিকভাবে অনুভব করা, পারস্পরিক সম্পর্ক সমৃদ্ধ করার প্রয়োজন অনুভব করা, কর্মসূচীর উপযুক্ততা এবং তার প্রথা প্রকরণ সম্পর্কে সঠিক অনুভবের পরিচয় দেওয়া অত্যন্ত জরুরী। অনুভব শক্তির উজ্জ্বল উপস্থিতি যে কোন গোষ্ঠীর অবস্থায় লক্ষ্যনীয় পরিবর্তন সাধনে সহায়ক হয়।

(চ) পুরস্কৃত করা (Rewarding) ঃ এটি এক বাস্তব সত্য যে গোষ্ঠীর সমস্ত সদস্য গোষ্ঠীর সমস্যা নিরূপণে, সম্পদ আহরনে, সমস্যার সমাধানের পথ অনুসন্ধানে, গোষ্ঠী পরিচালনায় সমান আগ্রহ ও দক্ষতা নিয়ে কাজ করে না। গোষ্ঠীর মধ্যে কারো কারো কার্যকারিতা খুব কম, কারো কারো মোটামুটি এবং কারো কারো অত্যন্ত বেশী। যাদের কার্যকারিতা অত্যন্ত বেশী, যারা গোষ্ঠীর আদর্শ বজায় রাখা এবং লক্ষ্য পূরণের ব্যাপারে উল্লেখযোগ্য কাজ করেন, তাদের পুরস্কৃত বা সম্মানিত করা উচিত। গোষ্ঠীর সমস্ত সদস্যকে উৎসাহিত করার পক্ষে এবং গোষ্ঠীর পরিবেশ উন্নত করার ক্ষেত্রে এই পদক্ষেপ গ্রহণ অত্যন্ত কার্যকরী।

(ছ) সংক্ষিপ্তকরণ (Summarising) ঃ গোষ্ঠীকর্মের ক্ষেত্রে আরও একটি কৌশল হলো সংক্ষিপ্তকরণ— যার অর্থ পুনর্বিবেচনার জন্য (review) গোষ্ঠীর সদস্যদের বক্তব্যের বা অভিমতের একত্রীকরণ এবং পরবর্তী পদক্ষেপ বিবেচনা করা। সংক্ষিপ্তকরণ হচ্ছে একটি প্রক্রিয়া যার মধ্যে সংক্ষিপ্তভাবে পূর্বে আলোচিত বিষয়সমূহকে একটি বিবরণীর মধ্যে একত্রিকরণ করা হয়। পরে তারই বিত্তিতে সহমত বা ঐক্যমতের চেষ্টা করা হয় অথবা দলের সদস্যদের কাছ থেকে সংশোধনী চাওয়া হয় যতক্ষণ না সংশোধনী বিবরণ সমস্ত সদস্যের দ্বারা সঠিক বলে বিবেচিত হয়।

(জ) দ্বার রক্ষণ (Gate keeping) ঃ দ্বার রক্ষণ হচ্ছে একটি আচরণ যা গোষ্ঠীর সমস্ত সদস্যকে তাদের নিজ নিজ সাধ্য বা সীমা অনুযায়ী গোষ্ঠী কর্মে অংশগ্রহনে সাহায্য করে এবং যে সমস্ত সদস্য গোষ্ঠীর আলোচনা কুক্ষিগত করে রাখে, তাদের নিয়ন্ত্রণ করে। আলোচনায় অল্প অংশগ্রহণ কারীদের বা অনাগ্রহীদের উৎসাহিত করা হয় যাতে তারাও আলোচনার শরীক হয়। এভাবে গোষ্ঠীর মধ্যে আলোচনায় ভারসাম্য আনা (achieving a balance in the participation) যে কোন গোষ্ঠীর সুস্থ বৃদ্ধির জন্য কাম্য।

(ঝ) মধ্যস্থতা করা (Mediating) ঃ গোষ্ঠী কর্মে অংশগ্রহণকারী সদস্যদের দ্বন্দ্বের (Conflicts) অবসান ঘটানোর উদ্দেশ্যে এই কৌশল অবলম্বন করা হয়। মধ্যস্থতার কাজে যুক্ত ব্যক্তি বা মধ্যস্থতাকারীর (Mediator) দরকার পক্ষপাতহীন আচরণ অর্থাৎ বাদী এবং বিবাদীপক্ষ উভয়েরই আস্থা অর্জন করে নিরপেক্ষভাবে তাদের মধ্যে যে অনৈক্য তৈরী হয়েছে তা দূর করার ব্যাপারে সাহায্য করা। এই পক্ষপাতহীন আচরণের মধ্য দিয়ে বিবাদমান দুই পক্ষের মধ্যে একটা বোঝাপড়ার পরিবেশ তৈরী করে গোষ্ঠীর স্বাভাবিক অগ্রগতিকে বজায় রাখতে সাহায্য করে।

(ঞ) উপযুক্তভাবে শুরু করা (Appropriate starting) ঃ গোষ্ঠীর যে কোন কাজ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করতে হলে তার সূত্রপাত হওয়া উচিত উপযুক্তভাবে। সূত্রপাত বা শুরু করার অর্থ একগুচ্ছ আচরণ (a set of behaviour) যা কাজের গুরুত্ব বুঝতে সাহায্য করে এবং সকল সদস্যকে সেই কাজে যুক্ত হতে উদ্বুদ্ধ করে। যে কোন কাজেই আরম্ভ করার পর্বটি গুরুত্বপূর্ণ। সূত্রপাত ভাল হলে যেমন কাজে আগ্রহ, গতি এবং মনযোগের সঞ্চার হয় তেমনি ঠিকভাবে সূত্রপাত না হলে সে কাজের মধ্যে প্রাণ প্রতিষ্ঠা হয় না। সেজন্য উপযুক্ত গুরুত্বের সঙ্গে কাজ শুরু করতে হয় কোন শৈথিল্য বা পরিকল্পনা হীনতার সুযোগ না রেখে।

১৫.৩ গোষ্ঠী সমাজ কর্মে প্রয়োজনীয় প্রাথমিক দক্ষতা

যে কোন কাজ সুচারুরূপে করতে হলে সংশ্লিষ্ট কর্মীকে কিছু জ্ঞান ও দক্ষতার অধিকারী হতে হয়। গোষ্ঠীগত সমাজ কর্মের ক্ষেত্রেও এটি সত্য। গোষ্ঠীসমাজ কর্মে দক্ষতা, বোধগম্যতা, কর্মীর সচেতন জ্ঞানের প্রয়োগ, বক্তব্যকে হৃদয়গ্রাহীকে উপস্থাপন করার ক্ষমতা ইত্যাদি দক্ষতা গোষ্ঠীকর্মী ও গোষ্ঠী সদস্যদের মধ্যে যত বেশী থাকবে ততই গোষ্ঠী কার্যকরী এবং শক্তিশালী হয়ে উঠবে। গোষ্ঠী সমাজ কর্মে যে সমস্ত প্রাথমিক বা মৌলিক দক্ষতার দরকার পড়ে সেগুলি হলো ঃ

(ক) উদ্দেশ্যপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপনের দক্ষতা (Skill in establishing purposeful relationship) ঃ গোষ্ঠী কর্মীকে গোষ্ঠীর সদস্যদের কাছে গ্রহণীয়তা (acceptance) বৃদ্ধির জন্য সদস্যদের সঙ্গে উদ্দেশ্যপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপনে এবং সদস্যের সঙ্গে সদস্যের সম্পর্কে উন্নতি ঘটানোর ক্ষেত্রে দক্ষ হতে হবে। নিজের কর্মদক্ষতা ব্যবহার এবং পেশামূলক মনোভাব প্রদর্শনের মাধ্যমে একদিকে যেমন নিজের গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি করবে অন্যদিকে তেমনি সদস্যদের মধ্যে পারস্পরিক বোঝাপড়ার মানসিকতা অর্জনের ক্ষেত্রে গোষ্ঠীকে সহায়তা প্রদানে সক্ষম হবে বা দক্ষতা প্রদর্শন করতে হবে।

(খ) গোষ্ঠীর পরিস্থিতি বিশ্লেষণের ক্ষমতা (Skill in analysing the group situation) ঃ

গোষ্ঠী কর্মীকে অবশ্যই গোষ্ঠীর বিকাশ সাধনের সীমা নির্ধারণের ব্যাপারে দক্ষ হতে হবে— অর্থাৎ তার সেই দক্ষতা থাকবে যাতে গোষ্ঠীর বর্তমান অবস্থা কি, গোষ্ঠী কি চায়, গোষ্ঠী কত দ্রুত এবং কিভাবে কাজ শুরু করতে চায়, কি কি সমস্যার মুখোমুখি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, কে কি ধরনের ভূমিকা পালনের উপযুক্ত এসব ব্যাপারে বিশ্লেষণ করার দক্ষতা এবং তদনুসারে সিদ্ধান্ত গ্রহণের দক্ষতা থাকা জরুরী। গোষ্ঠীর কর্মী গোষ্ঠীকে তার ধারণা প্রকাশ করতে, উদ্দেশ্য স্থির করতে এবং আস্ত লক্ষ্যের বিষয়ে ব্যাখ্যা করতে সাহায্য করার ক্ষেত্রে অবশ্যই দক্ষ হতে হবে।

(গ) গোষ্ঠীর সাথে অংশগ্রহণের দক্ষতা (Skill in participation with group) ঃ

গোষ্ঠীকর্মী অবশ্যই নানা বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণে (decision marking), অবস্থা ইত্যাদি ব্যাখ্যা করায় (analysing), কোন কর্মসূচী-কর্মপদ্ধতি-সিদ্ধান্তকে প্রয়োজনীয় পরিমার্জনে (modifying) গোষ্ঠীর সঙ্গে নিজেও দক্ষতার সঙ্গে অংশগ্রহণ করবে। অর্থাৎ গোষ্ঠীকর্মী এবং গোষ্ঠী সদস্য সকলকেই এ বিষয়ে দক্ষতা অর্জন করতে হবে। গোষ্ঠীর সদস্যদের এসব ক্ষেত্রে কার্যকরীভাবে অংশগ্রহণ করাতে, তাদের মধ্যে নেতৃত্ব চিহ্নিত করতে এবং তারা যাতে বিভিন্ন কাজে দায়িত্ব গ্রহণ করে সে ব্যাপারে উদ্যোগী করে তুলতে দক্ষ হতে হবে।

(ঘ) গোষ্ঠীর অনুভূতিকে নিয়ে কাজ করার দক্ষতা (Skill in dealing with group feeling) ঃ

গোষ্ঠীকর্মী অবশ্যই গোষ্ঠীর অনুভূতি উপলব্ধিতে দক্ষ হবে। সেই সঙ্গে তার নিজস্ব অনুভূতিকে নিয়ন্ত্রণে রাখার ক্ষেত্রেও দক্ষতা দেখাতে হবে। অনুভূতি ইতিবাচক এবং নেতিবাচক (positive and negative) দুইই হতে পারে। সেগুলি প্রকাশে সহায়তা করার ক্ষেত্রেও দক্ষ হতে হবে।

(ঙ) কর্মসূচী উন্নয়নে দক্ষতা (skill in programme development) ঃ

গোষ্ঠী কর্মী গোষ্ঠীর চিন্তাভাবনাকে সঠিক পথে পরিচালনার ক্ষেত্রে উপযুক্তভাবে দক্ষ হবে যাতে গোষ্ঠীর আগ্রহ এবং প্রয়োজন স্পষ্টভাবে কর্মরূপায়নের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। গোষ্ঠীকে তার কর্মসূচী প্রণয়নে যথোপযুক্ত সাহায্য করার মত দক্ষতা প্রদর্শন করতে হবে। কর্মসূচী উন্নয়ন অনায়াসে ঘটে না, তা দাবী করে কর্মী ও সদস্যদের প্রশ্নাতীত দক্ষতা।

(চ) সংস্থা ও সমষ্টির সম্পদ ব্যবহারের দক্ষতা (Skill in using Agency and community Resources) ঃ

উন্নয়নের জন্য নানান সংস্থা রয়েছে। সেই সব সংস্থা কিছু সম্পদের অধিকারী। সম্পদ রয়েছে প্রতিটি সমষ্টিতেও। সেইসব সম্পদ চিহ্নিত করনে এবং গোষ্ঠীর উন্নয়নে তা সদ্ব্যবহার করার ক্ষেত্রে কর্মী ও সদস্যদের দক্ষ হতে হবে। এভাবে সম্পদ ব্যবহারের মধ্য দিয়েই গোষ্ঠীর উন্নয়ন বাস্তবায়িত হয়। আকার গোষ্ঠীর মধ্য থেকে পূরণ করা যায় না, একক ব্যক্তির এমন বিশেষ প্রয়োজন মেটাতে বিশেষীকরণ পরিষেবা (Specialized services) দানের জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে উপযুক্ত প্রতিষ্ঠানে পাঠানোর ব্যাপারেও কর্মীকে দক্ষ হতে হয়।

(ছ) মূল্যায়নের দক্ষতা (Skill in evaluation) ঃ

যে কোন কাজের কার্যকরী প্রভাব পড়ে কার্যপ্রণালীর উপযুক্ত রূপায়নের মাধ্যমে। কর্মসূচীকে যথেষ্ট কার্যকর করার স্বার্থে কর্মপরিকল্পনা কতটা নিখুত, কর্মধারা কতটা বাস্তবোচিত, কর্ম-প্রক্রিয়ায় কর্মীদের যোগদান কতটা অর্থবহ, কোথাও ব্যর্থতা এলে কেন আসছে এবং কতটা আসছে তা মূল্যায়ন করার দক্ষতা থাকা দরকার। উন্নয়ন প্রক্রিয়াকে লিপিবদ্ধ করা এবং নথি ব্যবহারেও দক্ষ হতে হয় কর্মীকে। প্রয়োজনে গোষ্ঠী সিদ্ধান্তকে পুনঃর্বিবেচনা করার প্রক্রিয়াতেও পারঙ্গম হতে হয়, গোষ্ঠী কর্মে সাফল্য পেতে হলে।

১৫.৪ প্রশ্নাবলী ঃ

(১) Bertcher-এর মতের ভিত্তিতে সফল গোষ্ঠী বলতে কি বোঝ?

(২) গোষ্ঠীকর্মের মূল কলাকৌশলগুলি কি কি?

(৩) গোষ্ঠী সমাজ কর্ম কিছু দক্ষতার দাবী রাখে। সেগুলির উল্লেখ কর।

এম. এস. ডব্লু.

তৃতীয় পত্র

সমষ্টি সংগঠন

(Community Organization)

একক ১ □ সমষ্টি সম্পর্কিত ধারণা

গঠন

১.১ উদ্দেশ্য
১.২ সমষ্টির সংজ্ঞা/ধারণা
১.৩ সমষ্টির ধরন ও প্রকার
১.৪ সমষ্টির বৈশিষ্ট
১.৫ আমাদের সমষ্টি সমূহের মুখ্য সমস্যাবলী
১.৬ প্রশ্নাবলী
১.৭ গ্রন্থপঞ্জী

১.১ উদ্দেশ্য

সুদূর অতীত থেকেই মানুষ সমষ্টিবদ্ধ। সমুদয়গতভাবে জীবনযাপন মানুষের সভ্যতা-সংস্কৃতি বিকাশের ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। 'আমরা সমষ্টির, সমষ্টি আমাদের'—এই অনুভূতি ব্যতিরেকে আমাদের জীবন অর্থহীন। প্রকৃতপক্ষে এমন অবস্থা কল্পনাতেও আসে না যে, মানুষ আছে কিন্তু সমষ্টি নেই এবং তারা যে যার মত বাস করছে, কোন বাঁধন নেই। তাই মানুষের সমাজে সমষ্টির অস্তিত্ব অনিবার্য হয়ে পড়ে। সমষ্টি কখনো অচল এক বস্তুবিশেষ নয়। যেহেতু মানুষকে নিয়েই সমষ্টি তাই তার গঠন, উপাদান, বৈশিষ্ট, সমস্যা ইত্যাদিও রয়েছে। আবার এই সব ক্ষেত্রে একটি সমষ্টির সঙ্গে আর একটি সমষ্টির পার্থক্য থাকা খুবই স্বাভাবিক। সমাজসেবার ছাত্র-ছাত্রীদের উচিত সমষ্টি সংক্রান্ত সব ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ধারণার অধিকারী হওয়া। সেই উদ্দেশ্য পূর্তির জন্যই এই অধ্যায়ের অবতারনা।

১.২ সমষ্টির সংজ্ঞা/ধারণা

সমষ্টির নির্দিষ্ট কোন একটি সংজ্ঞা নেই। বিভিন্ন সমাজ বিজ্ঞানী বিভিন্নভাবে সমষ্টিকে ব্যাখ্যা করেছেন। তার মধ্যে এখানে কয়েকটি সংজ্ঞা বা অর্থের উল্লেখ করা যেতে পারে। যেমন (ক) সমষ্টি হচ্ছে একটি সম্পূর্ণ সংগঠিত একক যেখানে প্রতিটি উপাদান পারস্পরিক সম্পর্ক রেখে কাজ করে এবং প্রাণ আছে এমন সব কিছুকে স্বস্তি দিয়ে থাকে। (Community is the complete organised unit wherein each and every element functions in a related manner and produces comforts for other living beings.) (খ) সমষ্টির অর্থ যে কোন ছোট, কোন বিশেষ সীমাবদ্ধ রাজনৈতিক বিভাগ এবং অর্থনৈতিক ও সামাজিক একক যার সদস্যেরা এক সাধারণ মূল্যবোধের অংশীদার। (Community denotes any small, localized political, economic and social unit whose members share values in common.....) (গ) কিছু মানুষ যখন একটি নির্দিষ্ট ভৌগোলিক এলাকায় ঘনিষ্ঠভাবে বসবাস করে এবং কিছু সাধারণ ধারণা, স্বার্থ, উদ্বেগ বা ভাবনা, ভাষা এবং সংস্কৃতি নিয়ে চলে তখন তাকে সমষ্টি বলে। (A group of people living in close proximity (in a given area) and having some common idea, interest, concern, language and culture is called community).

উপরোক্ত সংজ্ঞাগুলি বিশ্লেষণ করলে যে সারমর্মটি ফুটে উঠে তা হলো, যখন কিছু মানুষ একটি নির্দিষ্ট ভৌগোলিক এলাকায় ঘনিষ্ঠভাবে বসবাস করেন এবং তাদের মোটামুটি একই ধরনের স্বার্থ, ধারণা, সমস্যা, ভাষা এবং সংস্কৃতি থাকে তখন তাকে সমষ্টি বলে। অর্থাৎ মানুষ ছাড়া সমষ্টি হয় না। কিন্তু মানুষের সঙ্গে তাদের সংগঠন, সম্পদ, বৈশিষ্ট, উদ্বেগ বা সমস্যাও থাকবে। সমষ্টি এমন একটি একক যেখানে সদস্যেরা অনুভব করে যে তারা এক ও সংঘবদ্ধ। তাই খুব সংক্ষেপে আমরা বলতে পারি, সচেতনভাবে সংগঠিত জনসমষ্টি যারা একটি নির্দিষ্ট ভৌগোলিক এলাকায় বসবাস করে এবং কিছু পরিমাণে স্বীকৃতি ও পারস্পরিক নির্ভরতা রেখে জীবনযাপন করে তাই হলো সমষ্টি।

১.৩ সমষ্টির ধরণ ও প্রকার

অবস্থান (location), পারস্পরিক ক্রিয়াপ্রক্রিয়া (interaction) এবং বাস্তুতত্ব (ecology) এই তিনটি বিষয়ের ভিত্তিতে সমষ্টিকে মূলতঃ তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়। সেগুলি হলো ঃ

(ক) শহুরে সমষ্টি (urban community) : এই সমষ্টির আয়তন বড় হয় এবং এটি গঠিত হয় বিভিন্ন ধরণের মানুষের সমাহারে। নানা ভাষাভাষী, সংস্কৃতি, জাতি এবং ধর্মের মানুষ সেখানে একসঙ্গে বাস ক'রে। এই ধরণের সমষ্টিকে বলে অসদৃশ সমষ্টি (Heterogeneous Community)।

(খ) গ্রামীণ সমষ্টি (Rural Community) : এই সমষ্টি আয়তনে ছোট। একই ভাষাভাষী এবং মোটামুটি একই সংস্কৃতিতে দীর্ঘকাল ধরে এরা লালিত। পারস্পরিক নির্ভরতার সূত্রে এই সমষ্টির সদস্যেরা আবদ্ধ।

(গ) আদিবাসী সমষ্টি (Tribal Community) : সাধারণ গ্রামীণ সমষ্টির বাইরে আরো এক শ্রেণীর সমষ্টি আমরা লক্ষ্য করে থাকি। এই আদিবাসী সমষ্টি সাধারণতঃ পাহাড় ও জঙ্গলে ছোট ছোট সমষ্টি গড়ে তুলে বসবাস করে। সাধারণতঃ আদিবাসী সমষ্টিতে অন্য কোন ভাষা, ধর্ম, জাতি বা সংস্কৃতির মানুষ বাস করে না। এগুলিকে তাই আক্ষরিক অর্থেই সদৃশ সমষ্টি (Homogeneous Community) বলে।

এছাড়া আর একটি সমষ্টি রয়েছে যাকে আমরা যাযাবর সমষ্টি (Nomadic Community) বলি। তেমন কোন স্থায়ী সম্পদের অভাবে এরা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে বসবাস করে। তারা যখন যেখানে বসতি স্থাপন করে তখন সেখান থেকেই নানা উপায়ে জীবিকা নির্বাহ করে। এই সমষ্টিও অত্যন্ত স্পষ্টভাবে সদৃশ সমষ্টি (Homogeneous Community)।

১.৪ সমষ্টির বৈশিষ্ট

প্রতি ব্যক্তি মানুষের যেমন কিছু চারিত্রিক বৈশিষ্ট থাকে তেমনি প্রতিটি সমষ্টিরও কিছু বৈশিষ্ট থাকে। সব সমষ্টি কখনো বৈশিষ্টের বিচারে এক হতে পারে না। তবু শহর, গ্রাম এবং আদিবাসী সমষ্টির সাধারণ চারিত্রিক বৈশিষ্টগুলি আমরা উল্লেখ করতে পারি।

(ক) শহুরে সমষ্টি ঃ

—সাধারণতঃ পরিবার, আত্মীয়তা ইত্যাদি ব্যবস্থা অনেক সরল এবং ধর্ম ও জাতিভিত্তিক ভেদাভেদ তুলনায় কম।

—শিক্ষার বহুল প্রচার এবং চেতনার স্তর উঁচু হওয়ায় অন্ধবিশ্বাস, কুসংস্কার এবং দেশাচার ইত্যাদির দ্বারা জীবনযাত্রা তেমনভাবে পরিচালিত নয়।

—প্রকৃতির সঙ্গে যোগ কম, প্রাকৃতিক বিপর্যয়ও তুলনায় কম।

—আয়তন বড় এবং জনসংখ্যা ও জনঘনত্ব বেশী। শান্ত পরিবেশের অভাব।

—অর্থনীতি মূলতঃ চাকুরি এবং ব্যবসাভিত্তিক। সাধারণতঃ পরিবারের দু' একজন অর্থকরী কাজে যুক্ত থাকেন, সকলে নয়।

—বৃত্তির ক্ষেত্রে বংশপরম্পরা ব্যাপারটি শহরের সমষ্টিতে মাত্রায় কম। এখানে মানুষের জীবিকা বা বৃত্তিতে পরিবর্তন ঘটার সুযোগ সম্ভাবনা বেশী।

—সচেতনতা এবং উন্নত পরিষেবার জন্য জন্মহার এবং মৃত্যুহার কম।

—পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া জোরালো নয়। সামাজিক ঐক্য তেমন গভীর ও বিস্তৃত নয়।

—গোপনীয়তা রক্ষা করা সম্ভব এবং তা সাধারণতঃ রক্ষিত হয়।

—জীবন খুব দ্রুত এবং প্রতিযোগিতার মনোভাব খুব স্পষ্ট। উচ্চাশা নিত্য সঙ্গী হওয়ায় আরো উঁচুতে ওঠার লড়াই সদা বাস্তব।

—যেহেতু এই সমষ্টি গড়ে উঠে বিভিন্ন স্থান থেকে আসা মানুষের সমাবেশে, স্বভাবতঃই ভাষা, সংস্কৃতি, আচরণের ক্ষেত্রে পার্থক্য থাকে।

—শিক্ষার প্রতি আগ্রহ বেশী।

—মহিলাদের অবস্থান (status) অন্য সমষ্টির মহিলার তুলনায় উন্নত।

—ভোগ প্রবণতা বেশী।

—মানুষ সাধারণতঃ যান্ত্রিক জীবনের শিকার।

(খ) গ্রামীণ সমষ্টি :

—পরিবার, বিবাহ, আত্মীয়তা, জাতিভেদ প্রথা, ধর্মভেদ প্রথা ইত্যাদি জটিল এবং প্রাচীন প্রথানুসারী।

—অন্ধবিশ্বাস, কুসংস্কার, দেশাচার ইত্যাদি জোরালোভাবে বিরাজ করে।

—মূলতঃ প্রকৃতি-নির্ভর জীবন। তার ফলে খরা, বন্যা, অন্যান্য প্রাকৃতিক বিপর্যয় অনেকসময় গ্রামীণ জীবনে বিপর্যয় ডেকে আনে। অন্যদিকে প্রকৃতিগত উপাদানের প্রভাবে তাদের জীবন ও জীবিকাতে স্বাভাবিকতা বজায় থাকে।

—আয়তন ছোট হয় এবং জনসংখ্যা, জনঘনত্ব কম হয়। পরিবেশের মধ্যে থাকে শান্ত ভাব।

—অর্থনীতি মূলতঃ কৃষিনির্ভর। তার সঙ্গে পশুপালন, কুটির শিল্প এবং ছোট ব্যবসাও জীবিকার মাধ্যম। এবং এসব কাজে পুরুষ, মহিলা এমনকি অপ্রাপ্তবয়স্ক ছেলেমেয়েরাও যুক্ত থাকে।

—বৃত্তির ক্ষেত্রে খুব সহজে পরিবর্তন ঘটে না। যে পরিবারের যে বৃত্তি বংশপরম্পরায় তারা সাধারণতঃ সেই বৃত্তিতেই যুক্ত থাকে।

—যেহেতু প্রতিটি পরিবার উৎপাদনের এক একটি একক সেজন্য জন্মহার বেশী হয়। তাছাড়া অশিক্ষা, অজ্ঞতা, পুত্র সন্তান কামনা ইত্যাদি কারনেও জন্মহার বেশী হয়।

—অজ্ঞতা, অনীহা, প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য পরিষেবার অভাব, দারিদ্র ইত্যাদি কারনে মৃত্যুহারও বেশী।

—পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া বেশী। সহযোগিতা ও শত্রুতা অনেক বেশী সরাসরি। সামাজিক ঐক্য তুলনায় বেশী দৃঢ়।

—গোপনীয়তা রক্ষা করার সুযোগ কম। পরস্পর পরস্পরের ব্যাপারে মোটামুটি ওয়াকিবহাল।

—প্রতিযোগিতার মনোভাব সীমাছাড়া নয়। তবে কোন কোন পরিবার বংশ-পরম্পরায় শত্রুতা বজায় রাখে।

—ভাষা, সংস্কৃতি, সামাজিক জীবনধারা একই রকম হয়।

—মহিলাদের অবস্থান পুরুষের তুলনায় অনেকাংশে হীন।

—ভোগের প্রবণতা তুনলায় কম।

—এক শ্রেণীর মানুষের মধ্যে দারিদ্র নিত্য সত্য।

(গ) আদিবাসী সমষ্টি ঃ

—বিচ্ছিন্নভাবে একান্তে অবস্থিত। সাধারণতঃ জঙ্গল, জঙ্গলসংলগ্ন এলাকা, পাহাড় এবং পাহাড়তলিতে এই সমষ্টির অবস্থান।

—বংশ পরম্পরায় দারিদ্র তাদের নিত্যসঙ্গী।

—অত্যন্ত সুসংবদ্ধ এবং শৃঙ্খলাময় জীবনযাপন।

—জীবিকায় স্থিরতার অভাব। অবৈজ্ঞানিক প্রথায় সামান্য চাষাবাদ, সামান্যভাবে পশুপালন, দলবদ্ধভাবে শিকার, কিছু কিছু কুটির শিল্প, দিনমজুরী ইত্যাদির মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ।

—নিজেদের সংস্কৃতির প্রতি প্রবল অনুরাগ।

—আদিবাসী নয় এমন কোন পরিবার সাধারণতঃ এই সমষ্টির সদস্য হয় না।

—মৃত্যুহার বেশী—দারিদ্র, অজ্ঞতা এবং স্বাস্থ্য পরিষেবার অভাবে।

—শিক্ষা গ্রহণের ব্যাপারে নির্লিপ্ত মনোভাব।

—সম্পূর্ণভাবেই প্রকৃতিনির্ভর জীবন।

উপরোক্ত বৈশিষ্টগুলি যে সর্বক্ষেত্রে সমানভাবে সত্য এমন অবশ্য বলা যায় না। কারন যোগাযোগ ব্যবস্থায় উন্নতি, শহর জীবনের প্রভাব, শিল্পায়ন, শিক্ষার প্রসার, বৃত্তির ক্ষেত্রে বহুমুখিতা ইত্যাদি কারনগুলি সব ধরণের সমষ্টির চারিত্রিক বৈশিষ্টের ক্ষেত্রেই পরিবর্তন ঘটিয়ে চলেছে নিরন্তর। তৎসত্ত্বেও বলা যায় যে, উপরোক্ত বৈশিষ্টগুলি বিভিন্ন সমষ্টির ক্ষেত্রে সত্য হয়ে আছে।

১.৫ আমাদের সমষ্টি সমূহের মুখ্য সমস্যাবলী

গ্রাম এবং শহর উভয় এলাকার সমষ্টিই নানা অসুবিধা বা সমস্যার শিকার। এইসব সমস্যার মধ্যে কিছু কিছু যেমন প্রায় চিরস্থায়ী তেমনি আরো কিছু সমস্যা বিভিন্ন সময় প্রকট হয়ে উঠে। এইসব সমস্যা এখানে সংক্ষিপ্তভাবে বিশ্লেষণ করা হবে।

(ক) গ্রামীণ সমষ্টি ঃ

—সীমিত বৃত্তি বা জীবিকার জন্য জনসম্পদকে বিভিন্ন ধরণের সৃষ্টিধর্মী কাজে যুক্ত করা সম্ভব হয় না। ফলে আর্থিক অবস্থা যেমন ভাল হয় না তেমনি জনসম্পদের অপচয় রোধ করাও সম্ভব হয় না।

—প্রাচীন পন্থায় কৃষিকাজ এবং পশুপালন করা, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পেও বৈচিত্র না আনা, সেচের উপযুক্ত পরিকাঠামো গড়ে না উঠা, বারবার জমির খণ্ডীকরণ, জীবনধারণের ক্ষেত্রে পরিকল্পনার অভাব, অধিক জন্মহার ইত্যাদি কারণে অধিকাংশ মানুষের জীবনে আর্থিক অস্বাচ্ছল্য এক চিরবাস্তব ঘটনা।

—শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পুষ্টি, স্বল্প সঞ্চয়, ছোট পরিবার গঠন ইত্যাদি বিষয়ে অজ্ঞতা ও অনীহার জন্য গ্রামীণ সমষ্টিতে লক্ষ্যণীয় আর্থ-সামাজিক পরিবর্তন না ঘটা।

—যোগাযোগ বা পরিবহনজনিত সমস্যার জন্য গ্রাম সমষ্টির অন্তর্গত মানুষ নানা সুযোগসুবিধা লাভ বা পরিষেবা থেকে বঞ্চিত হয়। যেমন রোগীকে চিকিৎসকের কাছে বা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া, উৎপাদিত বিভিন্ন দ্রব্য সহজে বাজারজাত করা, ছেলে-মেয়েদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পাঠানো, সরকারী-বেসরকারী নানা কার্যালয়ের সঙ্গে প্রয়োজনীয় সম্পর্ক রক্ষা করা ইত্যাদি ক্ষেত্রে গ্রাম সমষ্টির সদস্যেরা অনেকক্ষেত্রেই উপযুক্ত সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়।

—হতাশা, নিজেকে প্রয়োগ করার ক্ষেত্রে অনীহা, সৃষ্টিধর্মিতার অভাব গ্রাম সমষ্টির প্রগতিকে শ্লথ করে রাখে।

—মহিলাদের সামগ্রিক অবস্থান সাধারণভাবে বেদনাদায়ক। এই একবিংশ শতাব্দীতেও পূর্ণ মানুষের মর্যাদা পাওয়া সম্ভব হয়ে উঠে না অনেকক্ষেত্রে। অধিকাংশ মহিলার জীবনই সম্পূর্ণভাবে পুরুষনির্ভর। তাদেরও শিক্ষার প্রয়োজন আছে, চেতনার দরকার আছে, সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার আছে তা এখনো গ্রাম সমষ্টির বহু সদস্যের বোধের মধ্যে তেমনভাবে আসে নি।

(খ) শহুরে সমষ্টি ঃ

—জনঘনত্ব, বস্তির উপস্থিতি, যত্রতত্র গজিয়ে উঠা কলকারখানা, গাড়ীর ধোঁয়া, নাগরিকতা বোধের অভাব ইত্যাদি কারনে শহর সমষ্টির মানুষ পরিবেশগত সমস্যার শিকার। এর ফলে নানা ধরণের স্বাস্থ্যগত সমস্যা ক্রমবর্দ্ধমান।

—বিচ্ছিন্নতাবোধ শহুরে সমষ্টির আর এক জটিল সমস্যা। এর ফলে কখনো কখনো অসহায়তাবোধ দেখা দেয়, মানসিক রোগ দেখা দেয়। আবার এগুলিকে কেন্দ্র করে নানা শারীরিক জটিলতাও দেখা দেয়।

—মহিলাদের অবস্থান গ্রামীণ সমষ্টির মত হতাশাজনক না হলেও পুরুষের তুলনায় তারা যে অনেকটাই পশ্চাৎপদ তা নিয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। সামাজিক, আর্থিক, শিক্ষাগত সর্বক্ষেত্রেই তারা লক্ষ্যণীয়ভাবে পিছিয়ে। বিশেষতঃ বস্তি অঞ্চলে এই সমস্যার গভীরতা যথেষ্ট উদ্বেগজনক।

—শহরের সমষ্টিতে বিনোদন মূলতঃ বাণিজ্যিক। আর এই ধরণের বিনোদনকে কেন্দ্র করেই অপসংস্কৃতি জায়গা করে নিচ্ছে।

—নানা ধরণের অসামাজিক কাজকর্ম সংঘটিত হওয়াও শহুরে সমষ্টির অন্যতম সমস্যা। চুরি-ডাকাতি, প্রতারণা, নারীকেন্দ্রিক অপরাধ, শিশুকৃত অপরাধ (Delinquency), শিশুশ্রম, দেহ ব্যবসায় ইত্যাদি নানা অসামাজিক কাজ শহর সমষ্টির অঙ্গবিশেষ।

সমষ্টির সমস্যা হলো বহুমুখী এবং পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। উদাহরণ হিসাবে বলা যায়, বেকারত্ব এবং অপসংস্কৃতির সঙ্গে সরাসরি যোগ রয়েছে অসামাজিক ক্রিয়াকলাপের। তেমনি ভোগবাদের সঙ্গে যোগ রয়েছে অপসংস্কৃতির। উচ্চাশার সঙ্গে যোগ রয়েছে অস্বাস্থ্যকর প্রতিযোগিতার। চিরাচরিত প্রথায় কৃষিকাজ ও পশুপালনের সঙ্গে যোগ রয়েছে দারিদ্রের। একজন সমাজকর্মী বা সমষ্টি সংগঠককে এ বিষয়ে সতর্ক থাকতে হয়, সচেতন থাকতে হয়।

এই পর্যায়ে সমষ্টির যে সমস্ত বৈশিষ্ট এবং সমস্যাগুলি তুলে ধরা হলো সেগুলি বিশ্লেষণ করলে আমাদের উপলব্ধি করতে অসুবিধা হয় না যে সমষ্টি মাত্রই কিছু শক্তির অধিকারী আবার কিছু দুর্বলতার শিকার। একজন সমাজ সংগঠককে এগুলি সম্পর্কে প্রয়োজনীয় ধারণা অর্জন করতে হবে। এই ধারনার ভিত্তিভূমিতে দাঁড়িয়ে সমষ্টি সংগঠককে কাজ করতে হয়, যদিও ঐসব ধারণা চিরস্থায়ী হয়ে থাকবে তা নয়। নানা সময় তা পরিবর্তিত হবে, তাতে সংযোজন-বিয়োজন ঘটবে। যে কোন সজীব প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে অবস্থানগত পরিবর্তন যেহেতু খুব স্বাভাবিক ঘটনা, তাই সমষ্টি সম্পর্কে আমাদের ধারণাতেও পরিবর্তন ঘটবে ক্রমাগত। তবুও যে সব বিষয় এখানে আলোচিত হলো সেইসব বিষয়ে প্রাথমিক ধারণার অধিকারী হওয়া সমষ্টি সংগঠকের ক্ষেত্রে নিতান্তই জরুরী।

১.৬ প্রশ্নাবলী

১। সমষ্টি বলতে কি বোঝ এবং সমষ্টি কয় প্রকারের?

২। গ্রামীণ ও আদিবাসী সমষ্টির মূল বৈশিষ্ট কি?

৩। শহরে সমষ্টির সঙ্গে গ্রামীণ সমষ্টির বৈশিষ্টের তুলনা কর।

৪। বিভিন্ন সমষ্টির মূল সমস্যাগুলি কি?

৫। একজন সমষ্টি সংগঠকের সমষ্টি সম্পর্কে উপযুক্ত ধারণার অধিকারী হওয়া কেন প্রয়োজন?

১.৭ গ্রন্থপঞ্জী

01. Community Organization — Dr. (Mrs) Banmala

02. Encyclopaedia of Social Work in India Volume I — Planning Commission, Govt. of India.

একক ২ □ সমষ্টি সংগঠন

গঠন

২.১ উদ্দেশ্য

২.২ সমষ্টি সংগঠনের সংজ্ঞা

২.৩ সমষ্টি সংগঠনের পরিধি বা সুযোগ-সম্ভাবনা

২.৪ সমষ্টি সংগঠনের লক্ষ্য

২.৫ সমষ্টি সংগঠন প্রক্রিয়ার নীতিসমূহ

২.৬ সমষ্টি সংগঠনের কার্যপদ্ধতি

২.৭ সমষ্টি সংগঠকের দায়িত্ব/কর্তব্য

২.৮ প্রশ্নাবলী

২.৯ গ্রন্থপঞ্জী

২.১ উদ্দেশ্য

মানুষের উন্নতির জন্য যা যা দরকার তার মধ্যে অন্যতম হলো সুসংগঠিত সমষ্টি। অর্থাৎ যিনি যে সমষ্টির সদস্য সেই সমষ্টি যদি সুসঠিত, সুপরিচালিত, সুসংবদ্ধ হয় তাহলে তার সদস্যেরা ক্রমাগত উন্নতির পথে এগিয়ে যেতে পারে। অন্যদিকে সমষ্টিতে যদি বাঁধন না থাকে, বিশৃঙ্খলা দেখা দেয় তাহলে সেই সমষ্টি ও তার অন্তর্ভুক্ত মানুষের প্রগতি বাধাপ্রাপ্ত হয়। সেজন্য একজন সমষ্টি সংগঠকের জানা দরকার যে সমষ্টি সংগঠনের অর্থ কি, তার পরিধি কতদূর, মূল নীতিসমূহ কি কি এবং সমষ্টি সংগঠনের কার্যপদ্ধতি কি। সমাজ সংগঠনের কাজে যুক্ত থাকতে হলে উপরোক্ত বিষয়গুলি এবং সেই সঙ্গে সমাজ সংগঠকের ভূমিকা কি সে সম্পর্কে অবহিত থাকা উচিত। অন্যথায় তিনি তাঁর ভূমিকা পালনে সমর্থ হবেন না। সেই প্রেক্ষিতেই উপরোক্ত বিষয়গুলি সম্পর্কে যথাযথ আলোচনা করাই হচ্ছে এই এককের উদ্দেশ্য।

২.২ সমষ্টি সংগঠনের সংজ্ঞা

অত্যন্ত সহজ কথায় বলা যায়, সমষ্টি সংগঠকরা যা করে তাই হলো সমষ্টি সংগঠন। আবার সমাজবিজ্ঞানীদের ভাবনা অনুসারে সমষ্টি সংগঠন হলো একটি পদ্ধতি যার দ্বারা একটি সমষ্টি

—তার প্রয়োজন বা সমস্যাগুলিকে চিহ্নিত (identify) করে।

—সেগুলিকে প্রাথমিকতার (priority) ভিত্তিতে সাজায়।

—সেই প্রয়োজন মেটানোর জন্য বা সমস্যার সমাধানের জন্য সংশ্লিষ্ট মানুষের মধ্যে আগ্রহ বা আত্মবিশ্বাস গড়ে তুলে।

—প্রয়োজনীয় সম্পদ (resources) আহরন করে।

—সমস্যা সমাধানের জন্য উপযুক্ত পদক্ষেপ (step) গ্রহণ করে।

—সমষ্টির মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতার মানসিকতা বাড়িয়ে তোলে।

সমষ্টি সংগঠনকে আমরা সমাজ কর্মের এক গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি বলি। এটি এমন এক পদ্ধতি যা সচেতনভাবে

সমষ্টিতে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন সাধনে উদ্যোগী হয়। এবং তা করতে গিয়ে মানুষের আত্মসম্মানবোধে আঘাত করে না বরঞ্চ তাদের পছন্দ-অপছন্দের ব্যাপারটিকে গুরুত্ব দেয়।

সমষ্টি সংগঠনের আরো কয়েকটি সংজ্ঞা বা অর্থ তুলে ধরা যেতে পারে। **যেমন ঃ**

(ক) সমষ্টি সংগঠন হলো সামাজিক সংগঠনের সেই দশা বা ধাপবিশেষ যার মাধ্যমে সমষ্টির দিক থেকে এক সচেতন চেষ্টাকে ভিত্তি করে তার বিভিন্ন বিষয়গুলি গণতান্ত্রিকভাবে পরিচালনা করার ব্যাপারে উদ্যোগ নেওয়া হয়।

(খ) সমষ্টি সংগঠন কথার অর্থ মানুষের কোন গোষ্ঠীকে সাহায্য করা যাতে সর্বসাধারণের চাহিদাকে সংশ্লিষ্ট সকলে চিহ্নিত করে তা মেটানোর ব্যাপারে উদ্যোগী হয়।

(গ) সমষ্টি সংগঠন হলো একটি পদ্ধতি যার দ্বারা সমাজ কর্মী তার অন্তর্দৃষ্টি এবং দক্ষতা কাজে লাগিয়ে সমষ্টিকে (ভৌগোলিক এবং বৃত্তিসম্বন্ধীয়) তাদের সমস্যা চিহ্নিত করণে এবং তার সমাধানে সাহায্য করে।

উপরোক্ত সংজ্ঞাগুলি থেকে যা অনুধাবন করা যায় তা হলো এটি সমাজ কর্মের একটি পদ্ধতি যা সংশ্লিষ্ট মানুষকে সংগঠিত করার মাধ্যমে তাদের সমস্যা চিহ্নিত করে সেগুলির সমাধানে উদ্যোগ নিতে সাহায্য করে।

সমাজ কর্মের অনেকগুলি পদ্ধতি আছে। এই পদ্ধতিগুলির (Methods) মধ্যে অন্যতম হলো সমষ্টি সংগঠন। অন্য পদ্ধতিগুলি হলো ব্যক্তি কর্ম (Case work), গোষ্ঠীকর্ম (Group Work), সামাজিক পদক্ষেপ (Social Action), সামাজিক গবেষণা (Social Research) এবং সমাজ কল্যাণ প্রশাসন (Social Welfare Administration)। উপরোক্ত সব কয়টি পদ্ধতিই মানুষকে তার সমস্যার উর্দ্ধে উঠতে সাহায্য করে।

সমষ্টি সংগঠন পদ্ধতি এই বিশ্বাসকে ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে যে, মানুষ তার সমষ্টিগত অসুবিধাগুলিকে কাটিয়ে উঠে অগ্রগতির পথে এগোতে সক্ষম হয় যদি তারা সম্মিলিতভাবে প্রয়াস চালায় এবং ধারাবাহিকভাবে নিজেদের চাহিদা, সমস্যা এবং সম্পদ সম্পর্কে অবহিত থাকে। তাই সমাজবিজ্ঞানী আর্থার ও ডনহাম (Arther & Dunham) বলেছেন যে, সমষ্টি সংগঠন হলো চাহিদা এবং সম্পদের মধ্যে সমন্বয় সাধনের প্রক্রিয়া।

২.৩ সমষ্টি সংগঠনের পরিধি বা সুযোগ-সম্ভাবনা

বর্তমান সময়ের প্রেক্ষিতে সমষ্টি সংগঠনের পরিধি ব্যাপক। সময়ের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে যে কোন সমষ্টি নানা ধরণের সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছে। সমস্যার ব্যাপকতা যেমন বৃদ্ধি পাচ্ছে তেমনি বাড়ছে তার গভীরতা। মানুষের পরিবর্তিত ব্যবহার বা আচরণ, সামাজিক অবস্থা, পরিবেশ নানা ধরণের নতুন সমস্যার জন্ম দিচ্ছে এবং কিছু কিছু পুরানো সমস্যাকে বাড়িয়ে তুলছে। যে ধরণের কাঠামো, সম্পদ এবং পারস্পরিক পরিষেবা ছিল সমষ্টির আধার তা ক্রমশঃ দুর্বল হচ্ছে। সমষ্টির মধ্যে সমন্বয়ের অভাব ঘটছে। পারস্পরিক ক্রিয়া (interaction) কমে আসছে। এই ধরণের পরিস্থিতিতে সমষ্টি সংগঠনের পরিধি বা সুযোগ সম্ভাবনা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

সমাজ কর্মের অন্যতম পদ্ধতি হিসাবে সমষ্টি সংগঠন এক সাহায্যকারী কৌশল (supportive technique) হিসাবে উপরোক্ত পরিস্থিতিতে কার্যকরী ভূমিকা নিতে পারে। সমষ্টিকে যে সব সমস্যা ভয় দেখাচ্ছে বা খারাপ সংকেত দিচ্ছে সেগুলির মোকাবিলা করতে সাহায্য করে সমষ্টি সংগঠন প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সমষ্টিকে উন্নত ও প্রাণবন্ত হয়ে উঠতে সক্ষম করার লক্ষ্যে কাজ করা হয়। সমষ্টি সংগঠন প্রক্রিয়া বহুমুখী এবং তা বিভিন্ন ধরণের সমষ্টির নানা ধরণের সমস্যা সমাধানে সাহায্য করে। সুতরাং বলাই বাহুল্য, সমষ্টি সংগঠনের পরিধি ক্রমশঃ ব্যাপকতা পাচ্ছে।

২.৪ সমষ্টি সংগঠনের লক্ষ্য

বিভিন্ন সমাজবিজ্ঞানী সমাজ সংগঠনের লক্ষ্য বা উদ্দেশ্যকে উপস্থাপন করেছেন। এখানে তার মধ্যে কয়েকটি

উল্লেখ করলে বিষয়টি সম্পর্কে ধারণা স্পষ্ট হতে পারে।

(ক) সমষ্টির মানুষের মধ্যে সম্পর্কের পুনপ্রতিষ্ঠা ও রক্ষা করা যাতে তারা সম্মিলিতভাবে জীবনযাপনের আনন্দ নিতে পারে। (ড: এস. সিং)

(Community Organization aims at reestablishing and maintaining the community relations among the people for their happier living together.)

(খ) সমষ্টি সংগঠনের লক্ষ্য হলো, সমষ্টির পরিবেশে উন্নতি ঘটানোর পথ খোঁজা এবং সমষ্টি কল্যাণের জন্য সমষ্টি সংগঠন পদ্ধতিতে উন্নয়ন সাধন। (ম্যাক মিলেন)

(The objectives of Community Organization are 1) to find ways of improving the Community environment and 2) to improve on the methods of Community Organization for Community Welfare)

(গ) প্রক্রিয়ার সমস্ত স্তরে সমষ্টির অন্তর্গত ব্যক্তি এবং গোষ্ঠীর প্রতিনিধিদের মধ্যে পারস্পরিক বোঝাপড়া বা সমঝোতার ভিত্তিতে ঐক্যমতে পৌঁছনোর স্বার্থে তাদের অংশভাগিতাকে বাড়ানো। (এম. সি. নেইল)

(Bringing into participation in all phases of the process, individuals and representatives of groups concerned and of promoting interactions of attitudes........with the object of reaching agreement through mutual understanding)

(ঘ) সমষ্টি সম্পর্কে সচেতনতা বাড়ানো, অনাকাঙ্খিত চাপ থেকে সমষ্টিকে রক্ষা করা এবং নেতৃত্ব বিকাশ। (পলসন ও এন্ডারসন)

(Inculcation of community conciousness, protection of community from unwanted pressure and development of leadership.)

এছাড়া লেন (Lane) নামের এক সমাজবিজ্ঞানীর মতে সমষ্টি সংগঠনের সাধারন লক্ষ্য হলো সমাজ কল্যাণের চাহিদার সাথে সমাজ কল্যান সম্পদের কার্যকরী বোঝাপড়া বা সমন্বয় সাধন।

উপরোক্ত বক্তব্যগুলির যা সারাংশ দাঁড়ায় তা হলো সমষ্টির মানুষ যাতে সম্মিলিতভাবে জীবনযাপনের আনন্দ উপভোগ করতে পারে সেজন্য তাদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক এবং বোঝাপড়া বা সমন্বয়ের ক্ষেত্রটি মজবুত করা, সমাজের চাহিদা বা সমস্যা মেটানোর জন্য মানুষের অংশভাগিতা (participation) বাড়িয়ে সমষ্টি সম্পদের সদ্ব্যবহারের ব্যাপারে উদ্যোগী করে তোলা, এবং সমষ্টিকে মজবুত করার জন্য নেতৃত্ব বিকাশ ও সমাজ সম্পর্কে চেতনা বৃদ্ধি ঘটিয়ে অবাঞ্ছিত চাপ থেকে সমষ্টিকে রক্ষা করা—এগুলিই হলো সমষ্টি সংগঠনের লক্ষ্য।

২.৫ সমষ্টি সংগঠন প্রক্রিয়ার নীতিসমূহ

কোন কাজ সাফল্যের সঙ্গে করতে গেলে সেই কাজ কিছু নীতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত বা পরিচালিত হবে এটিই কাম্য। নীতিই হলো কোন কাজ সম্পাদনের ভিত্তি। সঠিকভাবে কাজটি সম্পাদন করার ক্ষেত্রে নীতিগুলি নিয়ম (rule) হিসাবে কাজ করে। সমষ্টি সংগঠন ও কিছু নীতির দ্বারা পরিচালিত। সমাজ কর্মের দর্শনই (Philosophy) সমষ্টি সংগঠনের নীতিগুলি নির্ধারিত করেছে। এখানে সেই নীতিগুলি সম্পর্কে আলোকপাত করা হবে।

(ক) সমষ্টি যে অবস্থায় আছে সেই অবস্থাতেই তাকে গ্রহণ করতে হবে (Accept the community as it is)। সমষ্টি সংগঠকের এ ক্ষেত্রে কোন পছন্দ-অপছন্দ থাকতে পারে না। উদাহরণের সাহায্যে এই বক্তব্যের অর্থ আরো স্পষ্ট করে বোঝানো যেতে পারে। ধরা যাক একটি সমষ্টির মানুষ অধিকাংশই নিরক্ষর, উদ্যমহীন, নানা কুসংস্কারে আচ্ছন্ন, জাতিভেদ প্রথার শিকার ইত্যাদি। সমষ্টি সংগঠককে এই অবস্থাতেই সংশ্লিষ্ট সমষ্টির কাজে যুক্ত হতে হবে তার মনোমত কোন সমষ্টির প্রত্যাশা না করে।

(খ) যে কোন সমষ্টিতে নানা চাহিদা বা সমস্যা থাকবে। সমষ্টিকে সেই সব সমস্যা সমাধানে সাহায্য করা দরকার। প্রকৃত সাহায্য দেওয়ার স্বার্থে সমষ্টির অধিকাংশ মানুষের অনুভূত সমস্যাগুলিকে প্রাথমিকতা দিতে হবে (Attaching priority to the felt-needs of the concerned people)। সমষ্টি যে গুলিকে বিশেষ সমস্যা বলে মনে করবে সেগুলিকে গুরুত্ব দিয়েই কাজ করতে হবে।

(গ) উপর থেকে কোন সিদ্ধান্ত সমষ্টির উপর চাপিয়ে দেওয়া চলবে না (No imposement)। সমষ্টির উন্নতির জন্য কি ধরণের কর্মসূচী নেওয়া হবে, কিভাবে তা রূপায়ন করা হবে সে সম্পর্কে কোন সিদ্ধান্তই চাপিয়ে দেওয়া অনৈতিক। সমস্ত সিদ্ধান্তই গৃহীত হওয়া উচিত সমষ্টি সদস্যদের সম্মিলিত সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে। সমষ্টি সংকল্পবদ্ধ হয়েই কোন কাজ শুরু করবে, কারো নির্দেশে নয়।

(ঘ) হঠাৎ করে নেওয়া সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে কাজ শুরু করা নয়, সমষ্টিকে মানসিকভাবে তৈরী হওয়ার সময় দিতে হবে (No drastic action)। অন্যথায় সুপরিকল্পিতভাবে কাজ করা যায় না এবং সমষ্টির অংশভাগিতাও নিশ্চিত করা সম্ভব হয় না।

(ঙ) কাজের গতি এমন হবে যে সমষ্টির মানুষ তার সঙ্গে তাল দিতে পারবে বা স্বচ্ছন্দ বোধ করবে (Community people should feel comfortable with the pace of work)। অন্যথায় তারা ক্রমশঃ প্রচেষ্টার অংশীদার না হয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে।

(চ) সমষ্টি কল্যাণের স্বাথে যে সব কর্মসূচী গৃহীত হবে এবং যে পদ্ধতিতে তার রূপায়ন হবে তা যেন সংশ্লিষ্ট সমষ্টির আর্থিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক পটভূমির সঙ্গে সাযুজ্য রেখে নির্ধারিত হয় (Programme should be organised in conformity with the socio-economic and cultural background of the community concerned)।

(ছ) সমষ্টি সংগঠক বা সমষ্টি নেতৃত্ব নির্দিষ্ট সমষ্টির সমস্ত গোষ্ঠী এবং ব্যক্তির সঙ্গে সমমানের সম্পর্ক রক্ষা করে চলবে (Equal relation with all)। কোনরকম পক্ষপাতিত্ব দেখানো থেকে বিরত থাকতে হবে, যাতে সামগ্রিক পরিবেশটি উন্নত সমষ্টি গঠনের অনুকূল হয়।

(জ) কোন কর্মসূচী সংগঠিত করতে গিয়ে সমষ্টির মানুষের মধ্যে বোঝাপড়া বা ঐক্য কোনভাবে ব্যাহত না হয়ে তা যাতে ক্রমশঃ উন্নত হয় সে ব্যাপারে সজাগ থাকা। (Improving the interpersonal relations)।

(ঝ) চরিত্রগতভাবে, সমস্যার ধরণ ও গভীরতায়, সমষ্টির মধ্যে বোঝাপড়ার মাত্রায়, সমষ্টি সম্পদের বিচারে একটি সমষ্টির সঙ্গে আর একটি সমষ্টির অমিল থাকাই স্বাভাবিক। সমষ্টিগুলি প্রত্যেক স্বতন্ত্র—এই তত্ত্বে আস্থা রেখে কাজ করতে হবে (Accepting the fact that communities are individualised)।

(ঞ) প্রশিক্ষিত সমাজকর্মীই সমষ্টি সংগঠনের কাজে যুক্ত থাকবে (It must be practiced by professionally trained personnel and community workers)। তাছাড়া যুক্ত থাকতে পারবে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত সমষ্টি কর্মী। যেহেতু এইসব কাজের জন্য বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী এবং কুশলতার দরকার তাই রীতিমত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মীরাই এ কাজে নেতৃত্ব দিতে পারে।

ড: গ্যাংরাডে (Dr. Gangrade) মনে করেন, উপরোক্ত সমস্ত নীতিগুলি মাথায় রেখে সমষ্টি সংগঠনের কাজ করা দরকার। কিন্তু তারই মধ্যে বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে মানুষকে আত্মোপলব্ধি এবং নিজ সিদ্ধান্ত গ্রহণে সক্ষমতা অর্জনে সাহায্য করার নীতিতে। অন্যদিকে আর্থার ও জনহাম যে নীতিগুলিকে বিশেষ বিবেচনায় রাখার পরামর্শ দিয়েছেন সেগুলি হলো :

—প্রয়োজনভিত্তিক কর্মসূচী পরিকল্পনা

—প্রকল্প/কর্মসূচী রচনায় সংশ্লিষ্ট মানুষের সক্রিয় অংশগ্রহণ।

—স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে সমষ্টির কাজে এগিয়ে আসার মানসিকতা তৈরী।

সামগ্রিকভাবে বলা যায়, সমষ্টি সংগঠনের নীতি হলো মানুষের শক্তিতে আস্থা রেখে, তাকে মূল্য দিয়ে, সমষ্টির উন্নয়নে তাকে আগ্রহী করে তুলে, সমষ্টির সম্পদ ব্যবহার করে, মানুষের অনুভূত সমস্যাকে গুরুত্ব দিয়ে, সুপরিকল্পিতভাবে কাজে নেমে, সমষ্টির সামগ্রিক পশ্চাৎপট বিবেচনায় রেখে সমষ্টি সংগঠনের কাজ করা।

২.৬ সমষ্টি সংগঠনের কার্যপদ্ধতি

পদ্ধতি হলো যে কোন কাজের উপযুক্ত হাতিয়ার। প্রথানুযায়ী কাজ করার জন্য যে কৌশল অবলম্বন করা হয় তাই হলো পদ্ধতি। যা করা হয় তা হলো কাজ এবং যেভাবে করা হয় তা হলো পদ্ধতি। যে কোন কাজে সাফল্য পেতে গেলে উপযুক্ত কর্মসূচী গ্রহণ যেমন প্রয়োজনীয় তেমনি দরকার সঠিক কর্মপদ্ধতি গ্রহণ বা অবলম্বন। প্রকৃতপক্ষে এরা পরস্পর পরস্পরের পরিপূরক।

সমষ্টি সংগঠনের ক্ষেত্রেও উপযুক্ত কর্মপদ্ধতি অবলম্বন করা জরুরী। যে সব পদ্ধতি সমষ্টি সংগঠন প্রয়াসকে সাফল্য দিতে পারে সেগুলি হলো :

(ক) সমষ্টি সংগঠক, সমষ্টি নেতৃত্ব এবং সমষ্টির সাধারণ সদস্যের মধ্যে কার্যকরী সম্পর্ক স্থাপন হওয়া দরকার। সম্পর্কের মধ্যে আন্তরিকতা ও গভীরতা থাকলে সমষ্টিকে বুঝতে যেমন সহজ হয়, তেমনি সমষ্টির কাজে সকলকে জড়িয়ে নিতেও সুবিধা হয়। তাছাড়া সমষ্টির মধ্যে সেই কাঙ্খিত পরিবেশ সৃষ্টি করা সম্ভব হয় যা কর্মসহায়ক। সেজন্য সম্পর্ক স্থাপন ও রক্ষায় গুরুত্ব দিতে হয়।

(খ) সমষ্টির সমস্যা বা চাহিদা সম্পর্কে সম্যকভাবে অবগত হওয়া, সমস্যাগুলিকে প্রাথমিকতার ভিত্তিতে সাজানো, তার সমাধানে কি পদক্ষেপ নেওয়া হবে তা স্থির করা, পদক্ষেপ গ্রহণের উপযুক্ত সময় নির্বাচন করা ইত্যাদিও সমষ্টি সংগঠনের অন্যতম পদ্ধতি।

(গ) সমস্যাগুলি সম্পর্কে সমষ্টির সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করা, কর্মসূচী এবং বাজেট সংক্রান্ত ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত সম্পর্কে তাদের অবহিত করা, কাজের ফলাফল সম্পর্কে আলোচনা সমষ্টি সংগঠনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি।

(ঘ) কর্মসূচী পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় সম্পদের সম্ভাব্য সূত্র কি তা নির্ণয় করা ও নিশ্চিত করা এবং সম্পদ সংগ্রহের জন্য সংযুক্তভাবে বা সম্মিলিতভাবে প্রয়োজনীয় অভিযান চালানো হলো সমষ্টি সংগঠনের আর এক পদ্ধতি।

(ঙ) সমষ্টির উন্নয়নের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে নানা ধরণের প্রতিষ্ঠান। সরকারী, বেসরকারী বা স্বশাসিত সেইসব সংগঠনের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করে সমষ্টির সমস্যা নিবারণে বা নিরসনে তাদের সহযোগিতাকে বাস্তবায়িত করা সমষ্টি সংগঠনের আর এক পদ্ধতি।

(চ) গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে কাজ করার লক্ষ্যে বিভিন্ন ব্যক্তি এবং গোষ্ঠীর মধ্যে কাজের দায়িত্ব বন্টন করা এবং স্বেচ্ছা-প্রণোদিতভাবে সেই কাজে যুক্ত হতে সকলকে উদ্বুদ্ধ করা।

(ছ) কাজের অগ্রগতির ব্যাপারে নিয়মিত খোঁজ খবর রাখা। কোথাও পদক্ষেপগত বা কর্মসূচীগত ত্রুটি বিচ্যুতি দেখা গেলে তা সংশোধন করে নেওয়ার মাধ্যমে ত্রুটিমুক্ত কর্মসূচী রূপায়নের ব্যাপারে সজাগ থাকা।

(জ) ধারাবাহিকভাবে কাজ সম্পর্কিত তথ্য সংরক্ষণ করা। সেইসব সংরক্ষিত তথে'র ভিত্তিতে সমষ্টির সঙ্গে আলোচনাক্রমে আরো বাস্তবসম্মত কর্মসূচী গ্রহণ করা যেমন সম্ভব, তেমনি যথাযথ কর্মপদ্ধতি গ্রহণও সম্ভব। তাই

যথেষ্ট গুরুত্বের সঙ্গে তথ্য রক্ষণের কাজ করতে হয়।

(ঝ) সমষ্টির কল্যাণের স্বার্থে বিভিন্ন স্তরে গৃহীত কর্মসূচীর মূল্যায়ন করা। যেহেতু মূল্যায়নের ভিতর দিয়েই কোন পদক্ষেপ বা কর্মসূচীর কার্যকারিতা সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া যায় তাই সমষ্টি সংগঠনের ক্ষেত্রেও এই পদ্ধতি অবলম্বন করা আবশ্যক।

(ঞ) সমষ্টির মধ্যে উপযুক্ত নেতৃত্ব বিকাশ ঘটানো। যেহেতু বাইরের শক্তিতে নয়, সমষ্টি তার নিজ শক্তিতে নিজের চাহিদা মিটিয়ে নিতে পারবে, উন্নয়ন প্রক্রিয়াকে স্থায়িত্ব দিতে পারবে তাই সমষ্টিকে আত্মনির্ভরশীল করার লক্ষ্যে সমষ্টির ভিতর থেকেই বলিষ্ঠ নেতৃত্বের বিকাশ ঘটাতে হবে।

সমষ্টি সংগঠনের ক্ষেত্রে উপরোক্ত পদ্ধতিগুলি হলো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এছাড়া পরিস্থিতি-পরিবেশ এবং সমষ্টির কোন বিশেষ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে অন্য কোন পদ্ধতিরও ব্যবহার করা যেতে পারে। সংশ্লিষ্ট কর্মীকে শুধু এটুকু মনে রাখতে হবে যে, পদ্ধতিকে গুরুত্ব দেওয়ার ক্ষেত্রে যেন আলস্য না দেখাই।

২.৭ সমষ্টি সংগঠকের দায়িত্ব/কর্তব্য

সমষ্টি সংগঠক হলো সমষ্টি উন্নয়নের অনুঘটক। একটি সমষ্টি তার চাহিদাগুলি মিটিয়ে বা সমস্যাগুলির মোকাবিলা করে কতটা জোরালোভাবে বা দৃঢ়তার সঙ্গে উন্নতির পথে এগিয়ে যাবে তা অনেকটাই নির্ভর করবে সমষ্টি সংগঠকের ভূমিকার উপর। সে যদি দক্ষতার সঙ্গে এবং সঠিকভাবে তার দায়িত্ব পালন করতে পারে তাহলে সংশ্লিষ্ট সমষ্টির সামগ্রিক অবস্থায় লক্ষ্যনীয় পরিবর্তন ঘটতে পারে। একজন সমষ্টি সংগঠকের মূল দায়িত্ব হলো :

(ক) সমষ্টি সম্পর্কে একটি স্পষ্ট ধারণা তৈরীর জন্য তাকে এলাকার সঙ্গে ভালভাবে পরিচিত হতে হবে। এজন্য তাকে দেখতে হবে, শুনতে হবে, আলোচনা করতে হবে, সমীক্ষা করতে হবে, অনুধাবন করতে হবে। কারণ এলাকা সম্পর্কে যথেষ্ট ধারণার অধিকারী না হয়ে কাজ করতে যাওয়া অবৈজ্ঞানিক এবং নীতিবিরুদ্ধ। সুতরাং এই কাজটি তাকে গুরুত্ব সহকারে করতে হবে। এই পরিচিতি প্রক্রিয়া হলো সময় সাপেক্ষ, পরিশ্রম সাপেক্ষ এবং নিষ্ঠা সাপেক্ষ। কিন্তু আগ্রহ থাকলে এবং প্রশিক্ষিত কর্মীর বিবেচনাবোধ ও কৌশলের উপযুক্ত ব্যবহার হলে এই প্রক্রিয়ায় সাফল্যলাভ সম্ভব।

(খ) সমষ্টির মধ্যে কোন যুব সংগঠন বা মহিলা সমিতি থাকলে তার সদস্যদের সঙ্গে সম্পর্ক তৈরী করতে হবে। তারা কি ধরণের কাজে যুক্ত সে সম্পর্কে অবহিত হতে হবে। ঐসব সংঘের সদস্যদের মধ্যে উপযুক্ত দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে তুলতে হবে। সমষ্টির সার্বিক কল্যাণের ভাবনায় তাদের ভাবিত করার ব্যাপারে উদ্যোগ নিতে হবে।

(গ) যেখানে যুব সংগঠন বা মহিলা সমিতি নেই সেখানে তা গঠন করার জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিতে হবে। সমষ্টির সদস্যদের এটি বোঝাতে হবে যে সমষ্টি সমস্যা নিয়ন্ত্রণের এবং উন্নয়নের পথে নিয়ে যাওয়ার জন্য সমষ্টিভিত্তিক সংঘ কতটা জরুরী। সংঘ বা সমিতি গড়তে উৎসাহ দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সংঘ গড়ে তোলার বা পরিচালনার রীতিনীতির ব্যাপারে তাদের অবহিত করতে হবে।

(ঘ) সমষ্টি সংগঠকের আর একটি প্রধান কাজ হবে কর্মী তৈরী এবং নেতৃত্ব বিকাশের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা। প্রয়োজনে সেজন্য উপযুক্ত কোন প্রতিষ্ঠানের সাহায্য নেওয়া যেতে পারে। উপযুক্ত নেতৃত্ব এবং দক্ষ ও উদ্বুদ্ধ কর্মীর অভাবে সমষ্টি সংগঠনের কাজ দুর্বল হয়ে পড়ে—এই তত্ত্বটি মনে রেখে তাকে কর্মী ও নেতার জন্য উপযুক্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।

(ঙ) সমষ্টি সংগঠনের কাজ যাতে গণতান্ত্রিকভাবে হয়, স্বেচ্ছাসেবার উৎসাহ ও মেজাজ বজায় রেখে হয় সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখতে হবে। মুষ্টিমেয় কিছু পদাধিকারীর ব্যক্তিগত সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে কাজ করার প্রবণতা রোধেও

সমষ্টি সংঘটককে উদ্যোগী হতে হবে।

(চ) জাতি-ধর্ম-নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকল মানুষের উত্থানেই সমষ্টির উত্থান এই সত্যটি মাথায় রেখে সমষ্টি সংগঠককে এমনভাবে সমষ্টি সংগঠনের কাজ করতে হবে যাতে সমষ্টি আক্ষরিক অর্থেই সমষ্টি হয়ে উঠতে পারে।

(ছ) ব্যক্তি, পরিবার, গোষ্ঠী বা সমষ্টি সকলের ক্ষেত্রেই উন্নতির অন্যতম প্রধান সর্ত হলো নিজ সম্পদের উপর নির্ভরশীলতা। অন্যের প্রত্যাশায় না থেকে সমষ্টির মধ্যে যে সব সম্পদ রয়েছে তার উপযুক্ত ব্যবহারের ফলে লক্ষ্যনীয় ভাবে অবস্থায় হেরফের ঘটানো সম্ভব। সমষ্টি সংগঠকের ভূমিকা হবে সমষ্টির সকলের মধ্যে এই চিন্তা ও বিশ্বাস সৃষ্টির লক্ষ্যে কাজ করা, যাতে সমষ্টিগুলি স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়।

(জ) উন্নয়নের একটি ছন্দ আছে। সমষ্টি উন্নয়নও বিজ্ঞান বিশেষ। সেজন্যই প্রয়োজন সুচিন্তিত পদক্ষেপ এবং কর্মপদ্ধতি গ্রহণের। এক্ষেত্রে উপযুক্ত পরামর্শদান এবং সহযোগিতার মাধ্যমে সমষ্টি সংগঠকের এক গঠনমূলক ভূমিকা পালনের সুযোগ রয়েছে।

(ঝ) সমষ্টি সম্পর্কিত তথ্য, উন্নয়ন পরিকল্পনার দলিল, সম্পদসূত্র, আয়-ব্যয়, মূল্যায়ন সম্পর্কিত তথ্য ইত্যাদি সঠিকভাবে তৈরী ও রক্ষনাবেক্ষণ করা, সাফল-ব্যর্থতার খতিয়ান রক্ষা ইত্যাদি দায়িত্ব পালন করাও সমষ্টি সংগঠকের দায়িত্বের মধ্যে পড়ে।

(ঞ) পঞ্চায়েৎ প্রতিষ্ঠান, বেসরকারী সংগঠন এবং সরকারী বিভাগ সকলেই উন্নয়ন কাজে জড়িত। এইসব প্রতিষ্ঠান বা বিভাগের ব্যাপারে অবহিত হওয়া এবং সেগুলির সঙ্গে সম্পর্ক তৈরী করার মাধ্যমে প্রয়োজনীয় নানা পরিষেবা ও সহযোগিতা প্রাপ্তির জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণও সমষ্টি সংগঠকের কর্তব্য।

এম. জি. রস-এর মতে সমষ্টি সংগঠকের ভূমিকা হলো :

—পথপ্রদর্শকের

—সাহায্যকারী

—বিশেষজ্ঞের

—আরোগ্যকারীর

আর্থার ও ডনহামের মতে সমষ্টি সংগঠকের ভূমিকা হলো একজন গঠনমূলক নেতার। আমরা অবশ্যই অনুমান করতে পারি যে উপরে বর্ণিত সব ভূমিকা বা দায়িত্ব পালন করাই হলো একজন গঠনমূলক নেতার কর্তব্য।

এইসব দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করতে হলে সমষ্টি সংগঠকের কিছু বিশেষ দক্ষতা ও জ্ঞানের দরকার। সেগুলি হলো :

(ক) বিভিন্ন উপায়ে সমষ্টিকে জানবার দক্ষতা

(খ) মনের ভাব এবং বক্তব্য কার্যকরীভাবে প্রকাশের দক্ষতা

(গ) সম্পর্ক তৈরী এবং রক্ষা করার দক্ষতা

(ঘ) অনুগমন (follow up) এবং মূল্যায়নের (evaluation) দক্ষতা

(ঙ) কর্মসূচী পরিকল্পনার দক্ষতা

(চ) সংগঠিত করার দক্ষতা

(ছ) জীবন-জীবিকার সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞান

(জ) রেকর্ড তৈরী ও রক্ষা করার দক্ষতা

(ঝ) কঠিন পরিস্থিতি মোকাবিলার দক্ষতা

(ঞ) সরকারী বেসরকারী বিভিন্ন সংগঠন/বিভাগ সম্পর্কে জ্ঞান।

২.৮ প্রশ্নাবলী

১। সমষ্টি সংগঠনের অর্থ ও প্রয়োজনীয়তা কি?

২। সমষ্টি সংগঠনের লক্ষ্য বর্ণনা কর।

৩। সমষ্টি সংগঠনের প্রক্রিয়ার মূলনীতিগুলি কি কি? এইসব নীতির প্রয়োজন হয় কেন?

৪। সমষ্টি সংগঠনের কার্যপদ্ধতি বর্ণনা কর।

৫। একজন সমষ্টি সংগঠকের কর্তব্য/দায়িত্ব কি? সেগুলি পালন করতে হলে কি কি দক্ষতার দরকার?

২.৯ গ্রন্থপঞ্জী

1. Community Organization Theory and Principles	R.G. Murray
2. Encyclopaedia of Social work in India	Ministry of Welfare, Govt. of India
3. Concepts and Methods of Social Work	W.A. Friedlander
4. Community Organization in India	K.D. Gangrade
5. Rural Community Organization	Sandarson and Polson

একক ৩ □ সমষ্টি সংগঠনে নেতৃত্বদান

গঠন

৩.১ উদ্দেশ্য
৩.২ নেতৃত্বের সংজ্ঞা বা অর্থ
৩.৩ নেতৃত্বের প্রকার
৩.৪ নেতার প্রয়োজনীয় গুণ
৩.৫ নেতার ভূমিকা
৩.৬ প্রশ্নাবলী

৩.১ উদ্দেশ্য

পরিবার, গোষ্ঠী, সমষ্টি, সংগঠন এবং সরকার সবকিছু পরিচালনা করতেই প্রয়োজন হয় নেতৃত্বদানের। ব্যক্তিগত বা গোষ্ঠীগতভাবে কাউকে না কাউকে নেতৃত্ব দিতে হয়। উপযুক্ত নেতৃত্বের গুণেই একটি সংসারে শৃঙ্খলা বজায় থাকে, একটি অলিখিত আচরণবিধি তৈরী হয়, নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য পূরণে পরিবারের সদস্যেরা শারীরিক ও মানসিকভাবে যুক্ত থাকেন, প্রতিবেশীদের কাছে মর্যাদা পায়, পরিবারটির উন্নতি ঘটে। গোষ্ঠী, সমষ্টি, সংগঠন এবং সরকারের ক্ষেত্রেও এই তত্ত্ব প্রযোজ্য। যেমন উপযুক্ত নেতার দ্বারা পরিচালিত সরকার দেশকে ক্রমাগত উন্নতির পথে নিয়ে যেতে পারে, সম্পদ আহরণ ও সদ্ব্যবহারে দক্ষতা দেখায়, কর্মসংস্কৃতির ক্ষেত্রে উদাহরণযোগ্য হয়ে উঠে, অন্যান্য দেশের সম্মান আদায় করে নেয়। সমষ্টির অস্তিত্ব রক্ষা এবং উন্নতির জন্যও দরকার উপযুক্ত নেতৃত্বের। সেই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই নেতৃত্ব সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয় এই অধ্যায়ে আলোচিত হবে।

৩.২ নেতৃত্বের সংজ্ঞা বা অর্থ

নেতৃত্ব শব্দটি আমাদের সকলের কাছেই অত্যন্ত পরিচিত। নেতৃত্বদানের অর্থ হলো পথ প্রদর্শন করা। পরিবার, গোষ্ঠী, সমষ্টি, সংগঠন বা দেশকে নিরাপত্তা দান এবং প্রগতির পথে পরিচালনা করার ব্যাপারে যে বা যারা অগ্রণী ভূমিকা পালন করে সে বা তারাই নেতা। মানুষের মনে উন্নতির আকাঙ্খাকে জাগিয়ে তোলা, উন্নতির প্রক্রিয়ায় তাদের যুক্ত করা, উন্নতির পথে সঠিকভাবে পরিচালনা করার ক্ষেত্রে যে বা যারা উদ্যোগী ভূমিকা নেয় সে বা তারা নেতা। গোষ্ঠী বা সমষ্টি প্রচেষ্টাকে সমন্বিত করে তাকে সুপরিকল্পিতভাবে কাজে রূপদান করার ইচ্ছা ও ক্ষমতা যার থাকে সেই নেতা।

একটি চীনা প্রবাদ অনুসারে, যে রাস্তা জানে, অন্যকে সেই রাস্তা দেখাতে পারে এবং নিজে সেই রাস্তায় হাঁটে (Who knows the way, shows the way and goes the way) সেই নেতা। অর্থাৎ একজন দূরদৃষ্টিসম্পন্ন মানুষ, যে অন্যদের সঠিকভাবে পথপ্রদর্শন করতে পারে এবং নিজে প্রত্যয় ও নিষ্ঠার সঙ্গে উদ্দিষ্ট কাজ রূপায়নে ভূমিকা নিতে পারে সেই নেতা। আবার শ্রীরামকৃষ্ণের কথায়, যে শির দেয় সেই সরদার। অর্থাৎ ঝুঁকি নেবার এবং স্বার্থত্যাগের ক্ষমতা ও মানসিকতা যার বেশী সেই নেতা। আবার একটি প্রচলিত ধারণা আছে যে, সেই প্রকৃত নেতা যার নামে ঢাক ঢোল বাজে না, বরঞ্চ তার নেতৃত্বে সাফল্যের সঙ্গে কোন কাজ শেষ হলে সংশ্লিষ্ট মানুষেরা অনুভব করে যে কাজটি তারা সম্মিলিতভাবে শেষ করেছে এবং এ তাদের সকলের সাফল্য। অর্থাৎ যে নিজের গরিমার

পিছনে না ছুটে সংশ্লিষ্ট মানুষকে উদ্যোগী, আত্মনির্ভরশীল, আত্মবিশ্বাসী, বিবেচক করে তুলে সেই প্রকৃত নেতা। সহযোদ্ধা এবং লক্ষ্যজনগোষ্ঠীর মধ্যে শক্তির জাগরন ঘটানো এবং তাদের শক্তিতে আস্থা রাখতে পারার মধ্যেই নেতৃত্বের প্রকাশ।

কোন কোন সমাজ বিজ্ঞানীর মতে নেতৃত্ব হলো সেই শক্তি যার মাধ্যমে একজন অনাগ্রহী মানুষকে দিয়েও কাজ করাতে সক্ষম হওয়া যায়। তাদের মতে নেতৃত্ব হচ্ছে এক যন্ত্র বা অস্ত্র বিশেষ যার মাধ্যমে দলবদ্ধ প্রচেষ্টাকে সমন্বিত করে জমাটবদ্ধ কর্মদ্যোগ বা ব্যবস্থা নিতে সাহায্য করা হয় (Leadership may be viewed as an instrument for coordinating the group efforts and channelising them into concrete action) আবার অন্য কিছু সমাজবিজ্ঞানী মনে করেন, নেতৃত্ব হলো একটি কাজ যার মাধ্যমে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সদস্যদের ব্যবহারকে প্রভাবিত করা যায়। (Leadership is an activity through which the behaviour of the members is influenced, either directly or indirectly.) Tead নামক সমাজবিজ্ঞানীর মতে নেতৃত্ব হলো মানুষকে সর্বসাধারণের কাঙ্খিত কিছু লক্ষ্য পুরণের ব্যাপারে সহযোগিতা করার জন্য প্রভাবিত করা (Leadership is the activity of influencing people to cooperate towards some common goal which they come to find desirable).

Cartwright and Zender এর মতও প্রায় একই রকম। তাঁদের দেওয়া সংজ্ঞাটি হলো নেতৃত্ব হচ্ছে কর্ম সম্পাদন করা যা গোষ্ঠীকে লক্ষ্য পুরণের দিকে এগোতে সাহায্য করে (Leadership is the performance of acts which enables a group to move towards goal achievement).

৩.৩ নেতৃত্বের প্রকার

ব্যবহারিক জীবনে আমরা নানা ধরনের নেতৃত্ব দেখে থাকি। ছোট একটি গোষ্ঠীর নেতৃত্বদান থেকে শুরু করে একটি রাষ্ট্রে নেতৃত্বদান পর্যন্ত সর্বস্তরেই নেতৃত্বদানের ধরণে কিছু পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। নেতৃত্বের প্রকার ভেদের বিষয়টি আমরা এভাবে দেখি।

(ক) নিয়োগের পদ্ধতি অনুসারে :

—নির্বাচিত : অর্থাৎ বিধিবদ্ধ প্রথার মাধ্যমে নির্বাচন প্রক্রিয়ায় অংশ নিয়ে জয়ী হয়ে আসা (Elected)

—মনোনীত : অর্থাৎ নির্বাচন প্রক্রিয়ার ভিতর না গিয়ে অধিকাংশ সদস্যের মতের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ (Selected)

—নিয়োগীকৃত : অর্থাৎ সংশ্লিষ্ট সংগঠনের/প্রতিষ্ঠানের উচ্চতর কর্তার সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে নেতৃত্বপ্রাপ্তি (Nominated)

(খ) কাজ করার ধরণের ভিত্তিতে :

—গণতান্ত্রিক : অর্থাৎ সবার মতকে গুরুত্ব দিয়ে, সকলকে নিয়ে কাজ করা (Democratic)

—স্বৈরতান্ত্রিক : নিরঙ্কুশ শাসনক্ষমতা ভোগের আকাঙ্খা নিয়ে কাজ করা। অন্যদের মতামতকে গুরুত্ব না দিয়ে নিজে সিদ্ধান্ত নিয়ে তাদের সে কাজ করতে নির্দেশ দেওয়া (Authoratarian)

—মুক্ত নেতৃত্ব : যেখানে নেতৃত্ব ব্যাপারটি প্রায় অগোচরে থেকে যায়, কোন কিছুই চাপিয়ে দেওয়া হয় না। সমস্ত সদস্যই ভূমিকা পালনের অফুরন্ত সুযোগ পায়। (Laissez Fair)

(গ) গুনগত উৎকর্ষতার ভিত্তিতে :

—সফল নেতা (successful leader) **:** অর্থাৎ যে সব নেতা লক্ষ্য পূরণে সমর্থ হয়, বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করার

ক্ষমতা রাখে।

—**কার্যকরী** নেতা (Effective leader) : যে নেতা সকলের সঙ্গে সম্পর্ক রেখে, সকলকে মূল্য দিয়ে, সকলের সহযোগিতা নিয়ে লক্ষ্যপূরণে তৎপর থাকে। সংশ্লিষ্ট সহকর্মীদের ব্যক্তিত্ব বিকাশ এবং গুণগত উৎকর্ষতা বৃদ্ধিতে ভূমিকা নেয়।

—**অসফল** নেতা (Unsuccessful leader) : যে নেতা সাফল্য করায়ত্ত করতেও অসফল থাকে, সম্পর্ক রক্ষায় অপারগ হয় এবং সম্মান ও ভালবাসা পেতে অসমর্থ হয়।

(ঘ) সম্পর্ক রক্ষা এবং সাফল্যের খতিয়ানের ভিত্তিতে :

—যার সহকর্মীদের সঙ্গে সম্পর্ক ভাল কিন্তু সাফল্যের খতিয়ান অনুজ্জ্বল।

—যার সহকর্মীদের সঙ্গে সম্পর্ক ভাল নয় কিন্তু সাফল্য করায়ত্ত।

—যার সহকর্মীদের সঙ্গেও সম্পর্ক ভাল আবার লক্ষ্য পুরণেও সফল।

—যার সহকর্মীদের সঙ্গেও সম্পর্ক খারাপ এবং সাফল্যের খতিয়ানও নিতান্ত দুর্বল।

৩.৪ নেতার প্রয়োজনীয় গুণ

নেতৃত্ব অনেককেই দিতে হয়—স্বেচ্ছায় বা অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে। স্বাভাবিকভাবেই বলা যায়, তাদের সকলের দক্ষতা এক হয় না। কার্যকরীভাবে নেতৃত্বদান করতে হলে কতগুলি গুণ বা দক্ষতার প্রয়োজন পড়ে। সেগুলি হলো:

(ক) সুস্বাস্থ্য এবং আনন্দদায়ক ব্যক্তিত্বের অধিকারী হওয়া। কারন নেতৃত্বের ভার বহন করতে হলে বাড়তি পরিশ্রম করার ক্ষমতা এবং তুলনায় উদ্যমী হওয়া জরুরী। প্রয়োজন বেশী সময় দেওয়া। তা করতে হলে সুস্বাস্থের অধিকারী হওয়া নিতান্তই প্রয়োজন। সেই সঙ্গে প্রয়োজন আনন্দদায়ক ব্যক্তিত্বের অধিকারী হওয়া। কারণ বিরক্তিকর ব্যক্তিত্ব যাদের তারা কখনো মানুষকে অকর্ষণ করতে পারে না, সহকর্মীদের শ্রদ্ধা-ভালবাসা অর্জন করতে পারে না। সহকর্মীরা তার সান্নিধ্য উপভোগ করে না, বরঞ্চ তাকে এড়িয়ে চলতে চায়। তাই নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির চরিত্রের অঙ্গ হওয়া উচিত আনন্দদায়ক ব্যক্তিত্ব।

(খ) সততা, স্বচ্ছতা, অনাড়ম্বর জীবনযাপন নেতৃত্বের আর একটি কাম্য গুণ বা বৈশিষ্ট। সততা এবং স্বচ্ছতার অভাব থাকলে তার প্রতি সহকর্মী এবং সাধারণ মানুষের আস্থার অভাব ঘটে। নেতার জীবনযাত্রা আড়ম্বরময় হলেও একদিকে তার সততা নিয়ে যেমন সন্দেহ দানা বাধবে তেমনি মানসিক দিক থেকে অন্যদের সঙ্গে ব্যবধান সৃষ্টি হবে। তেমন হলে নেতা কার্যকারিতা হারাবে। সেজন্য সততা, স্বচ্ছতা এবং আড়ম্বরহীন জীবনযাপন হলো যে কোন স্তরের নেতার অবশ্য কাম্য গুন। সমষ্টি সংগঠনের ক্ষেত্রেও একথা প্রযোজ্য।

(গ) সহকর্মী এবং সহযোগীদের উপর আস্থা বা বিশ্বাস রাখাও নেতার অন্যতম গুণ। যাদের নিয়ে কাজ করতে হবে তাদের ক্ষমতা, আগ্রহ, সততা, আনুগত্য, সদিচ্ছা ইত্যাদি বিষয়ে কোন সন্দেহ পোষণ করে চললে যেমন সংগঠনের উদ্দেশ্য পূর্ণ হয় না, তেমনি নেতা এবং সহযোগী কেউই দায়িত্ব পালন করাকে উপভোগ করে না। এই ধরণের অনাকাঙ্খিত পরিবেশ যাতে সৃষ্টি না হয় এবং কাজের উপযোগী পরিবেশ যাতে বজায় রাখা যায় সেজন্য তাকে সহযোগীদের উপর বিশ্বাস আরোপ করতে হয়।

(ঘ) নেতাকে দূরদৃষ্টিসম্পন্ন হতে হয়। দূরদৃষ্টিসম্পন্ন একজন নেতা যখন একটি রাষ্ট্রকে নেতৃত্ব দেন তখন সেই রাষ্ট্র প্রগতির পথে নিশ্চিতভাবে এগিয়ে যায়। উপযুক্ত নেতৃত্বের গুণে একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও গুণগত উৎকর্ষতার নজির রাখতে সমর্থ হয়। অনুরূপভাবে একটি সমষ্টিতে নেতৃত্বদানকারী ব্যক্তি বুদ্ধিমান এবং দূরদৃষ্টিসম্পন্ন

হয় তবে সেই সমষ্টি বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করে উন্নতির পথে এগিয়ে যেতে পারে।

(ঙ) নেতৃত্বদান যাকে করতে হয় তাকে পরিশ্রমী হতে হয়, উদ্যমী হতে হয়। এ ক্ষেত্রে তাকে আদর্শ স্থাপন করতে হয়। নিজের আচরণ দিয়ে সহযোগী এবং লক্ষ্যগোষ্ঠীকে প্রভাবিত করতে হয়। 'আপনি আচরি ধর্ম পরেরে শেখাও' শুধু একটি কথার কথা নয়, মূল্যবান তত্ত্বও। নিজে পরিশ্রম বিমুখ হয়ে অন্যদের মধ্যে উদ্যম-সংস্কৃতি সঞ্চার করা সম্ভব নয়। এই প্রেক্ষিতে সেই যুক্তি জোরালো হয়ে পড়ে যে নেতাকে পরিশ্রমী এবং উদ্যমগুণের অধিকারী হতে হবে।

(চ) যে কোন অর্থবহ কাজ করতে হলে কিছু ঝুঁকি নিতে হয়। ঝুঁকি না নিয়েই কোন বড় উদ্দেশ্য সাধন করা সম্ভব নয়। যে সব সংগঠনে নেতা ঝুঁকি নেওয়া থেকে বিরত থাকে সেই সব সংগঠন সাধারণ মানেই আটকে থাকে। 'যে শির দেয় সেই সরদার' শ্রীরামকৃষ্ণদেবের এই উক্তি থেকে ও উপলব্ধি করা যায় যে একজন নেতার অন্যান্য গুণের সঙ্গে আরো যে গুণটি অবশ্যই থাকা দরকার তা হলো ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা এবং মানসিকতা। কাজে বাধা আসবে এটি চিরকালীন সত্য। সেই বাধার মুখোমুখি হওয়ার ঝুঁকি নিয়ে কাজে নামার মত গুণ যে কোন নেতৃত্বের কাছেই কাম্য।

(ছ) আরো যে গুণটি যে কোন ব্যক্তিকে নেতৃত্বদানে সক্ষম করে তুলতে সহায়কের ভূমিকা নেয় তা হলো প্রয়োজনীয় নানা বিষয়ে জ্ঞান রাখা এবং কোন কোন বিষয়ে যথেষ্ট জ্ঞান রাখা। জ্ঞানবান মানুষ অন্যের শ্রদ্ধালাভ করে। সে জ্ঞান জীবন-জীবিকার যে কোন ক্ষেত্রেই হতে পারে। জ্ঞান, দক্ষতা, সচেতনতা মানুষের মূল্যবৃদ্ধিতে সহায়ক হয় এবং সংশ্লিষ্ট নেতার আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধিতেও সক্ষম হয়।

(জ) কাজের পদ্ধতি প্রকরণ সম্পর্কে নেতার পরিচ্ছন্ন ধারণা দরকার এবং সেই ধারণা অনুযায়ী কাজ করার আগ্রহ দরকার। যেমন স্বামীজির কথায় 'কাজ করতে হবে প্রভু হিসাবে নয়, সেবক হিসাবে'। এই তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করে সেইভাবে নেতৃত্বদান করলে কার্যকরী নেতৃত্বদান সম্ভব। স্বামীজিরই বলা আর একটি কথা 'উত্তিষ্ঠতঃ জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত'। অর্থাৎ উদ্যমী হয়ে, চেতনা সম্পন্ন হয়ে ধৈর্যরক্ষা করে নিষ্ঠার সঙ্গে লক্ষ্য পূরণের জন্য ব্রতী থাকাও কাজের অন্যতম পদ্ধতি। যে নেতা এই পদ্ধতি অনুসরণ করে কাজ করবে এবং 'আমি তোমাদেরই লোক' এই মানসিকতার অধিকারী হতে পারবে নেতা হিসাবে তার কার্যকারিতা সম্পর্কে সন্দেহের কোন অবকাশ থাকবে না।

(ঝ) নেতার চরিত্রের আর একটি প্রয়োজনীয় গুণ হলো অন্যের বক্তব্য মনযোগ সহকারে শুনে বক্তব্যের অন্তর্নিহিত অর্থ উপলব্ধি করা এবং বক্তার মনোভাবকে বুঝবার ক্ষমতা থাকা। মন দিয়ে অন্যের বক্তব্য শুনলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির ভাব-ভাবনা বা মতামত বুঝতে পারা যায় যা কর্মসূচী গ্রহণ এবং রূপায়নে সাহায্য করে। সাফল্যের সঙ্গে নেতৃত্ব দিতে গেলে যাদের জন্য এবং যাদের সঙ্গে কাজ করতে হয় তাদের দৃষ্টিভঙ্গী এবং মনোভাব জেনে নেওয়া জরুরী। তাছাড়া তারা তাদের বক্তব্য প্রকাশের সুযোগ না পেলে নেতার বিরুদ্ধে ক্ষোভের সঞ্চার হবে এবং স্বভাবতই কাজের পরিবেশ বিঘ্নিত হবে। এই কারণেই নেতাকে ধৈর্যশীল শ্রোতা হওয়া যেমন দরকার তেমনি বক্তার মনোভাব বুঝে নেওয়ার মুন্সিয়ানা দেখানোও দরকার।

(ঞ) নেতৃত্বে থাকা ব্যক্তির অন্যতম প্রধান কাঙ্খিত গুণ হলো নিজের বক্তব্য পরিষ্কারভাবে বুঝিয়ে বলার দক্ষতার অধিকারী হওয়া। পৃথিবীর ইতিহাস চর্চা করলেও আমরা দেখতে পাই সমস্ত সফল রাষ্ট্রনায়কই তাদের বক্তব্য প্রকাশে দক্ষ ছিলেন। সাহিত্য, সংস্কৃতি, রাজনীতি সর্বক্ষেত্রেই যারা পুরোধা ব্যক্তি তাদের প্রকাশ ক্ষমতা লক্ষণীয়। স্বামী বিবেকানন্দ শিকাগো ধর্মমহাসম্মেলনে যে বক্তব্য রেখে জগৎ বিখ্যাত হয়েছেন তা সম্ভব হয়েছিল তাঁর অনন্য প্রকাশ ক্ষমতার জন্যই। সমষ্টি সংগঠকের ক্ষেত্রেও নিজের গ্রহণযোগ্যতা এবং কার্যকারিতা বৃদ্ধি ঘটাতে হলে বক্তব্য বিষয় পরিষ্কারভাবেই প্রকাশ করার ক্ষমতা আয়ত্তে আনতে হবে।

এই কয়েকটি বিশেষ গুণ ছাড়া একজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির আরো কয়েকটি চারিত্রিক গুণ বা বৈশিষ্টের অধিকারী হওয়া দরকার। সেগুলি হলো ঃ

—কোন কিছুকে অকারণে জটিল না করে তোলা

—আমি নয়, আমরা এবং আমরা পরস্পরের জন্য—এই মানসিকতা নিয়ে চলা।

—ক্ষমতা অনুযায়ী কাজে অগ্রনী হওয়ার মত বিবেচনাবোধ।

—বিভিন্ন পরিস্থিতি থেকে এবং ভুল থেকে শিক্ষা নিতে জানা।

—প্রথার দাস না হয়ে সমস্যা সমাধানে বা উন্নয়ন বাস্তবায়নে সৃজনশীল মনোভাব নিয়ে কাজ করা।

—দায়িত্ব বন্টনের মাধ্যমে ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণ করে নিতে জানা।

—কারও মধ্যে অনর্থক প্রত্যাশার সঞ্চার না করা।

—ভুল-ত্রুটি-অজ্ঞতা স্বীকারে দ্বিধা না থাকা।

—নিরপেক্ষতা বজায় রেখে উচ্চ মূল্যবোধ নিয়ে কাজ করা।

—নিয়মানুবর্তিতা রক্ষার ব্যাপারে উপযুক্ত আগ্রহ রাখা।

—মানুষকে প্রভাবিত করতে পারা।

—সকলকে নিয়ে চলতে জানা।

—সংস্থা এবং কর্মসূচী পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় অন্তর্দৃষ্টি আহরণ করা।

উপরোক্ত সব কয়টি গুণ বা বৈশিষ্টই একজন নেতার মধ্যে থাকবে এমন সম্ভাবনা ক্ষীণ। কিন্তু যত বেশী সম্ভব গুণ বা বৈশিষ্ট যার আয়ত্বে থাকবে সে তত বেশী সফল নেতৃত্বদানে সক্ষম হবে। সেজন্য প্রতি নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির উচিত ক্রমাগত চেষ্টার ভিতর দিয়ে নিজের মধ্যে যে গুণ ও বৈশিষ্টগুলি রয়েছে সেগুলিকে আরো ধারালো করে তোলা এবং যেগুলির অভাব রয়েছে সেগুলির মধ্যে যতগুলি সম্ভব আয়ত্ত করার চেষ্টা করা।

৩.৫ নেতার ভূমিকা

নেতাকে নানা ভূমিকা পালন করতে হয়। তার মধ্যে প্রধান কয়েকটির কথা এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে।

(ক) কর্মী ও সদস্যদের সচেতন করা ঃ সব সংগঠন এবং সমষ্টির মধ্যেই কিছু না কিছু সমস্যা থাকে। সেই সব সমস্যা সম্পর্কে কর্মী ও সমষ্টির সদস্যেরা যাতে সজাগ ও সচেতন থাকে এবং সমস্যার কারণ বিশ্লেষণ করে তা সমাধানের কথা খুঁজতে পারে সেজন্য নেতাকে উপযুক্ত ভূমিকা পালন করতে হয়। সংশ্লিষ্ট মানুষের মধ্যে প্রয়োজনীয় সচেতনতা সৃষ্টি করে সমষ্টির উন্নতির জন্য নিরন্তর চেষ্টা চালানোর মধ্যেই নেতৃত্বের সাফল্য।

(খ) কর্মীর ভূমিকা ঃ নেতা শুধু পদ অধিকার করেই সন্তুষ্ট হবে বা পরামর্শ ও নির্দেশ দেওয়ার ভিতর দিয়েই তার কর্তব্য শেষ করবে না।সে নিজে কাজে হাত লাগিয়ে অন্যদেরও কাজে জড়িয়ে পড়তে উৎসাহিত করবে এটিও তার আর একটি ভূমিকা। আদর্শ স্থাপন না করলে সফল নেতৃত্বদান আশা করা যায় না। এ প্রসঙ্গে মহাত্মা গান্ধীর উদাহরণ আমরা স্মরণে রাখতে পারি।

(গ) সব মানুষের মধ্যেই সম্ভাবনার বীজ লুকিয়ে থাকে। সুযোগের অভাবে, অনীহা এবং হতাশার কারণে অনেকের জীবনেই তা প্রকাশিত হওয়ার সুযোগ পায় না। এই অবস্থা কাটিয়ে উঠার ক্ষেত্রে একজন নেতা সদর্থক ভূমিকা পালন করতে পারে। একজন নেতা যে সংগঠন, গোষ্ঠী বা সমষ্টির সঙ্গে যুক্ত, তার সদস্যদের পারদর্শিতা

ও দক্ষতার স্ফুরন ঘটাতে সাহায্য করা এবং তার সদ্ব্যবহারে উদ্বুদ্ধ করা অন্যতম প্রধান কাজ। মানুষকে সক্ষম করে তোলার অর্থই হলো তার বিকাশের পথ করে দেওয়া। যে সব মানুষ নানা কারণে নিজেদের মেলে ধরতে পারে না, কার্যকরী নেতৃত্বের ভূমিকা হবে উন্নতির লক্ষ্যে তাদের এগিয়ে যেতে সহায়তা করা।

(ঘ) সংযোগ রক্ষাকারীর ভূমিকা ঃ নেতৃত্বকে প্রয়োজন অনুযায়ী বিভিন্ন গোষ্ঠী, প্রতিষ্ঠান, সরকারী বিভাগ ইত্যাদির সঙ্গে সংযোগরক্ষাকারীর ভূমিকা পালন করতে হয়। প্রকৃতপক্ষে সংগঠনের পক্ষ থেকে এক্ষেত্রে তাকে সেতুবন্ধনের কাজ করতে হয়। এর ফলে পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে কাজ করা সম্ভব হয়, ভুল বোঝাবুঝি বা বাদ-বিসম্বাদের অবসান হয়, পরস্পরের অভিজ্ঞতাভিত্তিক জ্ঞান থেকে উপকৃত হওয়া যায়, গঠনমূলক প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র বিস্তৃত হয়। শুধু অন্য সংস্থা বা বিভাগের সঙ্গেই নয়, নিজের গোষ্ঠী বা সমষ্টির সদস্যদের মধ্যেও তাকে সংযোগরক্ষার দায়িত্ব পালন করতে হয়।

(ঙ) প্রবক্তার ভূমিকা ঃ দল বা সমষ্টির মুখপাত্র হলো নেতা। সেজন্য নানাক্ষেত্রে নিজের সংগঠন, গোষ্ঠী বা সমষ্টির পক্ষ থেকে তাকে মুখপাত্রের বা প্রবক্তার ভূমিকা পালন করতে হয়। নিজের প্রতিষ্ঠান বা সমষ্টির স্বার্থরক্ষার তাগিদে উপযুক্তভাবে সরব ও সচেষ্ট হওয়া তার কর্তব্য। নিজের সংগঠন, গোষ্ঠী বা সমষ্টির সমস্যাগুলি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও দপ্তরের কাছে সঠিকভাবে তুলে ধরা বা তার প্রতিকারের চেষ্টায় যুক্ত থাকা নেতার দায়িত্বের মধ্যে পড়ে।

(চ) সম্পদ সংগ্রহ ঃ সংস্থা এবং তার কর্মসূচী পরিচালনার জন্য সম্পদের প্রয়োজন হয়। সম্পদ সমষ্টি থেকেও সংগৃহীত হতে পারে আবার অন্যান্য সূত্র থেকেও আসতে পারে। দান সংগ্রহ, সংগঠন ও সমষ্টির কোন সম্পদকে কাজে লাগিয়ে আয়, যাত্রাপালার ব্যবস্থা, যোগ্য সংস্থা বা সরকারী বিভাগ থেকে অনুদান সংগ্রহ ইত্যাদি পন্থা প্রকরণের মাধ্যমে সম্পদ সংগ্রহ করা সম্ভব। এ ক্ষেত্রেও নেতার ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। সহযোগীদের নিয়ে সম্মিলিতভাবে সুষ্ঠু পরিকল্পনার মাধ্যমে এ ব্যাপারে তাকে অগ্রনী ভূমিকা নিতে হয়।

(ছ) প্রশাসনিক কর্তব্য সম্পাদন ঃ নেতৃত্বকে সর্বদা সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হয় যাতে গোষ্ঠী বা সংগঠন গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে পরিচালিত হয়। সংগঠনের নীতিকে ভিত্তিকরে সব কাজকর্ম যেন নিয়মানুযায়ী হয়, সংগঠনে বা সমষ্টিতে সবার মতামত যেন গুরুত্ব পায়, হিসাব এবং নথিপত্র যেন ঠিকভাবে রক্ষিত হয় সে বিষয়েও তাকে সজাগ থাকতে হয়। সংগঠন পরিচালনার দায়িত্বও সহযোগিদের মধ্যে বন্টন করে তাকে সমন্বায়কের ভূমিকা পালন করতে হয়। দায়িত্ব পালনে কারো কোন অসুবিধা হলে সংশ্লিষ্ট সহযোগীকে প্রয়োজনীয় সহায়তা দেওয়াও কর্তব্য।

(জ) সমষ্টি/গোষ্ঠী/সংগঠনের আদর্শকে তুলে ধরা ঃ যে কোন সমষ্টি বা সংগঠনের আসল শক্তি হচ্ছে তার আদর্শ। তাই আদর্শকে সর্বপ্রযত্নে রক্ষা করা প্রাথমিক প্রয়োজন। নিজেদের আচার আচরণ এবং কাজের মাধ্যমে সেই আদর্শকে তুলে ধরা এবং তাকে আরও দৃঢ়মূল ও প্রসারিত করা দরকার। এই ক্ষেত্রেও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হয়। এই মহৎ দায়িত্ব পালনের মধ্য দিয়েই নেতা তার গোষ্ঠী সমষ্টি এবং সংগঠনের মর্যাদা যেমন বৃদ্ধি করে তেমনি নিজের গ্রহণযোগ্যতাও বজায় থাকে।

(ঝ) সংস্থা কি কাজ করবে, সে সব কাজের পিছনে উদ্দেশ্য কি, উদ্দিষ্ট জনসমূহ (target population) কারা, কিভাবে কাজকর্ম পরিচালনা করা হবে, কিভাবে কাজের দায়িত্ব বন্টন করা হবে সে সম্পর্কে প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা না থাকলে কোন কাজই সাফল্যের সঙ্গে পরিচালনা করা সম্ভব হয় না। এই বিস্তারিত পরিকল্পনাকে ভিত্তি করে কাজে নামার ক্ষেত্রেও নেতার ভূমিকা রয়েছে। সংগঠন যাতে অর্থবহ কাজে যুক্ত থাকে এবং সেই কাজ যাতে সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হয় সেজন্য নেতাকে প্রয়োজনীয় ভূমিকা পালন করতে হয়।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে নেতৃত্বের দায় বহন করতে হলে নানা ভূমিকা পালন করতে হয়। ভূমিকাগুলিকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। সেগুলি হলো ঃ

(ক) গোষ্ঠী বা সমষ্টির স্বার্থ পরিপূরণকারী কর্মসূচীর পরিকল্পনা ও রূপায়ন করা এবং সমন্বয় সাধন।

(খ) গোষ্ঠী বা সমষ্টির সম্মিলিত লক্ষ্য পুরণের উদ্দেশ্যে সদস্যদের চেতনাবৃদ্ধি ঘটানো, উদ্দীপ্ত করা, সম্পদের আয়োজনে ভূমিকা নেওয়া

(গ) গোষ্ঠী বা সমষ্টির সমস্যা সমাধানে পথ প্রদর্শক (guide) এবং সুসাধ্যক (facilitator) হিসাবে সাহায্য করা। পারস্পরিক সম্পর্ক রক্ষায় উদ্যোগ নেওয়া।

নেতৃত্বগুণ না থাকলে নেতা হওয়া কঠিন। অনেকের মধ্যে এই গুণ ছোটবেলা থেকেই দেখা যায়। এরা জন্মনেতা (born leader)। স্বামী বিবেকানন্দ এবং নেতাজী সুভাষচন্দ্র ছিলেন এই পর্যায়ের নেতা। তাঁরা যে সাধারণের মধ্যে হারিয়ে যেতে আসেননি সে লক্ষণ ছোটবেলা থেকেই স্পষ্ট ছিল। আবার অনেক নেতার নেতৃত্বগুণ প্রকাশ পায় এবং ধারালো হয় জীবনের পরবর্তীকালে। তারা যে নেতা হতে পারেন কম বয়সে তা অনুমান করাও শক্ত হয়। অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তাদের নেতৃত্ব দিতে হয় এবং ধীরে ধীরে তাদের মধ্যে অনেকে ভাল নেতা হয়ে উঠেন। মহাত্মা গান্ধী এই ধরণের নেতার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

৩.৬ প্রশ্নাবলী

১। নেতৃত্ব বলতে আমরা কি বুঝি?

২। নেতৃত্বের প্রকারভেদ কর এবং সে সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা কর।

৩। কার্যকরী নেতৃত্ব দিতে গেলে কি কি গুণ ও দক্ষতার অধিকারী হওয়া দরকার?

৪। সমষ্টি সংগঠনের ক্ষেত্রে নেতার ভূমিকা কিঁ?

৫। টীকা লেখ :

—গণতান্ত্রিক নেতা

—কার্যকরী নেতা বনাম সফল নেতা

—লক্ষ্য জনসমষ্টি

—দূরদৃষ্টিসম্পন্ন নেতা

একক ৪ □ সমষ্টির অংশভাগিতা

গঠন

৪.১ উদ্দেশ্য

৪.২ সমষ্টির অংশভাগিতা কথাটির অর্থ

৪.৩ অংশভাগিতার প্রয়োজন বা গুরুত্ব

৪.৪ অংশভাগিতার ধরণ বা প্রকার

৪.৫ সমষ্টির অংশভাগিতা বা অংশগ্রহণের বিভিন্ন ক্ষেত্র

৪.৬ অংশভাগিতার অভাব ঘটে কেন

৪.৭ অংশভাগিতা নিশ্চিত করার উপায়

৪.৮ উপসংহার

৪.৯ প্রশ্নাবলী

৪.১০ গ্রন্থপঞ্জী

৪.১ উদ্দেশ্য

উন্নয়ন ভাবনায় এখন আধুনিকতার ছোঁয়া লেগেছে। উন্নয়ন মানেই সরকার বা অন্য কোন প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব এ ধরণের ভাবনাকে পিছনে ফেলে মানুষের চেষ্টায় মানুষের উন্নয়ন এইভাবনা স্থান করে নিচ্ছে। সেদিন অনেক পিছনে ফেলে এসেছি যখন আমরা ভাবতাম উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় সংশ্লিষ্ট মানুষ দর্শকমাত্র কিম্বা তারা কেবল ভোগের অধিকারী। রবীন্দ্রনাথ তাঁর পঞ্চাশ বছরের গ্রাম উন্নয়ন সাধনায় এই বিষয়কে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছিলেন যে, সমষ্টির সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে সমষ্টির উন্নয়ন ঘটুক। মানুষ তার শক্তি সম্পর্কে অবহিত হয়ে নিজেদের ভাগ্য পরিবর্তনে নিজেরা উদ্যোগী হবে। বর্তমানে 'অংশভাগিতার মাধ্যমে উন্নয়ন' এই তত্ত্বের ভিত্তিতে উন্নয়ন প্রক্রিয়া পরিচালনা করার চেষ্টা চলছে সর্বত্র। সরকারও এই পন্থাকে গুরুত্ব দিচ্ছে। স্বর্ণজয়ন্তী শহরী রোজগার যোজনা (SJSRY) এর এক প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এই পটভূমিতে সমাজ কর্মীদের এবং বিশেষভাবে সমষ্টি সংগঠকদের 'অংশভাগিতা' সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে উপযুক্ত ধারণার অধিকারী হওয়া জরুরী হয়ে পড়েছে। সেই উদ্দেশ্য পূর্তির লক্ষ্যে বর্তমান অধ্যাসটি রচনা করা হলো।

৪.২ সমষ্টির অংশভাগিতা কথাটির অর্থ

সমষ্টির অংশভাগিতা কথাটির অর্থ হলো সমষ্টির যে কোন উন্নয়ন ও কল্যাণধর্মী কাজে সমষ্টি সদস্যদের সক্রিয়ভাবে যোগদান এবং সমর্থন। এই সমর্থন এবং যোগদান হবে স্বতঃস্ফূর্তভাবে, কারো চাপে পড়ে নয়। বন্দ্যোপাধ্যায় ও কামাথ এর মতে অংশগ্রহণের অর্থ প্রতিনিধিত্বের মাধ্যমে সরাসরি জড়িয়ে থাকা বা লিপ্ত থাকা (direct involment through representation)। সেই প্রতিনিধিত্ব ঘটবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায়, উন্নয়ন পরিকল্পনা রূপায়নে, তদারকি ও মূল্যায়নে, প্রাপ্তসুবিধা বা উন্নয়নের সুফল ভোগের মাধ্যমে। বেনিনগার (Benninger) এর মতে অংশভাগিতাকে এভাবে ব্যাখ্যা করা যায় যে, সমষ্টি বা আরো বৃহৎ এলাকায় যে সমস্তঘটনা ঘটে বা কর্মদ্যোগ নেওয়া হয় তাতে অংশগ্রহণ (taking part in the events taking place in a community or a larger area)।

সামগ্রিকভাবে বিশ্লেষণ করে বলা যায় সমষ্টির কল্যাণের জন্য পরিকল্পনা রচনা থেকে শুরু করে তার রূপায়ন, তদারকি, মূল্যায়ন এমনকি সুফল ভোগ করা পর্যন্ত সম্পূর্ণ প্রক্রিয়ায় সক্রিয়ভাবে সমষ্টির মানুষের জড়িত থাকাই হলো সমষ্টির অংশভাগিতা।

৪.৩ অংশভাগিতার প্রয়োজন বা গুরুত্ব

স্মরণাতীত কাল থেকেই মানুষকে বাঁচার তাগিদে এবং উন্নয়নের প্রশ্নে সমষ্টিগত জীবনযাপন এবং পারস্পরিক সহযোগিতা করতে হয়েছে। কিন্তু সাম্প্রতিক কালে সেই সমষ্টি ভাবনা শিল্পায়নজনিত নগরসভ্যতার প্রকোপে কিছুটা ছিন্নভিন্ন। সমষ্টির উন্নয়ন যে আমাদের সম্মিলিত দায় এই ভাবনা ক্রমশঃ শিথিল হচ্ছে। এরকম এক পটভূমিতে সমষ্টির উন্নতির ক্ষেত্রে সমষ্টির অংশগ্রহণ বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে। পরমুখাপেক্ষী হওয়া থেকে রক্ষা করা এবং আত্মশক্তি ও আত্মইচ্ছার বিকাশ ঘটানোতে সহায়ক বলেই সমষ্টির অংশগ্রহণ ব্যাপারটি এত গুরুত্বপূর্ণ।

'সমষ্টির অংশভাগিতা'—এই বহুশ্রুত এবং বহুব্যবহৃত শব্দটির বাস্তব প্রয়োগ এজন্যও গুরুত্বপূর্ণ যে, এই অবস্থা বা ব্যবস্থা মানুষের মধ্যে উদ্দীপনা এবং সঙ্কল্পের জন্ম দিতে সক্ষম।

আমাদের মত উন্নয়নশীল দেশে সমস্ত রকম উন্নয়ন প্রচেষ্টাতেই সমষ্টির অংশভাগিতার প্রয়োজন রয়েছে এজন্যও যে এর মধ্য দিয়ে মানুষের মধ্যে আত্মপ্রত্যয়, আত্মচেতনা, বিবেকবুদ্ধি, সহযোগিতা এবং সহানুভূতির মনোভাব ইত্যাদি গুণগুলি সমৃদ্ধ হয়। উপযুক্ত চেতনার উন্মেষ এবং পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তি সুদৃঢ় না হলে সমষ্টির অগ্রগতি ঘটা তো দূরের কথা, অস্তিত্ব রক্ষা করাও কঠিন হয়ে পড়ে। সমষ্টিকে বাসযোগ্য করে তোলার ক্ষেত্রে সমষ্টির সকলের যে দায়িত্ব রয়েছে তা পালন করার জন্য শিক্ষা, প্রেরণা এবং সংঘবদ্ধতার প্রয়োজন। সমষ্টির অংশভাগিতার ভিতর দিয়েই সেগুলি জেগে উঠে। তাছাড়া এর ভিতর দিয়েই আশাহত মানুষকে সনাক্তকরণ করা সম্ভব হয় এবং তাদেরও কার্যকরী ভূমিকা পালনে সাহায্য করা হয়।

উপরোক্ত কারণগুলির জন্যই সমষ্টির অংশভাগিতা গুরুত্বপূর্ণ।

৪.৪ অংশভাগিতার ধরণ বা প্রকার

সমষ্টি কল্যাণ বা উন্নয়নের কাজে মানুষ দু'ভাবে অংশগ্রহণ করতে পারে। সেই ভাগ দু'টি হলো ঃ

(ক) সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ (active participation) : সংশ্লিষ্ট সমষ্টির সদস্যের সমষ্টির সমস্যা অনুসন্ধানের সঙ্গে, সেই সমস্যা দুর করার লক্ষ্যে পরিকল্পনা রচনার সঙ্গে, সেই পরিকল্পনা রূপায়নে এবং সমষ্টি সংগঠন পরিচালনায় যখন সক্রিয়ভাবে যুক্ত থাকে সেই অবস্থাকে বলে সমষ্টির সক্রিয় অংশগ্রহণ।

(খ) নিষ্ক্রিয় অংশগ্রহণ (inactive participation) : যখন সমষ্টির সদস্যেরা সমষ্টি উন্নয়নের কোন লক্ষ্যেই বা উদ্যোগেই আন্তরিক ও সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে না কিন্তু উদ্যোগে বাধা সৃষ্টি করে না সেই অবস্থাকে বলে সমষ্টির নিষ্ক্রিয় অংশগ্রহণ।

৪.৫ সমষ্টির অংশভাগিতা বা অংশগ্রহণের বিভিন্ন ক্ষেত্র

সমষ্টির কাজে সংশ্লিষ্ট সমষ্টির সদস্যেরা নানাভাবে অংশগ্রহণ করতে পারে। অংশগ্রহনের সেই ক্ষেত্রগুলি এরকম ঃ

(ক) বিভিন্ন পদ্ধতির মাধ্যমে সমষ্টির সমস্যা অনুসন্ধান।

(খ) সমস্যা দূরীকরণের জন্য লক্ষ্য স্থির করা।

(গ) সেই লক্ষ্যের ভিত্তিতে পরিকল্পনা রচনা করা।

(ঘ) প্রতিটি কর্মসূচীর লক্ষ্যগোষ্ঠী সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

(ঙ) প্রয়োজনীয় বিষয়ে সচেতন হয়ে অন্যকে সচেতন করা।

(চ) পরিকল্পনা রূপায়নে সাধ্যের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে ভূমিকা পালন।

(ছ) রূপায়ণ স্তরে অগ্রগতি সম্পর্কে খোঁজ খবর রাখা।

(জ) কর্ম পরিকল্পনার মূল্যায়নে অংশ নেওয়া।

(ঝ) বিশেষ সমস্যার সময় একযোগে প্রতিরোধ ও প্রতিকার করার কাজে যুক্ত হওয়া।

(ঞ) তথ্য সংগ্রহ এবং রক্ষণাবেক্ষণে সাহায্য করা।

(ট) শ্রমদান।

(ঠ) জ্ঞান ও দক্ষতা বিনিময় করা।

(ড) অর্থদান/অর্থসংগ্রহের উদ্যোগে সামিল হওয়া।

(ঢ) সামগ্রী দান ও সংগ্রহে যুক্ত হওয়া।

(ন) সমষ্টির স্বার্থ রক্ষায় অন্যদের সঙ্গে প্রয়োজনীয় যোগাযোগ রক্ষা ও আলোচনা করা।

৪.৬ অংশভাগিতার অভাব ঘটে কেন

অনেক কারণেই বিভিন্ন সমষ্টিতে অংশগ্রহণের অভাব ঘটে। এই অভাব ঘটা বা সমস্যা দেখা দেওয়ার পিছনে এক এক সমষ্টিতে এক এক রকম কারণ থাকতে পারে। তার মধ্যে প্রধান কয়েকটি কারণ হলো ঃ

(ক) অশিক্ষা এবং চেতনার অভাব।

(খ) অংশগ্রহণকে নিশ্চিত করার মত সমষ্টিভিত্তিক সংগঠনের অভাব।

(গ) যে সমস্ত সংগঠন/বিভাগ সমষ্টির কল্যাণে যুক্ত তাদের দিক থেকে আন্তরিক চেষ্টার অভাব।

(ঘ) সমষ্টি সংগঠক, বিভাগীয় কর্মীদের কৌশলের ক্ষেত্রে দীনতা।

(ঙ) বিভিন্ন সমষ্টির আর্থ-সামাজিক কাঠামো।

(চ) গণতান্ত্রিক নেতৃত্বের অভাব।

(ছ) সমষ্টির অন্তর্গত বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে বিবাদ।

(জ) উন্নয়ন/কল্যাণের কাজে যুক্ত ব্যক্তিদের আশঙ্কা যে জনগণকে যুক্ত করলে তাদের নিজেদের ক্ষমতা হ্রাস পাবে।

(ঝ) দারিদ্র এবং অনীহা।

(ঞ) স্বীকৃতির অভাব।

(ট) মানুষকে অংশগ্রহণে উৎসাহিত করতে পারে এমন উদ্যোগ নেওয়ার ক্ষেত্রে গণমাধ্যমগুলির পক্ষ থেকে সাধারনভাবে ইতিবাচক মনোভাবের অভাব।

৪.৭ অংশভাগিতা নিশ্চিত করার উপায়

অংশভাগী করার কথা বলা আর প্রকৃতই অংশভাগী করে তোলা এক কথা নয়। অর্থাৎ যত সহজে আমরা এই প্রস্তাব রাখতে পারি বা এই ভাবনা ভাবতে পারি তত সহজে তা ঘটাতে পারি না। ঘটাতে না পারার পিছনে সম্ভাব্য কারণ কি হতে পারে তা আমরা ইতিপূর্বে আলোচনা করেছি। সেই সব কারণ মাথায় রেখে সমষ্টিকে অংশভাগী করে তোলার উপায় খুঁজতে পারি। সম্ভাব্য উপায়গুলি হলো ঃ

(ক) মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন (Identification with the people) ঃ মানুষকে সমষ্টির উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় যুক্ত করতে হলে তাদের সঙ্গে নেতৃত্বের সম্পর্ক স্থাপন করা জরুরী। সমষ্টি সংগঠন নেতৃত্বকে এমনভাবে তাদের সঙ্গে আচরণ করতে হবে যেন সাধারণ মানুষ তাদের নিজেদেরই একজন বলে মনে করতে পারে। পারস্পরিক বিশ্বাস, সহানুভূতি এবং শ্রদ্ধাবোধ জন্মানোর জন্য এই ধরণের কার্যকরী সম্পর্ক গড়ে তোলা জরুরী। গান্ধীজি লিখেছেন, 'যাদের জন্য আমরা কথা বলি তাদের আমরা জানি না, তারাও আমাদের জানে না' (Those for whom we speak we know not; neither do they know us)। এরকম পরস্পরের কাছে অজানা বা অচেনা রয়ে গেলে অংশভাগিতাকে বাস্তবায়িত করা যাবে না। 'মোর নাম এই বলে খ্যাত হোক, আমি তোমাদেরই লোক' (Let my only introduction be I am yours, and yours only) রবীন্দ্রনাথের কথার সেই গূঢ় দৃষ্টিভঙ্গী ও ভাবটি নিয়ে সমষ্টি সংগঠনের কাজে ব্রতী হলে সমষ্টির সদস্যদের অংশগ্রহণ করানো সম্ভব।

(খ) অনুভূত সমস্যার ভিত্তিতে কর্মসূচী (Programme on the basis of felt needs) : সমষ্টিতে প্রায় সবসময়ই কিছু কিছু সমস্যা থাকে, যার মধ্যে কয়েকটি সমস্যা সমষ্টিকে অত্যন্ত বিব্রত করে। সমষ্টি সদস্যরাই এইসব সমস্যা সঠিকভাবে অনুভব করতে পারে। সমষ্টি সংগঠনের কাজ করতে গেলে প্রথমেই মানুষের এই অনুভূত সমস্যাগুলিকে গুরুত্ব দিয়ে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। তবেই স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণকে নিশ্চিত করা যাবে। একটি উদাহরণের মাধ্যমে বিষয়টিকে আরো সহজভাবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। ধরা যাক একটি গ্রামের মানুষ যথেষ্ট শস্য এবং শাকসব্জি ফলায়। সেই গ্রাম থেকে বাজারে যাওয়ার রাস্তা অত্যন্ত খারাপ অবস্থায় থাকায় উৎপাদিত শস্য এবং শাকসব্জি বিক্রি করতে গিয়ে তাদের হয়রান হতে হয়। বিশেষতঃ বর্ষাকালে এই সমস্যা অত্যন্ত জটিল হয়ে উঠে। ঐ গ্রামে নিরক্ষরতা, জাতিভেদ প্রথা, অধিক সন্তানের জন্ম ইত্যাদি সমস্যাও রয়েছে। এক্ষেত্রে কোন্ সমস্যা দূরীকরণে প্রাথমিকতা দেওয়া হবে? অবশ্যই যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত করার জন্য রাস্তা মেরামতকে। কারণ এটিই তাদের সব চেয়ে বেশী অনুভূত সমস্যা। এটিকে প্রাথমিকতা দিলে সমষ্টির মানুষ তাতে অংশগ্রহন করবে। এবং এ কাজ সাফল্যের সঙ্গে শেষ করলে অন্যান্য কর্মসূচী যখন নেওয়া হবে তাতেও মানুষ আগ্রহের সঙ্গে অংশ নেবে।

(গ) সমষ্টির সংস্কৃতিকে মাথায় রেখে কাজ (culture bound approach) : এক এক সমষ্টির সামাজিক-সাংস্কৃতিক পটভূমি এক এক রকম। সংস্কৃতি যেহেতু মানুষের জীবনের অঙ্গ, কোন সমষ্টির সাংস্কৃতিক-সামাজিক প্রথা বা ব্যবস্থাকে আঘাত করে সমষ্টি সংগঠনের কাজ করা অনৈতিক। কোন কোন সমষ্টি এমন কোন শতাব্দী প্রাচীন প্রথা নিয়ে চলতে পারে যা ঐ সমষ্টির পক্ষে হিতকর নয়। তবু সমষ্টি সংগঠনের কাজ করতে গিয়ে সেই সব প্রথায় আঁচড় দিলে সমষ্টির অংশগ্রহণ অসম্ভব হয়ে উঠবে। শিক্ষা-চেতনা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এবং মানসিকতায় কাঙ্খিত পরিবর্তন ঘটলে ধীরে ধীরে সেই সব অহিতকর সংস্কৃতি দূর করা যেতে পারে। সেজন্য সমষ্টির প্রচলিত সংস্কৃতিকে মেনে নিয়ে সমাজ সংগঠনের কাজ করা দরকার। সে পথেই সমষ্টির অংশগ্রহণ ঘটানো সম্ভব।

(ঘ) হঠাৎ পরিবর্তন ঘটানোর লক্ষ্যে কাজ না করা (No action to bring drastic change) : সমষ্টির আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে সর্বদাই পরিবর্তন ঘটে। এটি এক স্বাভাবিক প্রক্রিয়া। কিন্তু পরিবর্তনের এক নিজস্ব

গতি আছে। সমষ্টির পক্ষে অকল্যাণকর কোন প্রথা পরিবর্তন খুব প্রয়োজনীয় বলে বোধ হতে পারে। কিন্তু সেক্ষেত্রেও সংশ্লিষ্ট মানুষকে আগে সে সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন করে ধীরে ধীরে তাতে পরিবর্তন ঘটাতে হয়। রাতারাতি পরিবর্তন ঘটানোর লক্ষ্যে কোন উদ্যোগ নিলে তা কল্যাণের পরিবর্তে অকল্যাণ ডেকে আনে এবং সমষ্টি সংগঠনের কাজে সমষ্টির মানুষের অংশগ্রহণ অনিশ্চিত হয়ে পড়ে। অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হলে সেইসব ক্ষেত্রে পরিবর্তন আনার জন্য তাদের মানসিকভাবে তৈরী হওয়ার সময় দিতে হবে।

(ঙ) তৎপর ও নিবেদিত নেতৃত্ব (Active and dedicated leadership) : সমষ্টি সংগঠনের কাজে জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হলে নেতৃত্বকে নিবেদিত হতে হবে, তৎপর হতে হবে। সমষ্টির কল্যাণ ভাবনা সাধারণের মনে প্রোথিত করতে হলে, সেই দৃষ্টিভঙ্গী তাদের মানসিকতায় প্রবিষ্ট করাতে হলে নেতৃত্বকে উদারহণযোগ্য হয়ে উঠতে হয়। নেতৃত্বের প্রতি আস্থা, ভালবাসা এবং শ্রদ্ধা জন্মালে স্বাভাবিকভাবেই মানুষ সমষ্টি-কল্যাণের কাজে অংশগ্রহণ করার ব্যাপারে তৎপর হবে।

(চ) কার্যকরী যোগাযোগ রক্ষা (Effective Communication) : সমষ্টি সংগঠনের কাজ সমেত উন্নয়নের সর্বক্ষেত্রে সমস্ত শ্রেণীর মানুষের সঙ্গে কার্যকরী যোগাযোগ রক্ষা করাও মানুষের অংশভাগিতায় বৃদ্ধি ঘটায়। ঠিকমত যোগাযোগ রক্ষা করা হলে কোন সিদ্ধান্ত সম্পর্কে, তার পিছনের যুক্তি সম্পর্কে কোন সন্দেহ থাকে না। কিভাবে সে কাজ করা হবে এবং তাতে একজন ব্যক্তির অংশগ্রহণের ক্ষেত্র কি হবে সে সম্পর্কেও অবহিত হতে পারবে। কোন ভুল বোঝাবুঝিরও অবকাশ থাকবে না। স্বভাবতই মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের সম্ভাবনা বৃদ্ধি পাবে।

(ছ) অন্যের উপর ক্ষমতা ও কার্যভার অর্পন (Authority delegation) : প্রতি মানুষের মধ্যে আত্মমর্যাদাবোধ কাজ করে। আবার প্রত্যেকের মধ্যে কিছু যোগ্যতা, কিছু গুণ, কিছু দক্ষতা থাকে। এ ক্ষেত্রে পরিমাণের দিক থেকে মানুষে মানুষে কিছু পার্থক্য থাকা স্বাভাবিক, কিন্তু কেউই সম্পূর্ণ অপদার্থ (worthless) নয়। মানুষের সেই আত্মমর্যাদাবোধকে মূল্য দিয়ে, তার দক্ষতা ও যোগ্যতাকে বিবেচনার মধ্যে রেখে উপযুক্ত কাজের দায়িত্ব দিলে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে আগ্রহ সঞ্চার হবে। যাদের হাতে নেতৃত্ব তারা নিজেদের হাতে সব ক্ষমতা না রেখে অন্যদেরকেও দায়িত্ব পালনে জড়িয়ে নিতে পারলে অংশগ্রহণের অনুকূল পরিবেশ তৈরী হয়। যত বেশী করে এই দায়িত্বভার বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া যাবে তত বেশী সম্ভাবনা দেখা দেবে সমষ্টি সংগঠনের কাজে মানুষের অংশগ্রহণের।

(জ) যৌথ তদারকি এবং মূল্যায়ন (Joint Supervision/Evaluation) : সমষ্টি সংগঠন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে যে কর্মসূচী গ্রহণ করা হয় তার ঠিক ঠিক রূপায়নের স্বার্থে এবং কাজে প্রয়োজনীয় গতি আনতে নিয়মিত তদারকির যেমন প্রয়োজন, তেমনি প্রয়োজন মূল্যায়নের। এই তদারকি ও মূল্যায়নের কাজ নির্দিষ্ট কোন ব্যক্তির মাধ্যমে নয়, যৌথভাবে হওয়া কাম্য। সমষ্টি নেতৃত্ব, সাধারণ সদস্যদের প্রতিনিধি, সাহায্যকারী সংস্থা থাকলে তার প্রতিনিধি ইত্যাদিকে নিয়ে যৌথভাবে ঐ কাজ করলে সমষ্টির মধ্যে যৌথভাবে দায়িত্ব পালনের এক মানসিকতা তৈরী করা যায়। এ ধরণের মানসিকতা তৈরী হলে জনগণের অংশগ্রহণের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়।

(ঝ) কারণের প্রতি আন্তরিকতা (Sincerity to the cause) : আমরা অনেক সময় কাজ করি যাতে প্রাণের ছোঁয়া থাকে না। যেন করতে হয় বলে করা। এই আন্তরিকতাহীন প্রয়াস ফলদায়ী হয় না। সেরকম কাজে মানুষের সমর্থনও থাকে না। স্বভাবতই তারা এড়িয়ে চলে অথবা বিরোধিতা করে। তাই মানুষের সমর্থন আদায় করতে হলে, তাদের কাজের সঙ্গে অঙ্গীভূত করে নিতে হলে সম্পূর্ণ আন্তরিকতার সঙ্গে কাজ করতে হবে। ঐ কাজ সমষ্টির কল্যাণ সহায়ক হবে সেই বিশ্বাস রেখে সঙ্কল্পবদ্ধতার সঙ্গে কাজ করলে সাধারণ মানুষও সেই কাজে যোগ দিতে আগ্রহ বোধ করবে।

(ঞ) গণমাধ্যমের গঠনমূলক ভূমিকা (Constructive role of Mass Media) : গণমাধ্যমগুলির যথেষ্ট প্রভাব

রয়েছে সমষ্টির উপর। তাই বিভিন্ন গণমাধ্যম যদি গঠনমূলক ভূমিকা পালন করে তাহলেও সমষ্টি সদস্যদের অংশগ্রহণের মাত্রা বৃদ্ধি পায়। সমষ্টির সদস্যদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে সদর্থক পরিবর্তন ঘটেছে এমন ঘটনাগুলি পরিকল্পিত এবং আকর্ষণীয়ভাবে তুলে ধরলে অন্য সমষ্টির মানুষেরা তাতে উৎসাহিত হয়ে নিজেরাও সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে তেমন কিছু করতে চাইবে। স্বভাবতঃই এভাবে অংশগ্রহণের মাত্রা বৃদ্ধি পেতে পারে।

(ট) সামাজিক ন্যায়বিচার (Social Justice) : প্রায় সব সমষ্টির মধ্যেই কিছু অসমতা (inequalities) রয়েছে। ধর্ম, বর্ণ, আর্থিক অবস্থা এবং সামাজিক প্রতিপত্তিকে ভিত্তি করে। এগুলি সমষ্টিতে বিভেদ সৃষ্টির বীজ বপন করে। সমষ্টিগুলিতে সামাজিক ন্যায় বিচার যত বেশি সম্ভব নিশ্চিত করতে পারলে, শোষন এবং নিপীড়নের হাত থেকে কিছুটা নিষ্কৃতি দিতে পারলে সমাজের তলায় পড়ে থাকা মানুষগুলিও সমষ্টির সকলের কল্যাণের লক্ষ্যে যে সব উদ্যোগ নেওয়া হবে তাতে অংশগ্রহণে আগ্রহ জন্মাবে।

(ঠ) বাছাই করা কর্মীর প্রশিক্ষণ (Training of Selected Workers) : সমষ্টির অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার আর একটি উত্তম পন্থা হচ্ছে সমষ্টির মধ্য থেকে নির্বাচিত কিছু উৎসাহী যুবক যুবতীকে সমষ্টি সংগঠনের কাজে প্রশিক্ষণ দেওয়া। এই ধরণের প্রশিক্ষণের ফলে তারা সে কাজে দক্ষতা অর্জন করতে পারে। এতে আগ্রহ বৃদ্ধিও ঘটে। নিজেদের ছেলে মেয়েদের এই আগ্রহ বৃদ্ধি সার্বিকভাবে সমষ্টিকে প্রভাবিত করতে পারে যার ফলে অংশভাগিতা বৃদ্ধির সম্ভাবনা জোরালো হয়।

(ড) মহিলাদের অবস্থানগত উন্নয়ন (Improvement in the status of women) : মহিলারা সমষ্টির ভাল-মন্দের ব্যাপারে অনেক ক্ষেত্রেই নীরব দর্শক মাত্র হয়ে থাকেন। কোন ক্ষেত্রেই সিদ্ধান্ত গ্রহণে সাধারণতঃ তাদের কোন ভূমিকা থাকে না। গৃহস্থের কাজের বাইরে অন্য কোন কাজে তারা যুক্ত হবে সেই বিধিই যেন অনুপস্থিত। সমষ্টির অংশগ্রহণকে বাস্তব রূপ দিতে হলে মহিলাদের অবস্থানগত উন্নয়ন ঘটিয়ে তাদের সমষ্টির সমগ্র উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় যুক্ত করে নিতে হবে।

(ঢ) রাজনৈতিক সদিচ্ছা (Political will) : যে কোন সমষ্টির সদস্যদের সার্বিক উন্নয়ন সাধন, সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠা, নারীর অবস্থানগত পরিবর্তন ইত্যাদি বিভিন্ন ক্ষেত্রে সদর্থক কিছু করতে গেলে রাজনৈতিক সদিচ্ছার প্রয়োজন। কারণ রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের ভিত্তিতেই এই পরিবর্তন সাফল্যের সঙ্গে ঘটানো সম্ভব। সেই পরিবর্তন সাধন সম্ভব হলে সমষ্টির বিভিন্ন সমস্যার মোকাবিলায় তারাই সংগঠিতভাবে তৎপর হতে পারে। সে অবস্থায় অংশগ্রহণের ব্যাপারটি অনেক সহজ হয়ে যায়।

৪.৮ উপসংহার

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে সমষ্টির কাজে সংশ্লিষ্ট সমষ্টির সদস্যদের অংশগ্রহণ অত্যন্ত জরুরী একটি বিষয়, কিন্তু তা বাস্তবে ঘটানো কখনোই সহজ কাজ নয়। সমষ্টি সংগঠনের প্রাথমিক অবস্থায় তো এ কাজ নিতান্তই কঠিন। শিক্ষা, চেতনা, উৎসাহদান এবং পিছনে লেগে থাকা (education, enlightenment, encouragement and pursuation)—এ সব না হলে অংশগ্রহণে উৎসাহ সৃষ্টি করা কঠিন। বিভিন্ন ব্যক্তি এবং গোষ্ঠীর মধ্যে ভাল বোঝাপড়ার পরিবেশ তৈরী করাও অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে আগ্রহ সঞ্চারের অন্যতম পূর্ব শর্ত। সাধারণতঃ কোন সমষ্টিতেই মানুষের উপযোগী একটি আদর্শ পরিবেশ খুঁজে পাওয়া কঠিন। সেই ধরণের পরিবেশ তৈরী করে নিতে হয়। বিভিন্ন ব্যক্তি এবং গোষ্ঠীর মধ্যে বিবাদের ক্ষেত্রগুলি কমিয়ে এনে, মতপার্থক্য হ্রাস ঘটিয়ে, পারস্পরিক বোঝাপড়ার ক্ষেত্র বিস্তীর্ণ করে, সমষ্টি কল্যাণে আগ্রহী করে তুলে অংশভাগিতার পরিমাণ বৃদ্ধি ঘটাতে হয়।

৪.৯ প্রশ্নাবলী

১। সমষ্টির অংশভাগিতা কথাটির অর্থ কি? সমষ্টি সংগঠনের ক্ষেত্রে তার গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর।

২। অংশভাগিতার ধরনগুলি কি এবং কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে সমষ্টির অংশভাগিতা কাম্য?

৩। অংশভাগিতার অভাব ঘটার পিছনে কি কি কারণ রয়েছে?

৪। অংশভাগিতা নিশ্চিত করার পন্থাগুলি বিশ্লেষণ কর।

৪.১০ গ্রন্থপঞ্জী

01. Rural Poor-their hopes and aspirations — Madhu S. Mishra

02. Community Organization — Dr. (Mrs) Banmala

একক ৫ □ গ্রাম ও শহরে সমষ্টি সংগঠন

গঠন

৫.১ উদ্দেশ্য
৫.২ প্রারম্ভিক কথা
৫.৩ উভয় সমষ্টির বৈশিষ্টমূলক দিক
৫.৪ সমাজকর্মীর কর্মগত কৌশল
৫.৫ প্রশ্নাবলী

৫.১ উদ্দেশ্য

গ্রাম এবং শহর মূলতঃ এই দুই সমষ্টিকে নিয়ে আমাদের সমাজ। এই দুই সমষ্টিতেই সমষ্টি সংগঠনের কাজ করতে হয় সমাজ কর্মীকে। একথা স্বীকার্য যে, যে কোনো সমষ্টিতে কাজ করতে হলে সেই সমষ্টির বৈশিষ্টগুলি সম্পর্কে এবং সেই সব বৈশিষ্টের পরিপ্রেক্ষিতে সমাজকর্মীর কর্মগত কৌশল কি হবে সে সম্পর্কেও এক পরিচ্ছন্ন ধারণার অধিকারী হওয়া প্রয়োজন। সেই প্রয়োজন মেটানো আলোচ্য এককের উদ্দেশ্য।

৫.২ প্রারম্ভিক কথা

সমষ্টি সংগঠন হলো সমাজ কর্ম পেশার একটি বিশেষ পদ্ধতি। এটি একটি সচেতনতা এবং পারস্পরিকতা বৃদ্ধিকারী প্রক্রিয়া বা প্রয়াস যার দ্বারা সমষ্টির সদস্যদের মধ্যে সুষ্ঠু উন্নয়নমূলক পরিবর্তন আনয়নের ব্যবস্থা করা হয় এবং উন্নয়ন ঘটানোর ক্রমাগত চেষ্টা চলে।

ভারতবর্ষের যে কোন প্রান্তে সমষ্টি উন্নয়ন বা সমষ্টি সংগঠনের কাজ করতে গেলে সমাজকর্মী ভৌগোলিক অবস্থান বা চারিত্রিক বৈশিষ্টের ভিত্তিতে মূলতঃ দুই ধরণের সমষ্টির অস্তিত্ব লক্ষ্য করেন—গ্রাম সমষ্টি ও শহর সমষ্টি। অনেকগুলি বৈশিষ্টগত পার্থক্যের জন্য দুই সমষ্টির মধ্যে কিছু কিছু ভেদরেখা অনুভব করা যায় সহজেই। দুই সমষ্টিকে পৃথকীকরন করতে এই বৈশিষ্টগুলি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

৫.৩ উভয় সমষ্টির বৈশিষ্টমূলক দিক

(ক) গ্রাম সমষ্টি :

—গ্রাম সমষ্টির সামাজিক প্রতিষ্ঠানগত নিয়ম প্রণালীগুলি খুবই জটিল এবং মিশ্র ধরণের হয়। গ্রামীণ সমষ্টির মধ্যে জাতিসম্পর্ক, আত্মীয়তা বিভিন্নতা, যৌথ এবং বিস্তৃত পরিবার ইত্যাদির উপস্থিতির জন্য সামাজিক প্রতিষ্ঠান যথা পরিবার, বিবাহ ইত্যাদি সম্পর্কিত নিয়ম প্রণালীগুলি এরদ্বারা জটিলতা প্রাপ্ত হয়।

—গ্রামীণ সমষ্টির স্বরূপ লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে এরা শিক্ষার অভাবে পীড়িত হয়ে এবং অন্যান্য কিছু কারণে শহরাঞ্চল অপেক্ষা কম উন্নত।

—বহু পুরাতন সামাজিক প্রথার দ্বারা তাদের জীবনধারা পরিচালিত।

—অর্থব্যবস্থা মূলতঃ কৃষিনির্ভর। ক্ষেত্র বিশেষে কিছু কিছু ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের অস্তিত্বও লক্ষ্য করা যায়।

—সমপ্রকৃতিমূলক সমাজব্যবস্থা।

—পেশার ক্ষেত্রে পরিবর্তনের হার উল্লেখযোগ্য নয়।

—প্রতিযোগিতার মনোভাব তীব্র নয়।

—জন্ম ও মৃত্যুহার তুলনামূলকভাবে বেশী।

—জীবন গতিহীনতার শিকার

(খ) শহুরে সমষ্টি :

—স্বল্প পরিসরে বিশাল জনসংখ্যার চাপ

—সাধারনতঃ দেশান্তরী বা স্থানবদলকারী জনসমষ্টি

—ভিন্নজাতীয়তা এবং তৎজনিত বিভিন্নতা

—তুলনায় উচ্চ শিক্ষাহার ও সচেতনতা

—চাকুরি এবং ব্যবসা মূল জীবিকা

—সর্বরকম সুযোগ সুবিধার ক্ষেত্রে তুলনায় অগ্রনী

সমষ্টি সংগঠন পদ্ধতি যেহেতু উন্নয়ন সাধনের ক্ষেত্রে এক অবশ্য পালনীয় প্রক্রিয়া সেহেতু এই প্রক্রিয়া অবলম্বনে সমষ্টি বিশেষে কিছু পার্থক্য রেখে চলতে হয়। গ্রামীন এবং শহুরে উভয় সমষ্টিতেই এই পদ্ধতির ব্যবহারের পিছনে মৌলিক উদ্দেশ্য অভিন্ন। উভয় সমষ্টির ক্ষেত্রেই সমাজকর্মী সমষ্টিবন্ধন, পারস্পরিক সহযোগিতা, সাহায্যকারী মনোভাবের বিস্তারে পথপ্রদর্শন করেন এবং সমষ্টিভুক্ত দলগুলির এই ইচ্ছা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে ভূমিকা পালন করেন এর ফলস্বরূপ সমষ্টির মধ্যে আত্মনির্ভরতা, অপরের প্রতি বিশ্বাসপূর্ণ নির্ভরতা, নিজসম্পদ নিয়োগের মাধ্যমে উন্নয়ন ইত্যাদি গুণাগুণগুলি বর্দ্ধিত হয়। এই বৈশিষ্টগুলি ক্রমান্বয়ে সমষ্টির সদস্যদের একত্রিত হয়ে উন্নয়ন প্রচেষ্টায় অংশীদার হতে সাহ্যা করে। কিন্তু এজন্য সমাজকর্মীকে উভয় সমষ্টির বৈশিষ্টগুলি বিচার করে, তাদের বিভিন্নতাকে বিশেষ মূল্য দিয়ে সমষ্টি উন্নয়নের জন্য কার্যপরিকল্পনা এবং কার্যনীতি নির্ধারণ করতে হয়। সমষ্টির উন্নয়নকল্পে সমষ্টি সদস্যদের বিশেষভাবে অংশগ্রহণের জন্য উৎসাহিত করতে হয়। সমষ্টির মনুষ্য সম্পদকে সক্রিয় করে তোলার জন্য সমাজকর্মী সমস্যা চিহ্নিতকরণ থেকে সমস্যা সমাধান কল্পে সবরকম কর্মসূচীতে সংশ্লিষ্ট জনসমষ্টির বিচারবুদ্ধি, ক্ষমতা,সমষ্টি সম্পদ ইত্যাদির ব্যবহার করবেন। সমষ্টি উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় কিভাবে উভয় সমষ্টিতে সমাজকর্মী কাজ করবেন তার আলোচনা করা প্রয়োজন।

৫.৪ সমাজকর্মীর কর্মগত কৌশল

সমষ্টিবিশেষে সমাজকর্মীর কর্মগত কৌশল হবে নিম্নরূপ ঃ

গ্রাম সমষ্টি	শহুরে সমষ্টি
১। গ্রামীণ মানুষের ব্যবহারিক দিকটি এবং তার পিছনের কারণগুলি তাদের গ্রামীণ জীবনের নিরিখে ভালভাবে বুঝতে হবে।	১। ব্যক্তি স্বাধীনতার সুযোগ বেশী। গ্রামীণ মূল্যবোধ ও প্রথার ব্যবহার তেমনভাবে পরিলক্ষিত হয় না। শহুরে এলাকার সমষ্টি সংগঠককে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে এই সব সমষ্টির মানুষের জীবনধারার পদ্ধতিগুলি।

গ্রাম সমষ্টি	শহুরে সমষ্টি
২। গ্রামীণ সমষ্টির অর্থনৈতিক উন্নয়নের ব্যাপারে বিশেষ দৃষ্টি দিয়ে জনগনকে নিয়ে পরিকল্পনা গ্রহন করতে হবে।	২। এক্ষেত্রে সমষ্টি সংগঠক শহরভিত্তিক নাগরিক জীবনের জন্য উপযোগী শিক্ষার দিকটি বিশেষভাবে তার পরকল্পনায় স্থান দেবেন যাতে শহরের সমষ্টি ও পারস্পরিক সম্পর্ক ও স্বার্থরক্ষায় উদ্যোগী থাকে।
৩। গ্রামীণ সমষ্টির মানুষ সহজে কোন পরিবর্তন সাধনে আগ্রহী হয় না। সাধারণতঃ নিজেদের কিছুটা গুটিয়ে রাখেন। যথেষ্ট গণসংযোগ এবং চেতনা বৃদ্ধিকারী পদক্ষেপের মাধ্যমে তা দূর করার চেষ্টা করতে হবে। বিভিন্ন সরকারী সংগঠনের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে তাদের গণ-মাধ্যমগুলিকেও ব্যবহার করতে হবে।	৩। সর্বপ্রথম নজর দিতে হবে বস্তি উন্নয়নে। এর জন্য শহর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, পৌরসভা এবং হাসপাতাল -গুলির সঙ্গে প্রয়োজনীয় যোগাযোগ রাখতে হবে। আলোচনা সভার আয়োজন এবং গবেষণার মাধ্যমে সমাজ এবং তার পরিবর্তনের দিকগুলি নিয়ে সমষ্টি সদস্যদের চিন্তার মধ্যে প্রসারতা নিয়ে আসার অবিরত চেষ্টা চালাতে হবে।
৪। সকলকে একত্রিত করে স্বয়ংক্রিয় দলের মাধ্যমে সমষ্টি সদস্যদের সমষ্টি ভাবনায় প্রভাবিত করতে হবে। এর জন্য স্বয়ংক্রিয় দল গঠন করে বিশেষ কোন অর্থনৈতিক এবং সামাজিক কাজে তাদের যুক্ত করতে হবে। এভাবে অংশগ্রহণের ফলে জনমানসে বিচার শক্তি বৃদ্ধি পাবে।	৪। শহর এলাকার সমষ্টিতে ব্যক্তি এবং ছোট ছোট দলের উন্নয়নের জন্য সমষ্টি সংগঠক পরিকল্পনা নেবেন। এক্ষেত্রে ব্যক্তিকর্ম (case work) এবং গোষ্ঠীকর্ম (Group work) পদ্ধতি ব্যবহারের প্রয়োজন।
৫। পরম্পরাগত গোষ্ঠী নেতাদেরও সাহায্য নিতে হবে। নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের সম্পদরূপে গণ্য করে তাদের বিভিন্ন দায়িত্ব পালনের সুযোগ দিয়ে সুপরিকল্পিত ও অর্থবহ নেতৃত্বদানের শিক্ষাগ্রহণের সুযোগ করে দিতে হবে। ভবিষ্যতে সেভাবেই তারা নিজ নিজ সমষ্টির উন্নয়নের ক্ষেত্রে নেতৃত্বদান করবেন।	৫। সমষ্টির মধ্যে যে সব সম্পদ যেমন স্বাস্থ্যকেন্দ্র, পাঠাগার, ক্রীড়াকেন্দ্র, সংস্কৃতি চর্চা কেন্দ্র ইত্যাদি সমষ্টির সকলে যাতে তার সুবিধা নিতে পারে তা দেখতে হবে। এসব বিষয়ে প্রয়োজনমত সকলকে সচেতন করতে হবে।

উপরোক্ত কর্মপদ্ধতি এবং কর্মকৌশল প্রয়োজনমত ব্যবহৃত হবে। গ্রাম এবং শহরের সমষ্টির মধ্যে চরিত্রগত পার্থক্য ক্রমশঃ হ্রাস পাচ্ছে উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা, শিক্ষাপ্রসার ইত্যাদি কারনে। গ্রামের সমষ্টি যেমন শহুরে সমষ্টির অনেক চারিত্রিক বৈশিষ্টের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে তেমনি শহুরে সমষ্টিও অনেক গ্রামীণ বৈশিষ্টকে ছাড়তে পারেনি— বিশেষতঃ বস্তি অঞ্চলের বাসিন্দারা। এই দিকগুলি সমষ্টি সংগঠকের ভাবনায় থাকা দরকার। উভয় সমষ্টির সদস্যদেরই তাদের প্রয়োজনগুলি অনুভব করতে হবে। অনুভূতিপ্রবণ হলেই অংশগ্রহণের আকাঙ্খা বৃদ্ধি পাবে। এবং অংশগ্রহণের মাধ্যমে তাদের চিন্তনে, মননে পরিবর্তন আসবে এবং সেটাই হবে উন্নয়নের ক্ষেত্রে প্রকৃত সহায়ক।

৫.৫ প্রশ্নাবলী

১। শহর এবং গ্রাম সমষ্টির বৈশিষ্টগুলি কি কি?

২। সমষ্টি উন্নয়নের ক্ষেত্রে একজন সমষ্টি সংগঠক কি ধরণের কর্মগত কৌশল অবলম্বন করবেন?

একক ৬ □ সমাজ কর্মের বিভিন্ন ক্ষেত্রে পদ্ধতি হিসাবে সমাজ সংগঠনের প্রাসঙ্গিকতা

গঠন

৬.১ সমাজ কর্মের অর্থ

৬.২ সমষ্টি সংগঠনের অর্থ

৬.৩ সমাজ কর্মের বিভিন্ন ক্ষেত্রে পদ্ধতি হিসাবে সমাজ সংগঠনের প্রাসঙ্গিকতা

৬.৪ প্রশ্নাবলী

৬.১ সমাজ কর্মের অর্থ

উপরোক্ত বিষয়ে আলোচনার শুরুতে আমরা সমাজ কর্ম সম্পর্কে ধারণাটি পরিষ্কার করে নিতে পারি। এক্ষেত্রে দু' একজন সমাজ বিজ্ঞানীর মতামত বিশ্লেষণই শ্রেষ্ঠ পন্থা হতে পারে। ফ্রায়েডলেন্ডারের (Friedlander) এর মতানুসারে সমাজ কর্ম হলো এক পেশাভিত্তিক পরিষেবা যা দাঁড়িয়ে আছে মানুষের পারস্পরিক সম্পর্কের ব্যাপারে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ও দক্ষতার উপর এবং যা কোন ব্যক্তিকে এককভাবে বা গোষ্ঠীর মধ্যে সাহায্য করে। কোনাপকার (Konopka) মতে সমাজ কর্ম হলো একটি অস্তিত্ব যা প্রতিনিধিত্ব করে পৃথক অথচ আন্ত সম্পর্ক জড়িত তিনটি খন্ডে—সামাজিক পরিষেবার জাল বিশেষ, সতর্কভাবে তৈরী বা গৃহীত পদ্ধতিপ্রকরণ এবং সামাজিক প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তির মাধ্যমে প্রকাশিত সামাজিক নীতি। আবার ১৯৫৭ সালে পেশাদার ভারতীয় সমাজ কর্মীদের সম্মেলনে গৃহীত সিদ্ধান্ত মতে সমাজ কর্ম হলো মানবিক দর্শন, বৈজ্ঞানিক জ্ঞান, পেশা সংক্রান্ত দক্ষতা ইত্যাদির সাহায্যে কল্যাণধর্মী কাজ করা যাতে ব্যক্তি, গোষ্ঠী এবং সমষ্টি ভালভাবে জীবনযাপন করতে পারে। এইসব মতামত থেকে আমরা বলতে পারি যে সমাজ কর্ম হলো ঃ (ক) এক পেশাদার পরিষেবা যা বিশেষ জ্ঞান ও দক্ষতা দাবী করে। (খ) এক গতিময় কর্ম যা সামাজিক নীতি প্রয়োগের জন্য ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায়, সরকারী উদ্যোগে বা সংস্থাগত আগ্রহে ঘটতে পারে। (গ) ব্যক্তি, পরিবার, গোষ্ঠী ও সমষ্টির সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক কল্যানের জন্য গৃহীত কর্মদ্যোগ।

৬.২ সমষ্টি সংগঠনের অর্থ

সমষ্টি সংগঠন পদ্ধতির অর্থ হলো পেশাদার কর্মী ও সমষ্টির সদস্যদের উদ্যোগে গৃহীত সুপরিকল্পিত কর্মসূচী যা সমষ্টির নানা সমস্যা সমাধানের ভিতর দিয়ে সমষ্টির উন্নয়ন সূচিত করে। সমষ্টি সংগঠন হলো সমাজ কর্মের অন্যতম পদ্ধতি যা সংশ্লিষ্ট সমষ্টির মানুষের সহযোগিতার ভিতর দিয়ে পরিচালিত হয়।

৬.৩ সমাজ কর্মের বিভিন্ন ক্ষেত্রে পদ্ধতি হিসাবে সমাজ সংগঠনের প্রাসঙ্গিকতা

সমাজ সংগঠন এমন এক প্রক্রিয়া যা সমাজ ও সমষ্টির সামগ্রিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। মানুষের জীবনের কয়েকটি বিশেষ ক্ষেত্রে এই পদ্ধতির প্রাসঙ্গিকতার বিষয়টি আলোচনা করা যেতে পারে।

(ক) স্বাস্থ্য (Health) ঃ স্বাস্থ্য সংক্রান্ত ব্যাপারে স্পষ্ট কয়েকটি দিক আছে। প্রথমতঃ স্বাস্থ্য সংক্রান্ত নানা বিষয়ে সচেতনতার অভাব, যার ফলে প্রতিরোধ ব্যবস্থা নিতান্ত অপ্রতুল। দ্বিতীয়তঃ উপযুক্ত তথ্য বা জ্ঞানের অভাবে প্রতিকার

ব্যবস্থার সুযোগ ও উপযুক্ত সময়ে নেওয়া হয় না বা একেবারে নেওয়া হয় না। তৃতীয়তঃ রোগী নিজে এবং তার পরিবারের সদস্যেরা অনেকসময় চরম মানসিক উদ্বেগের শিকার হয়। এর ফলে তাদের জীবনের স্বাভাবিকতা বিঘ্নিত হয়।

এইসব সমস্যা মোকাবিলায় ব্যক্তিকর্ম (Case Work), গোষ্ঠী কর্ম (Group Work) এবং সমষ্টি সংগঠন (Community Organisation)—সমাজ কর্মের (Social work) তিনটি পদ্ধতি ব্যবহার করেই সুফল পাওয়া যায়। সমষ্টি সংগঠনের মাধ্যমে সমষ্টিবদ্ধ সমস্ত মানুষের মধ্যে স্বাস্থ্য সংক্রান্ত চেতনা সঞ্চারের কাজ করতে পারলে প্রতিরোধ ব্যবস্থায় কার্যকরী ফলপ্রাপ্তি সম্ভব। দ্বিতীয়তঃ কোন অসুখকে কেন্দ্র করে যে উদ্বেগের সঞ্চার হয় তাদের সমষ্টিতে অনুষ্ঠিত নানা ধরনের সৃষ্টিধর্মী কাজে যুক্ত করে দিয়ে উদ্বেগ প্রশমনে সাহায্য করা সম্ভব হয়। তাছাড়া টীকা করণ, ছোট পরিবার গঠন ইত্যাদি ব্যাপারে কোন কোন সমষ্টির মধ্যে যে জড়তা বা মানসিক প্রতিবন্ধকতা ও কুসংস্কার থাকে, সমষ্টি সংগঠনের মধ্য দিয়ে তা কাটিয়ে উঠতে সাহায্য করে। এভাবে সমষ্টি সংগঠন প্রক্রিয়া স্বাস্থ্যক্ষেত্রে কিছু কার্যকরী ভূমিকা পালন করতে পারে।

(খ) শিক্ষা (Education) ঃ প্রতিটি সমাজেই শিক্ষার প্রয়োজন অপরিহার্য। উন্নতির অন্যতম প্রধান মতই হলো শিক্ষার প্রসার। স্বাধীনতার পর অনেকগুলি বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেলেও ও দেশের এক তৃতীয়াংশের মত মানুষ আজও নিরক্ষর। সব রাজ্যে, সব জেলায় বা জেলার সব অংশে নিরক্ষরতাজনিত সমস্যার গভীরতা এক নয়। কিন্তু যা সত্য তা হলো সারাটা দেশই কমবেশী এই সমস্যায় জড়িত। এর সঙ্গে জড়িত রয়েছে আর একটি সমস্যা। সেটি হলো বিদ্যালয় ছুট হওয়ার প্রবণতা। যারা বিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার সুযোগ পায় নানা কারণে তাদের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ বিদ্যালয় ছুট হয়ে পড়ে।

সমষ্টি সংগঠনের মাধ্যমে এই ক্ষেত্রেই কার্যকরী ভূমিকা পালন করা যায়। সমষ্টি সম্পদকে কাজে লাগিয়ে নিরক্ষরতা দূর করার কাজে যেমন সাফল্যের সঙ্গে যুক্ত থাকা যায়, তেমনি বিদ্যালয় ছুট (school dropout) জনিত সমস্যারও মোকাবিলা করা যায়। সমস্যাটিকে সঠিকভাবে সমষ্টিসদস্যদের ভাবনায় প্রবিষ্ট করানো এবং তা দূরীকরণে কি ধরনের ভূমিকা পালন বা পদ্ধতি অবলম্বন করা দরকার সে সম্পর্কে অবহিত ও উদ্বুদ্ধ করার মাধ্যমে সমষ্টির অংশভাগিতাকে নিশ্চিত করে এই সমস্যার সমাধান করা সম্ভব। সমষ্টি সংগঠন প্রক্রিয়া এভাবেই শিক্ষা সংক্রান্ত সমস্যা নিরসনেও অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক।

(গ) গৃহনির্মাণ (Housing) ঃ খাদ্য, বস্ত্র, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের মত মানুষের জীবনযাপনের ক্ষেত্রে আর এক প্রয়োজনীয় জিনিষ হলো বাসগৃহ। প্রতি পরিবার নিজের বাসগৃহ নিজে তৈরী করে নেবে সেটিই স্বাভাবিক ব্যবস্থা। তৎসত্ত্বেও কখনো কখনো সমষ্টিকে সম্মিলিতভাবে এক্ষেত্রে কাজে নামতে হয়। উড়িষ্যার এক শ্রেণির ভ্রাম্যমান আদিবাসী সমষ্টির জন্য সমষ্টি সংগঠনের মাধ্যমে 'গৃহহীনদের জন্য গৃহ' (Home for Homeless) প্রকল্প চালু করে তাদের একটি নির্দিষ্ট ভৌগোলিক এলাকায় স্থায়ীভাবে বসবাসের সুযোগ করে দিয়েছে। কোন কোন সমষ্টিতে কিছু কিছু পরিবারের গৃহ সংক্রান্ত দুরবস্থা পীড়াদায়ক পর্যায়ে থাকে। সমষ্টি সংগঠনের মাধ্যমে সেখানে কার্যকরী ভূমিকা পালন করার সুযোগ থাকে।

(ঘ) স্বাস্থ্যকর ব্যবস্থা (Sanitation) ঃ মানুষের বাঁচার জন্য যে সব জিনিষের নিতান্ত প্রয়োজন তার মধ্যে অন্যতম হলো স্বাস্থ্যকর ব্যবস্থা। কিন্তু স্বাস্থ্যকর ব্যবস্থার অভাবে শহরের বস্তি অঞ্চল এবং গ্রামাঞ্চলের অধিকতর এলাকায় একটি বাস্তব ঘটনা। সমষ্টির মানুষকে স্বাস্থ্যকর ব্যবস্থা ও তার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে উপযুক্ত ধারণা সৃষ্টি এবং তা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে তাদের ভূমিকা পালনে উদ্বুদ্ধ করার মাধ্যমে সমষ্টি সংগঠন প্রক্রিয়া তার কার্যকারিতা প্রমাণ করতে পারে।

(ঙ) আয় সঞ্চার (Income Generation) : প্রায় সমস্ত সমষ্টিতেই দেখা যায় দরিদ্রের লাঞ্ছনা। একশ্রেণির মানুষ বংশানুক্রমিকভাবে দারিদ্রের শিকার। সুপরিকল্পনার ভিতর দিয়ে সমষ্টির সম্পদ ও নিজেদের প্রচেষ্টা কাজে লাগিয়ে আয়ের পথ সুগম করার ব্যাপারে সংগঠিত প্রয়াসের অভাব লক্ষ্য করা যায়। সমষ্টি সংগঠন প্রক্রিয়ার ভিতর দিয়ে সম্পদ চিহ্নিত করণ, বাজারে চাহিদা সম্পর্কে ধারণা সৃষ্টি, পেশামুখী হওয়ার জন্য দক্ষতা ও মানসিকতা সৃষ্টি নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য পূর্তির জন্য সমষ্টির মধ্যে গোষ্ঠী গঠন ইত্যাদি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আয় সৃষ্টি বা আয় সঞ্চারের ব্যাপারে সমষ্টির মানুষকে আগ্রহী করে তোলাও সমষ্টি সংগঠনের অন্যতম ভূমিকা হতে পারে।

(চ) স্থানচ্যুতি (Displacement) : মানুষের তৈরী কারণে বা প্রাকৃতিক বিপর্যয় ইত্যাদি কারণে বিভিন্ন সমষ্টির মানুষকে কখনো কখনো স্থানচ্যুত হতে হয়। স্থানচ্যুতি মানুষের জীবনে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে নানা সমস্য ডেকে আনে। সমষ্টি সংগঠনের মাধ্যমে এই ধরনের সমস্যা কবলিত মানুষের সমস্যা নিরসনেরও ভূমিকা পালন করা যায়। নতুন বসতি এলাকার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের সঙ্গে মানিয়ে নিতে সাহায্য করে, মানসিক যন্ত্রণা উপশমের জন্য নানা ধরনের কর্মসূচীর আয়োজন করে সমষ্টি সংগঠনের মাধ্যমে এক্ষেত্রেও নির্দিষ্ট ভূমিকা পালন করা যায়। স্থানচ্যুতি অন্য নানা সমস্যার মধ্যে সবচেয়ে বড় যে সমস্যা ডেকে আনে তা হলো অসহায়তা বোধ, সব হারানোর যন্ত্রণা। সেই যন্ত্রণার উর্দ্ধে তুলতে, সেই অসহায়তা কাটিয়ে তুলতে সমষ্টি সংগঠন প্রক্রিয়া এক উপযুক্ত পদ্ধতি।

উপরোক্ত কয়েকটি ক্ষেত্র ছাড়া জীবন জীবিকার আরও বহুক্ষেত্রে সমষ্টি সংগঠন প্রক্রিয়ার প্রাসঙ্গিকতা রয়েছে উল্লেখযোগ্যভাবে চর্চার জন্য।

৬.৪ প্রশ্নাবলী

১। 'সমাজ কর্ম' এবং 'সমষ্টি সংগঠনের' অর্থ কি?

২। সমাজ কর্মের বিভিন্ন ক্ষেত্রে পদ্ধতি হিসাবে সমাজ সংগঠনের প্রাসঙ্গিকতা ব্যাখ্যা কর।

একক ৭ □ সামাজিক কার্যসম্পাদন

গঠন

৭.১ উদ্দেশ্য
৭.২ সমাজ কর্মের বা সমাজ ক্রিয়ার অর্থ
৭.৩ সমাজ কর্মের বা সমাজ ক্রিয়ার বৈশিষ্ট
৭.৪ সমাজ ক্রিয়ার কৌশল
৭.৫ প্রশ্নাবলী
৭.৬ গ্রন্থপঞ্জী

৭.১ উদ্দেশ্য

সমাজে নানা সময় নানা ধরণের সমস্যা গভীরভাবে সংক্রমিত হতে হতে বহু মানুষকে তার প্রভাবের শিকার হতে হয়। এই সব সমস্যা আর্থিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিবেশ ইত্যাদি সংক্রান্ত হতে পারে। আবার এর বাইরে অন্য কোন ধরণের সমস্যাও সমাজের কোন কোন এলাকায় বসবাসকারী জনগোষ্ঠীকে গ্রাস করতে পারে। সবসময় সরকারী উদ্যোগে সেইসব সমস্যার সমাধান ঘটবে এমন নয়। সংশ্লিষ্ট মানুষকে নিয়ে সমস্যা নিরোধক বা সমস্যা সমাধানের আন্দোলন গড়ে তোলার প্রয়োজন দেখা দিতে পারে। সেই আন্দোলনভিত্তিক কর্মকান্ড সম্পর্কে, তার অর্থ-বৈশিষ্ট-কৌশল ইত্যাদি সম্পর্কে সমাজকর্মী বা সমষ্টি সংগঠককে ধারণার অধিকারী হতে হয়। সেই প্রয়োজন মেটানোই এই এককের উদ্দেশ্য।

৭.২ সমাজ কার্মের বা সমাজ ক্রিয়ার অর্থ

সমাজ ক্রিয়া হলো সমাজ কর্ম দর্শনের কাঠামো নিহিত একটি প্রচেষ্টা যার মাধ্যমে কোন বিশেষ ব্যক্তি বা গোষ্ঠী সামাজিক রীতিনীতি বা আইন কানুনের মধ্যে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন সাধনের মাধ্যমে সমাজের বিশেষ কোন সমস্যার নিরসন ঘটিয়ে সমাজের অগ্রগতিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করে।

এলিজাবেথ উইকনেডন-এর বক্তব্য অনুসারে "সমাজকর্মে সমাজক্রিয়া সাধারণভাবে ব্যবহৃত একটি নির্দিষ্ট কার্য যার মাধ্যমে অপ্রয়োজনীয় নীতি এবং সামাজিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে পরিবর্তনের দ্বারা এক রূপান্তরিত এবং পরিবর্তিত পরিবেশের গঠন হয়। ("Social Action is a term commonly applied to that aspect of organised social welfare activities directed towards shaping, modifying, maintaining the social institution and policies that collectively constitute the social environment")। মেরী রিচমন্ড-এর মতানুসারে "সমাজক্রিয়া একটি সংঘবদ্ধ প্রচারকার্য এবং সামাজিক আইন প্রণয়নের মাধ্যমে উন্নয়ন কার্য।" ("Social Action is mass betterment through propaganda and social legislation")

কে. কে. জেকব-এর মত অনুসারে "সমাজ ক্রিয়া আর্থ সামাজিক পরিস্থিতির উন্নতি এবং সুষ্ঠু সামাজিক পরিবেশ সৃষ্টির জন্য এক প্রয়োজনীয় প্রচেষ্টা যা সম্ভব হবে নূতন পরিবর্তন এবং সংস্কারের সূত্রপাতের মাধ্যমে।" ("Social Action is essentially an effort at initiating suitable changes and reforms to improve socio-economic condition and to better social climate")

এম. সি. নানাবতী সমাজ ক্রিয়াকে বর্ণনা করেছেন "আকাঙ্খিত পরিবর্তনের নিমিত্ত ইচ্ছুক দল এবং ব্যক্তির

এক ক্রিয়াকলাপ" হিসাবে। ("A process of bringing a part by designed changes by deliberate group and community effort.")

উপরোক্ত সংজ্ঞাগুলি আলোচনা বা বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায় যে, সমাজক্রিয়া একটি সচেতন, সংগঠিত, রীতিবদ্ধ সহায়ক প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে সমস্যার সমাধান এবং পরিস্থিতির উন্নয়নমূলক পরিবর্তন সম্ভব যা দুর্বল ও দরিদ্র শ্রেণির বা কোন বিশেষ সমস্যা কবলিত মানুষের প্রয়োজনের অনুকূল হয়ে সমাজ সংস্কারে রত হবে নতুন সমাজধারাকে অহিংস পথে প্রতিষ্ঠা করার জন্য।

৭.৩ সমাজ কর্মের বা সমাজক্রিয়ার বৈশিষ্ট

সমাজ ক্রিয়ার নানা বৈশিষ্টের মধ্যে যেগুলি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সেগুলি হলো ঃ

(ক) সমাজক্রিয়া এক বা একাধিক ব্যক্তির প্রচেষ্টায় সংঘটিত হতে পারে কিন্তু ক্রমান্বয়ে দলীয় ক্রিয়া ব্যতিরেকে এর পরিপূর্ণতা সম্ভব নয়।

(খ) সমাজক্রিয়া গণতান্ত্রিক পদ্ধতি অনুসরণ করে এবং নাগরিক অধিকারের উপর গুরুত্ব দেয়।

(গ) সমাজক্রিয়া সঞ্চালকরূপে মানুষের চিন্তাভাবনায় গতি সঞ্চার করে সমাজ উন্নয়নে সচেষ্ট হয়।

(ঘ) বিভিন্ন সমষ্টির সমস্যা অপসারণের ক্ষেত্রে সমস্যার মূলে আঘাত হানে এবং মূল কারণগুলি দূরীকরণে প্রবৃত্ত হয়।

(ঙ) গোষ্ঠীর মধ্যে সমাজক্রিয়া পদ্ধতি অনুসরণ কালে সংঘবদ্ধ প্রচার কার্যের মধ্য দিয়ে শিক্ষাপ্রদ কার্যবিধি অবলম্বন করা হয়। অহিংস পথের মাধ্যমে ধীরে ধীরে মানুষকে তার সমস্যার বিষয়ে অবহিত করে পরিবর্তন আনয়ন করার উদ্যোগ নেওয়া হয়। বিরোধিতার ভিতর দিয়ে নয়, সুইচ্ছা সৃষ্টি করে মানুষকে তার উন্নয়নের জন্য মানসিকভাবে তৈরী করা হয়।

(চ) সমাজক্রিয়ার প্রাক্কালে গোষ্ঠী বা সমষ্টির সংশ্লিষ্ট সমস্যার বিষয়ে গবেষণার প্রয়োজন রয়েছে। কারণ গবেষণার মাধ্যমেই সমস্যার মূলের সন্ধান পাওয়া সম্ভব।

(ছ) সমাজক্রিয়ায় সংখ্যাগুরু মানুষের সমর্থনের বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। অন্যথায় এর উদ্দেশ্য বিফলে যাবে। কারণ সমস্যার পিছনে যে সব মূল কারণ রয়েছে তা অপসারণের জন্য বিশাল সংখ্যক সমর্থকের সচেতনতার প্রয়োজন। অর্থাৎ সমস্যা এবং তার সৃষ্টির পিছনে মূল কারণগুলির প্রতি সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধির ব্যাপারে বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হয়।

৭.৪ সমাজক্রিয়ার কৌশল

সমাজক্রিয়া সাফল্যের সঙ্গে পরিচালনা করতে গেলে কতগুলি কৌশল অবলম্বন করতে হয়। সেগুলি হলোঃ

(ক) বিশ্বাসযোগ্যতা নির্মাণ (Building credibility) : সমাজক্রিয়ায় অংশগ্রহণকারীগণ সমস্যা নিরসনে এক সুষ্ঠু ব্যবস্থা এবং উপযুক্ত পথের জন্য অগ্রসর হয়ে অন্যান্য সকলের নিকট বিষয়টি বোধগম্য করে তুলবে যার ফলে পরিবর্তনের বিপক্ষে থাকা মানুষজনও ধীরে ধীরে এর উপযোগিতা উপলব্ধি করে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে। সমাজক্রিয়ায় নেতৃত্বদানকারী ব্যক্তিকে সাধারণের কাছে বিশ্বাসযোগ্য করে তুলতে হবে যাতে সমর্থনকারীর সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পায়। সংশ্লিষ্ট সকলের চিন্তনে প্রসার ঘটাতেও উদ্যোগী হবেন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি বা ব্যক্তিরা।

(খ) বৈধকরণ (Legitimization) : সমাজক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত মানুষেরা এবং সাধারণ নাগরিক সকলেরই বোঝা দরকার যে, এই আন্দোলনের একটি নৈতিক উদ্দেশ্য রয়েছে। সেই উদ্দেশ্য পূরণের জন্য পরিকল্পনার প্রারম্ভে সক্রিয়

বৈধকরণ করা দরকার। এটি এমন এক চলমান প্রক্রিয়া যার মাধমে যারা সমস্যার দ্বারা আক্রান্ত হতে পারে, সমাজক্রিয়া আন্দোলনে তাদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পাবে। শ্রমিক সংগ্রাম, ধর্মঘট ইত্যাদির মাধ্যমে সমস্যা বা প্রয়োজনটির চেহারা বা গুরুত্ব বোঝানো যায় বা জনসমর্থন আদায়ে সুবিধা হয়।

(গ) শিক্ষাপ্রদ কৌশল (Educational strategy) : সভা, আলোচনা সভা, মুদ্রণমাধ্যম বা অন্যান্য প্রচার মাধ্যমের সাহায্যে ব্যাপক সংখ্যক মানুষকে, বিশেষতঃ সংশ্লিষ্ট জনসমষ্টিকে নির্দিষ্ট সমস্যার ব্যাপারে সচেতন করে, তাদের মননে বিশেষ ছাপ ফেলে সমস্যা সমাধানে দায়িত্বশীল করে তোলা দরকার।

(ঘ) আন্দোলনকে দৃশ্যমান করে তোলা (Dramatization) : আন্দোলন বা সংগ্রামকে মানুষের কাছে দৃশ্যমান করে তুলতে হবে। জনসাধারণকে জাগানোর জন্য তাদের আবেগে ধাক্কা দিতে হবে। স্পর্শকাতর খবর প্রচারের ব্যবস্থা, স্লোগান, সংগীত, শক্তিশালী বক্তব্যপেশ, পথনাটিকা, সত্যাগ্রহীগণের বিভিন্ন এলাকায় পরিভ্রমণ ইত্যাদির মাধ্যমে মানুষের মধ্যে জাগরন ঘটানোর চেষ্টায় এবং তাদের উৎসাহবর্দ্ধনে ব্রতী হতে হয়।

(ঙ) অহিংস আন্দোলন (Nonviolent movement) : বিভিন্ন ধরণের অহিংসা পদক্ষেপের মাধ্যমে আন্দোলনকে জোরদার করা সম্ভব এবং তার মাধ্যমে সাধারণ মানুষের চিন্তাধারায় প্রয়োজনীয় পরিবর্তন আনাও সম্ভব হয়।

(চ) বিভিন্ন প্রকারের কার্যকরণ (Various Activities) : জনসাধারণকে উদ্দীপ্ত করার জন্য বিভিন্ন রকম সামাজিক অনুষ্ঠান আয়োজনের প্রয়োজন। মনুষ্য সম্পদকে শক্তিশালী করতে হলে অস্পৃশ্যতা, শিশুবিবাহরোধ, মহিলাদের সশক্তকরণ, মদ্যপান বিরোধিতা ইত্যাদি নানা বিষয়ে মানুষের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির প্রয়োজন রয়েছে। কারণ এই সচেতনতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে মানুষের আগ্রহ এবং কর্মশক্তি বৃদ্ধি পাবে। সমস্যা দূরীকরণে এর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত অন্যান্য সমস্যাগুলিও দূর করতে হবে।

সমষ্টি উন্নয়নের জন্য সমাজকর্মী বিশেষ জনসমস্যাগুলিকে জনমানসে তুলে ধরেন বিশেষ দক্ষতা এবং কৌশলের মাধ্যমে। হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করেন গবেষণা, শিক্ষাপ্রদ অনুষ্ঠান, সংগঠন সৃষ্টি, সহযোগিতা, মধ্যস্থতা, আলোচনা, মৃদু বলপ্রয়োগ, সম্মিলিত কর্মদ্যোগ ইত্যাদিকে। এভাবে জনসাধারণের মনে প্রভাব বিস্তার করে ধীরে ধীরে তাদের মধ্যে প্রয়োজনীয় মানসিকতা বা দৃষ্টিভঙ্গী তৈরী করে আন্দোলনে তাদের সামিল করে তোলা এবং সাফল্যের সঙ্গে আন্দোলনকে পরিচালনা করে সমষ্টিকে গঠনমূলক পরিবর্তনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সমাজক্রিয়ার মত সক্রিয় ব্যবস্থার প্রয়োজন রয়েছে। তবে মনে রাখতে হবে যে, সমাজ কর্ম সংগঠিত হবে আইনসম্মতভাবে।

৭.৫ প্রশ্নাবলী

১। সমাজ ক্রিয়ার অর্থ ব্যাখ্যা কর।

২। সমাজ ক্রিয়ার মূল বৈশিষ্টগুলি সম্পর্কে বিশ্লেষণী ব্যাখ্যা কর।

৩। সমাজ ক্রিয়া সাফল্যের সঙ্গে পরিচালনা করতে গেলে কি কি কৌশল অবলম্বন করা দরকার?

৭.৬ গ্রন্থপঞ্জী

Community Organization — Dr. (Mrs.) Banmala

একক ৮ □ সমাজ কর্মের অন্যান্য পদ্ধতির সঙ্গে সমষ্টি সংগঠন পদ্ধতির সম্পর্ক

গঠন

৮.১ উদ্দেশ্য
৮.২ সমাজ কর্মের মূল তিনটি পদ্ধতির গুরুত্ব
৮.৩ পদ্ধতিগুলির মধ্যে সাদৃশ্য
৮.৪ সারাংশ
৮.৫ প্রশ্নাবলী

৮.১ উদ্দেশ্য

সমাজ কর্মের বিভিন্ন পদ্ধতি রয়েছে। প্রতিটি পদ্ধতিই গুরুত্বপূর্ণ। সমস্ত পদ্ধতির সুনিয়ন্ত্রিত ব্যবহারের বা প্রয়োগের মাধ্যমেই সমাজ কর্ম উদ্দেশ্য পূরণে সফল হয়। এইসব পদ্ধতির মধ্যে সাদৃশ্য এবং বৈসাদৃশ্য দুইই রয়েছে। একজন সমাজকর্মীকে যেমন এই পদ্ধতিগুলি সম্পর্কে জানতে হবে তেমনি পদ্ধতিগুলির গুরুত্ব, তাদের মধ্যে পার্থক্য এবং মিল এসব বিষয়েও উপযুক্ত ধারণার অধিকারী হতে হয়। অন্যথায় তার ভূমিকা সঠিকভাবে পালন করা সম্ভব হয় না। সমাজকর্মীর মধ্যে ঐ প্রয়োজনীয় ধারণা সৃষ্টির উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই বর্তমান এককটি রচিত হলো।

৮.২ সমাজ কর্মের মূল তিনটি পদ্ধতির গুরুত্ব

সমাজকর্ম পেশার মৌলিক উদ্দেশ্যগুলি সম্পাদন করার জন্য সমষ্টি সংগঠন এক বিশেষ পদ্ধতি হিসাবে স্থান পেয়েছে। এই পদ্ধতি স্বউদ্দেশ্যে কাজ করার সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তির উন্নয়নের জন্য সমাজকর্মের অন্য দুটি বিশেষ প্রয়োজনীয় এবং কার্যকরী পদ্ধতির যথা ব্যক্তিভিত্তিক সমাজকর্ম এবং দল বা গোষ্ঠীভিত্তিক সমাজকর্মের অন্তর্ভূক্তি ঘটিয়ে সমষ্টি উন্নয়নকে সম্পূর্ণ করে থাকে।

ব্যক্তিভিত্তিক, গোষ্ঠিভিত্তিক এবং সমষ্টি ভিত্তিক এই তিনটি পদ্ধতির প্রসঙ্গগুলি সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন হলেও এদের মৌলিক উদ্দেশ্যগুলি অভিন্ন। সকল স্তরে মনুষ্য সম্পদের বিকাশ এবং উন্নয়নের মাধ্যমে সমাজের ভিত্তিকে সুদৃঢ় করে মনুষ্য সমাজকে তার কল্যাণের কাজে সম্পদ হিসাবে সমৃদ্ধ হওয়ার জন্য এই তিনটি পদ্ধতিই সাহায্য করে।

সমষ্টি উন্নয়ন এক জটিল প্রক্রিয়া। এখানে সামগ্রিকভাবে সমষ্টির, সমষ্টির মধ্যে গোষ্ঠীর এবং গোষ্ঠীর মধ্যে বিভিন্ন সদস্যের সমস্যা ও স্বার্থরক্ষা ও উন্নয়নের বিষয়টি একসঙ্গে গ্রথিত রয়েছে। সেজন্য ব্যক্তিভিত্তিক গোষ্ঠীভিত্তিক এবং সমষ্টিভিত্তিক সমস্যাগুলির ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতিতে মোকাবিলা না করা হলে সার্বিকভাবে সমষ্টির উন্নতি সাধন সম্ভব হয় না। ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর সমস্যাকে উপেক্ষা করে কখনোই সমষ্টিকে উন্নতির পথে অর্থবহভাবে সামিল করা যায় না। ব্যক্তি, গোষ্ঠী, সমষ্টি এতটাই পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত যে, সমষ্টির উন্নতির জন্য যে কোন উদ্যোগ নেওয়াই হোক না কেন তা কখনো ব্যক্তি এবং সমষ্টির মধ্যে থাকা গোষ্ঠীগুলির উন্নতির ব্যাপারে একইভাবে বা একইসময়ে উদ্যোগী না হলে চলেনা।

সমষ্টির বেশ কিছু সদস্য বা ব্যক্তি সমষ্টির মধ্যে ভারসাম্য রেখে চলতে পারে না। কোন না কোন সমস্যায় তারা বিব্রত থাকে। দৃষ্টিভঙ্গীও খুবই অবৈজ্ঞানিক হতে পারে। সমষ্টি বা সমষ্টির অন্তর্গত বিভিন্ন গোষ্ঠীতে কিছু কিছু ব্যক্তি নিজেদের মানানসই করে তুলতে পারে না। এতে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি যেমন পিছিয়ে পড়ে তেমনি সমষ্টি বা সমষ্টির

অন্তর্গত গোষ্ঠীর গায়েও ক্ষতিকর আঁচড় কাটে। এই সমস্ত ব্যক্তির মানসিকতায় প্রয়োজনীয় পরিবর্তন সাধনের ভিতর দিয়ে সমষ্টির মধ্যে মানানসই করে তুলতে প্রয়োজন হয় ব্যক্তি কর্ম বা Case Work-এর। ওই একই নিয়মে গোষ্ঠী এবং সমষ্টিকে সমস্যা অতিক্রমের উপযুক্ত করে তুলে উন্নতির পথে এগিয়ে দিতে গোষ্ঠী কর্ম (Group Work) এবং সমষ্টি সংগঠন (Community Organisation) পদ্ধতি অবলম্বনের প্রয়োজন। এই প্রেক্ষিতেই উপরোক্ত তিনটি পদ্ধতিই গুরুত্বপূর্ণ।

ব্যক্তিভিত্তিক সমাজকর্ম ব্যক্তিকে সকল অবস্থার উপযোগী করে তুলতে সাহায্য করে যাতে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি সামাজিক এবং মানসিকভাবে তার পরিস্থিতির সঙ্গে যথাযথভাবে নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারে এবং তার সমস্যাগুলির সঙ্গে উপযুক্তভাবে মোকাবিলা করে এক সামাজিক কার্যকারিতায় উন্নীত হতে পারে। তেমনি গোষ্ঠীভিত্তিক কাজের (Group work) মাধ্যমে এমন পরিবেশ সৃষ্টি করা সম্ভব যার মাধ্যমে ব্যক্তিকে দলভুক্ত করে ব্যক্তিত্ব বিকাশে সাহায্য করে এবং কিছু সহযোগিতামূলক সুযোগ-সুবিধাযুক্ত ব্যবস্থার মাধ্যমে ব্যক্তিকে একাকীত্ব থেকে সুরক্ষা দেয়। অপরদিকে সমষ্টি-সংগঠন (Community Organisation) বা সমষ্টি উন্নয়ন কর্ম সামগ্রিকভাবে উন্নয়নের জন্য সমষ্টিকে উপযুক্তভাবে তৈরী করার উদ্যোগ নেয়। এর ফলে সমাজ কল্যাণের বিষয়টি বা তার প্রয়োজনটি গোষ্ঠীভুক্ত বা সমষ্টিভুক্ত সকলের যৌথ বা সম্মিলিত দায়িত্ব বলে পরিগণিত করার অবিরত চেষ্টা চলে। সহমর্মিতা, সহযোগিতা এবং 'সকলের তরে সকলে আমরা' ভাবনার পরিস্ফুটন ঘটে। এই উদ্যোগের ফলে মানুষের মধ্যে অতি প্রয়োজনীয় উপাদান 'দায়িত্ববোধ' বৃদ্ধি পায়।

আলোচিত পদ্ধতি তিনটি একে অপরের থেকে বিচ্ছিন্ন না হয়ে পরস্পরের পরিপূরক হয়ে উঠে। প্রতিটি পদ্ধতি স্বব্যবস্থাগুলির মাধ্যমে একে অপরের পরিপূরক হয়ে উঠে। দেখা যায়, প্রতিটি পদ্ধতিই এক অচলাবস্থা থেকে ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা সমষ্টিকে সচল অবস্থার দিকে নিয়ে গিয়ে সততঃ পরিবর্তনের কাজ করে চলে।

৮.৩ পদ্ধতিগুলির মধ্যে সাদৃশ্য

উপরোক্ত তিনটি পদ্ধতির মধ্যে সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য দুইই রয়েছে। তবে বৈসাদৃশ্যের চাইতে সাদৃশ্যের পরিমাণ অনেক বেশী। যেসব ক্ষেত্রে সাদৃশ্য রয়েছে সেগুলি আলোচনা করলে আমাদের এই সিদ্ধান্তে আসতে সুবিধা হবে যে এদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক রয়েছে। সাদৃশ্যের সেই ক্ষেত্রগুলি সম্পর্কে আমরা এখানে আলোচনা করতে পারি।

(ক) তিনটি পদ্ধতিই অনুসরণকালে সমাজবিজ্ঞানের সাহায্য নেয়। সুতরাং তাদের আবশ্যিকতা যে বিভিন্ন হবে না সে বিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। এক চলমান এবং যুক্তিযুক্ত অবস্থার সৃষ্টি আলোচ্য তিন পদ্ধতিরই মূল লক্ষ্য এবং প্রয়োজন বলে এদের মধ্যে যে সাদৃশ্য থাকা নিতান্ত স্বাভাবিক তা মেনে নিতে হয়।

(খ) উপরোক্ত তিনটি পদ্ধতিই উন্নয়নের পথে সামাজিক বাধা অপসারণের চেষ্টা, সম্ভাবনাযুক্ত ক্ষমতার উন্মোচন, অন্তর্নিহিত ক্ষমতার ব্যবহার, ব্যক্তিজীবনকে চালনা করার ক্ষমতা, সমঝোতামূলক সম্পৃক্তি ইত্যাদি চেষ্টায় রত। এই চেষ্টার আয়োজনের ক্ষেত্রে ব্যক্তিকর্মে, গোষ্ঠীকর্মে এবং সমষ্টি সংগঠন কর্মে কিছু বিভিন্নতা থাকলে তাদের চেষ্টার লক্ষ্য এক।

(গ) সব কয়টি পদ্ধতির প্রক্রিয়াই একই অনুমিত সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। সেগুলির মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হলো ব্যক্তির সহজাত মর্যাদা এবং মূল্য, ব্যক্তি সমস্যা সমাধানে বা ব্যবস্থার মধ্যে নিহিত ক্ষমতা, উন্নতিবর্দ্ধনে সহজাত ক্ষমতা, ব্যক্তির সমস্যা সমাধানে ব্যক্তির সুকৌশল সক্ষমতা ইত্যাদি। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, কোন ব্যক্তি যখন সর্বতোভাবে সমস্যার জটিলতা দ্বারা আক্রান্ত তখন সমাজকর্মীর সাহায্যে সে তার স্বক্ষমতা ব্যবহারের ভিতর দিয়ে

সচল ও স্বাভাবিক পরিস্থিতির মধ্যে ফিরে আসতে সক্ষম হবে। কারণ সমাজকর্ম ব্যক্তির অন্তর্নিহিত মর্যাদা এবং শক্তির উপর বিশ্বাস করে বলে এ ধরণের পরিবর্তন আনা সম্ভব। তেমনি কোন সমষ্টি কখনো কোন সমস্যার প্রভাবে শক্তিহীন বা বিশৃঙ্খল হয়ে পড়লে সমাজকর্ম তার অনুমিত বিশ্বাসের ভিত্তিতে সমষ্টির মধ্যে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন সাধন করে পুণরায় সেই সমষ্টিকে সঞ্জীবিত করতে পারে। সেক্ষেত্রে আবার সংশ্লিষ্ট সমষ্টি তার সদস্যদের পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে সুসংগঠিত এবং সক্ষম হয়ে উঠে।

(ঘ) তিনটি পদ্ধতিই বিশ্বাস করে এবং স্বীকার করে যে, প্রতিটি ব্যক্তি এবং সমষ্টি এবং প্রয়োজনভিত্তিক গোষ্ঠীগুলি ব্যক্তিস্বাতন্ত্রবাদে অদ্বিতীয়। কারণ ভৌগোলিক, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক ক্ষমতার পরিপ্রেক্ষিতে ব্যক্তি, গোষ্ঠী এবং সমষ্টিগুলি ভিন্নতার দাবী রাখে। এই বিভিন্নতার দিকে দৃষ্টি দিয়ে প্রক্রিয়াকরণে প্রবৃত্ত হয়। এই তিনটি পদ্ধতিই উন্নয়নের জন্য, সমস্যা সমাধানের জন্য সামাজিক সম্পর্কগুলির সচেতন সুষ্ঠু ব্যবহার। পার্থিব উপকরণের ব্যবহার সমাজে অবস্থিত প্রতিষ্ঠানগুলির ব্যবহার ও তার প্রয়োজনে বিশ্বাস রাখে।

(ঙ) উপরোক্ত পদ্ধতিগুলি কোন কোন ক্ষেত্রে অনুরূপ রীতি এবং নির্দিষ্ট কয়েকটি দিক গ্রহণ করে, যেমন, সমষ্টি গোষ্ঠী এবং ব্যক্তিকে তাদের স্ব-ক্ষেত্রে স্ব-ভাবে গ্রহণ করা। মক্কেলের বর্তমান পরিস্থিতি থেকে কাজ শুরু করা, মক্কেলকে তার নিজের জায়গায় থেকে গ্রহণ করা, তাকে তার নিজস্ব সিদ্ধান্ত গ্রহণে সঠিকভাবে সাহায্য করা, সাহায্যের দিকগুলি বিশ্লেষণ করা, সমস্যাসঙ্কুল পরিস্থিতিতে মানসিক সমর্থন প্রদান ইত্যাদি ক্ষেত্রেও উপরোক্ত তিন পদ্ধতির মধ্যে সাদৃশ্য বর্তমান।

(চ) জ্ঞান এবং দক্ষতার প্রেক্ষিতে সবকয়টি পদ্ধতিই সাদৃশ্য সহকারে সাহায্য করে। সমাজকর্মী তার যে কোন কর্মক্ষেত্রে একই ধরণের দক্ষতা নিয়ে তার কাজ সমাধা করে। যেমন, পক্ষপাতহীন, বিশ্বাসযোগ্যতা, সহযোগিতা, রীতি অনুযায়ীতা ইত্যাদি ক্ষমতাগুলি উপরোক্ত তিনটি পদ্ধতির কর্মক্ষেত্রেই অভ্যাস এবং অনুশীলনের দ্বারা রপ্ত করে।

(ছ) ব্যক্তি বিশেষ, গোষ্ঠীর কার্যকলাপ অথবা সমষ্টিভিত্তিক সমাজকর্ম যাই হোক্ না কেন, প্রতিক্ষেত্রেই সমাজকর্মী সমস্যাগ্রস্থ ব্যবস্থার মূল কারণগুলি চিহ্নিতকরণ থেকে শুরু করে পরিকল্পনাগ্রহণ, মক্কেলের অংশগ্রহন বর্দ্ধিতকরণ, সমস্যার প্রতি সকলস্তরের মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ, জনমত গঠন ও বৃদ্ধিকরণ, সমাধানকল্পে পরিকল্পনা গ্রহণ এবং রূপায়ন, উন্নতিকল্পে অবস্থিত সম্পদের সদ্ব্যবহার বিষয়গুলি প্রক্রিয়াভুক্ত করেন। এই প্রক্রিয়াই মনুষ্যসম্পদের গুণাগুণগুলি বর্দ্ধিত করে এবং সেজন্য সফল প্রক্রিয়া হিসাবে গণ্য হয়।

এভাবে আমরা বিশ্লেষণের ভিতর দিয়ে অনুভব করতে পারি যে, ব্যক্তি কর্ম, গোষ্ঠী কর্ম এবং সমষ্টি সংগঠন কর্ম এই তিন পদ্ধতির মধ্যে সাদৃশ্যের ক্ষেত্র রয়েছে অনেক। কিন্তু এসব সাদৃশ্য সত্ত্বেও এমন কিছু কিছু ক্ষেত্র রয়েছে যেখানে বৈসাদৃশ্যও বিরাজ করে। দর্শন এবং কর্মপদ্ধতির ক্ষেত্রে তারা অনেকাংশে অভিন্ন হলেও এদের মধ্যে যে সব তাৎপর্যপূর্ণ বিভিন্নতা রয়েছে তাও বিশ্লেষণ করা যেতে পারে। মূল সেই বিভিন্নতাগুলি হলো ঃ

(ক) বিভিন্নতা বা পার্থক্যের অন্যতম ক্ষেত্র হলো এদের কাজের বৈশিষ্টতায়। ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা সমষ্টির কাজের ক্ষেত্রে স্পষ্টতই পৃথক বৈশিষ্ট রয়েছে। কোন কোন বিশেষজ্ঞের মতে, ব্যক্তি সমস্যার ক্ষেত্রে সমাজকর্মী সমস্যার গভীরতা ও উৎস সন্ধানে এবং নির্ণয়ের জন্য বিশেষভাবে সচেষ্ট হন যার ভিত্তিতে সমস্যা-মুক্তির ব্যবস্থা নেওয়া হয়। অপরদিকে সমষ্টি সংগঠন কর্মী বা গোষ্ঠী কর্মী তুলনামূলকভাবে সমস্যার উপরিস্তরের সমাধানে প্রবৃত্ত হন।

(খ) পদ্ধতি ব্যবহার এবং কর্মপদ্ধতির প্রক্রিয়াগত বিভিন্নতাও বিভিন্নভাবে প্রতিফলিত হয়। একজন সমাজকর্মী ব্যক্তিসমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে ব্যক্তির সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত হয়ে তার সমস্যা সমাধানে সাহায্য করেন। গোষ্ঠীকর্মী সংশ্লিষ্ট মানুষের ব্যক্তিত্ব বিকাশে গোষ্ঠীর সাহায্য নিতে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের সাহায্য নিয়ে থাকেন। অন্যদিকে সমষ্টিকর্মী

সমষ্টির সমস্যা সমাধানে সমষ্টির অংশগ্রহণের উপর বেশী গুরুত্ব আরোপ করেন। সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে সমষ্টির সদস্যদের মধ্যে যোগাযোগ বিস্তার এবং সম্পর্কের বিস্তার ঘটে। গুণগত এবং পরিমাণগতভাবে উন্নয়নভাবনায় সমষ্টি সদস্যদের ভাবিত করে, গঠনমূলক পরিবর্তনের মাধ্যমে উত্তরোত্তর পরিবর্ধিত আকারে উন্নয়নের বীজ পুঁতে সামগ্রিক কল্যাণমূলক ভাবনার বিস্তারে সমষ্টি কর্ম অগ্রসর হয়। তাই এক্ষেত্রেও তিনটি পদ্ধতির মধ্যে পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়।

(গ) ব্যক্তিকর্মী বিশেষ ব্যক্তির মনোগতির উপর গুরুত্ব দিয়ে তার ব্যক্তিত্ব নির্ধারণ করার চেষ্টা করেন এবং তার ব্যক্তিগত আচরণবিধিকে মনোগতির সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে সমস্যা নির্ণয়ের ব্যবস্থা করেন। অন্যদিকে সমষ্টিকর্মীসমষ্টির কৃষ্টি, সামাজিক অবস্থা, অর্থনৈতিক পরিস্থিতি, রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী, সমষ্টির অন্তর্গত বিভিন্ন গোষ্ঠীর আন্তঃ সম্পর্কের উপর মনোনিবেশ করে সমস্যার মূল খুঁজে বার করেন এবং প্রধানতঃ সমষ্টির মধ্যে লভ্য মনুষ্যসম্পদ, প্রাকৃতিক সম্পদ, আর্থিক সম্পদের উপর নির্ভর করে বা তাকে উন্নত করে পুনর্বার উন্নয়নের কাজে ব্যবহার করতে সমষ্টি সদস্যদের উৎসাহিত করেন। আলোচনা, সভা-সমাবেশ ইত্যাদির মাধ্যমে সমষ্টি সদস্যদের মতামত প্রকাশে উৎসাহিত করে তাদের ক্ষমতায়নের প্রচেষ্টাকে সমর্থ করে তোলেন। জাতীয় উন্নয়নে অংশীদার করে তোলার জন্য সমষ্টিভুক্ত মানুষকে এভাবে শিক্ষিত করে তোলেন।

(ঘ) ব্যক্তির ব্যক্তিত্বে তার অজ্ঞান মনের প্রভাব পড়লে যে সব সমস্যার সৃষ্টি হয় ব্যক্তি এবং তার পরিবার জীবনে তার মোকাবিলা করার জন্য সমাজকর্মী তাকে মনোবিজ্ঞানী বা মন-চিকিৎসকের কাছে প্রেরণ করতে পারেন। অন্যদিকে গোষ্ঠীকর্মী তার ব্যক্তিগত সাহচর্যের মাধ্যমে গোষ্ঠীকে চালনা করে গোষ্ঠীভুক্ত ব্যক্তিকে তার বিকাশে সহায়তা করেন অথবা প্রয়োজনে অন্য কোন গোষ্ঠীতে যুক্ত করে আচরণে পরিবর্তন ঘটান। আবার সমষ্টিকর্মী প্রক্রিয়া কর্মকালে যদি কোন বিরুদ্ধভাব বা পরস্পরবিরোধী মতবাদলক্ষ্য করেন তাহলে সমষ্টিভুক্ত ব্যক্তিদের মাধ্যমে এই ধরণের অবস্থাকে, যা সংঘাতের জন্ম দিতে পারে, প্রতিহত করতে পারেন।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে বোঝা যায় যে, সমাজকর্মের প্রতিটি পদ্ধতি সাধারণভাবে একই পদক্ষেপের মাধ্যমে মৌলিক নীতি অনুসরণের মাধ্যমে সমস্যার মোকাবিলা করে মনুষ্য সমাজকে স্বাস্থ্যকর পরিবেশের সন্ধান দেয়। কিন্তু সুনির্দিষ্ট এবং স্বতন্ত্র পরিস্থিতিতে ব্যক্তি, গোষ্ঠী এবং সমষ্টি নির্দিষ্ট এবং স্বতন্ত্র ব্যবস্থায় সমস্যা সমাধানে অংশগ্রহণ করে।

৮.৪ সারাংশ

পরিশেষে উল্লেখ্য যে, ব্যক্তিকর্মী, গোষ্ঠীকর্মী এবং সমষ্টিকর্মীর মধ্যে কর্মগত প্রক্রিয়ায় যেমন বিশেষ কিছু মিল আছে তেমনই কিছু স্বতন্ত্র ব্যবস্থা বা অমিল রয়েছে এবং এরা পরস্পর সংযুক্ত হয়ে সমস্যার সমাধানে সাহায্য করে চলে। ব্যক্তি সমস্যা সমাধানের উপাদান অনেক ক্ষেত্রে গোষ্ঠীর মধ্য থেকে আহরণ করা হয়। আবার গোষ্ঠীর উন্নয়নের প্রয়োজনে ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব বিকাশ একটি বিশেষ উপাদান। ব্যক্তিসত্ত্বার ক্ষমতায়নের উপর সমষ্টির বিকাশ অনেকাংশে নির্ভরশীল। সমস্যা সমাধানের জন্য সমাজকর্মে কোন সাময়িক ব্যবস্থার কথা বলা বয় না। পুনঃপ্রতিষ্ঠার দ্বারা এক দীর্ঘস্থায়ী উন্নয়নমূলক পরিস্থিতির মধ্যে ফেলে মানুষকে তার নির্ভরশীলতা থেকে মুক্ত করে স্ব-ক্ষমতায় বলীয়ান করারই এর প্রধান উদ্দেশ্য।

বর্তমান সমাজকর্মের বিশ্বাস যে পরিবার এবং সমষ্টির মধ্যে পুনঃ প্রতিষ্টিত হলে মানুষ মূলস্রোতে মিশে যাবে, বিচ্ছিন্নতা থেকে মুক্তি পাবে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, একজন মানসিক বা শারীরিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তি বিচ্ছিন্নতার মধ্য থেকে বিশেষ সমস্যা আক্রান্ত হয়ে সেই সমস্যার সমাধানে সমর্থ হবে না। পরিবার ও সমাজকে অগ্রণী হতে হবে তাকে সহায়তা দিয়ে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে। সমস্যাযুক্ত পরিস্থিতির পরিবর্তন যদি সমাজকর্মের উদ্দেশ্য হয়

সেক্ষেত্রে পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতিকে পরিবর্তক হিসাবে কাজে লাগাতে হবে। এরজন্য প্রয়োজন সবকয়টি পদ্ধতির মধ্যে কার্যকরী সম্পর্ক এবং একত্রিত প্রক্রিয়া।

৮.৫ প্রশ্নাবলী

১। সমাজকর্মের পদ্ধতিগুলির গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর।

২। সমাজকর্মের বিভিন্ন পদ্ধতির মধ্যে সাদৃশ্যগুলি বিশ্লেষন কর।

৩। সমাজকর্মের মূল তিনটি পদ্ধতির মধ্যে যে সব বৈসাদৃশ্য রয়েছে সেগুলির ব্যাখ্যাসহ উল্লেখ কর।

একক ৯ □ সমাজ সংগঠন কর্মীর ভূমিকা

গঠন

৯.১ উদ্দেশ্য

৯.২ সমষ্টি সংগঠন কর্মীর ভূমিকা

৯.৩ সমষ্টি সংগঠকের ভূমিকা পালনের উপযোগী উপকরণ

৯.৪ প্রশ্নাবলী

৯.১ উদ্দেশ্য

নানান ব্যক্তি এবং গোষ্ঠীর স্থায়ী সমাবেশে গড়ে উঠে সমষ্টি। প্রতিটি ব্যক্তি এবং গোষ্ঠীর মধ্যে নানা বিপরীতধর্মী ক্রিয়া-প্রক্রিয়া চলে। স্বভাবতঃই সমষ্টি জীবনও বিভিন্ন ঘাত-প্রতিঘাতের ভিতর দিয়ে এগিয়ে চলে। কখনো কখনো কোন কোন সমষ্টি চূড়ান্ত বিশৃঙ্খলতার শিকার হয়। তার সঙ্গে যুক্ত সদস্যদের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা এবং প্রগতি ব্যাহত হয়। সমষ্টির ভিতরের শক্তি যেন অন্তর্হিত হয়। সমষ্টি সদস্যেরা বা সমষ্টির মধ্যকার বিভিন্ন গোষ্ঠীগুলি সমস্যার কারণ বিশ্লেষণ করে সমাধানের পথ খোঁজার পরিবর্তে অন্তঃকলহ বা বিচ্ছিন্নতা বোধের প্রভাবে আচ্ছন্ন হয়। একজন পেশাদার সমষ্টি সংগঠক বা সমাজ কর্মীকে এইসব সমষ্টির মধ্যে কাজ করতে গিয়ে বিভিন্ন ধরণের ভূমিকা পালন করতে হয়। কি নির্দিষ্ট ভূমিকা তাকে বিশেষভাবে পালন করতে হবে সে সম্পর্কে ধারণা সৃষ্টিই আলোচ্য অধ্যায়ের উদ্দেশ্য।

৯.২ সমষ্টি সংগঠন কর্মীর ভূমিকা

সমষ্টি সংগঠন কর্মীকে নানান ভূমিকা পালন করতে হয়। সমষ্টি সংগঠন সংক্রান্ত আলোচনার এই অংশে আমরা সমষ্টি উন্নয়ন কর্মকান্ডে একজন পেশাদার সমাজকর্মীর পালনীয় কর্তব্য কর্মের ব্যাপারে এবং ভূমিকাগুলি সম্পর্কে আলোচনা করব। এই আলোচনা থেকে তার কর্মধারাগুলি বিস্তারিতভাবে বোঝা যাবে। কিভাবে একজন কর্ম সমষ্টির উন্নয়নকল্পে পদ্ধতিগতভাবে মানুষকে সংগঠিত করবেন, কোন পরিস্থিতিতে কিভাবে অগ্রসর হবেন নিম্নলিখিত আলোচনায় তা স্পষ্ট ধারনা করা সম্ভব হবে।

পেশাদার সমাজকর্মী বা সমষ্টি সংগঠক তার ভূমিকা পালনে পেশা অন্তর্নিহিত মূল্যবোধ, মৌলিক নীতি এবং পদ্ধতিগুলির ব্যবহার করবেন। পেশাদার সমষ্টি সংগঠকের মূল চারটি ভূমিকা যথা পথ প্রদর্শক, সমর্থনকারী, বিশেষজ্ঞ এবং সমস্যা ও তার আরোগ্য নির্ণায়ক সম্পর্কে এবার একে একে আলোচনা করা হবে।

০১। পথপ্রদর্শক (Guide) ঃ সমষ্টি সংগঠন কর্মী সমষ্টিকে ফলোৎপাদকভাবে অবস্থা এবং অবস্থান পরিবর্তনে সমষ্টির দ্বারা নির্ধারিত পথে চলতে সাহায্য করেন। এক্ষেত্রে সংগঠন কর্মী সমষ্টিকে তাদেরই নির্দ্ধারিত পথে চলতে পথপ্রদর্শন করেন তার বিজ্ঞানসম্মত পেশাদারিত্ব দিয়ে যাতে সমাজকর্মী সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং অন্যান্য বিষয়ে জ্ঞানপ্রাপ্ত হয়ে সমষ্টিকে গুণগত উৎকর্ষতার দিকে এগিয়ে নিয়ে চলে। কিন্তু এক্ষেত্রেও কর্মীর নিয়ন্ত্রণক্ষমতা নিয়ন্ত্রিত হবে সমষ্টির পছন্দ এবং প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ সাপেক্ষে। অর্থাৎ সমস্যা চিহ্নিতকরণে, সমস্যা সমাধানে সমষ্টির চিন্তাভাবনাকেও কাজে লাগাতে হবে।

সমষ্টি সংগঠন কর্মী প্রধানতঃ সমষ্টির অনুভূতিকে জোরদার করবেন। সমষ্টি তার অনুভূতির দ্বারা সমস্যার বিষয়ে সচেতন হয়ে কার্য নির্দ্ধারণ করবে। কর্মী শুধুমাত্র কৌশলগত দিকগুলি পরিচালনা করবেন, এবং পরিকল্পনা গ্রহণে

কলা কৌশলের দিকগুলির প্রতি উপযুক্ত পথ অবলম্বনে সাহায্য করবেন। সমষ্টি সংগঠনকর্মী কখনোই তার নিজস্ব মতামত এবং অনুভূতি সমষ্টির উপর চাপিয়ে দিতে পারেন না। যতক্ষন পর্যন্ত না সমষ্টি কোন উন্নয়নমূলক কাজের জন্য অনুভূতিপুষ্ট হয়ে কাজে আগ্রহী হবে ততক্ষণ কর্মী কোন পরিকল্পনা গ্রহণ করবেন না। প্রক্রিয়ার সমগ্র অংশে সমষ্টিভূক্ত মানুষ তাদের সমস্যা নিরূপণের সঙ্গে সঙ্গে সেই ক্ষমতার অধিকারী হয় যার দ্বারা সমষ্টির সমস্যা সমাধানেও তারা কার্যকরীভাবে অংশগ্রহণ করতে পারে। অর্থাৎ এই বিশেষ ক্ষমতা এবং আগ্রহ গুণগত মান হিসাবে আত্মপ্রকাশ লাভ করে। এভাবেই একজন সমাজকর্মী পেশাগত সাফল্য লাভ করেন। সমগ্র পরিকল্পনায় তিনি সমষ্টির স্বাধিকারবোধ, চেতনাবোধ, পরম্পরাগত ঐতিহ্যবোধ এবং তাদের ইচ্ছাকে সর্বাগ্রে গুরুত্ব দেবেন। কারন প্রতিটি সমষ্টি তাদের নিজস্বতার উপর চলমান। সমস্যাগুলিকে সমস্যা হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়ার সাথে সাথে সমষ্টির মধ্যে ক্ষমতায়নের একটা সম্ভাবনা দেখা দেবে এবং এই ক্ষমতায়ন শক্তিকে উন্নয়নমুখী কর্মকান্ডে কাজে লাগানোর চেষ্টাতে সমষ্টি সংগঠন কর্মী পথপ্রদর্শক হিসাবে কাজ চালিয়ে যাবেন। এভাবেই সমষ্টির দায়িত্বশীলতা এবং সংবেদনশীলতা ইত্যাদি গুণগুলি ধীরে ধীরে বিকশিত হবে।

আমরা এখানে একটি উদাহরণের সাহায্য নিতে পারি। ধরা যাক কোন একটি সমষ্টি বিশেষ কোন সমস্যায় আক্রান্ত। সমাজকর্মীর পরিবর্তে সংশ্লিষ্ট সমষ্টির দ্বারা তা নিরূপিত হলো। সেক্ষেত্রে পরিকল্পনাগুলি প্রবর্তনকালে অনেক বেশী স্বার্থকতা লাভ করবে। কোন কাজ সমষ্টির দ্বারা স্বীকৃতি না পেলে সেই কাজে অগ্রসর না হয়ে সমষ্টি অনুভূত সমস্যা সমাধানে সহায়তা দিলে সমষ্টির ক্ষমতা স্বতঃস্ফুর্তভাবে বৃদ্ধি পাবে। তাদের মধ্যে সহায়তাবোধ, অন্যের সমস্যার প্রতি অনুভূতিবোধ, সমর্থনের ইচ্ছা এবং একত্রে সহযোগিতাপূর্ণ কাজের ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে এবং ঐসব গুণগুলি বৃদ্ধি পাবে। অভিজ্ঞতা তাদের বুদ্ধির বিকাশে সহায়ক হয়ে সমষ্টির অন্যান্য সমস্যাগুলি বুঝতে সহায়ক হবে। সেইসঙ্গে সমষ্টির সমস্যা সমাধানে একত্রিত বা সম্মিলিত প্রচেষ্টার চিন্তা কাজ করবে।

পথপ্রদর্শকের ভূমিকায় পালনীয় কিছু নিশ্চিত উপাদান ঃ

(ক) প্রাথমিক সূত্রপাত ঃ মানুষের প্রয়োজনবোধকে জাগরিত করানো হলো তার ভূমিকার প্রাথমিক উপাদান। সাহায্য প্রদান করা নয়, সমস্যা সম্পর্কে মানুষের চেনাবোধকে চালিত করা প্রয়োজন। সমষ্টির সদস্যদের হতাশাবোধকে দূর করে তাদের সুষ্ঠুভাবে চালিত করা যার মাধ্যমে সমস্যাগুলি পুনরায় চিহ্নিত করে তার সমাধানের উদ্যোগের মাধ্যমে অবস্থার পরিবর্তনে সাহায্য করবে, সমষ্টির উন্নয়নে বিকল্প পথের সন্ধান দেবে।

দক্ষতার সঙ্গে এ কাজ করতে গেলে সমষ্টি উন্নয়ন কর্মীর প্রয়োজন সমষ্টি বিষয়ক গভীর জ্ঞান এবং সচেতনতা। তারই ভিত্তিতে সমষ্টির নিজস্ব অন্তর্নিহিত ক্ষমতাগুলি এবং তার কৃষ্টি যা উন্নয়নের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে, খুঁজে বার করতে হবে।

অনেক সমষ্টি তাদের সমস্যাগুলি অনেকদিন ধরে দেখতে দেখতে এমন অভ্যস্থ হয়ে যায় যে, সমস্যার সঠিক কারণ, স্বরূপ এবং সেগুলি যে উন্নয়নের পথে বাধা তাও তারা বিচার করতে পারে না এবং সমস্যাগুলিকে বা অনুন্নত অবস্থানকে কোন পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে উন্নয়নের পথে নিয়ে যাওয়ার চিন্তা বা তাগিদবোধ করে না। পথপ্রদর্শক হিসাবে সমাজ কর্মী বা সমষ্টি সংগঠককে এক্ষেত্রে উপযুক্তভাবে পথপ্রদর্শন করতে হবে।

(খ) কর্মকারকীয় এবং বস্তুগত উদ্দেশ্য সাধন ঃ পেশাদার সমাজ কর্মী সমষ্টির অবস্থানের বিষয়ে এবং সমস্যাগুলি সঠিকভাবে জানার বিষয়ে বিশেষ যত্নবান হবেন। অবস্থান কিভাবে উন্নীত করা যায় বা সমস্যাগুলির সমাধান কিভাবে সম্ভব সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে সমষ্টির সদস্যদের অংশগ্রহণের মাত্রা বৃদ্ধি ঘটানোর চেষ্টায় রত হবেন। কিন্তু তার ব্যক্তিগত মতপ্রদানে বিরত থাকার চেষ্টা করে যাবেন। অর্থাৎ সমস্যার কারণ নির্দ্ধারণে তার জ্ঞান এবং ধারণাকে কাজে লাগাবেন কিন্তু কোন সমালোচনা করবেন না। সমষ্টির ভাবনা চিন্তা এবং পরিস্থিতি থেকে তিনি অবস্থানগত

ভাবে অনেক উচ্চস্থানে রয়েছেন এমন ধারণা নিয়ে কাজ করতে গেলে সমষ্টির কাছে তার গ্রহণযোগ্যতা কমে যাবে সেজন্য তিনি সমষ্টিকে তার স্বস্থানে রেখেই গ্রহণ করবেন। সমষ্টির যাবতীয় বিশ্বাস, প্রথা, মূল্যবোধ, কায়েমি স্বার্থবোধ এগুলির কোনটিকেই কোনরকমে তিনি সমস্যার উৎপত্তিস্থল মনে করে সোজাসুজি দায়ী করতে পারবেন না বা দোষারোপ করবেন না। আবার তাকে প্রসংসার্হ বলেও বিবেচনা করবেন না। কাজের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে সমষ্টি-সম্ভূত ভাবনা চিন্তা এবং উন্নতি মূল সমস্যাগুলিকে চিহ্নিত করবে এবং সমষ্টির সদস্যদের মধ্যে যোগাযোগ বিস্তৃতির ফলে মূল সমস্যাগুলিও ধীরে ধীরে অপসৃত হবে।

(গ) সমষ্টির সঙ্গে নিজেকে অভেদীকরণ ঃ

সমষ্টি সংগঠন কর্মী কখনো সমষ্টিভূক্ত বিশেষ কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের দ্বারা প্রভাবিত হবেন না। সমস্ত ব্যক্তি এবং গোষ্ঠী তার কাছে সমমূল্য পাবে। অন্য ভাবে, তিনি বিভিন্ন গোষ্ঠীর বিভিন্নতাকে সকলের প্রয়োজনে কাজে লাগানোর জন্য বিশেষ কর্মপদ্ধতির ব্যবহার করবেন। একের সঙ্গে অপরের যোগাযোগ ব্যবস্থাকে বিস্তারিত করবেন, যথেষ্ট জনসংযোগ বৃদ্ধিকারী ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। গোষ্ঠী আলোচনা, আঞ্চলিক কার্য নির্বাহক সমিতি গঠন, সঞ্চিত ভান্ডার গড়ে তোলা ইত্যাদির মাধ্যমে পারস্পরিক সংযুক্তি বাড়িয়ে গঠনমূলক সমষ্টি ভাবনার বিস্তার লাভে পথ দেখাবেন। এক্ষেত্রে দুর্বল এবং সবল সকলেই তাঁর কাছে সমগুরুত্বপূর্ণ।

(ঘ) নিজের ভূমিকার সঠিক প্রয়োগ ঃ

সংগঠন কর্মী সমষ্টিকে গ্রহণ করবেন তাঁর সমর্থন এবং স্বীকৃতি দিয়ে। কখনোই সমষ্টির কোন কাজ সমষ্টি সদস্যদের হয়ে সম্পাদন করা তাঁর উচিত হবে না। তাঁকে সুস্পষ্টভাবে নিজের ভূমিকাটি বুঝে নিতে হবে। তিনি সমষ্টি সদস্যদের উদ্যোগকে সমর্থন দেবেন, তাদের পাশে থাকবেন কিন্তু সরাসরি কারক (Doer) হবেন না।

(ঙ) সমষ্টিকে তার ভূমিকা সম্পর্কে সচেতন করা ঃ

তিনি নিজে যেমন তাঁর কাজের দিকটি বুঝে নিয়ে পরিকল্পনামাফিক সমষ্টির কাজে যুক্ত থাকবেন তেমনই দায়িত্ব নিয়ে সমষ্টিকে তার কাজ এবং ভূমিকাগুলিকে বুঝিয়ে দিতে হবে। অন্যথায় সমষ্টির সদস্যেরা তার উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়বেন এবং সেক্ষেত্রে তাদের উন্নয়ন প্রক্রিয়া বাধাপ্রাপ্ত হবে।

২। সমর্থনকারী বা সাহায্যকারী (Helper) :

এই ভূমিকায় সমষ্টি সংগঠক সমষ্টি সংগঠনের কাজে নিম্নলিখিত ভূমিকা পালন করতে পারেন।

(ক) সমষ্টি সংগঠক সমষ্টি সদস্যদের সাহায্য করবেন তাদের সমস্যাগুলি চিহ্নিতকরণ করে বাচনিক করে তুলতে। মূল সমস্যাগুলি শুধু অনুভূতির দ্বারা বোধগম্য করলেই হবে না অনুভূত বিষয়গুলি সমষ্টির সদস্যদের সুন্দরভাবে বোঝাতে হবে। এজন্য অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কার্যকলাপের প্রবর্তন করার উদ্যোগ নিতে হবে। শিক্ষাব্যবস্থার প্রসার, আলোচনা সভার ব্যবস্থা করতে পারলে মানুষের প্রকাশভঙ্গী বিকশিত হবে।

উদাহরনস্বরূপ বলা যায়, কোন ব্যক্তি সমস্যা কেন সমষ্টি সমস্যা হিসাবে পরিগণিত হবে এ বিষয়ে সমষ্টিকে সচেতন করার প্রয়োজন রয়েছে। অপুষ্টিজনিত সমস্যা, শিশু ও মহিলা সংক্রান্ত সমস্যা কিভাবে সমষ্টির সমস্যা হিসাবে আকার লাভ করবে সেগুলি সমষ্টির মানুষের অনুভূতিতে আনতে হবে। এভাবে ধীরে ধীরে সমষ্টি সংগঠন কর্মী সমষ্টির সমস্যাগুলিকে চিহ্নিত করার কাজে তার সমর্থনকারীর ভূমিকাকে কাজে লাগাবেন। এর জন্য প্রয়োজন ধৈর্য সহকারে সমস্যার কথা শোনা, দেখার মাধ্যমে অনুভব করা, প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে আলোচনা করা ইত্যাদি। নিজে সঠিকভাবে সমস্যাগুলিকে বুঝে সমর্থনকারীর ভূমিকায় থাকা সমষ্টি সংগঠক সেইসব সমস্যাগুলিকে সমষ্টি সদস্যদের বোধগম্যতায় পৌঁছে দেওয়ার ভূমিকা পালন করবেন। এভাবে সমষ্টি সদস্যেরা নিজ সমষ্টির সমস্যাগুলি চিহ্নিত

করতে পারলে যেমন সমস্যাগুলি সম্পর্কে তাদের ধারণা স্পষ্ট হয় তেমনি তা দূরীকরণের উপায়ও খুঁজে পায়।

(খ) প্রতিষ্ঠান গঠনে উৎসাহ প্রদান করা। যেহেতু প্রতিষ্ঠানকে ভিত্তি করেই অগ্রগতি বাস্তবায়ন করা সম্ভব তাই এ ব্যাপারে উদ্যোগ নিতে হয়। সমষ্টিভুক্ত মানুষের মধ্যে সমষ্টি চেতনা সৃষ্টি করার জন্য সকলে মিলে সাধারণ সমস্যাগুলি নিয়ে একত্র হওয়ার মধ্য দিয়ে সংগঠন বড় আকার নেবে এবং পরবর্তীকালে রাজনৈতিক, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক সমস্যাগুলি মোকাবিলায় সম্মিলিত উদ্যোগ নেবে এবং আরও উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে সামিল হবে। সেই উদ্দেশেই এই ভূমিকা তাকে পালন করতে হয়।

(গ) আন্তঃসম্পর্ক উন্নয়নে উৎসাহ প্রদান করাও তার অন্যতম ভূমিকা। কর্মী নিজে বন্ধুভাবাপন্ন হবেন, সমষ্টির অন্তর্গত মানুষের সঙ্গে উষ্ণ সম্পর্ক স্থাপন করবেন। সমষ্টির প্রতিটি ঘটনাকে প্রয়োজনীয় গুরুত্ব দেবেন। খুব কম গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু সমষ্টি সদস্যদের ভাবনা অনুসারে খুবই প্রয়োজনীয় এরকম বিষয়েও তিনি উৎসারী হয়ে অংশগ্রহণ করবেন. সমষ্টির অন্তর্গত বিভিন্ন গোষ্ঠীর কাজকর্ম এবং আলোচনা সভাগুলি এমনভাবে সংগঠিত করতে হবে যাতে মানুষের মধ্যে আন্তঃসম্পর্ক কার্যকরী রূপ লাভ করে।

পেশাদারী সমষ্টি সংগঠক যদি সমষ্টির কাছে গ্রহণীয় এবং বিশ্বাসযোগ্য হন তাহলে তার ফলস্বরূপ সমষ্টি সদস্যেরা আলোচনায় আগ্রহের সঙ্গে বেশী সংখ্যায় অংশগ্রহণ করবে এবং সহযোগিতামূলক মনোভাব নিয়ে একে অপরের প্রয়োজনে সহায়ক হবে। সংগঠকের গ্রহণযোগ্যতা এবং বিশ্বাসযোগ্যতাই একটি সমষ্টিকে এক শক্ত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করতে পারে। সমষ্টি সংগঠক এমনভাবে আলোচনা সভাগুলি পরিচালনা করতে সাহায্য করবেন যাতে প্রতিটি মানুষ নিঃসঙ্কোচে তার মতামত প্রকাশ করতে পারে এবং নিজের ব্যক্তিগত ভাবনাকে প্রকাশ করার সুযোগ পায়। এভাবে গোষ্ঠীগত স্বার্থভাবনা, অনাবশ্যক উদ্বেগ ইত্যাদির অবসান হয়ে এক স্বচ্ছ পরিমন্ডল সৃষ্টির ক্ষেত্রেসমষ্টি সংগঠক বা পেশাদার সমাজকর্মী ভূমিকা পালন করতে পারে।

০৩। বিশেষজ্ঞের ভূমিকা (Role of an expert) :

একজন বিশেষজ্ঞ হিসাবে সমষ্টি সংগঠক বিভিন্ন প্রয়োজনীয় বিষয়ে গবেষণালব্ধ তথ্য সমষ্টিকে প্রদান করেন এবং নানা ক্ষেত্রে উপযুক্ত পরামর্শ দিয়ে থাকেন। বিশেষজ্ঞের ভূমিকায় তিনি অনেক বেশী প্রত্যক্ষভাবে সমষ্টির কাজে অংশগ্রহণ করেন। এক্ষেত্রে সোজাসুজিভাবে সমষ্টির বিভিন্ন দিকগুলি পর্যালোচনা করে তার উপর নিজের সুস্পষ্ট মতামত প্রকাশ করে সমষ্টিকে সাহায্য করেন। তিনি বিশেষজ্ঞের দক্ষতায় নির্দ্ধারণ করতে সাহায্য করেন কিভাবে সমষ্টির মধ্যে দলীয় সংঘাত এবং অসহযোগের কারণগুলিকে অপসারণ করা যায়। এই নির্ণয়করণের মাধ্যমেও তিনি বিশেষজ্ঞের ভূমিকা পালন করেন। নির্দিষ্টভাবে বলতে গেলে বিশেষজ্ঞ হিসাবে একজন সমষ্টি সংগঠক নিম্নলিখিত কাজগুলি করতে পারেন।

(ক) অন্যান্য সমষ্টিতে কিভাবে উন্নয়নমূলক কাজ চলছে সে বিষয়ে অভিজ্ঞতা বিনিময়ের মাধ্যমে তিনি সমষ্টি সদস্যদের সাহায্য করেন। তিনি তাঁর শিক্ষাগত জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানের দ্বারা সমষ্টিকে তার অগ্রগতির ক্ষেত্রে সঠিক পথে পরিচালনা করতে পারেন।

(খ) সমষ্টি সংগঠকের বিভিন্ন কারিগরী কৌশলের ব্যাপারে জ্ঞান এবং দক্ষতা থাকা জরুরী। কিভাবে বিশেষ ক্ষেত্রে উন্নয়নের জন্য সরকারী সাহায্য পাওয়া যায় সে বিষয়ে তাকে ওয়াকিবহাল হতে হয়। এই জ্ঞানের বা তথ্যের দ্বারা তিনি সমষ্টিকে প্রভূত সাহায্য করতে পারেন। আবার সমষ্টির মধ্যে যে সম্পদ রয়েছে যেমন ভৌগোলিক, অর্থনৈতিক, মানবসম্পর্ক, কারিগরী সম্পদ ইত্যাদি সেগুলিকে ঠিক কখন কিভাবে প্রয়োগ করলে মানুষের প্রয়োজন এবং প্রয়োজনমুখী সম্পদগুলির মধ্যে মেলবন্ধন ঘটানো যায় সে বিষয়ে সমষ্টি সংগঠকের অভিজ্ঞতালব্ধ বিশেষ জ্ঞানের দ্বারা সমষ্টিকে সাহায্য করার ভিতর দিয়েও সংগঠক বিশেষজ্ঞের ভূমিকা পালন করতে পারেন।

(গ) মূল্যায়ন পদ্ধতির দ্বারা সমষ্টির কর্মকান্ডের উপর নজর রাখাও বিশেষজ্ঞের অন্যতম এক কাজ হিসাবে গণ্য হয়। এরজন্য পর্যবেক্ষণ, গবেষণা, সেমিনারের আয়োজন করা ইত্যাদির প্রয়োজন রয়েছে। উপরোক্ত বিষয়গুলির ব্যাপারে বিশেষ অভিজ্ঞতা এবং পুঁথিলব্ধ জ্ঞানার্জনের দ্বারা সমষ্টি সংগঠক বিশেষজ্ঞের ভূমিকা পালন করতে পারে।

০৪। আরোগ্যকের ভূমিকা (Therapist) :

এই ভূমিকায় নিহিত রয়েছে সমস্যা নির্ণয় করা এবং তার সমাধানকর্ম। সমাধান কর্মের ক্ষেত্রে পেশাদার সমাজকর্মী বা সমষ্টি সংগঠক অপ্রত্যক্ষভাবে কিছুটা নেতৃত্ব দেবেন। বিশেষতঃ সমষ্টির মধ্যে ক্ষমতায়নের শিক্ষা দেওয়ার ব্যাপারে সংগঠকের নেতৃত্বদান অত্যন্ত জরুরী। এছাড়া তিনি অপ্রয়োজনীয় কুসংস্কার, প্রথা, রীতিনীতি এবং অস্বাস্থ্যকর উদ্বেগের কারণগুলি চিহ্নিত করতে সাহায্য করবেন। সমস্যা সমাধানের জন্য সমষ্টির উৎপত্তির মূল এবং তার পূর্ব ইতিহাসকে নিয়ে সমষ্টি সংগঠক পর্যালোচনা করবেন এবং সে বিষয়ে জ্ঞানসমৃদ্ধ হবেন। এভাবেই তিনি সমস্যার মূল খুঁজে সমষ্টিকে সেই সব সমস্যা কাটিয়ে উঠতে সাহায্য করবেন।

৯.৩ সমষ্টি সংগঠকের ভূমিকার উপযোগী উপকরণ

সমষ্টি সংগঠক তার ভূমিকা উপযুক্তভাবে পালন করার জন্য বিশেষ উপকরণ সংগ্রহ করেন তার ব্যক্তিগত গুণাবলী, সাধারণ শিক্ষাগত যোগ্যতা, পেশাগত শিক্ষা, কাজের অভিজ্ঞতা ইত্যাদি থেকে। সঠিকভাবে ভূমিকা পালন করার জন্য তার কর্ম-অভিজ্ঞতা তাকে বিশেষ শিক্ষা দেয়। বাস্তব পরিস্থিতি এবং পেশাগত শিক্ষা ও তার ভূমিকা পালনে যথেষ্ট সহায়ক হয়। তাই এগুলিই হলো তার ভূমিকা পালনের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ।

মানুষের মৌলিক প্রয়োজনগুলি, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক অবস্থান, মানুষের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক সমাজকর্মে কর্মগত দক্ষতা, আঞ্চলিক থেকে জাতীয় বিভিন্ন স্তরের সম্পদ ইত্যাদি বিষয়ে একজন সংগঠককে সচেতন এবং দায়িত্বশীল হয়ে কাজ করতে হয়। তার ব্যক্তিগত গুণাবলী যেমন উৎসাহ, আবেগের মধ্যে ভারসাম্যতা, বিচারবোধ, সৃষ্টিসহায়ক কল্পনাপ্রবণতা, মানুষের প্রতি ধৈর্যসহ শ্রদ্ধা ভালবাসার আকাঙ্খা ইত্যাদি গুণগুলি একজন সংগঠককে উপযুক্তভাবে ভূমিকা পালন করতে সাহায্য করে।

৯.৪ প্রশ্নাবলী

০১। সমষ্টি সংগঠনকর্মীর ভূমিকা কি এবং কিভাবে তিনি তা পালন করতে সক্ষম হবেন?

একক ১০ □ পারস্পরিক যোগাযোগ

গঠন

১০.১ উদ্দেশ্য
১০.২ যোগাযোগের সংজ্ঞা বা ধারণা
১০.৩ যোগাযোগের ধরন, Variables এবং প্রয়োজনীয়তা
১০.৪ যোগাযোগের পদ্ধতি
১০.৫ কার্যকরীভাবে যোগাযোগের উপায়
১০.৬ সফল যোগাযোগকারী প্রয়োজনীয় গুণ বা দক্ষতা
১০.৭ প্রশ্নাবলী

১০.১ উদ্দেশ্য

মনোভাব ব্যক্ত করা, ভাবের বিনিময় ঘটানো বা কাউকে কিছু জ্ঞাপিত করা এমন একটি বিষয় যা ব্যতিরেকে মানুষ তার অস্তিত্বের কল্পনাই করতে পারে না। আমাদের সভ্যতা-সংস্কৃতির ক্রমাগত উন্নতি ঘটার পিছনে মহোত্তম অবদান পারস্পরিক যোগাযোগের। বিশ্ব আজকে ছোট হয়ে আসছে এই যোগাযোগ বিপ্লবের জন্য। জীবনের অন্যক্ষেত্রে যেমন, তেমনি সমষ্টি সংগঠনের ক্ষেত্রেও এর প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। মানুষকে সংগঠিত করে সমষ্টি উন্নয়নের কাজে সামিল করা নীরবে হয় না। তার জন্য বহু ভাবের আদানপ্রদান, তথ্যদান প্রক্রিয়া, আলোচনা, তর্ক বিতর্ক, তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ ইত্যাদি করতে হয়। আর এ সবই করতে হয় যোগাযোগের মাধ্যমে। সেজন্য একজন সমষ্টি সংগঠককে এ বিষয়ে বিশেষভাবে ব্যুৎপত্তিলাভ করতেই হয়। আলোচ্য এককের উদ্দেশ্য হলো যোগাযোগ সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে সমাজকর্মী বা সমষ্টি সংগঠককে ওয়াকিবহাল করা।

১০.২ যোগাযোগের সংজ্ঞা বা ধারণা

'যোগাযোগ' শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে ল্যাটিন শব্দ 'Communis' থেকে যার অর্থ তথ্য ও ভাব ইত্যাদির বিনিময়। মানুষে মানুষে সম্পর্ক তৈরী ও রক্ষা করার এ হলো অন্যতম এক বাহন। প্রকৃতপক্ষে যোগাযোগই প্রধান উপায় যার দ্বারা সম্পর্ক তৈরী ও রক্ষার ব্যাপারটি যুগ যুগ ধরে চলে আসছে। মানুষের সঙ্গে মানুষের পারস্পরিক ভাব বিনিময়ের ক্ষেত্রে যোগাযোগ হলো অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। তথ্য বা ভাব অন্যের কাছ থেকে গ্রহণ করা এবং অন্যের কাছে তা পৌঁছে দেওয়াই হলো যোগাযোগ। যোগাযোগের অর্থ পরিষ্কারভাবে বোঝার জন্য আমরা এখানে তুলে ধরতে পারি কয়েকজন সমাজবিজ্ঞানীর দেওয়া কয়েকটি সংজ্ঞা।

(ক) সমাজবিজ্ঞানী হার্টম্যান (Hartman) এর মতে কার্যকরী উপায়ের বা পদ্ধতির মাধমে ভাবের পারস্পরিক বিনিময়কে বলে যোগাযোগ (It is characterised as mutual interchange of ideas by effective means)।

(খ) অন্য এক সমাজবিজ্ঞানী হাওল্যাণ্ড (Howland) বলেছেন, দুই অথবা আরো বেশী মানুষের মধ্যে বোধের পারস্পরিক বিনিময়কে কার্যকরী করাই হলো যোগাযোগ (Effecting an interchange of understanding between two or more people)।

(গ) আবার সমাজ বিজ্ঞানী ওয়ারার উইভারের (Warrer Weover) এর মতে যোগাযোগ হলো সেই সব

পদ্ধতি যার দ্বারা একজন মানুষ আর একজন মানুষকে প্রভাবিত করে (The concept of Communication would include all those process by which people influence on another)।

এই সমস্ত সংজ্ঞাগুলি থেকেও যা পরিষ্কারভাবে বোঝা যায় তা হলো সমষ্টি সংগঠনের ক্ষেত্রে যোগাযোগ হলো কোন তথ্য বা ভাব ইত্যাদি গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে বিনিময় করা এবং তার দ্বারা প্রভাবিত করা বা প্রভাবিত হওয়া। সমষ্টির সদস্যদের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের জন্য, সমষ্টির সদস্যদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কে উন্নতি ঘটানোর লক্ষ্যে, মানুষকে তাদের প্রয়োজন সম্পর্কে সচেতন করার উদ্দেশ্যে, নিজ উদ্যোগে সেই সব প্রয়োজন মেটানোর ব্যাপারে তাদের আগ্রহী করে তোলার প্রয়োজনে এবং অর্থবহ জীবন যাপনের ব্যাপারে সচেতন করার তাগিদে পারস্পরিক ভাব বা তথ্য বিনিময় করাই হলো সমষ্টি সংগঠনের ক্ষেত্রে যোগাযোগ।

১০.৩ যোগাযোগের ধরন, Variables এবং প্রয়োজনীয়তা

(ক) যোগাযোগের ধরণ ঃ

যোগাযোগের ধরন হলো মোটামুটি তিনটি—উৰ্দ্ধমুখী (upward), নিম্নমুখী (downward) এবং সমান্তরাল (horizontal)। যখন একজন অধস্থন কর্মী/ব্যক্তি উর্দ্ধতন কর্মী/ব্যক্তিকে কিছু জানানোর উদ্দেশ্যে যোগাযোগ করে তখন তাকে উৰ্দ্ধমুখী (upward) যোগাযোগ বলে। উদাহরণ হিসাবে বলা যায় একজন ছাত্র যখন প্রধান শিক্ষকের কাছে কোন আবেদন জানায়, কোন কর্মী যখন নিয়োগকর্তাকে কিছু জানায় বা অনুরোধ করে, একজন অধস্থন কর্মী যখন উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথোপকথন করে বা একজন সাধারণ সদস্য যখন সংশ্লিষ্ট সংস্থার পরিচালকবর্গের সঙ্গে যোগাযোগ করে তখন তাকে উৰ্দ্ধমুখী যোগাযোগ বলে।

অন্যদিকে নিম্নমুখী (downward) যোগাযোগ হলো যখন উর্দ্ধতন ব্যক্তি/কর্তৃপক্ষ তার অধীনস্থ বা নিম্নস্তরের ব্যক্তিকে বা আবেদনকারী/অনুরোধকারীকে কিছু জানায় বা নির্দেশ দেয়। মুখ্যসচিব যখন জেলাশাসককে কোন নির্দেশ দেন, ডাক্তার যখন রোগীকে কোন পরামর্শ দেন, শিক্ষক যখন ছাত্রকে শাসন করেন তখন সেগুলি নিম্নমুখী যোগাযোগ হিসাবে চিহ্নিত হবে। রাষ্ট্র থেকে পরিবার স্তর পর্যন্ত সর্বক্ষেত্রেই যেমন উৰ্দ্ধমুখী যোগাযোগ ঘটে চলে নিরন্তর, তেমনি নিম্নমুখী যোগাযোগও ঘটে সব সময়।

তৃতীয় যোগাযোগের ধরনটি হলো সমান্তরাল (horizontal)। উপরে উল্লেখিত দুই ধরনের যোগাযোগের মত সমান্তরাল যোগাযোগও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রকৃত পক্ষে সমান্তরাল যোগাযোগই সবচেয়ে বেশী ব্যবহৃত। সমান্তরাল যোগাযোগ হলো যখন একে অপরের সঙ্গে সমানতার ভিত্তিতে তথ্য প্রদান, ভাবের আদানপ্রদান বা বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা চলে বা তর্কবিতর্ক হয়। ভাই, বোন, বন্ধু, সহকর্মী, সহযাত্রী, সহসদস্য, সহযোগী ইত্যাদির সঙ্গে যে যোগাযোগ ঘটে তাকে বলে সমান্তরাল যোগাযোগ। সমষ্টি সংগঠনের কাজে সাধারনতঃ সমান্তরাল যোগাযোগই ঘটে থাকে এবং সেটিই কাম্য।

(খ) যোগাযোগের Variables :

যোগাযোগের Variables হলো চারটি। Variables বলতে আমরা বুঝি সেই সব জিনিষ যার উপর ভিত্তি করে একটি ব্যবস্থা টিকে থাকে। যোগাযোগ ব্যবস্থাও টিকে আছে যে কয়েকটি বিষয়ের উপর সেগুলিই হলো তার Variables। যোগাযোগের ক্ষেত্রে সেই Variables গুলি হলো ঃ

—বক্তব্য বিষয় অর্থাৎ যা বলা হয়/বলতে চাওয়া হয়।

—বক্তা অর্থাৎ যিনি বা যারা বক্তব্য প্রকাশে বা আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন।

—গ্রহণকারী অর্থাৎ যিনি সেই বক্তব্য শোনেন, পাঠ করেন অথবা দেখে জানেন (দূরদর্শনের ক্ষেত্রে)।

—পদ্ধতি অর্থাৎ যে নির্দিষ্ট উপায়ে তা জানানো হয়।

উপরোক্ত চারটি জিনিষের সমন্বয় ছাড়া কোন যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে উঠতেই পারে না। একজন সমাজ কর্মী বা সমষ্টি সংগঠককে অবশ্যই সেই তত্ত্বটি মনে রাখতে হবে।

(গ) যোগাযোগের গুরুত্ব বা প্রয়োজনীয়তা ঃ

উন্নয়ন এক জটিল বিষয়। নানা জটিল প্রক্রিয়ার ভিতর দিয়ে তা ঘটাতে হয়। সেই বিবিধ প্রক্রিয়ার মধ্যে অন্যতম হলো কার্যকরী যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলা। সমষ্টি সংগঠনের ক্ষেত্রেও এটি সত্য। তথ্য সম্প্রসারন, ভাবের আদানপ্রদান, পারস্পরিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় পাওয়া ইত্যাদির সঙ্গে উন্নয়নের সরাসরি যোগ রয়েছে। যে কোন সমষ্টির পিছিয়ে থাকার পিছনে যে সব কারণ কাজ করে তার মধ্যে অন্যতম হলো প্রয়োজনীয় তথ্য সম্পর্কে অজ্ঞতা, উপযুক্ত ভাবনাচিন্তা এবং দৃষ্টিভঙ্গীর বিনিময় না হওয়া। একটি উদাহরণ সহযোগে বক্তব্যটি আরো স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। এ দেশে সরকারের সরাসরি উদ্যোগে পরিচালিত প্রকল্পের সংখ্যা অনেক। শিশু কল্যাণ, যুব কল্যাণ, নারী কল্যাণ, শ্রমিক কল্যাণ, বৃদ্ধ কল্যাণ, আদিবাসী ও অনুসূচিত জাতি কল্যাণ, বস্তিবাসী কল্যাণ, ছাত্র কল্যাণ ইত্যাদি গোষ্ঠীভিত্তিক নানা কল্যাণ ও উন্নয়নধর্মী প্রকল্প রয়েছে। কিন্তু উপযুক্ত যোগাযোগ ব্যবস্থার অভাবে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে বহু মানুষ সে সম্পর্কে অজ্ঞ। ফলে পরিষেবা থাকা সত্ত্বেও বহু মানুষ তার সুযোগ নেওয়া থেকে বঞ্চিত থাকে। দেশের যে অংশের মানুষ যতটা সচেতন সেই অঞ্চল ততটা এগিয়ে। যে অঞ্চল যতটা অজ্ঞতার শিকার সেই অঞ্চল ততটা পিছিয়ে। এই অবস্থানগত সত্য রূপটিই স্পষ্ট করে দেয় যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তার দিকটি।

তাছাড়া যোগাযোগের সুতোয় একে অপরকে না বাঁধলে কোন কিছু সঠিকভাবে সংগঠিত করা যায় না। যোগাযোগের অভাবে মানুষ বিচ্ছিন্নতার শিকার হয় এবং সমবেত বা সম্মিলিত শক্তি ও সদিচ্ছার ভিত্তিতে নিজেদের উন্নতি ঘটানোর প্রচেষ্টায় সামিল হয় না, সমষ্টির মানুষ একতাবদ্ধ হয়ে উন্নয়নকে বাস্তবায়িত করার জন্য উদ্যোগী হয় না। এ সবের পরিপ্রেক্ষিতেই যোগাযোগের গুরুত্ব রয়েছে সর্বত্র, সমষ্টি সংগঠনের ক্ষেত্রে তো অবশ্যই।

১০.৪ যোগাযোগের পদ্ধতি

সব কাজই পদ্ধতি নির্ভর। উপযুক্ত পদ্ধতি নির্বাচন করে সেই পদ্ধতি অবলম্বন করে কাজ করলে সাফল্যের সম্ভাবনা থাকে বেশী। যোগাযোগের কিছু পদ্ধতি আছে। সেগুলি হলো ঃ

(ক) মৌখিকভাবে যোগাযোগ (Verbal Communication)

(খ) লিখিতভাবে যোগাযোগ (Written Communication)

(গ) শ্রাব্য-দৃশ্য পদ্ধতির মাধ্যমে যোগাযোগ (Andio Visual Communication)

আমরা যখন কারো সঙ্গে কথোপকথন করি, তর্ক বিতর্ক করি, আলোচনা করি, পারস্পরিক পরামর্শ করি, তথ্য পরিবেশন করি তখন তাকে মৌখিকভাবে যোগাযোগ করা বলা হয়। আবার যখন চিঠির মাধ্যমে, নোটিশের মাধ্যমে, লিফলেট বা বিজ্ঞানের মাধ্যমে, সংবাদপত্র-পত্রিকা-বই-পোষ্টার-ব্যানার ইত্যাদির মাধ্যমে কোন ভাব বা তথ্য সরবরাহ করি তখন তাকে বলা হয় লিখিতভাবে যোগাযোগ। অন্যদিকে টেলিফোন, রেডিও, দূরদর্শন, ফ্যাক্স, চিত্র বা তথ্যচিত্র ইত্যাদির মাধ্যমে যখন কিছু জানানো হয় তখন তাকে বলে শ্রাব্যদৃশ্য পদ্ধতির মাধ্যমে যোগাযোগ।

উপরোক্ত সব কয়টি যোগাযোগ পদ্ধতিরই নিজস্ব গুরুত্ব রয়েছে। তবু বলা যেতে পারে এর মধ্যে মৌখিক যোগাযোগই সবচেয়ে বেশী কার্যকরী এবং অবশ্যই সবচেয়ে বেশী ব্যবহৃত। মৌখিক যোগাযোগের সুবিধা হলো যাদের সঙ্গে যোগাযোগ করা হবে তাদের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সম্পর্ক স্থাপন করা সম্ভব হয়, তাদের মনোভাব বোঝা যায়, প্রয়োজনমত বক্তব্যে সংযোজন বিয়োজন করা যায়, আলোচনা একতরফা হয় না, অন্যপক্ষের কিছু বলার থাকলে

সেই সুযোগও পাওয়া যায়। গোষ্ঠী আলোচনা, প্রশ্নোত্তরের আসর, আলোচনা সভায় সকলের অংশভাগিতার সুযোগ রয়ে যায়। লিখিতভাবে যোগাযোগ পদ্ধতিটিও অত্যন্ত উপযোগী কারণ এগুলির মাধ্যমে বিভিন্ন বিষয় এবং তথ্য সম্পর্কে বিশ্বাসযোগ্যভাবে জানতে পারা যায় এবং সেই সব তথ্য সংরক্ষণ করা যায়। শ্রাব্যদৃশ্য পদ্ধতিটিও অত্যন্ত কার্যকরী। প্রয়োজনমত এই পদ্ধতির ব্যবহার করলে সমষ্টি সংগঠনের কাজ ভালভাবে পরিচালনা করার ক্ষেত্রে সহায়ক হবে। বিশেষ করে চোখে দেখার ভিতর দিয়ে যে বিশ্বাসযোগ্যতা সৃষ্টি হয় তেমনটি আর কোন কিছুর মাধ্যমেই হবার নয়। প্রকৃতপক্ষে উপরোক্ত পদ্ধতিগুলি একে অপরের পরিপূরক।

১০.৫ কার্যকরীভাবে যোগাযোগের উপায়

কার্যকরীভাবে যোগাযোগ গড়ে তুলতে না পারলে সমষ্টি সংগঠনের কাজ গতি পায় না এবং উদ্দেশ্য পূরণে অসমর্থ থাকে। সেজন্য সমষ্টি সংগঠনের ক্ষেত্রে যোগ্য যোগাযোগ রক্ষাকারীর প্রয়োজন হয়। দক্ষতা বা যোগ্যতার সঙ্গে যোগাযোগের ক্ষেত্রে কতগুলি পূর্বশর্ত (Pre-condition) রয়েছে। সেগুলি হলো ঃ

(ক) বক্তব্য বা আলোচনার বিষয় সম্পর্কে সঠিক ধারণা (Clear Concept) থাকতে হবে। বিষয়টি সম্পর্কে অল্পবিস্তর জেনেই সে সম্পর্কে অন্যকে জানাতে যাওয়া বা অন্যের সঙ্গে আলোচনা করতে যাওয়া বিবেচকের কাজ নয়। সঠিকভাবে না জানা বিষয় কখনো দক্ষতার সঙ্গে অন্যকে জানানো সম্ভব নয়। যোগাযোগকারী যদি সংশ্লিষ্ট বিষয় সম্পর্কে উপযুক্ত ধারণার অধিকারী হয় তাহলে সে দক্ষতা, যোগ্যতা ও আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে যোগাযোগ গড়ে তুলতে এবং তা রক্ষা করতে সক্ষম হয়।

(খ) বক্তব্য জানাতে গিয়ে কোন্ কোন্ বিষয় উত্থাপন করা হবে সে সম্পর্কে মুক্তমন হতে হবে। এ ক্ষেত্রে কোন কড়াকড়ি ভাবনা (rigidity) থাকলে যোগাযোগের কার্যকারিতা হ্রাস পায়। যারা মনে করেন তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গীই সঠিক বা তাদের ভাবনাই শেষ কথা এবং অন্যের ভাবনা বা মতের কোন গুরুত্ব নেই তাঁরা উপযুক্ত যোগাযোগকারী হতে পারেন না। অন্যের ভাবনা বা মতামতকে মূল্য দিতে হবে।

(গ) মতামত, দৃষ্টিভঙ্গী বা বক্তব্য রাখতে হবে পরিচ্ছন্নভাবে। বক্তব্য রাখতে গিয়ে বা মতামত প্রকাশ করতে গিয়ে ধোঁয়াশার সৃষ্টি হলে যাকে উদ্দেশ্য করে বলা তার কোন উপকার হবে না বা সেই ব্যক্তি বা গোষ্ঠী বা সমষ্টির মধ্যে তেমন কোন প্রতিক্রিয়া হবে না। তাই কার্যকরী যোগাযোগের অন্যতম পূর্বশর্ত হলো অন্যের সঙ্গে যোগাযোগের সময় পরিষ্কারভাবে বক্তব্য/ধারণা/তথ্য তুলে ধরা যাতে তাদের বুঝে নিতে কোন অসুবিধা না হয়।

(ঘ) তথ্য বা ভাব প্রকাশ করতে গিয়ে বা যোগাযোগ গড়ে তুলতে গিয়ে অবশ্যই মনে রাখতে হবে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি/গোষ্ঠী/সমষ্টির প্রয়োজনের দিকটি। অপ্রয়োজনীয় কোন বিষয় নিয়ে সমষ্টি সংগঠক যদি আলোচনা করতে বা মতামত জানাতে যান তাহলে তাতে কারো আগ্রহ জাগবে না বা সেই আলোচনা কারো প্রয়োজনেও লাগবে না। সেজন্য সচেতন থাকতে হবে প্রয়োজনভিত্তিক বক্তব্য রাখার ব্যাপারে বা আলোচনার ব্যাপারে।

(ঙ) আলোচনা চলা কালে কোন স্তরেই যেন আলোচনার ধারা প্রসঙ্গান্তরে না চলে যায়। তেমন কিছু হলে যাদের সঙ্গে যোগাযোগ গড়ে তোলার চেষ্টা হবে তারা ঐ আলোচনায় আগ্রহ বোধ করবে না বা উৎসাহ হারাবে। তাই নির্দিষ্ট বিষয়ের উপরই আলোচনা বা বক্তব্যকে সীমাবদ্ধ রাখতে হবে।

(চ) বক্তব্য বা আলোচনাকে আনন্দদায়ক বা উৎসাহবর্দ্ধক (interesting) করে তুলতে হবে। পরিবেশন বা উপস্থাপনার গুণে যে কোন বক্তব্যই হৃদয়গ্রাহী হয়ে উঠতে পারে। সংবাদপাঠ, আবৃত্তি বা সঙ্গীত পরিবেশন, নাটকের কোন চরিত্র ফুটিয়ে তোলা, শ্রেণিকক্ষে শিক্ষাদান সর্বক্ষেত্রেই কার্যকারিতার মাত্রা অনেকাংশ নির্ভর করে কতখানি আনন্দদায়কভাবে তা পরিবেশন করা হয় তার উপর। সমষ্টি সংগঠনের ক্ষেত্রও এর ব্যতিক্রম নয়।

(ছ) প্রকাশের ক্ষেত্রে স্বাভাবিকতা (natural in expression) বজায় রাখতে হবে। অতি নাটকীয়ভাবে কিছু বলা, অকারণ গাম্ভীর্য এনে পরিবেশকে গুরুগম্ভীর করে তোলা কার্যকরীভাবে যোগাযোগ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে সহায়ক হয় না। অনেকক্ষেত্রে দেখা যায় যোগাযোগকারী তার স্বাভাবিকতা হারিয়ে বসে। এটি যোগাযোগ প্রক্রিয়াকে দারুনভাবে ব্যাহত করে। তাই এ বিষয়েও সতর্ক থাকতে হবে।

(জ) বক্তব্য বা আলোচনা অকারণে দীর্ঘ করা ঠিক নয়। সমষ্টি সংগঠককে মনে রাখতে হবে যে প্রয়োজনের অতিরিক্ত সময় ধরে বক্তব্য রাখতে গেলে বা আলোচনা চালালে যোগাযোগ কার্যকরী হয় না কারণ যার বা যাদের সঙ্গে আলোচনা সে বা তারা এতে বিরক্তিবোধ করতে পারে। এই বিরক্তির ফলে তাদের একাগ্রতা নষ্ট হওয়ায় স্বাভাবিক। সে রকম অবস্থার সৃষ্টি যাতে না হয় সে ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে।

(ঝ) যাদের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয় তাদের পশ্চাৎপট (background) মাথায় রাখতে হয়। তাদের আর্থিক, সামাজিক সাংস্কৃতিক, শিক্ষাগত ছবিটি পরিষ্কারভাবে অবগত থাকলে যোগাযোগকে অর্থবহ করে তুলতে সহায়ক হয়। এগুলি মাথায় রেখে তদনুসারে যোগাযোগ করার চেষ্টা করলে তা কার্যকরী হয়। এক্ষেত্রে বিবেচনাবোধের প্রয়োগ দরকার। তাছাড়া শ্রোতার বা আলোচনায় অংশগ্রহণকারীর স্তরে নেমে এসে বা উঠে গিয়ে বক্তব্য রাখলে বা আলোচনা করলে তবেই তার মাধ্যমে কার্যকরীভাবে যোগাযোগ গড়ে তোলা সম্ভব। সেজন্য এ বিষয়টিও বিশেষভাবে বিবেচনায় রাখা দরকার।

(ঞ) কোন্ বক্তব্য রাখা হবে এবং কিভাবে তা রাখা হবে তা নিয়ে অগ্রিম ভেবে নেওয়া বা প্রস্তুতি নেওয়াও জরুরী একটি পূর্বশর্ত। যোগাযোগে সাফল্য আনতে গেলে এই অগ্রিম প্রস্তুতি (Home Work) করা অবশ্য কর্তব্যের মধ্যে পড়ে।

(ট) যার বা যাদের সঙ্গে ভাব বা তথ্য বিনিময় প্রক্রিয়া চলে তাদের বক্তব্যও মনযোগ সহকারে শুনতে হয়। তার বা তাদের কথা শোনার এই মানসিকতা ও ধৈর্য্য কার্যকরীভাবে যোগাযোগ গড়ে তোলা এবং রক্ষা করার ক্ষেত্রে অত্যন্ত সহায়ক। কারণ তাদের মত বা দৃষ্টিভঙ্গী বা বক্তব্য শুনলে নিজের বক্তব্য রাখার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সংযোজন, বিয়োজন, পরিমার্জন করে নেওয়া সম্ভব। কোন কোন বিষয়ে অতিরিক্ত ব্যাখ্যাও দেওয়া যেতে পারে। এবং এর ভিতর দিয়ে তাদের মর্যাদা দেওয়াও সম্ভব হয়।

(ঠ) বক্তব্য বিষয় জানানোর জন্য উপযুক্ত সময় বা অবস্থা (proper time or condition) বেছে নিতে হবে। সব অবস্থায় বা সবসময় একজন মানুষ কোন তথ্য জানার জন্য বা ভাব গ্রহণের জন্য তৈরী থাকে না। সমষ্টি সংগঠক বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে উপযুক্ত অবস্থা বিচার করে যোগাযোগ করলে তা অনেক বেশী কার্যকরী হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

(ড) একই সঙ্গে অনেক ধারণা বা বহু তথ্য দেবার চেষ্টা না করা ভাল। প্রতি ব্যক্তিরই গ্রহণ ক্ষমতা একটা সীমার মধ্যে থাকে। সে কথা মনে রেখে পরিকল্পিতভাবে এবং পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন তথ্য বা ভাব পরিবেশন করা হলে কার্যকরীভাবে যোগাযোগ গড়ে তোলা সম্ভব।

(ঢ) কোন কোন সময় সমষ্টির মধ্যে কিছু সংবেদনশীল (sensitive) বিষয় আলোচনা করার প্রয়োজন দেখা দেয়। অত্যন্ত সচেতনভাবে এবং যত্নবান হয়ে সে সব বিষয় আলোচনা করা দরকার। সঠিকভাবে তা আলোচনা না করলে হিতে বিপরীত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

১০.৬ সফল যোগাযোগকারীর প্রয়োজনীয় গুণ বা দক্ষতা

সাফল্যের সঙ্গে যোগাযোগ করতে গেলে যোগাযোগকারীকে কিছু গুণের অধিকারী হতে হয়, কিছু দক্ষতা অর্জন করতে হয়। সেই সমস্ত প্রয়োজনীয় গুণ বা দক্ষতাগুলি হলো :

(ক) সমষ্টির বা বাইরের কোন মানুষের সঙ্গে মুখোমুখি হওয়ার ক্ষেত্রে সঙ্কোচহীন হতে হবে। পঞ্চাশ বছর ধরে গ্রামোন্নয়নের কাজে জড়িত ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। তিনি লিখেছেন 'সঙ্কোচের বিহ্বলতায় হয়ো না ম্রিয়মান'। তাঁর গানের এই একটি কলি মাথায় রেখে যোগাযোগের কাজ করতে পারলে সমষ্টি সংগঠকের কার্যকারিতা অনেকখানি বৃদ্ধি পায়। মানুষের চোখে চোখ রেখে বক্তব্য বলা বা আলোচনা করার সাহস থাকতে হবে। ক্রমাগত চেষ্টায় তা আহরণ বা অর্জন করতে হবে।

(খ) আলোচনা করা বা বক্তব্য রাখার সময় বিবেচনাপ্রসূত এবং শোভন রসিকতা করা, উপযুক্ত প্রবাদের ব্যবহার করা এবং বিভিন্ন বাস্তবধর্মী উদাহরণের উল্লেখ করা দরকার। এতে বক্তব্য আকর্ষক হয়, বক্তব্য বিষয় বুঝতে সহজ হয়। সমষ্টি সংগঠককে সেজন্য রসিকতা বোধের অধিকারী হতে হয়, নানা ধরনের প্রবাদ ও উদাহরণ মনে রাখতে হয় এবং উপযুক্তভাবে তা প্রয়োগ করতে শিখতে হয়।

(গ) যোগাযোগকারীর ভাষায় দখল থাকা দরকার। কারণ ভাষাই ভাবের বাহক। ভাষায় দক্ষতা থাকলে যোগাযোগের ক্ষেত্রে সাফল্যপ্রাপ্তি অনেক সহজ হয়ে যায়। অন্যদিকে ভাষায় দীনতা থাকলে প্রকাশ জনিত অক্ষমতার কারণে সঠিকভাবে যোগাযোগ গড়ে তোলা যায় না। অতএব যোগাযোগে সাফল্য পেতে গেলে বা দক্ষতা অর্জন করতে হলে ভাষা আয়ত্তে আনতে হবে।

(ঘ) সফল বা দক্ষ যোগাযোগকারীকে গঠনমূলক বা ইতিবাচক মনোভাব বা দৃষ্টিভঙ্গীর (constructive and positive outlook) অধিকারী হতে হবে। নিজের মধ্যে সেই গুণের অভাব থাকলে অন্যকে প্রভাবিত করার মত করে যোগাযোগ করা সম্ভব হয় না।

(ঙ) সমষ্টি সংগঠককে ভাল যোগাযোগকারী হওয়ার জন্য উপস্থিত বুদ্ধির (presence of mind) ব্যবহার বা প্রয়োগ করতে হয়। এ ক্ষেত্রে যে যত দক্ষ হয়ে উঠতে পারে এবং সতর্ক থাকতে পারে সে তত অর্থবহভাবে যোগাযোগ গড়ে তুলতে পারে।

(চ) যোগাযোগের বিভিন্ন পদ্ধতি সম্পর্কে বা তার ব্যবহার সম্পর্কে ধারণা ও দক্ষতা থাকা দরকার। নির্দিষ্ট একটি পদ্ধতিতে দক্ষতা অর্জন করে কার্যকরী যোগাযোগরক্ষাকারীর ভূমিকা পালন করা সম্ভব নয়। তাছাড়া তার সেই জ্ঞানের অধিকারী হওয়াও দরকার যে কোন্ পদ্ধতি কোন্ অবস্থায় প্রয়োগ করা দরকার।

(ছ) যোগাযোগ তৈরী ও রক্ষা করা নিতান্ত সহজ কাজ নয় এবং কোন কোন ক্ষেত্রে অসাফল্যের মুখোমুখি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এরকম কিছু হলে ভেঙ্গে না পড়ে বা হতাশ না হয়ে কোন্ কোন্ কারণে অসাফল্য তা বিশ্লেষণ করে সেই কারণগুলি বা দুর্বলতাগুলি কাটিয়ে উঠার মানসিকতার অধিকারী হওয়া যোগাযোগকারীর আর একটি গুণ। দুর্বলতা কাটিয়ে উঠা বা ভুল থেকে শিক্ষা নিয়ে আরো দক্ষতা ও যোগ্যতার সঙ্গে যোগাযোগ করার আগ্রহ বজায় রেখে চলাই হলো সমষ্টি সংগঠক সমেত সমস্তরকম যোগাযোগকারীর একটি অন্যতম প্রধান গুণ।

১০.৭ প্রশ্নাবলী

১। যোগাযোগ বলতে আমরা কি বুঝি?
২। যোগাযোগের ধরন কয়টি তা উদাহরন সহযোগে উপস্থাপন কর।
৩। যোগাযোগের প্রয়োজনীয়তা কি?
৪। যোগাযোগর পদ্ধতিগুলি ব্যাখ্যা কর।
৫। কার্যকরী যোগাযোগের পূর্বসর্ত কিঠ
৬। দক্ষ যোগাযোগকারীর প্রয়োজনীয় গুন কি?

একক ১১ □ সর্বোদয় আন্দোলন

গঠন

১১.১ উদ্দেশ্য

১.১২ 'সর্বোদয়'-এর ধারণা

১১.৩ পরিপ্রেক্ষিত এবং প্রয়োজনীয়তা

১১.৪ সর্বোদয় ভাবনার উৎপত্তি

১১.৫ সর্বোদয়-এর মুখ্য উদ্দেশ্য

১১.৬ সর্বোদয়ের সাধারণ ও সমাজ কল্যাণমূলক বৈশিষ্ট

১১.৭ পরিসমাপ্তি

১১.৮ প্রশ্নাবলী

১১.১ উদ্দেশ্য

সমাজ কর্মের মূল উদ্দেশ্য হলো মানুষের অংশভাগিতার মাধ্যমে সমাজের উন্নয়ন ও কল্যাণ সাধন। মানুষের শক্তি ও সম্পদের উপর আস্থা রেখে, সমস্যাগুলিকে চিহ্নিত করে, গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ও সুপরিকল্পনার মাধ্যমে সমষ্টির সার্বিক উন্নয়নকে নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কাজ করাই হলো সমাজ কর্মের পদ্ধতি। সমাজকর্ম পেশা হিসাবে গড়ে উঠেছে এক দর্শনকে কেন্দ্র করে। সেটি হলো নিজ সম্পদ চিহ্নিতকরণ ও আহরণের মধ্য দিয়ে, নিজেদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় ব্যক্তি-গোষ্ঠী-সমষ্টির সমস্যার মূলে আঘাত করে অগ্রগতির পথে পা রাখা সম্ভব। সমাজ কর্মও বিশ্বাস করে যে, জাত-ধর্ম-সামাজিক ও আর্থিক অবস্থান ইত্যাদির ভিত্তিতে শোষণকে নির্মূল করতে হবে সমাজেরই প্রগতির স্বার্থে। 'সর্বোদয়' ভাবনা এবং 'সমাজ কর্ম' দর্শনের ভাবনার মধ্যে সাদৃশ্য রয়েছে বিস্তর। সেজন্যই সমাজ কর্ম-এর ছাত্র-ছাত্রীদের 'সর্বোদয়'-সংক্রান্ত মূলতত্ত্বগুলি সম্পর্কে অবহিত হওয়া কাম্য। সেই উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই এই অধ্যায়ের অবতারণা করা হলো।

১১.২ 'সর্বোদয়'-এর ধারণা

'সর্বোদয়' Sarvodaya কথাটির আক্ষরিক অর্থ হলো 'সকলের উদয় বা উত্থান'। শব্দটি সর্বপ্রথম প্রণয়ন করেন মহাত্মা গান্ধী। গান্ধীজির বিবেচনায় 'সর্বোদয়'-এর অর্থ নির্দেশ করে জীবনধারনের সেই পথ বা মতবাদকে যা সত্য, প্রেম এবং অহিংসার ভিত্তিনির্মিত। এর প্রকৃষ্ট প্রতিফলন ও সৎ জীবানযাপনের মধ্য দিয়ে, সামাজিক এবং আর্থিক ইত্যাদি ক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়া মানুষের অবস্থা উপলব্ধি করে সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠী বা জনসমষ্টিকে উন্নয়নের স্রোতে কার্যকরীভাবে যুক্ত করে তাদের অবস্থানগত উন্নয়ন ঘটানোই হলো 'সর্বোদয়'।

১১.৩ পরিপ্রেক্ষিত এবং প্রয়োজনীয়তা

সমকালীন সমাজ স্বার্থক্ষুধা নিবৃত্তি এবং নিজ সন্তুষ্টি বিধান—এই লক্ষ্যে ধাবমান। এমনকি বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তিবিদ্যা ও ভোগবাদের প্রভাবমুক্ত নয়। সব ধরনের উন্নয়ন বা প্রগতির লক্ষ্যই যেন ভোগবাদের দ্বারা প্রভাবিত যার ফলস্বরূপ ভোগবাদজনিত সমস্যা ক্রমশঃ প্রসারিত হচ্ছে। অবিশ্বাস, ভয়, নিরাপত্তাহীনতা, বিচ্ছিন্নতাবোধ, অসুস্থ

প্রতিযোগিতা সমাজের পরতে পরতে প্রবিষ্ট হয়ে চলেছে। নৈতিকতাবোধ ক্রমশঃ স্থানচ্যুত হচ্ছে এবং বিভিন্ন রকমের শোষণ ও অবিচারের শিকার হচ্ছে সমাজের বহুতর মানুষ। বিভিন্ন দেশের সরকারও যুক্তিসঙ্গত এবং পক্ষপাত শূন্য প্রশাসনের মাধ্যমে এক সুব্যবস্থিত সমাজব্যবস্থা গঠনে ব্যর্থ। বর্তমানে মূলতঃ তিন মতাদর্শের দ্বারা সমাজকে চালিত হতে দেখা যায়। সেগুলি হলো ঃ

(ক) ধনতন্ত্রবাদ (Capitalism) :

এই ব্যবস্থায় সম্পদ ও ক্ষমতা সাধারণতঃ কেন্দ্রীভূত হয় মুষ্টিমেয় কিছু ব্যক্তির হাতে। তুলনায় বেশী সংখ্যক মানুষ তুলনায় ক্ষমতাহীন এবং সঙ্গীন আর্থিক অবস্থার শিকার হয়। জন্ম হয় সীমাহীন অসাম্যতা এবং শোষণের।

(খ) সাম্যবাদ (Communism) :

এই ব্যবস্থায় অসাম্য ও শোষণকে নির্মূল করার ব্যাপারে সমর্থন রয়েছে। কিন্তু দর্শনের সঙ্গে প্রয়োগের বেশ পার্থক্য রয়ে যাওয়ায় বৈষম্য এবং শোষণ দূরীকরণে লক্ষ্যণীয় সাফল্য আসেনি অধিকাংশক্ষেত্রেই। বরঞ্চ এক চিরস্থায়ী শ্রেণী সংগ্রামের বিভিন্ন ক্ষেত্রে আশানুরূপ ফললাভের ক্ষেত্রে সহায়ক হয়নি।

(গ) গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রবাদ (Democratic Socialism) :

এই ব্যবস্থায় ব্যক্তি উন্মেষে বাধা না দিয়েও দারিদ্র এবং অসাম্যতা দূরীকরণে সচেষ্ট হয়। কিন্তু এই ব্যবস্থাও কাঙ্খিত ফল দেয়নি। সাধারণ মানুষের স্বার্থ বিঘ্নিত হয়ে আমলাতন্ত্রের সৃষ্টি হয়েছে।

এই পরিস্থিতিতে সমাজের প্রয়োজন ত্রুটিমুক্ত আদর্শবাদের গুণগত দিকগুলির ব্যবহার। সেই পরিপ্রেক্ষিতে মহাত্মা গান্ধী প্রবর্তিত সর্বোদয় আন্দোলনের ভাবনা প্রয়োগের কথা অবশ্যই চিন্তা করা যেতে পারে।

১১.৪ সর্বোদয় ভাবনার উৎপত্তি

সর্বোদয় ভাবনার প্রধান বা সর্বপ্রথম বিষয় হলো সমাজের সকলের মঙ্গল ও প্রগতি। মহাত্মা গান্ধীর বিশ্বাস, প্রতি মানুষের মধ্যে নিহিত ক্ষমতার উৎসরণ এবং তার সঠিক ব্যবহারের মধ্যে তার নিজের এবং সেই সঙ্গে অপরের উন্নয়নের সুযোগ রয়েছে। নিজের গুণাগুণ এবং ক্ষমতাকে ঠিকভাবে চালিত করলে মানুষ তার ফলাফল ভোগ করতে পারবে।

গান্ধীজি বিশ্বাস করতেন, প্রতিটি ব্যক্তির মধ্যে যে ক্ষমতা রয়েছে তার সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য মানুষের ইচ্ছাকে জাগ্রত করতে হবে এবং স্বেচ্ছাচারকে দমন করার মাধ্যমে মানুষকে তার নিজগুণে পারিপার্শ্বিক উন্নয়নে সক্ষম করে তুলতে হবে। এই ভাবনা অনুসারে সকলের পিছনে পড়ে থাকা মানুষের উন্নতির প্রশ্নটিকে অগ্রাধিকার দিয়ে সকলের প্রগতি সাধন।

সর্বোদয়ের দর্শন ও চিন্তাধারা গান্ধীজি আহরণ করেছেন জন রাসকিনের 'আনটু দি লাষ্ট' বইটি থেকে। তিনটি বিষয় তিনি গভীরভাবে অনুধাবন করেছেন। সেগুলি হলো ঃ

(ক) ব্যক্তির উন্নয়ন ততক্ষণই সম্ভব যতক্ষণ ব্যক্তি অন্যের উন্নয়নকে আপন উন্নয়নের কারণ বলে মনে করবে।

(খ) প্রতিটি কর্মধারা তা নৈতিক, মানসিক, কলা সৌন্দর্য সংক্রান্ত বা অন্য যাই হোক না কেন তা সমমানের এবং সমগুরুত্বপূর্ণ হবে।

(গ) প্রতিটি ব্যক্তি তার শ্রমের দ্বারা সমাজের প্রতি তার দায়িত্ব পালন করবে।

সর্বোদয়ের ফলিত রূপ দেখার জন্য গান্ধীজি সারাজীবন কাজ করে গেছেন। তাঁর মৃত্যুর পর আচার্য বিনোবা ভাবে এই মতবাদের বা অনুশীলনের ধারাটিকে বজায় রেখেছিলেন তাঁর 'ভূদান' আন্দোলনের মধ্য দিয়ে। প্রকৃতপক্ষে

এই ভাবনার সম্প্রসারণে তাঁর অবদানও স্বীকার্য। তিনিও এই তত্ত্বে বিশ্বাস রাখতেন যে ঃ

(ক) ব্যক্তির কল্যাণ নিহিত রয়েছে সকলের কল্যাণের মধ্যে।

(খ) সবরকম কর্মের সমমূল্য বা সমগুরুত্ব রয়েছে। একজন আইনজীবি এবং একজন ক্ষৌরকার উভয়ের শ্রমেরই প্রয়োজন রয়েছে। নিজ শ্রমের বিনিময়ে উভয়েরই স্ব-রোজগারের অধিকার রয়েছে।

(গ) যে জমি চাষ করে সে তার বাঁচার অধিকারে এটা করে। অর্থাৎ সমাজের সম্পদে মানুষের অধিকার রয়েছে।

১১.৫ সর্বোদয়-এর মুখ্য উদ্দেশ্য

'সর্বোদয়' ভাবনা গড়ে উঠেছে কয়েকটি মুখ্য উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে। সেগুলি হলো ঃ

(ক) আদর্শ সামাজিক নিয়ম প্রতিষ্ঠা করা, ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ ঘটানো।

(খ) সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠা করা।

(গ) জাতি ভিত্তিক বিভেদ-এর মানসিকতা দূর করা।

(ঘ) সমাজে অর্থনৈতিক সাম্য বাস্তবায়ন করা।

(ঙ) কর্ম নিয়োগের ক্ষেত্র বৃদ্ধি করার জন্য পুরুষ ও নারী উভয়ের কর্মসংস্থানকে সম অধিকার দান।

(চ) ছাত্রসমাজকে সংগঠিত করা।

(ছ) তপশিলী জাতি, তপশিলী উপজাতি এবং অনগ্রসর শ্রেণীর মানুষের জন্য বিশেষ কল্যাণমূলক কাজের উদ্যোগ নেওয়া।

গান্ধীজির ভাবনায় এই সমস্ত উদ্দেশ্য পূরণের একমাত্র পথ ছিল অহিংসা, এক দলকে অন্য দলের কাছে বিশ্বস্ত রাখা। তিনি চেয়েছিলেন এই পদ্ধতিটি ক্রমে ক্রমে এবং ধীরে ধীরে কার্যকরী করা হোক কারণ মানুষের হৃদয় পরিবর্তনের মধ্য দিয়েই এই দর্শনের স্বার্থক রূপায়ণ সম্ভব। ভূদান, গ্রামদান ও গ্রামস্বরাজই হলো সর্বোদয় পরিকল্পনা এবং কার্যক্রমের উদ্দেশ্য। সর্বোদয় জনসাধারণের আগ্রহী এবং স্বেচ্ছায় অংশগ্রহনকে বৃহত্তর সমাজকর্ম এবং রাজনৈতিক সংস্কারের ক্ষেত্রে এবং ক্ষুদ্রতর সমাজকর্মের ক্ষেত্রে সমানভাবে উৎসাহিত করে। আধুনিক সমাজের অর্থনৈতিক কেন্দ্রীকরণ, রাজনৈতিক ক্ষমতালাভ এবং যে কোন ধরনের সামাজিক চাহিদার জন্য সমাজসেবামূলক উপায়ের উপর নির্ভর করার যে প্রবণতা তার বিরুদ্ধে একটি শক্তিশালী ও আদর্শসম্মত আন্দোলনের পথপ্রদর্শকরূপে সর্বোদয়ের কার্যক্রমের পদ্ধতি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।

সর্বোদয়ের প্রধানতম উদ্দেশ্য সত্য থেকে সত্যে উন্নীত হওয়া যা মানবজাতির আরোহণের পথকে নির্দেশ করে। সর্বোদয়ের পন্থাটি ছিল সমষ্টিগত উন্নয়নের অভিমুখী যা নিম্নলিখিত দশটি গুণগত উৎকর্ষের সমন্বয়ে গঠিত।

(ক) ভয়হীনতা (fearlessness)

(খ) অহিংসা (non-violence)

(গ) ন্যায় (justice)

(ঘ) ব্রহ্মচর্য (celibacy)

(ঙ) নিকটভাবে ভাবিত (thought of nearness)

(চ) সর্বধর্মের সমগুরুত্ব ভাবনা (equality of all religions)

(ছ) প্রকৃত জাতীয়তাবাদের ভাবনা (the spirit of true nationalism)

(জ) শারীর শ্রম (physical labour)

(ঝ) পরার্থভাবনা (thought of doing good to others)

(ঞ) সত্যাগ্রহ (non-violent non-cooperation)

১১.৬ সর্বোদয়ের সাধারণ ও সমাজকল্যাণমূলক বৈশিষ্ট

সর্বোদয় ভাবনা যে সব বৈশিষ্টের জন্য অন্যান্য ভাবনা বা দর্শন থেকে পৃথক তা হলো ঃ

(ক) শ্রমের মর্যাদা (dignity of labour) : সমাজের উত্থানের জন্য তার প্রতিটি সদস্যেরই সাধ্য অনুসারে শ্রমদান করা উচিত। সেই সঙ্গে সকলের এটিও বিবেচনায় রাখা উচিত যে, প্রতিটি কাজেরই যথার্থ মর্যাদা ও প্রয়োজন রয়েছে।

(খ) সক্রিয় অংশগ্রহণ (active participation) : জীবন অমূল্য, তাই শ্রমবিমুখতা বা আলস্য বরদাস্ত করা অনুচিত। অলস জীবন যাপন গতিময় উন্নয়নের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। সমাজে গঠনমূলক পরিবর্তন আনয়নের জন্য প্রতিটি ব্যক্তির উচিত উপযুক্ত কার্যক্রমে সক্রিয় অংশগ্রহণ।

(গ) সকলের জন্য সুখ (happiness for all) : কোন ব্যক্তিই একা সুখ বোধ করতে পারে না। সকলের মঙ্গলের বা উন্নতির মধ্য দিয়েই ব্যক্তির মঙ্গল বা উন্নতি হতে পারে। সমাজের প্রত্যেক মানুষের জীবনের মৌলিক চাহিদাগুলি মিটলে তবেই ব্যক্তির উন্নতি ও মঙ্গল সম্ভব।

(ঘ) সত্য এবং অহিংস নীতির উপর আস্থা (Faith in the principle of truth and non-violence) : সর্বোদয় ভাবনা বা আদর্শের বাস্তবায়নের জন্য সত্য এবং অহিংস নীতিকে অবলম্বন করা হয়, কোন ভাবেই চাতুরি বা হিংসার পথকে গ্রহণ করা হয় না।

(ঙ) উৎপাদিত সম্পদে অধিকার (Right in the goods produced) : সমাজের বিভিন্ন মানুষ যে সব উৎপাদনের কাজে যুক্ত হয়ে নানা দ্রব্য উৎপাদন করে সেইসব দ্রব্য ব্যবহারে তাদের অধিকার থাকবে। কোনভাবেই সেই উৎপাদিত দ্রব্য ভোগের ক্ষেত্রে তারা বঞ্চিত থাকবে না।

(চ) বিদেশে উৎপাদিত বস্তুর কদর না করে স্বদেশে উৎপাদিত দ্রব্যের ব্যবহারে গুরুত্বদান।

(ছ) সকল ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীলতা বজায় রাখা।

(জ) অস্পৃশ্যতার মত সমস্যাকে সমর্থন না করা।

(ঝ) সহজ সরল জীবনযাপন, নির্ভীকচিত্ততা, অপরের দ্রব্য অপহরণ না করা এবং স্বার্থত্যাগে উদ্বুদ্ধ হয়ে কাজ করা।

(ঞ) সর্বোদয় ভাবনার প্রকৃত রূপায়ণ ঘটেছে তার সুসংবদ্ধ পরিকল্পনার মাধ্যমে।

১১.৭ পরিসমাপ্তি

গান্ধীজির সর্বোদয় দর্শনের ভাবনা কয়েকটি স্তম্ভের উপর দাঁড়িয়ে আছে! সেগুলি হলো সত্য, প্রেম, অহিংসা, সম্পদের সঠিক তত্ত্বাবধান, কায়িক শ্রম ইত্যাদি। সমাজের সকল স্তরে ক্ষমতাবন্টন তখনই সম্ভব হবে যখন সকলে যার যার মত প্রয়োজনীয় কায়িকশ্রম করবে। শ্রম ব্যতিরেকে ফললাভের আশা করা যায় না। সর্বোদয় ভাবনার স্রষ্টা গান্ধীজি সুষ্ঠু সমাজ বলতে সমতা এবং অসুস্থ প্রতিযোগিতাহীন একটা ব্যবস্থার কথা ভেবেছেন। এখানে ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণের কথা বলা হয়েছে। স্বদেশী মতাদর্শ এবং স্থানীয় প্রয়োজনভিত্তিক উৎপাদনের প্রয়োজনীয়তাকে বিশেষ

মূল্য দিয়ে প্রতিযোগিতামূলক বাজার দখলের ভাবনার অপসারণের কথা বলা হয়েছে।

সর্বোদয়ের সার কথা হলো একটি শ্রেণীহীন, অশোষিত, স্বয়ংসম্পূর্ণ, সহযোগিতাপূর্ন ব্যবস্থা যেখানে দুর্নীতির কোন স্থান থাকবে না এবং লোকনীতির প্রাধান্য থাকবে যা সামাজিক কিছু নিয়মের মাধ্যমে ব্যক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করবে। অর্থাৎ হৃদয়কে জাগিয়ে ব্যক্তিমানসকে কর্মে এবং শ্রমে আগ্রহান্বিত করার প্রয়াস নেওয়া। গণতান্ত্রিক আদর্শের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন—যেখানে সব মানুষের অংশগ্রহণ একটি বিশেষ ভূমিকা নেবে এবং কোন এক বিশেষ স্তরে ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হবে না, অবিচার ও শোষণের বিরুদ্ধে অহিংস আন্দোলন এবং গঠনমূলক কর্মসূচীর মাধ্যমে সমাজে সর্বস্তরের সব ব্যক্তিমানুষের উত্তরণ এবং উন্নয়নই সর্বোদয়ের মূল ভাবনা।

সর্বোদয় ভাবনা সমষ্টি উন্নয়নের কাজে সুচিন্তিতভাবে ব্যবহার করতে পারলে সমষ্টি তার সমস্যা নিরূপণে, আস্থার প্রয়োজনে, সকলের মতামত সাপেক্ষে সর্বসাধারণের জন্য কল্যাণমুখী কর্ম সম্পাদনে স্বার্থকতা লাভ করবে। সার্বিক উন্নয়নের চিন্তা যেমন সমষ্টি উন্নয়নের একটি বিশেষ দিক—সমভাবে সর্বোদয়ও একই নীতিতে বিশ্বাসী।

সমাজকর্ম পেশায় সমষ্টি উন্নয়ন পদ্ধতির কাজে সর্বোদয় আন্দোলনের দর্শনকে কাজে লাগিয়ে সমাজকে সচেতন সত্যের দিকে অগ্রসর করানো গেলে মানবসম্পদ ক্রমাগত উন্নয়নমুখী চিন্তা করতে শিখবে, দায়িত্বের সঙ্গে নিজের শ্রম দান করতে পারবে।

১১.৮ প্রশ্নাবলী

১। 'সর্বোদয়' বলতে আমরা কি বুঝি এবং এর প্রয়োজনীয়তা কি?

২। 'সর্বোদয়' ভাবনার উৎপত্তি সম্পর্কে আলোকপাত কর।

৩। 'সর্বোদয়'-এর মুখ্য উদ্দেশ্য কি?

৪। 'সর্বোদয়'-এর বৈশিষ্টগুলি ব্যাখ্যা কর।

এম. এস. ডব্লু.

চতুর্থ পত্র

মানুষ ও সমাজ

(Man and Society)

প্রথম ভাগ ঃ সমাজতত্ত্ব

একক ১ □ সমাজতত্ত্ব, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, সামাজিক নৃতত্ত্ব, সামাজিক মনস্তত্ত্ব এবং অর্থনীতির প্রেক্ষাপটে সমাজের সংজ্ঞা ও সুযোগ। সমাজ কর্মের ক্ষেত্রে সমাজতত্ত্বের গুরুত্ব (Definition and scope of society from the angle of Economics, Social Psychology, Social Anthropology, Political Science and Sociology. Importance of Sociology in Social Work)

গঠন ঃ

১.১ প্রস্তাবনা

১.২ সমাজতত্ত্ব

১.৩ সামাজিক নৃতত্ত্ব

১.৪ সমাজ মনোবিদ্যা

১.৫ অর্থনীতি

১.৬ রাষ্ট্রবিজ্ঞান

১.৭ সমাজকর্মের ক্ষেত্রে সমাজতত্ত্বের গুরুত্ব

১.৮ অনুশীলনী

১.১ প্রস্তাবনা ঃ

মানব ও সমাজ সম্বন্ধে বিশদভাবে জানার আগে আমাদের জানা দরকার সমাজ সম্বন্ধে। কোন একটি নির্দিষ্ট ভৌগলিক সীমানার মধ্যে মানুষ যখন পারস্পরিক সম্পর্কে আবদ্ধ হয়ে বসবাস করে তাকে সমাজ বলে। সমাজবিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গীতে কোন একটি নির্দিষ্ট সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের মধ্যে অবস্থিত মানুষ ও গোষ্ঠীর মধ্যে পারস্পরিক নিবিড় সম্পর্ক ও ঘাত-প্রতিঘাতের সম্বন্ধজাল। মানুষ একটি সামাজিক প্রাণী। শিশু থেকে মানুষ হিসাবে রূপান্তরিত হয় কিছু প্রতিষ্ঠিত নিয়মকানুন ও আচার-ব্যবস্থার মাধ্যমে। সামগ্রিকভাবে এই বিষয়গুলি তার দৈনন্দিন ব্যবহারের ওপর প্রভাব রাখে। এই ব্যবস্থা মানুষকে স্বাধীনতা দেবার সঙ্গে সঙ্গে তার কর্ম ও আচার ব্যবহারের মানদণ্ডও বেঁধে দেয়। সমাজে স্বৈরাচার ও অত্যাচার দেখা গেলেও সমাজ ছাড়া মানুষ বাঁচতে পারে না। সামাজিক বিধান ও বিধিনিষেধের সঙ্গে থাকে পারস্পরিক সাহায্য ও সহযোগিতা, বিভিন্ন দল ও দলাদলি। এই ক্রমবিকাশ জটিল ব্যবস্থাকে আমরা society বা সমাজ বলি। সমাজের মধ্যে সামাজিক সম্পর্ক ও বন্ধনগুলি পরিবর্তনশীল।

সমাজ যতই জটিল, ততই বিচিত্র সামাজিক সম্পর্কগুলি। যেমন ভোটদাতার সঙ্গে ভোটপ্রার্থীর সম্পর্ক, মায়ের সঙ্গে শিশুর, কর্মীর সঙ্গে কর্মদাতার, বন্ধুর সঙ্গে বন্ধুর। অগণিত এমন ছোটবড়, প্রধান-গৌণ সম্পর্কে,

এক আদান প্রদান দেখা যায়। এই সম্পর্কগুলির কিছু হয়তো প্রধানতঃ অর্থনৈতিক, কিছু রাজনৈতিক, কিছু ব্যক্তিগত, কিছু নৈর্ব্যক্তিক, কিছু বন্ধুত্বসুলভ আবার কিছু প্রতিযোগিতা বা প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক। যে ধরনেরই সম্পর্ক হোক না কেন-বন্ধুতার বা শত্রুতার-সেই সম্পর্কের মধ্যে আছে পারস্পরিক স্বীকৃতি। সামাজিক সম্বন্ধের মধ্যে আছে সমষ্টিভুক্ত হয়ে এক অন্যের ওপর নির্ভরশীল হওয়া। শুধু তাই নয়, সামাজিক সম্পদ বা অনুভূতিকে ভাগ করে নেওয়াও সামাজিক জীবের এক বিশেষ দায়িত্ব। সমাজের প্রতি মানুষের অনেক কর্তব্য। আবার তেমনই থাকে সমাজ থেকে আশা ও প্রত্যাশা। সকলের আশা ও প্রত্যাশা পূরণ করা সামাজিক জীব হিসাবে আমাদেরই কর্তব্য।

এই আশা ও প্রত্যাশায় সাযুজ্যের সঙ্গে সঙ্গে পার্থক্যও থাকে। মিল না থাকলে একত্র বাস করবার প্রবণতা দেখা দেবে না। অনেক ক্ষেত্রেই একটি সমাজের বসবাসকারীদের মধ্যে শারীরিক ও মানসিক মিল দেখা যায়। এই সত্যটিকে উপলব্ধি করবার জন্যও এই শারীরিক ও মানসিক নৈকট্যের প্রয়োজন হয়। তাদের মধ্যে একটি মিলিত চেতনা জেগে ওঠে। সমাজ গঠনের প্রারম্ভে বা আদিম সমাজব্যবস্থায় এই ধরনের নৈকট্যের বিশেষ প্রয়োজন ছিল। যোগাযোগ ব্যবস্থার ব্যাপ্তিও আধুনিকতার সঙ্গে সঙ্গে বৈচিত্র এসে দেখা দিয়েছে যা একধরনের হওয়ার একঘেয়েমিকে ভেঙে দিচ্ছে বা দিয়েছে। সমাজের ধারণা ও চেতনা এমন বিস্তৃতি লাভ করেছে যে হয়তো বিশ্বমানবসমাজের ছবিও আমরা ধীরে ধীরে আঁকতে শুরু করতে পারি। অর্থনৈতিক উদারীকরণ ও পুঁজির বিশ্বায়নের সঙ্গে সঙ্গে সাংস্কৃতিক উদারীকরণ ও বিশ্বায়নও হয়েছে। কোন দেশিয় সমাজ তার সমাজ ও সংস্কৃতিকে ভৌগলিক/রাজনৈতিক সীমানায় আবদ্ধ রাখতে পারছে না। আমরা বিদেশি পোষাক পরছি, বিদেশি খাবার খাচ্ছি, বিদেশি ভাষা বলছি, বিদেশি নাচ রপ্ত করছি। তাই আমাদের সমাজ এক জায়গায় আটকে থাকছে না।

মানুষ মূলতঃ একটি সামজিক জীব। সে তার সুরক্ষা, আরাম, লালনপালন, শিক্ষা, সুযোগসুবিধা এবং নানাবিধ পরিষেবার জন্য এই সমাজের উপরেই নির্ভরশীল। তার চিন্তা-ভাবনা, আশা-আকাঙ্ক্ষা, স্বপ্ন, বিশ্বাস-সবই তার নিজস্ব সমাজ নির্ধারিত করে। সে জন্মেইছে সমাজের অঙ্গ হিসাবে, তার মৃত্যুও এই সমাজেই। সেজন্য একাকীত্বকে মানুষ ভয় করে। এমনকি সন্ন্যাসীরাও সংসার ত্যাগ করে গেলেও সমাজ বহির্ভূত হয়ে থাকেন না। জীবনধারণের জন্য তাঁরাও সমাজের ওপর নির্ভরশীল আর জ্ঞান বা ধ্যানলব্ধ উপলব্ধি ও অভিজ্ঞতা এই সমাজের মানুষের সঙ্গেই বিনিময় করে থাকেন।

সমাজ সম্পর্কিত আলোচনায় সমাজতত্ত্ব (Sociology), অর্থবিজ্ঞান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান ও সামাজিক নৃতত্ত্ববিজ্ঞানের সম্পর্ক জানা প্রয়োজন। এখানে সংক্ষিপ্তাকারে তা বিশ্লেষণ করা যেতে পারে।

১.২ সমাজতত্ত্ব (Sociology)

সমাজতত্ত্ব (Sociology) সমাজবিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার মধ্যে সর্বাপেক্ষা কনিষ্ঠতম। ফরাসী দার্শনিক অগস্ট কোঁৎ (August Comte) সর্বপ্রথম সমাজতত্ত্বের নামকরণ করেন। তাঁর পরবর্তীকালে মার্কস, স্পেনসার, ডুর্কহেইম, গিডিন্স, ম্যাক্স হেবার প্রমুখ সমাজবিজ্ঞানীরা সমাজতত্ত্বের দৃষ্টিকোণ থেকে সমাজের বিভিন্ন বিষয়কে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন।

ট্যালকট পার্সন্স বলেন, সমাজতত্ত্ব মানরগোষ্ঠী, সামাজিক সম্পর্ক এবং সামাজিক সংগঠন বা সংস্থাকে বিজ্ঞানসম্মতভাবে বিশ্লেষণ করে। হব্‌হাউস বলেছেন, সমাজতত্ত্ব মানবসমাজের বিশ্লেষণ যার অর্থ একটি সম্পর্কের সম্বন্ধজাল যার মধ্যে মানুষ একে অপরের সংস্পর্শে আসে (Society is the study of human society which means a web of relationships into which men enter with one another)। ম্যাকাইভার পেজ এই

সামাজিক সম্পর্ককে বিভাজিত করে তার স্বরূপ বর্ণনা করেছেন বিশেষতঃ সংঘমধ্যস্থিত সামাজিক সম্পর্কের যেটি মানুষের আচার ব্যবহারের স্বরূপ ও সত্বাকে নির্দেশ করে। সামগ্রিকভাবে বলতে গেলে সমাজতত্ত্ব সমাজজীবন ও সামাজিক উত্তরণের নিয়মকানুনের বিজ্ঞানসম্মত অনুধাবন। এটি সামাজিক সম্পর্কের স্থিতিশীল ও পরিবর্তনশীল সামাজিক সম্পর্কের গভীর অধ্যয়ন। বর্তমানে বিভিন্নরকম সামাজিক সমস্যার উৎস এবং সেগুলি দূরীভূতকরণের ব্যবস্থাদির কথাও সমাজতত্ত্বের বিষয়বস্তু।

সমাজতত্ত্ব সমাজের ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে সমাজ ও মানবের সামাজিক ব্যবহারকে বোঝবার চেষ্টা করে। সমাজের কোন দিকটায় বিশেষ নজর দেওয়া হচ্ছে তার ওপর নির্ভর করে বিভিন্ন সমাজ-অধ্যয়নের বিষয়গুলি। সমাজের বিভিন্ন দিক নয়, মূল ও সম্পূর্ণ সমাজটাকে নিয়েই অধ্যয়ন সমাজতত্ত্বের। তার অর্থ এই নয় যে বিভিন্ন সমাজকেন্দ্রিক বিষয়গুলিকে এক একটি বন্ধ ঘরের মধ্যে ভাগ করে রাখা যায়। অর্থবিজ্ঞান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, ইত্যাদি সবই সমাজকেন্দ্রিক, তবে একমাত্র সমাজ নিয়েই আবদ্ধ নয়। সেসব বিষয়ের বাস্তব উদ্দেশ্য একে অন্যের চেয়ে পৃথক এবং প্রত্যেকটির নিজস্ব এবং সীমিত আগ্রহ বা interest আছে।

সমাজবিজ্ঞানীরা সামাজিক সম্পর্কের যে কোনো অংশ সম্পর্কে জানতে চায়। তারমধ্যে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং ধর্মীয় সম্পর্কগুলিও থাকে। কিন্তু তার প্রকৃত আগ্রহ থাকে সমাজের সামাজিক দিকটির উপরেই। একটি মানবজীবনে বিভিন্ন দিক থাকে— অর্থনৈতিক, নান্দনিক, বা ধর্মীয় দিক। কিন্তু সবকিছুর মধ্যে সামঞ্জস্য আনে একমাত্র তার সামাজিক দিকটি। প্রতিটি কাজকর্মে বা আদানপ্রদানে মানুষ মানুষেরই সাথে যুক্ত। সমাজ হচ্ছে এমন এক স্থান যেখানে এই বিভিন্ন সম্পর্কের সম্পূর্ণতা দেখা দেয়। সম্পর্ক যতই বদলাতে থাকুক, এগিয়ে যেতে থাকুক, সমস্ত প্রভেদ ও বিভিন্নতা একই সূত্রে গাঁথা। এসবের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণ হ'তে পারে সমাজতত্ত্বের দ্বারাই। তাই সমাজের সামগ্রিক বিষয়গুলি নিয়েই সমাজতত্ত্ব বা **Sociology**।

১.৩ সামাজিক নৃতত্ত্ব (Social Arthropology)

সামাজিক নৃতত্ত্ব ও সমাজতত্ত্বের মধ্যে পার্থক্য খুবই সূক্ষ্ম যদিও সামাজিক নৃতত্ত্বর অধ্যয়নের বিষয়ের মধ্যে নির্দিষ্ট পার্থক্য রয়েছে। পার্থক্য লক্ষ করা যায় প্রয়োগের ক্ষেত্রেও। সামাজিক নৃতত্ত্ববিজ্ঞানীরা সাধারণতঃ ছোট ছোট সমাজের অধ্যয়ন করেন, যেগুলি বৃহত্তর সমাজ থেকে বিশেষভাবে আলাদা। আলাদা কারণ তাদের সামগ্রিক জীবন সমাজের অন্য অংশের মানুষের থেকে ভিন্নতা দাবি করে। এইসব জনসমষ্টি সম্পর্কে ইতিহাসেও তেমনভাবে লেখা হয়নি এবং জীবন জীবিকার সর্বক্ষেত্রে তাদের পরিবর্তন এমন যে প্রায় চোখেই পড়ে না।

এই পরিস্থিতির ক্ষেত্রে ধীরে ধীরে পরিবর্তন আসছে। বহু আদিম সমাজের উপরে আধুনিক পাশ্চাত্য সমাজের প্রভাব পড়তে শুরু করেছে। পাশ্চাত্য ভাবনা ও প্রযুক্তির প্রভাবে আদিবাসী সমাজজীবনেও নানা পরিবর্তন ঘটছে। এই পরিস্থিতির প্রভাব পড়েছে সামাজিক নৃতত্ত্ববিজ্ঞানীদের উপরও। তারা এখন সমাজ-তাত্ত্বিকদের মতোই পরিবর্তনের বিচারেও ব্রতী হয়েছে। তবু নৃতত্ত্ববিজ্ঞানীর অধ্যয়নের আওতা ক্রমে ক্রমে সঙ্কুচিত হয়ে পড়ছে কারণ পৃথিবীর মানচিত্র থেকে আদিম জাতি ও সমাজ ক্রমশঃ কমে আসছে। পার্থক্যও ক্রমে ক্রমে হ্রাস পাচ্ছে। যাই হোক, একথা স্পষ্টভাবে বলা যায়, নৃতত্ত্ব ও সমাজতত্ত্বের অধ্যয়ন শাখার ভাষা আলাদা, দৃষ্টিভঙ্গী আলাদা এবং অধ্যয়নশৈলী (method) আলাদা। তবে উভয়ের লক্ষ্য এখন মোটামুটি এক।

বর্তমান সমাজব্যবস্থা না সম্পূর্ণ আদিম, না পুরোপুরি শিল্পোন্নত ও আধুনিক। ভারতীয় সমাজে অত্যাধুনিক পরিস্থিতিতেও জাতিভেদ আছে, অন্ধবিশ্বাস আছে, শহরে বাস করেও নানা গ্রামীণ অভ্যাস বেঁচে আছে। তাই নৃতত্ত্ববিজ্ঞানী ও সমাজতাত্ত্বিককে কখনো কখনো একসঙ্গে কাজ করতে হয়।

১.৪ সমাজ-মনোবিদ্যা (Social Psychology)

মানুষের বা সামাজিক প্রাণীর মন নিয়ে চর্চাই হলো সমাজ মনোবিদ্যা। গিডিন্স বলেছেন, 'মনোবিজ্ঞান মন বা মানসিক প্রক্রিয়ার বিজ্ঞান' (Psychology is the science of mind or of mental process)। জন স্টুয়ার্ট মিল বলেছেন, মানুষের যাবতীয় কাজকর্মের পশ্চাতে তার মন কাজ করে। সমাজ মানুষকে নিয়ে এবং মানুষের দ্বারা গঠিত। মানুষের মনই মানুষের ব্যবহারকে নিয়ন্ত্রণ করে। তাই মানুষের কাজকর্ম, ব্যবহার ইত্যাদি বুঝতে গেলে মানুষের মনকে তো বুঝতেই হবে। অন্যদিকে ডুর্কহেইম বলেছেন, মানুষের সমস্ত কাজের পিছনে থাকে কোন সামাজিক ঘটনা (social facts)। সামাজিক তথ্য ও ঘটনাগুলি বুঝতে গেলে যারা সে কাজগুলি করছে, যাদের কারণে ঐ ঘটনাগুলি ঘটছে, তাদের বুঝতে চেষ্টা করতে হবে। তবে সমাজবিজ্ঞান পড়বার সময় আমরা মনস্তত্ত্বের দিকটা খেয়াল রাখিনা, আমরা একটি সামাজিক ঘটনার ওপরে অন্যান্য সামাজিক ঘটনার প্রভাব বোঝবার চেষ্টা করি। কোন সামাজিক ঘটনাকে একমাত্র মনস্তত্ত্বের দিক থেকে বিচার করা যায় না। কিন্তু সেই সঙ্গে এটাও অস্বীকার করা যায় না যে কেন একটি বা একাধিক মানুষ সেই ঘটনাটা ঘটালো তা বুঝলে সমাজকে সামগ্রিকভাবে বোঝা আরও সহজ হবে। এই ধরনের অধ্যয়নকে হয়তো বা আমরা সামাজিক মনস্তত্ত্ব বলতে পারি।

সমাজ মনোবিদ্যা একটি স্বতন্ত্র বিষয় হিসাবে সমাজতত্ত্বের ও মনোবিদ্যার পার্থক্য দূরে সরিয়ে দিয়েছে। যে কোনও মনস্তাত্ত্বিক ঘটনা সমাজের আওতার মধ্যেই ঘটে এবং তা সমাজকে বিভিন্ন মাত্রায় প্রভাবিত করে। যুদ্ধবিবাদ বুঝতে হলে সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক দু'রকমের ব্যাখ্যাই দিতে হয়, যদিও রাজনীতির মনস্তত্ত্বকে একইরকম প্রাধান্য দেওয়া হয় না। রাজনৈতিক ব্যবহারের সঙ্গে মনস্তত্ত্বের কোনও সম্পর্ক আছে বলে মনে করা হয় না। সামাজিক মনোবিজ্ঞানীর কাজ হচ্ছে বিভিন্ন সমাজে নারী ও পুরুষের ব্যবহার ও উদ্দেশ্যকে বোঝা। তার বাহ্যিক ব্যবহার ও কাজকর্মের সঙ্গে অন্তর্মুখী জীবনের একটা সমন্বয় খুঁজে বার করবার চেষ্টা করা হয়। বিভিন্ন সমাজে বিভিন্ন ধরনের মানুষ ও তাদের বিভিন্ন ধরনের ব্যবহার একে অন্যের সঙ্গে। এইখানে প্রশ্ন উঠছে বিভিন্ন সমাজে বিভিন্ন মানুষের ভূমিকার এবং অবদানের। সমাজগুলির মধ্যে একটা পারস্পরিক সম্পর্ক, সামাজিক জীবদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক; একটি সমাজের বাসিন্দাদের সঙ্গে অন্য অনেক সমাজের মানুষদের সম্পর্ক এবং একটি দলবদ্ধ নাগরিকের সঙ্গে আর একদল নাগরিকের সম্পর্ক-এসবই বুঝতে গেলে শুধুমাত্র সমাজতাত্ত্বিক হলে চলবে না, চাই মনোবিজ্ঞানীর সাহায্যও।

সমাজবদ্ধ জীবনে শুধুমাত্র ব্যক্তিচেতনা নয়, গোষ্ঠিচেতনা বা সাম্প্রদায়িক চেতনারও বিরাট মাহাত্ম্য। দলগত মত এবং জনসাধারণের মত শুধু রাজনৈতিক চিন্তাভাবনা নয়, সম্প্রদায়গত চিন্তাভাবনাও বদলে দেয় বা প্রভাবিত করে। দলগত ব্যবহার বা কাজকর্মের কারণ শুধু রাজনৈতিক চেতনাতে নয়, গোষ্ঠী বা সাম্প্রদায়িক চেতনাতে নিহিত থাকে। সেই চেতনার উৎস, কারণ ও ব্যাপ্তির কারণ বুঝতে হলে দলগত মনস্তত্ত্বের অধ্যয়ন প্রয়োজন। সমাজের সমষ্টিগত ব্যবহার বা ক্রিয়াকলাপ বুঝতে হলে, সেই সমষ্টির প্রতিটি ব্যক্তির, বিশেষ করে নেতৃস্থানীয়দের, মনস্তত্ত্ব বুঝতে হবে। তা না হলে একটি বিশেষ ঘটনা বা আন্দোলন বা কীর্তি বোঝা কঠিন হয়ে পড়ে। সাধারণ মানুষ যে এতো সহজে নেতার দ্বারা প্রভাবিত হয়, এবং তাদের এগিয়ে যাবার জন্য যে নেতার বা বিশেষ ব্যক্তিত্বের প্রয়োজন হয়, তার কারণ ও উপকারিতা বুঝতেও মনোবিজ্ঞানের প্রয়োজন এসে পড়ে।

মন আছে তাই মানুষ। এই অর্থে মানুষ অন্যান্য প্রাণীদের থেকে আলাদা। মন মানুষের জীবনের বা বেঁচে থাকার এক বিরাট সত্তা-শরীরের চেয়েও হয়তো বেশি। Stephen Hawking কে দেখে আমরা বুঝতে পারি যে শরীর অচল হ'লেও মন বা মাথা কাজ করতে পারে এবং তীব্রভাবে পারে। অতএব যে সব বিজ্ঞান মানুষকে নিয়ে কাজ করে, তা সমাজবিজ্ঞান, সমাজতত্ত্ব, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, নৃতত্ত্ব, অর্থনীতির মত মনোবিজ্ঞানও তাই সমাজবিজ্ঞানের

অঙ্গ। সমাজ সৃষ্ট হয়েছিল শুধুমাত্র মানুষের শারীরিক প্রয়োজনে বা আত্মরক্ষার তাগিদে, তা নয়। সমাজ সৃষ্ট হয়েছিল মানুষের মনের চাহিদা মেটাতে-যেমন ভাবের আদান-প্রদান (ভাষার মাধ্যমে) ও মনোভাবের আদান-প্রদান সম্ভব করতে। একে অন্যকে জানতে ও বুঝতে এবং আপনার করে নিতে সমাজের প্রয়োজন হয়। আর সেই সমাজকে সৃষ্টি করতে ও বাঁচিয়ে রাখতে প্রয়োজন হয় মনের। অতএব সমাজ ও সমাজবিজ্ঞানের সঙ্গে মনোবিজ্ঞানের এক অনস্বীকার্য সম্বন্ধ আছে।

১.৫ অর্থনীতি (Economics)

অর্থনীতির সঙ্গে সমাজের সম্পর্ক খুবই ঘনিষ্ঠ। অর্থনীতির মূল বিষয়বস্তু ধন ও তার সঙ্গে সম্পৃক্ত মানুষের কাজকর্ম। অর্থনীতির কর্মভূমি তো সমাজই। সামাজিক সম্বন্ধগুলিও নির্ণয় করে অর্থনীতি। যেমন বিবাহ শুধুমাত্র পারিবারিক ও সামাজিক আচারব্যবস্থা নয়, বিশেষভাবে অর্থনৈতিকও। দুইটি মানুষ একত্রিত হয় জৈবিক মিলন ও নিরাপত্তার খোঁজে। নিরাপত্তা দু'ধরনের-শারীরিক বা প্রাণের এবং খাদ্যবস্ত্র ও আশ্রয়ের। দ্বিতীয় নিরাপত্তাটির প্রাধান্য অধিক। খাদ্যবস্ত্র ও আশ্রয়ের নিরাপত্তা এই অর্থনৈতিক নিরাপত্তা থেকেই আসে। সন্তান পিতার সম্পত্তির (স্থাবর ও অস্থাবর) উত্তরাধিকারী হয়। সন্তানকে আর্থিক নিরাপত্তা দেয় পরিবার বা বিশেষভাবে পিতামাতা। আবার পিতামাতাকে দেখাশোনা করে সন্তান। এ সব সম্পর্কের বা পারস্পরিক নিরাপত্তা দানের ভিত্তি অর্থ বা অর্থনীতি। দুইটি বিভিন্ন সমাজের মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্যগত সম্পর্ক গড়ে ওঠে, যার ফলে সংস্কৃতির আদান-প্রদান হয়। সেও অর্থনৈতিক সম্বন্ধ ছাড়া সম্ভব নয়। দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে যখন দাঙ্গা লাগে, সেও প্রধানতঃ অর্থনৈতিক কারণেই-যেমন পাঞ্জাবে শিখ ভূমিহীন কৃষকেরা এবং প্রাক্-স্বাধীনতা কালে বাংলায় মুসলমান কৃষকেরা জমির মালিকানা চেয়েছিল। বর্তমানে যত আন্দোলন হয়েছে বা হচ্ছে বা সন্ত্রাসবাদ মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে তার পিছনেও রয়েছে আরো কিছু কারণের সঙ্গে অর্থনীতি। তারা জমির অধিকার চায় বা খনিজ সম্পদের (যেমন ঝাড়খণ্ডের ক্ষেত্রে) অধিকার বা নদীর জলের অধিকার চায়। ভুরি ভুরি উদাহরণ দেওয়া যায়। এসব কিছুর অধ্যয়নে সমাজবিজ্ঞান ও সামাজিক মনোবিজ্ঞান সাহায্য করে। সামাজিক নৃতত্ত্ববিজ্ঞানের দ্বারা মানবজাতির আদিম অর্থনৈতিক ধাঁচ ও সম্পর্কগুলিকে বোঝা যায়। অতএব প্রত্যেকটি বিষয়ের সঙ্গে প্রত্যেকটি বিষয়ের বেশ গুরুত্বপূর্ণ সম্বন্ধ বা বন্ধন রয়েছে।

সমাজবিজ্ঞানীদের গুরুত্বপূর্ণ অবদান আছে অর্থনীতি অধ্যয়নের ক্ষেত্রে। অর্থনীতি যে সম্পূর্ণ স্বয়ংসিদ্ধ বিষয় হ'তে পারে না, সে বিষয়ে অনেক আলোচনা প্রত্যালোচনা এবং অধ্যয়ন আছে। A. Lawe তাঁর বই 'অর্থনীতি ও সমাজবিজ্ঞান'-এ অর্থনীতির বৈশিষ্ট্য ও সীমা নিয়ে আলোচনা করেছেন। অর্থনীতির চিরাচরিত নীতির পেছনে যে দু'টি সমাজবৈজ্ঞানিক নীতি চোখে পড়ে তারও উল্লেখ করেছেন— একটি 'অর্থনৈতিক মানব', দ্বিতীয়টি উপাদানের উৎপাদনগুলি। অতএব অর্থনীতি ও সমাজবিজ্ঞানের মধ্যে অর্থপূর্ণ সহযোগিতা হতে পারে। বস্তুতঃ Talcott Parson এবং N J Smelser অর্থনৈতিক তত্ত্বকে সাধারণ সমাজবৈজ্ঞানিক তত্ত্বের অন্তর্গত করে ভেবেছেন। তাঁরা 'সমাজবৈজ্ঞানিক অর্থনীতি'র কথাও ভেবেছেন। মজুরি ও দামের মধ্যে বিশ্লেষণ করে মজুরির এক সমাজবৈজ্ঞানিক তত্ত্বে গিয়ে পৌঁছেছেন। ওঁরা মনে করেন মজুরির চিরাচরিত (classical) বিশ্লেষণে বা approach-এ অনেক অসম্পূর্ণতা রয়ে গেছে। মজুরি নির্ধারণের আসল পদ্ধতি ও তার সপক্ষের যুক্তিগুলিকে বুঝতে অর্থনীতির সঙ্গে সমাজবিজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তাও রয়েছে।

সমাজবিজ্ঞান অর্থনীতির মধ্যে সব থেকে বেশি ঢুকে পড়ে যখন অর্থনীতির সাধারণ পরিচিতিগুলো নিয়ে আলোচনা করা হয়। সমাজবিজ্ঞানীরা মানুষের অর্থনৈতিক ব্যবহারের এমন সব দিক নিয়ে আলোচনা করেছে যা

অর্থনীতিবিদরা হয়তো ভাবেননি। Marx-এর Capitalকে বোধহয় সমাজবৈজ্ঞানিক অর্থনীতিবিদ দ্বারা লেখা বলা যেতে পারে, যদিও Capital বা পুঁজি শুধুমাত্র অর্থনীতির আওতায় পড়ে বলে আমাদের ধারণা।

অর্থনীতির অন্যান্য অঙ্গ যেমন সম্পত্তির রীতি, শ্রমবিভাজন, কাজ ও চাকুরি ও শিল্পোদ্যোগ ইত্যাদিতেও সমাজ ও সমাজবিজ্ঞানীদের অবদান আছে সে কথা বলাই বাহুল্য। যতই হোক, এই অর্থনৈতিক কাজকর্ম (activities) সমাজের গভীর অর্থনীতির মধ্যে সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর করেছে, কারণ অর্থনীতির মধ্যেই উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন এসেছে। আধুনিক অর্থনীতির দুটি দিক এখানে উল্লেখ করা দরকার। প্রথম, বাজার কৌশল (mechanism) থেকে সম্পূর্ণ জাতীয় উৎপাদন ও জাতীয় আয়ের দিকে অধ্যয়নের মোড় ঘুরে গেছে। এই কারণে অর্থনৈতিক অগ্রগতির বা বিকাশের পেছনে যে সামাজিক প্রভাবগুলি আছে তার বিশ্লেষণ করেছেন অর্থনীতিবিদেরা। এটা অনুন্নত পরিস্থিতি বা সমাজে বিশেষভাবে প্রকট হয়ে দেখা দেয়। উন্নতির উপায় বুঝতে অর্থনীতিজ্ঞকে হয় সমাজবিজ্ঞানীর সাহায্য নিতে হয় আর না হলে নিজেকে অর্থনৈতিক সমাজবিজ্ঞানী হতে হয়। দ্বিতীয়তঃ অর্থনৈতিক model বা নমুনা তৈরী করতে গেলেও বর্তমান বা চালু সমাজব্যবস্থাকে বুঝতে হয়। যেমন অর্থনৈতিক বিশ্বায়ন বা বিদেশি পুঁজির নিয়োজন সাফল্যমন্ডিত হত না যদি না সাংস্কৃতিক বিশ্বায়নও হাত ধরে আসত। বিদেশি কাপড় তখনই বিক্রী হবে যখন বিদেশি কাপড় মানুষ পরতে শুরু করবে, বিদেশি পুঁজি তখনই এসে ঢুকবে যখন দেশীয় কোম্পানীগুলি আন্তর্জাতিক মানের জিনিস বানাতে পারবে না। এখানে শুধু সমাজ-বিবর্তন নয়, সামাজিক মনস্তত্ত্বেরও সহযোগিতা চাই চালু অর্থনীতিকে এবং তার গতিকে বোঝার জন্য।

১.৬ রাষ্ট্রবিজ্ঞান (Political Science)

রাষ্ট্রবিজ্ঞানও এমন একটি বিষয় যার মানবসমাজের বাইরে কোনও অস্তিত্ব নেই। মানুষের এক বিশেষ ব্যবহারের অধ্যয়ন হচ্ছে রাষ্ট্রবিজ্ঞান। অর্থবিজ্ঞান মানুষের খাওয়া-পরা, আশ্রয়, কর্মসংস্থান ইত্যাদি সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে চর্চা করে। তার বেঁচে থাকার যে ন্যূনতম অধিকার তা ভোগ করতে হলে অর্থনীতির সাহায্য চাই। অর্থনৈতিক চাহিদাগুলি না মিটলে বেঁচে থাকার সঠিক অধিকার প্রাপ্য হয় না। কিন্তু সেই সঙ্গে চাই স্বাধীনতা-বাক্ স্বাধীনতা, নিজেকে প্রকাশ করবার স্বাধীনতা, চাহিদাগুলি পরিপূরণের জন্য সমিতি বা সংস্থা তৈরির স্বাধীনতা এবং নিজেকে নিজের শাসনে রাখবার স্বাধীনতা, ইত্যাদি। এগুলি পেলেও যথাযথভাবে বাঁচা যায় না। মানুষ হিসাবে সম্যকরূপে বাঁচতে গেলে সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক স্বাধীনতা ও অধিকার এসবই চাই। মানুষ সামাজিক জীব হিসাবে, তার নির্দিষ্ট সমাজে বসে তার রাজনৈতিক অধিকারগুলি ভোগ করে এবং কায়েম রাখে। সমাজের বাইরে তার আচরণ-সে রাজনৈতিকই হোক না কেন-পরিষ্কারভাবে বোঝা যায় না।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানে রাজনৈতিক প্রাতিষ্ঠানিক সংগঠনগুলির (institutions) বিশেষ প্রাধান্য আছে। ক্ষমতার বন্টন ও নিয়ন্ত্রণের কারণে যে সমস্ত সমস্যাগুলি সামনে এসে দাঁড়ায় সেইগুলি এক বিশেষ স্থান অধিকার করে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে। দ্বিতীয়তঃ রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা প্রাধান্য দেন একটি সভ্য সমাজ, সরকার ও শাসকগোষ্ঠীর রীতিগত প্রথাকে (formal system)। সমাজবিজ্ঞানীরা সাধারণতঃ মাথায় রাখেন না আইনের কাঠামো ও রাজনৈতিক 'বাদ'গুলিকে- যেমন জাতিবাদ, সাম্রাজ্যবাদ, ইত্যাদি। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সঙ্গে রাষ্ট্রদর্শনের যোগ বুঝতে চেয়ে ছাত্রছাত্রীরা এক বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ আলোচনায় ঢুকে পড়ে। সমাজতাত্ত্বিকেরা সাধারণতঃ এই বৈশিষ্ট্যগুলি নিয়ে আলোচনায় প্রবিষ্ট হন না।

রাষ্ট্রবিজ্ঞান চর্চা এখন সমাজবিজ্ঞান চর্চার অন্যতম উপাদান। সেটা অনিবার্য। কারণ রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে কেবল রাষ্ট্রের কথা ভাবলে চলবে না, ভাবতে হয় রাষ্ট্রের বাসিন্দাদের সম্বন্ধে। রাজনীতির ক্রিয়াকলাপ যাদের হাতে, তারা তো এই সমাজেরই অংশ। তাদের প্রতিটি রাজনৈতিক পদক্ষেপের পেছনে সামাজিক চেতনা থাকে, থাকতে বাধ্য।

অর্থনীতিবিদরা হয়তো ভাবেননি। Marx-এর Capitalকে বোধহয় সমাজবৈজ্ঞানিক অর্থনীতিবিদ দ্বারা লেখা বলা যেতে পারে, যদিও Capital বা পুঁজি শুধুমাত্র অর্থনীতির আওতায় পড়ে বলে আমাদের ধারণা।

অর্থনীতির অন্যান্য অঙ্গ যেমন সম্পত্তির রীতি, শ্রমবিভাজন, কাজ ও চাকুরি ও শিল্পোদ্যোগ ইত্যাদিতেও সমাজ ও সমাজবিজ্ঞানীদের অবদান আছে সে কথা বলাই বাহুল্য। যতই হোক, এই অর্থনৈতিক কাজকর্ম (activities) সমাজের গভীর অর্থনীতির মধ্যে সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর করেছে, কারণ অর্থনীতির মধ্যেই উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন এসেছে। আধুনিক অর্থনীতির দুটি দিক এখানে উল্লেখ করা দরকার। প্রথম, বাজার কৌশল (mechanism) থেকে সম্পূর্ণ জাতীয় উৎপাদন ও জাতীয় আয়ের দিকে অধ্যয়নের মোড় ঘুরে গেছে। এই কারণে অর্থনৈতিক অগ্রগতির বা বিকাশের পেছনে যে সামাজিক প্রভাবগুলি আছে তার বিশ্লেষণ করেছেন অর্থনীতিবিদেরা। এটা অনুন্নত পরিস্থিতি বা সমাজে বিশেষভাবে প্রকট হয়ে দেখা দেয়। উন্নতির উপায় বুঝতে অর্থনীতিজ্ঞকে হয় সমাজবিজ্ঞানীর সাহায্য নিতে হয় আর না হলে নিজেকে অর্থনৈতিক সমাজবিজ্ঞানী হতে হয়। দ্বিতীয়তঃ অর্থনৈতিক model বা নমুনা তৈরী করতে গেলেও বর্তমান বা চালু সমাজব্যবস্থাকে বুঝতে হয়। যেমন অর্থনৈতিক বিশ্বায়ন বা বিদেশি পুঁজির নিয়োজন সাফল্যমণ্ডিত হত না যদি না সাংস্কৃতিক বিশ্বায়নও হাত ধরে আসত। বিদেশি কাপড় তখনই বিক্রী হবে যখন বিদেশি কাপড় মানুষ পরতে শুরু করবে, বিদেশি পুঁজি তখনই এসে ঢুকবে যখন দেশীয় কোম্পানীগুলি আন্তর্জাতিক মানের জিনিস বানাতে পারবে না। এখানে শুধু সমাজ-বিবর্তন নয়, সামাজিক মনস্তত্ত্বেরও সহযোগিতা চাই চালু অর্থনীতিকে এবং তার গতিকে বোঝার জন্য।

১.৬ রাষ্ট্রবিজ্ঞান (Political Science)

রাষ্ট্রবিজ্ঞানও এমন একটি বিষয় যার মানবসমাজের বাইরে কোনও অস্তিত্ব নেই। মানুষের এক বিশেষ ব্যবহারের অধ্যয়ন হচ্ছে রাষ্ট্রবিজ্ঞান। অর্থবিজ্ঞান মানুষের খাওয়া-পরা, আশ্রয়, কর্মসংস্থান ইত্যাদি সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে চর্চা করে। তার বেঁচে থাকার যে ন্যূনতম অধিকার তা ভোগ করতে হলে অর্থনীতির সাহায্য চাই। অর্থনৈতিক চাহিদাগুলি না মিটলে বেঁচে থাকার সঠিক অধিকার প্রাপ্য হয় না। কিন্তু সেই সঙ্গে চাই স্বাধীনতা-বাক্ স্বাধীনতা, নিজেকে প্রকাশ করবার স্বাধীনতা, চাহিদাগুলি পরিপূরণের জন্য সমিতি বা সংস্থা তৈরির স্বাধীনতা এবং নিজেকে নিজের শাসনে রাখবার স্বাধীনতা, ইত্যাদি। এগুলি পেলেও যথাযথভাবে বাঁচা যায় না। মানুষ হিসাবে সম্যকরূপে বাঁচতে গেলে সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক স্বাধীনতা ও অধিকার এসবই চাই। মানুষ সামাজিক জীব হিসাবে, তার নির্দিষ্ট সমাজে বসে তার রাজনৈতিক অধিকারগুলি ভোগ করে এবং কায়েম রাখে। সমাজের বাইরে তার আচরণ-সে রাজনৈতিকই হোক না কেন-পরিষ্কারভাবে বোঝা যায় না।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানে রাজনৈতিক প্রাতিষ্ঠানিক সংগঠনগুলির (institutions) বিশেষ প্রাধান্য আছে। ক্ষমতার বন্টন ও নিয়ন্ত্রণের কারণে যে সমস্ত সমস্যাগুলি সামনে এসে দাঁড়ায় সেইগুলি এক বিশেষ স্থান অধিকার করে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে। দ্বিতীয়তঃ রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা প্রাধান্য দেন একটি সভ্য সমাজ, সরকার ও শাসকগোষ্ঠীর রীতিগত প্রথাকে (formal system)। সমাজবিজ্ঞানীরা সাধারণতঃ মাথায় রাখেন না আইনের কাঠামো ও রাজনৈতিক 'বাদ'গুলিকে- যেমন জাতিবাদ, সাম্রাজ্যবাদ, ইত্যাদি। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সঙ্গে রাষ্ট্রদর্শনের যোগ বুঝতে চেয়ে ছাত্রছাত্রীরা এক বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ আলোচনায় ঢুকে পড়ে। সমাজতাত্ত্বিকেরা সাধারণতঃ এই বৈশিষ্ট্যগুলি নিয়ে আলোচনায় প্রবিষ্ট হন না।

রাষ্ট্রবিজ্ঞান চর্চা এখন সমাজবিজ্ঞান চর্চার অন্যতম উপাদান। সেটা অনিবার্য। কারণ রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে কেবল রাষ্ট্রের কথা ভাবলে চলবে না, ভাবতে হয় রাষ্ট্রের বাসিন্দাদের সম্বন্ধে। রাজনীতির ক্রিয়াকলাপ যাদের হাতে, তারা তো এই সমাজেরই অংশ। তাদের প্রতিটি রাজনৈতিক পদক্ষেপের পেছনে সামাজিক চেতনা থাকে, থাকতে বাধ্য।

তারা যে ভোট দান পদ্ধতিতে যোগ দেয় এবং দেওয়ার আগে যে চিন্তাভাবনা করে তা তাদের দৈনন্দিন জীবনযাপন এবং তার সুবিধা-অসুবিধাগুলি মাথায় রেখে। যে কোনও রাজনৈতিক নির্ণয়ের ভিত হচ্ছে সামাজিক চিন্তাধারা, চিন্তাভাবনা ও নির্ণয়।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিষয় মানুষের রাষ্ট্রনৈতিক কাজকর্ম। এটি একটি বিশেষ সমাজবিজ্ঞান যেমন রাষ্ট্রের উদ্ভব ও তার স্বরূপ আবার সাধারণ মানুষের সঙ্গে রাষ্ট্রব্যবস্থার সম্পর্ক। অধ্যাপক গিডিংস্ বলেছেন, যে মানুষের সমাজতত্ত্বের প্রাথমিক সূত্র সম্পর্কে কোন ধারণা নেই তাদের রাষ্ট্রের তত্ত্ব শিক্ষা দেওয়া যেন নিউটনের গতিতত্ত্ব সম্পর্কে অজ্ঞকে মহাকাশ বিজ্ঞান সম্পর্কে অবহিত করা (To teach theory of the state to men who have not learned the first principles of sociology is like teaching astronomy or thermodynamics to men who have not learned the Neutonian Laws of Motion-Professor Giddings)।

এজন্যই Political Sociology বা রাষ্ট্রবিজ্ঞান সমাজতত্ত্ব নামে একটি স্বতন্ত্র বিষয় হিসাবে উঠে এসেছে। যার লক্ষ্য বৃহত্তর মানবসমাজের নৈর্ব্যক্তিক আমলাতান্ত্রিক আচার-ব্যবহারকে ব্যাখ্যা করা। কতিপয় উচ্চশ্রেণির মানুষ আমলাতান্ত্রিক সংগঠন, গণমাধ্যম ও যোগাযোগ ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণভাবে ব্যবহার করে পারিবারিক বাঁধনকে শিথিল করে দিচ্ছে, সমষ্টিজীবনকে ভেঙ্গে দিয়ে মানুষকে সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিচ্ছে। এসব নিয়ে বিশ্লেষণাত্মক আলোচনা করাই রাষ্ট্রবিজ্ঞান সমাজতত্ত্বের উদ্দেশ্য।

অতএব আমরা উপলব্ধি করতে পারি যে, সমাজের উপরে ভর করেই দাঁড়িয়ে আছে উপরোক্ত প্রতিটি বিষয় বা অধ্যয়ন-অধ্যাপনের বিশিষ্ট অঙ্গগুলি-সমাজতত্ত্ব, সামাজিক নৃতত্ত্ববিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, অর্থনীতি এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞান।

১.৭ সমাজ কর্মের ক্ষেত্রে সমাজতত্ত্বের গুরুত্ব

সমাজ কর্মের লক্ষ্য মানুষ— যে মানুষ কোন না কোন পরিবার, গোষ্ঠী, সমিতি, সমষ্টির সদস্য। সে নানারকম সম্পর্কের বন্ধনে আবদ্ধ। তার সামাজিকীকরণও হয় উপরোক্ত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সদস্য হিসাবে। তার সামাজিক, আর্থিক, সাংস্কৃতিক জীবন আবর্তিত হয় ওগুলির মধ্যেই। মানুষের সমস্যা এবং সম্ভাবনা, হতাশা এবং উদ্দীপনা সবকিছুই সৃষ্টি হয় ঐ পরিবার, গোষ্ঠী, সমিতি বা সমষ্টির মধ্যে। তাই সমাজ কর্ম করতে গেলে উপরোক্ত উপাদানগুলি সম্পর্কে বিস্তারিত জ্ঞানের প্রয়োজন হয়। সমষ্টি সংগঠন (Community organisation), গোষ্ঠী কর্ম (Group work) বা ব্যক্তি কর্ম (Case work) যাই করি না কেন পরিবার-গোষ্ঠী-সমষ্টির কাঠামো, গতিপ্রকৃতি, বৈচিত্র ইত্যাদি সম্পর্কে অবহিত হতে হয়। সমাজতত্ত্ব এক্ষেত্রে কার্যকরী ভূমিকা নিতে পারে। সমাজতত্ত্ব সম্পর্কে প্রাথমিক জ্ঞান থাকলে উপরোক্ত উপাদানগুলি সম্পর্কে বিশ্লেষণধর্মী সিদ্ধান্তে পৌঁছতে সুবিধা হয়। এবং সেক্ষেত্রে সমাজকর্মের যে কোন উদ্যোগ সাফল্যমণ্ডিত হয়। তাই সমাজকর্মের ক্ষেত্রে সমাজতত্ত্বের প্রয়োজন সীমাহীন।

১.৮ অনুশীলনী

ক। সামাজিক নৃতত্ত্ব এবং সমাজতত্ত্বের মধ্যে পার্থক্য কী?

খ। সমাজ ও অর্থনীতি বিষয়ে একটি প্রবন্ধ লেখ।

গ। সামাজিক মনোবিদ্যা কী এবং তার প্রয়োজনীয়তা কী?

একক ২ □ সমাজের উপাদান—সমষ্টি, সংঘ এবং প্রতিষ্ঠান (Elements of Society—Community, Association and Institution)

গঠন ঃ

২.১ জনসমষ্টি
২.২ সংঘ / সমিতি
২.৩ প্রতিষ্ঠিত আচার ব্যবস্থা

সমাজ সংগঠনের মূলে রয়েছে সমষ্টি, একত্রিত হবার বাসনা থেকে জন্ম নেওয়া সংঘ এবং কিছু প্রাতিষ্ঠানিক সংগঠনাবলী। আমরা এক এক করে এই তিনটি উপাদান নিয়ে আলোচনা করব যে কি কারণে সমাজ ব্যবস্থা এই তিনটির উপর নির্ভরশীল।

২.১ জনসমষ্টি (Community)

জনসমষ্টির সংজ্ঞা দিতে গিয়ে ফার্ডিনান্ড টনিজ্ বলেছেন, এটি একটি জৈবিক, স্বাভাবিক সামাজিক সংঘ যার সদস্যরা প্রতিদিনের কাজকর্মের মধ্য দিয়ে একে অপরের সঙ্গে সম্পর্কের দ্বারা একীভূত অনুভব করে। (A Community is an organic, natural kind of social group whose members are bound together by a sense of belonging created out of everyday contacts covering the whole range of human activities).

ম্যাকাইভার (MacIver) বলেছেন, যে জায়গার মানুষের মধ্যে জীবনের একটা সাযুজ্য বর্তমান, তা গ্রাম বা তা থেকে বড় আয়তনের হতে পারে, তাই সমষ্টি। জনসমষ্টি বা সমষ্টি হিসাবে পরিগণিত হতে গেলে অন্যান্য জায়গা থেকে সেই জায়গাটির একটি স্বকীয়তা থাকবে, সাযুজ্যের একটি নিজস্ব বৈশিষ্ট্য থাকবে এবং তার একটি অর্থ-থাকবে। এটি একটি কোন এলাকার সামাজিক জীবনের সামগ্রিক সংঘ বা সংগঠন, কোন এক ব্যক্তির জীবন তার অন্তর্ভুক্ত। জনসমষ্টি মূলতঃ দুটি জিনিসের উপরে দাঁড়িয়ে আছে (ক) ভৌগলিক নিকটত্ব ও (খ) সমাজগত পূর্ণতা। যে কোন জনসমূহ একটি এলাকায় সমানভাবে বিস্তৃত থাকে না। তারা একটি গুচ্ছে (Cluster) একত্রিত হয় এবং সেই গুচ্ছের মধ্যেই একজন আরেকজনের সঙ্গে সম্পর্ক রক্ষা ও আদান প্রদান করে। এমন নয় যে তার বাইরে কোন আদান-প্রদান হয় না কিন্তু নির্দিষ্ট গুচ্ছের মধ্যেই তা বেশি হয়ে থাকে। পারস্পরিক যোগাযোগ, ধর্মানুষ্ঠান, সামাজিক কাজকর্ম, খেলাধূলা এবং আলোচনা-সমালোচনাও নিজ গুচ্ছের মানুষের মধ্যেই বেশি হয়।

এমন নয় যে আকস্মিকভাবে কিছু মানুষ একত্রিত বা কোন স্থান থেকে চ্যুত হয়। বিভিন্ন প্রয়োজনে তা হয়। যেমন একে অপরের সহায়ক হতে পারে, রক্ষাকারী হতে পারে, ভরসাদানকারী হতে পারে। এই ধরনের বন্ধনের ভক্ত হয়ে পড়ে বিশেষ গোষ্ঠীবদ্ধ মানুষেরা। উপকারিতা অনুভব করে ; এক বিশেষ শক্তির প্রবাহ যেন তাদের মধ্য দিয়ে বয়ে যায়। সেই সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষ তখন সাম্প্রদায়িক রীতি নীতি, আইন-বিধান মেনে চলতে চায় এবং মেনে চলতে বাধ্যও হয়।

একটি জনসমষ্টিকে একটি সমাজের ছোট সংস্করণ বলা যায়। এর ভৌগলিক আওতা স্বল্প এবং সীমিত। কিন্তু একটি সমাজের প্রায় সবকটি বৈশিষ্ট্য এর মধ্যে পাওয়া যায়। একটি সমষ্টি এলাকার ভিত্তিতে সীমিত হ'লেও,

সমাজের প্রধান প্রতিষ্ঠিত আচার ব্যবস্থাগুলি জোরালোভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকে। সমষ্টির মধ্যে বিভিন্ন স্তর ও স্বার্থগুলিও বজায় থাকে। একটি নির্দিষ্ট জাতি বা উপজাতিকে নিয়েও একটি জনসমষ্টি গঠিত হতে পারে আবার ভিন্ন ভিন্ন জাতি, ধর্মের মানুষকে নিয়েও তা গঠিত হতে পারে। সেক্ষেত্রে, বলা বাহুল্য, সম্প্রদায়টি কোনও ভৌগলিক বা সাংস্কৃতিক গণ্ডীর মধ্যে সীমিত থাকে না, থাকতে পারে না। সবরকম গণ্ডী, যেমন ভাষা, সামাজিক রীতি-নীতি, পোশাক-আশাক, খাদ্যাভ্যাস ইত্যাদির সীমানা পেরিয়েও তারা একটি জনসমষ্টি হতে পারে। বাঙালি মুসলমান ও কেরলের মুসলমানের মধ্যে নানা অমিল রয়েছে। অন্যদিকে বাঙালি হিন্দু ও বাঙালি মুসলমানের মধ্যে ধর্মমত এবং ধর্মীয় আচার-আচরণ ছাড়া প্রচুর মিল রয়েছে। ভারতের প্রতিটি ধর্মগোষ্ঠীর ক্ষেত্রে এই মিল ও অমিল প্রযোজ্য। অন্যদিকে এক ভাষাভাষী হ'য়েও এবং একই খাদ্য প্রণালীতে অভ্যস্ত হ'য়েও ধর্মীয় পার্থক্যের জন্য সবিশেষ পার্থক্য থেকে যায়, তাও অস্বীকার করা যায় না। তাই বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে বিভিন্ন মাপকাঠি প্রয়োগ করতেই হয়।

আমরা শুরুতে বলেছি যে ভৌগলিক নিকটত্ব বা একত্ব একটি জনসমষ্টি গঠনের ক্ষেত্রে বিশেষ প্রয়োজন। সমষ্টি গঠনের আদিপর্বে সেটা এক গুরুত্বপূর্ণ মাপকাঠি বা প্রয়োজন ছিল। কিন্তু এখন একই এলাকায়, নানা সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষের অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়।

জনসমষ্টির পৃথক রূপ :

আমরা একেক ধরনের জনসমষ্টিকে চিনতে পারি— (১) জনসংখ্যা, (২) বিস্তার ও সম্পদ, (৩) সমাজের মধ্যে জনসমষ্টির স্থান এবং কাজকর্ম, (৪) কি ধরনের সংগঠন ও প্রতিষ্ঠানাদি সমষ্টির মধ্যে পাওয়া যায় তার ভিত্তিতে। এই চারটি উপায়ে আমরা বিভিন্ন আদিম জমসমষ্টির মধ্যে, আদিম ও সভ্য সমাজের বা জনসমষ্টির মধ্যে, গ্রামীণ ও নগরকেন্দ্রিক জনসমষ্টির মধ্যেও দুটি গ্রামীণ বা দু'টি নগরকেন্দ্রিক জনসমষ্টির মধ্যে পার্থক্য বুঝতে পারি।

আদিম সভ্যতার বৈশিষ্ট্য ছিল যে মানুষ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাগে বিভাজিত ছিল, জনসংখ্যাও কম ছিল এবং ছড়ানো ছিটানো ভাবে বসবাস করত। সামাজিক সংগঠনগুলিও ছিল সহজ এবং ক্ষুদ্র, প্রযুক্তি ছিল অপরিণত ও আদিম। যাতায়াতের ব্যবস্থা ছিল অনুন্নত। সাধারণতঃ খাদ্য সংগ্রহ, মাছধরা এবং শিকার ছিল জীবনধারণের প্রধান উপায়।

চাষবাসের প্রচলনের সঙ্গে সঙ্গে একেটি জনসমষ্টি একেকটি গ্রামে বাস করতে লাগল। ধীরে ধীরে গ্রামীণ সভ্যতা উন্নত হওয়ার সাথে সাথে চাষ ছাড়াও অন্যান্য কাজ যখন গ্রামবাসীরা করতে লাগল, তখন একটি গ্রামে একাধিক জনসমষ্টি বাস করতে লাগল। শ্রমবিভাগের সঙ্গে সঙ্গে জনসমষ্টির মনোভাবের মধ্যেও পরিবর্তন এলো। যত আদিম, ততই কম ছিল শ্রমবিভাগ বা কাজের বৈচিত্র্য। মানুষ তখন অনেক বেশি স্বনির্ভর ছিল, কারণ জুতোসেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ সবরকম কাজই একেকটি পরিবার বা সমষ্টিকে একা হাতে করতে হত।

একেকটি গ্রামে যখন একেকটি সমষ্টি প্রতিষ্ঠিত হল তখন গ্রামে গ্রামে সাংস্কৃতিক পার্থক্য ও বৈচিত্র্য দেখা দিতে লাগল। শ্রমবিভাগ নয় (কারণ প্রত্যেকটি গ্রামে মোটামুটি এক ধরনের কর্মবিভাজন বা কর্ম-পারদর্শিতা দেখা দিতে লাগল), সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য হ'য়ে উঠল বিভিন্ন সমষ্টির পরিচয়। সভ্যতার বিকাশের প্রথম পদক্ষেপ হচ্ছে স্থানীয়ত্বের অবসান।

গ্রামীণ বনাম শহুরে সমষ্টি :

আধুনিক সভ্যতায় গ্রাম ও শহরের মধ্যে বিশেষ তফাৎ করা হয়। আদিম সভ্যতা পুরোপুরি গ্রাম্য সভ্যতা ছিল এবং এখনকার গ্রামগুলির মত তাদের উপরে কোনও শহুরে প্রভাব ছিল না। শহরের কতকগুলি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে (১) অল্প জায়গায় অধিক জনসংখ্যা, (২) যারা কিছু শহুরে সংগঠন, প্রতিষ্ঠান ইত্যাদির ওপরে বিশেষভাবে

নির্ভরশীল (৩) ক্ষুদ্রানুক্ষুদ্ররূপে শ্রম বা পারদর্শিতা বিভাজন হয়েছে বলে শহরবাসী ছোটবড় প্রতিটি কাজের জন্য, দৈনন্দিন জীবনযাপনের জন্য, অন্যের উপরে— যে অন্যকে তারা ব্যক্তিগতভাবে চেনে না— সর্বতোভাবে নির্ভরশীল। শহরে যে সুবিধা বা অধিকারগুলি পাওয়া যায়, বিশেষ করে শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে (যা দিয়ে কর্মকুশলতা বাড়ে), তা গ্রামবাসীদের শহরের দিকে আকৃষ্ট করে এবং তখন শহরের প্রভাব গ্রামীণ সমষ্টির উপর বেশ ভালোভাবেই পড়ে। কিন্তু গ্রামে নৈর্ব্যক্তিক পরিবেশ নেই, সকলে সকলের সঙ্গে পরিচিত, অতএব প্রয়োজনে সাহায্যের হাত বাড়াতে আগ্রহী। অতএব সমষ্টিভুক্ত মানুষ যে কোনও সীমানার মধ্যে থাকতে পারে— গ্রামে, শহরে, একটি উপজাতি (Tribe) অধ্যুষিত অঞ্চলে। একটি জনসমষ্টির বিভিন্ন আকার ও ব্যপ্তি থাকে। একটি ছোট সমষ্টি একটি বড় জনসমষ্টির অংশীভুত হ'তে পারে। আবার সেই পুরো এলাকা জুড়ে একটি জাতি বা nation-এর অংশভূত হ'তে পারে। সবশেষে আমরা বিশ্বগোষ্ঠী বা বিশ্ব জনসমষ্টিকেও অস্বীকার করতে পারি না।

এইভাবে বিশ্বস্তরের বিকাশকে আমরা আপন করে নিতে পারি এবং করা কর্তব্য। সভ্যতার পথে এগিয়ে যেতে হ'লে পৃথক পৃথক স্তরের, পৃথক পৃথক আকারের সম্প্রদায়কে জীবনযাত্রা থেকে আলাদা করা যাবে না। বর্তমান সভ্যতায় যেখানে শ্রমবিভাগ চরমে এবং পুঙ্খানুপুঙ্খ মাত্রায় পৌঁছেছে, সেখানে কোনও একটি জনসমষ্টির দয়ায় বাঁচা সম্ভব নয়। শুধু শিল্প ও শিল্পায়নের ক্ষেত্রে নয় কৃষি এবং কৃষিজাতি দ্রব্যের ক্ষেত্রেও বিভিন্ন জনসমষ্টির বা গোষ্ঠীর সাহায্য নিতে হয়। বস্তুতঃ বিশ্বমানবের, বিশ্বজনসমষ্টিরই মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হয়। বৃহৎ সমষ্টি আমাদের এনে দেয় সুযোগ-সুবিধা, স্থায়িত্ব, সমৃদ্ধি ও বৈচিত্র্যময় সংস্কৃতির সান্নিধ্য ও অর্থনৈতিক সম্পূর্ণতা। এছাড়া, বৃহৎ সমষ্টি দেয় আমাদের শান্তি ও নিরাপত্তা। অন্যদিকে ক্ষুদ্র জনসমষ্টি, যা এলাকা, বৃহত্তর পরিবার ও নিজের ছোট পরিবারের মধ্যে সীমিত থাকে, আমাদের দেয় বন্ধুত্ব, আন্তরিকতা, সন্তুষ্টি। তবে ছোট-বড় সব ধরনের সমষ্টিতেই মানুষকে হিংসা, প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্মুখীনও হ'তে হয়। তার পেছনে থাকে নানা কারণ। সবকিছু নিয়েই জনসমষ্টি আমাদের জীবনযাপনের একমাত্র স্থান ও গতি।

২.২ সংঘ/সমিতি (Association)

এটি একটি কতিপয় মানুষের গোষ্ঠী যারা কোন বিশেষ উদ্দেশ্যে বা স্বার্থ সাধনের জন্য গঠন করে। যেমন, শ্রমিক সংগঠন, রাজনৈতিক দল, যুব সংঘ, এমনকি রাষ্ট্র পর্যন্ত।

প্রধানতঃ তিনটি উপায়ে একটি জাতি বা সমষ্টির মানুষ তার উদ্দেশ্যসিদ্ধির চেষ্টা করে। প্রথমতঃ অন্যদের সুবিধা-অসুবিধার ব্যাপারে চিন্তা না করে সম্পূর্ণ নিজের মতে চলে। এ ধরনের পন্থা তার চলার পথকে সীমিত করে তোলে, বিশেষতঃ মানুষকে যখন একত্র থাকতেই হ'বে। দ্বিতীয়তঃ প্রথম পন্থাটির কারণে মানুষের মধ্যে কলহ ও অসহিষ্ণুতার সৃষ্টি হয়। এই ধরনের আচরণে সমগ্র সমাজ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। প্রতিদ্বন্দ্বিতা সমাজের, বিশেষ করে অর্থনৈতিক কাঠামোর এক অঙ্গ ঠিকই, কিন্তু সেটা যখন প্রবল শত্রুতার রূপধারণ করে, অসম সামাজিক ব্যবস্থা ও স্থায়িত্বের বিশেষ ক্ষতি হয়। তৃতীয়তঃ, এই সম্ভাবনা ও ভয় থেকে মুক্তি পেতে মানুষ একত্রিত হয়ে, সহযোগিতার হাত বাড়িয়েও উদ্দেশ্য সিদ্ধি করতে পারে। এইভাবে, প্রত্যেকেই তার সহবাসী ও সহকর্মীদের সঙ্গে হাত মিলিয়েও স্বার্থসিদ্ধি করতে পারে। স্বার্থসিদ্ধি সম্পূর্ণরূপে বিসর্জন দেওয়া কঠিন, কারণ উদ্দেশ্য ও স্বার্থ ছাড়া, মানুষ কোনওরকম কাজে লিপ্ত হতে উদ্বুদ্ধ হবে এমন সম্ভাবনা কম।

এই শেষোক্ত উপায়টি, অর্থাৎ সহযোগিতামূলক স্বার্থসিদ্ধি, স্বতঃস্ফূর্ত হ'তে পারে। বা এমনোও হ'তে পারে যে ঘটে গেছে, এবং কোনও বিশেষ চেষ্টা বা ইচ্ছা ছিল না তার পেছনে। আবার এটাও হ'তে পারে যে এই সহযোগিতা নিতান্ত স্বাভাবিকভাবে হতে পারে যেমন ফসল তোলার সময়ে চাষীরা পরস্পরকে সাহায্য করে।

উপরোক্ত মনোভাব নিয়ে যখন একটি দল সংঘবদ্ধ হয়, তখন সেই সংঘবদ্ধতার ফলকে Association বা সমিতি বলা যায়। সমিতির প্রতিটি সভ্যর থাকে সংঘবদ্ধ ইচ্ছা, উদ্দেশ্য ও স্বার্থ। এই দলবদ্ধ প্রয়োজনের স্বার্থে একটি সমিতির (Association) জন্ম হয় এবং এই সমিতির মাধ্যমে সেই দলটি (যা এক বা একাধিক উদ্দেশ্য নিয়ে একত্রিত হয়েছে) তার উদ্দেশ্যসিদ্ধি করে বা প্রয়োজন পূর্ণ করে।

অতএব সমিতি ও সম্প্রদায় এক নয়, যদিও দু'টোর মধ্যেই রয়েছে এক বিশেষ দলের একত্রিত হওয়া। কিন্তু সম্প্রদায় কোনও বিশেষ চেষ্টায় নির্মিত হয় না, ইতিহাসের গতিতে ধীরে ধীরে সংগঠিত হয়। জনসমষ্টিভুক্ত হ'য়ে একত্রিত হ'বার পিছনে বিভিন্ন, বৈচিত্র্যপূর্ণ একাধিক কারণ থাকে। একটি জাতির মধ্যে বিভিন্ন জনসমষ্টি ও একটি জনসমষ্টিতে বিভিন্ন উপজাতি পাওয়া যায়। সমিতির ক্ষেত্রে তা হয় না। একটি জনসমষ্টির এক বা একাধিক সমিতি থাকতে পারে, আবার বিভিন্ন জনসমষ্টি নিয়েও একটি সমিতি গঠিত হ'তে পারে। ব্যবসায়ীদের সমিতিতে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোক থাকবে স্বাভাবিকভাবেই। আবার চার্চকে যদি সমিতি ধরা হয়, তাহলে তা গঠিত হয় একটিই ধর্ম সম্প্রদায়ের সদস্যদের নিয়ে। কিন্তু খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের মধ্যে বাঙালি, অবাঙালি থাকতে পারে। অতএব পুরোপুরি একই সম্প্রদায়ের মানুষকে সমিতিতে পাওয়া যায় না।

দ্বিতীয়তঃ, আমরা একটি জনসমষ্টিতে জন্মগ্রহণ করি এবং সেই জন্মসূত্রে তার অন্তর্ভুক্ত হই। কিন্তু আমরা বড় হয়ে, বিচার-বিবেচনা করে, সম্পূর্ণ স্বেচ্ছায় একটি সমিতির সভ্য বা সভ্যা হই। কারণ সমিতি একটি বিশেষ উদ্দেশ্যে গঠিত এবং তার বাইরে সমিতিটির কোনও এক্তিয়ার নেই। অন্যদিকে একটি সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্যের প্রায় সীমা নেই বলা চলে। যতজন সভ্য, ততটি উদ্দেশ্য থাকতে পারে এবং একটিমাত্র সভ্যরও যদি উদ্দেশ্যসাধন হয়, জমসমষ্টি সে দিকে নজর না দিয়ে পারে না। এরকম বিভিন্ন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য একজন মানুষকে অসংখ্য সমিতির সভ্য হ'তে হয়। তাছাড়া, একটি জনসমষ্টিতে থাকবার জন্য মানুষকে বিশেষভাবে ইচ্ছাপ্রকাশ করতে হয় না। সে স্বভাবিকভাবেই, জন্মাবধি সেই সমষ্টির অন্তর্গত, অতএব সে তাই-ই থাকবে যতক্ষণ না স্বেচ্ছায়, সুচিন্তিত মতামত নিয়ে সে জনসমষ্টিকে ত্যাগ করছে।

এমন হ'তে পারে যে সমিতির কাজকর্মে আমাদের যে আগ্রহ-বা নিষ্ঠা, তেমন আগ্রহ জনসমষ্টির কাজে নেই। আমরা হয়তো অজ্ঞাতভাবে এবং অবহেলার সঙ্গে আমাদের জনসমষ্টিভুক্ত, কিন্তু সমিতির ব্যাপারে বিশেষ ঔৎসুক্যপরায়ণ এবং দায়বদ্ধ। তবু আমরা অতিসহজেই সমিতির আওতার বাইরে চলে আসতে, সমিতি ছেড়ে দিতে পারি, একত্র হওয়ার বাসনা ত্যাগ করতে পারি। কিন্তু জনসমষ্টির ক্ষেত্রে এসব কোনটাই প্রযোজ্য নয়। সম্প্রদায়-বহির্ভূত হ'লে মানুষ স্বীয় অস্তিত্ব-বহির্ভূত, পরিচয়-বহির্ভূত হয়ে যাবে।

আধুনিক নাগরিক সভ্যতায় পরিবারকে, বিশেষ করে অনুপরিবারকে একটি Association মনে হয়। কারণ অনু-পরিবারের প্রতিটি প্রাপ্তবয়স্ক যেন এক চুক্তিতে আবদ্ধ হয়ে রয়েছে—একসঙ্গে থাকবার চুক্তি, কারণ একসঙ্গে থাকলে দৈনন্দিন জীবনযাপনের কিছু সুবিধা পাওয়া যায়। একসঙ্গে থাকবার পিছনে বিশেষ উদ্দেশ্য, বিশেষ স্বার্থসিদ্ধি থাকে। কিন্তু প্রথাগত বা traditional অর্থে পরিবার চুক্তি বা সমিতি নয়, একটি অনু-জনসমষ্টি। জনসমষ্টি ছাড়া যেমন মানুষ বাঁচতে পারে না, তার কোনও পরিচয় নেই, সেরকম পরিবার (বাবা-মা, ভাই বোন, স্বামী-স্ত্রী, সন্তান-সন্ততি, ইত্যাদি) ছাড়াও বাঁচা কঠিন। হয়তো কাউকে একা জীবন যাপন করতে হয়। কিন্তু জীবনের প্রারম্ভে সেও একটি পরিবারভুক্ত ছিল। যদি অনাথও হয়, তাহলেও অনাথালয় বা যারা তাকে বড় করেছে, তাদের পরিবারের অংশ ছিল।

এখন প্রশ্ন উঠতে পারে রাষ্ট্র (State) কি একটি সমিতি? জনসমষ্টিতে যতই আমরা একটি রাষ্ট্রের আওতার মধ্যে জন্মগ্রহণ করি কিন্তু একটি সমিতির মতনই কিছু সবিশেষ উদ্দেশ্যসাধনের জন্য একটি রাষ্ট্রের অন্তর্গত হই।

জনসমষ্টির মত রাষ্ট্রের আওতা ও আয়ত্বের ভিতর থেকে যে বেরিয়ে আসা যায় না, তা নয়। নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে এক রাষ্ট্রের মানুষ অন্য রাষ্ট্রে নাগরিকতা গ্রহণ করতে পারে। মোদ্দা কথা হল রাষ্ট্র ও সমিতি থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করা যায় কিন্তু জনসমষ্টি থেকে যায় না।

রাষ্ট্র ও সাধারণ সমিতি এক নয়। যেমন আগে বলা হয়েছে প্রাপ্তবয়স্করা নিজের ইচ্ছায় একটি বা কয়েকটি উদ্দেশ্য মাথায় রেখে সমিতি গড়ে। সেই সমিতির সভ্য-সভ্যা হওয়া সম্পূর্ণ স্বেচ্ছিক। লোকে জনসমষ্টি বা রাষ্ট্রের মত সমিতিতে জন্মগ্রহণ করে না। রাষ্ট্রের নাগরিক হওয়া পুরোপুরি স্বেচ্ছিক নয়। প্রতিটি শিশু একটি জনসমষ্টিতে ও রাষ্ট্রে জন্মায়, লালিত পালিত হয়, শিক্ষা, দীক্ষা, পায় এবং বড় হয়ে কাজকর্ম ও দায়িত্ব পায়। বড় হয়ে সে হয়তো অন্য একটি রাষ্ট্রের নাগরিক হ'বার সিদ্ধান্ত নেয়। যতক্ষণ না সে ইচ্ছা বিশেষভাবে প্রকাশ করা হচ্ছে, ততক্ষণ সে স্বাভাবিকভাবে এবং পূর্বনিয়ন্ত্রিতভাবেই একটি রাষ্ট্রের অঙ্গীভূত হয়ে থাকে। কিন্তু সমিতিতে সে স্বাভাবিকভাবে আসে না, বিশেষ ইচ্ছা এবং interest সহকারে সেটিতে যোগদান করে। যখন তার প্রয়োজন ও Interest বা আগ্রহ ফুরিয়ে যায়, সে সহজেই বেরিয়ে আসে তার নিয়মকানুনের গণ্ডী থেকে।

সমিতির মতই রাষ্ট্রের কিছু পূর্বপরিকল্পিত এবং পূর্বনির্ধারিত কর্তব্য থাকে। জনসমষ্টির কর্তব্য নিজের প্রয়োজনে ও গতিতে বিবর্তিত হয়ে আসে। কিন্তু রাষ্ট্রের কর্তব্যাবলী ও ক্ষমতাবলী মোটামুটিভাবে স্থায়ী ও অপরিবর্তনীয় থাকে এবং রাষ্ট্রের সঙ্গে ব্যক্তির সম্বন্ধও স্থায়ী বা দীর্ঘ প্রসারী থাকে। রাষ্ট্রের কাছে থাকে ব্যক্তির বা নাগরিকের আশা, প্রত্যাশা ও দাবি-যা পরিস্থিতি অনুযায়ী কমতে বাড়তে পারে। কিন্তু সমিতির কার্য্যকলাপ ও কার্য্যক্ষমতা সম্বন্ধে নাগরিক প্রথম থেকেই ওয়াকিবহাল থাকে এবং নিজের হাতে সৃষ্ট সেই আশা-প্রত্যাশাগুলির ব্যাপ্তি বা সীমাও নিজেরাই স্থির করে। রাষ্ট্র, জনসমষ্টির মত, জীবনের এবং জীবনধারণের প্রায় প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ঢুকে থাকে, হয়তো তার অধিকারও থাকে একটি নাগরিকের জীবনে সামগ্রিকভাবে সে প্রভাব রাখবার। সমিতির সে অধিকার বা প্রয়োজন থাকে না।

২.৩ প্রতিষ্ঠিত আচার ব্যবস্থা (Institution)

প্রতিষ্ঠিত আচার ব্যবস্থায় অনুমোদিত ও প্রতিষ্ঠিত কতকগুলি রীতি বা আচার যেগুলি মানুষ ও গোষ্ঠীর মধ্যে সম্বন্ধকে নিয়ন্ত্রণ করে। একটি কার্য্য ধারার (Procedure-এর) প্রতিষ্ঠিত (established) ধরন বা ধারাকে হয়তো বা Institution বলা যায়। কোনও একটি ধারা বা ধরনকে যখন সামাজিকভাবে প্রতিষ্ঠিত করা হয়, সামাজিক আইন বা রীতি-নীতি দ্বারা সিদ্ধ করা যায়, তাকে Institution বা প্রাতিষ্ঠানিক সংগঠন বলা যেতে পারে।

সামাজিকভাবে প্রতিষ্ঠিত আচার ব্যবস্থা এক সামাজিক কাঠামো ও যন্ত্র যার মাধ্যমে মানুষ সংগঠিত করে, নির্দেশ দেয় এবং কার্য্যে পরিণত করে। মানুষের বিভিন্ন ও বিচিত্র প্রয়োজন মেটাতে মানুষকে বিভিন্ন ধরনের ক্রিয়াকলাপে যুক্ত হতে হয়। এই অর্থে পরিবার, বিবাহ, রাষ্ট্র ও সরকার-এ সবই প্রাতিষ্ঠানিক সংগঠন। যৌথ কার্য্যকলাপের জন্য যে ধরনের ধাঁচা, শর্ত, নিয়মকানুন ও রীতিনীতির প্রয়োজন—এ সবই প্রতিষ্ঠিত আচার ব্যবস্থা।

এই পর্যায়ে এসে বোধহয় Institution ও Association -এর মধ্যে পার্থক্যটা বোঝা দরকার। সমিতিকে বেঁধে রাখবার জন্য এবং সুষ্ঠুভাবে তার উদ্দেশ্যসাধন করবার জন্য যে নিয়মাবলীর প্রয়োজন হয়, তাকেও প্রাতিষ্ঠানিক সংগঠন বলা যেতে পারে। প্রত্যেকটি সমিতি তাই স্বীয় প্রয়োজন অনুযায়ী বিশেষ বিশেষ প্রাতিষ্ঠানিক সংগঠনের প্রতিষ্ঠা করে। একটি বিশেষ church একটি বিশেষ সমিতি আর সেই বিশেষ সমিতির আছে একান্ত নিজস্ব, সবিশেষ উপাসনা পদ্ধতি বা সংস্কার। সেগুলি সেই বিশেষ সমিতির প্রাতিষ্ঠানিক সংগঠন।

রাষ্ট্রেরও কিছু প্রাতিষ্ঠানিক সংগঠন আছে যা দিয়ে সেটিকে চেনা যায়— যেমন অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতা ও কর্তব্য, নাগরিকের সেবার জন্য বিভিন্ন সংস্থা ও সংগঠন। আমাদের সংসদ, বিধানসভা, আদালত ও ন্যায় প্রথা ইত্যাদিকে একটি সরকারের প্রাতিষ্ঠানিক সংগঠন বলা হয়।

এখানে একটা খুব বড় কথা হোল যে আমরা একটি সম্প্রদায় বা সমিতির অঙ্গ হ'তে পারি এবং হ'য়ে থাকি, কিন্তু একটি প্রাতিষ্ঠানিক সংগঠনের অঙ্গ হ'তে পারি না। কিন্তু আমাদের ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবন—দুইয়ের উপরই থাকে বিভিন্ন ও বিচিত্র প্রাতিষ্ঠানিক সংগঠনাবলীর প্রভাব। নিম্নবর্তী ছকের সাহায্যে আমরা আরো ভালোভাবে বুঝতে পারবো সমিতি ও প্রাতিষ্ঠানিক সংগঠনের পার্থক্য এবং সেইসঙ্গে যোগও। পার্থক্যের মধ্যেই যেন রয়েছে দু'টির মধ্যে এমন বন্ধন যার ফলে একের অস্তিত্ব নেই অন্যের ব্যতিরেকে।

সমিতি (Association)	প্রতিষ্ঠিত আচার ব্যবস্থা (Institution)	গঠনের কারণ
১। পরিবার	বিবাহ, গৃহ বা গার্হস্থ্য, উত্তরাধিকার	যৌনতা, গার্হস্থ্য বা গৃহ এবং পিতামাতা হ'বার আকাঙ্ক্ষা
২। কলেজ বা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান	শিক্ষাদান,	বিদ্যার্জন,
৩। ব্যবসা-বাণিজ্য	হিসাবপত্র, পুঁজি, বিনিয়োগ	মুনাফা
৪। শ্রমিক সংগঠন (Trade Union)	সংঘবদ্ধভাবে দরাদরি,	কার্যে নিরাপত্তা, মজুরীর হার, মানবীয় কর্মব্যবস্থা
৫। ধর্মসংস্থা	পুজো, পাঠ, প্রচার	ধর্মীয়ভাব উদ্রেক
৬। রাজনৈতিক দল	দলচালনা, রাজনৈতিক খুঁটি, নির্বাচন, ইত্যাদি	ক্ষমতা, রাজনৈতিক নীতির প্রতিষ্ঠা
৭। রাষ্ট্র	সংবিধান, আইন, সরকারের বিভিন্ন স্তর ও কাজ	দেশের ও জাতির নিয়ন্ত্রণ ও উন্নয়ন

এখন জনসমষ্টি ও প্রতিষ্ঠিত আচার ব্যবস্থার মধ্যে তফাৎটা বোঝা প্রয়োজন। জনসমষ্টি ও সমিতি দুটিই প্রতিষ্ঠিত আচার ব্যবস্থার জন্ম দেয়। যেমন বিভিন্ন উৎসব, অনুষ্ঠান যা আমোদ-প্রমোদের এক বিশিষ্ট অঙ্গ। সেইসবের রীতি-নীতিগুলি জনসমষ্টির প্রাতিষ্ঠানিক সংগঠন।

একটি জনসমষ্টির প্রতিষ্ঠিত আচার ব্যবস্থা বিশেষ ইচ্ছা বা প্রচেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত হয় না। সেগুলি জনসমষ্টির স্বতঃস্ফূর্ত ও স্বাভাবিক প্রয়োজনে বা তাদের কোনও আকাঙ্ক্ষা বা দাবি মেটাতে সৃষ্ট হয়। সেগুলি ধীরে ধীরে সামাজিক স্বীকৃতি পায় এবং ইতিহাসের একটি বিশেষ সময়ে প্রতিষ্ঠিত হয়। যেমন নারীপুরুষের সম্পর্ক বা বিবাহ প্রণালীর অনেক পরিবর্তন বা বিবর্তন হয়েছে আধুনিকতা বা বিশ্বায়নের জোয়ারে। ধার্মিক প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যেও উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন এসেছে। তারা শুধুমাত্র ধর্মচিন্তা বা ধর্মাচরণে সীমিত না থেকে জনসেবামূলক কাজ করছে। ধর্মনিরপেক্ষ সমাজসেবামূলক সংগঠনও প্রচুর গড়ে উঠেছে। তাই হয়তো বলা যায় সমাজসেবা বর্তমান জগতে এক প্রধান প্রাতিষ্ঠানিক সংগঠন।

অতএব institution-এর কোনও সুনিশ্চিত আরম্ভ নেই আর নেই কোনও সুনিশ্চিত বা অপরিবর্তনীয় পরিচিতি। ইতিহাসের পাতায় পাতায় প্রতিষ্ঠিত আচার ব্যবস্থার ওঠা-নামার ভুরি ভুরি নিদর্শন আছে। যেমন প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্র, পুঁজিবাদ ও তার ক্রমবর্ধমান দাপট, বহুবিবাহের বিবর্তনমূলক অবসান, ইত্যাদি। একটি

সমাজে যেমন বিভিন্ন প্রাতিষ্ঠানিক সংগঠন থাকে, সেরকম একটিই institution বিভিন্ন সমাজে থাকতে পারে। বিবাহ প্রতিটি সমাজ ও জনসমষ্টিতে আছে, কিন্তু বিবাহের রকমফেরও আছে। সেই দৃষ্টিভঙ্গী থেকে প্রতিটি সমাজ পৃথক হওয়া সত্ত্বেও তাদের মধ্যে সাধারণ যোগসূত্র পাওয়া যায়। এই প্রসঙ্গে আমাদের মনে রাখা দরকার যে সৃষ্ট হলেও এবং বিবর্ত্তিত না হলেও, কোনও প্রতিষ্ঠিত আচারব্যবস্থাই বন্ধ ঘর নয়। সেই ঘরের মধ্যে মানুষের আসা-যাওয়ার কারণে বিবর্তন-পরিবর্তন ঘটতেই থাকে। বিবাহ সম্বন্ধে জানতে হ'লে বিবাহ-সংক্রান্ত অনেক কিছু সম্বন্ধে জানতে হবে— যেমন বিবাহের সঙ্গে পরবর্তী institution গুলির সম্বন্ধ— যেমন আইন, সম্পদ ও সম্পত্তি, কুটুম্বিতা ও ধর্মসংক্রান্ত প্রতিষ্ঠিত আচার ব্যবস্থা। এগুলি একটি দল বা গোষ্ঠী দ্বারা সৃষ্ট হ'তে পারে বা আইন দ্বারা সিদ্ধ হ'তে পারে। যে কোনও সামাজিক বাস্তবতা বা সত্যতা বুঝতে হ'লে প্রতিষ্ঠিত আচার ব্যবস্থাকে ভালোভাবে বুঝতে হ'বে।

একটি সমিতির প্রয়োজন ও ব্যাপ্তি অনুযায়ী বিভিন্ন ধরনের প্রতিষ্ঠিত আচার ব্যবস্থা থাকে। আবার একই প্রতিষ্ঠিত আচারব্যবস্থা যেমন সভ্য হ'বার নিয়মাবলী, প্রতিটি সমিতিতেই থাকে। কী ধরনের প্রাতিষ্ঠানিক সংগঠন হ'বে সেটা স্বভাবতঃই নির্ভর করে সমিতির সভ্যদের প্রয়োজন ও আগ্রহ অনুযায়ী।

আশা করি, আমরা উপরের আলোচনাগুলির মাধ্যমে জনসমষ্টি, সমিতি ও প্রতিষ্ঠিত আচার ব্যবস্থা (Community, Association এবং Institution)- এর পার্থক্য ও মিল বুঝতে পেরেছি। আশা করি, এও বুঝতে পেরেছি যে তিনটি তিনটিকে কীভাবে প্রভাবিত করে এবং বাঁচিয়ে রাখে। সমাজকে সম্যকরূপে বুঝতে গেলে এই তিনটির সঙ্গে পরিচয় বিশেষ দরকার। কারণ এই তিনটি পরস্পরের পরিপূরক।

একক ৩ □ ভারতের সামাজিক কাঠামো—শহুরে, গ্রামীণ, চিরাচরিত, আধুনিক এবং উপজাতীয় (Indian Social Structure— Rural, Traditional, Modern and Tribal)

গঠন ঃ

৩.১ প্রস্তাবনা

৩.২ গ্রামীণ ও আধুনিক সামাজিক কাঠামো

৩.৩ আদিবাসী সামাজিক কাঠামো

৩.৪ পরিসমাপ্তি

৩.৫ অনুশীলনী

৩.১ প্রস্তাবনা

ভারতীয় সমাজের কাঠামোর বৈশিষ্ট্যগুলি বিভিন্ন দিক থেকে বিশ্লেষণ করা যেতে পারে যেমন প্রাচীন বা প্রথাগত বনাম আধুনিক, গ্রামীণ বনাম উপজাতীয় ইত্যাদি। আমাদের সভ্যতায় নানারকমের সামাজিক অবস্থা দেখা যায়। এমনও দেখা যায় যে একই পরিবারে অত্যাধুনিক সদস্যের সঙ্গে প্রাচীনপন্থী সদস্য বসবাস করছে এবং একই শহরে বসবাসকারী মানুষের মধ্যে গ্রাম্য ও শহুরে মানসিকতা লক্ষ্য করা যায়। দুই বন্ধুর মধ্যেও সে ধরনের পার্থক্য থাকা একেবারে অস্বাভাবিক নয়। দুই প্রজন্মের মধ্যে তো সে পার্থক্য থাকেই। কিন্তু এই বৈপরীত্যের মধ্যেও একসাথে বসবাস করা সম্ভব হচ্ছে কারণ প্রাচীনপন্থী বা আধুনিক, গ্রামীণ বা শহুরে কোন পুরোপুরি বিভক্ত দল নয়। তাদের মধ্যে আদান-প্রদান আছে, মেলামেশা আছে, পরস্পরের সঙ্গে মানিয়ে চলার চেষ্টা আছে। কোন সভ্যতা একা একা, নিজের অহংকারে সমৃদ্ধি লাভ করেনি। ব্যবসা-বাণিজ্য, সাহিত্য-সংস্কৃতি, যুদ্ধবিগ্রহের মধ্য দিয়ে ভালো মন্দের আদান-প্রদান ঘটেছে। সেরকমই প্রাচীনের সঙ্গে আধুনিকের, শহুরের সঙ্গে গ্রামীণের, উপজাতির সঙ্গে অনুপজাতির মেলামেশা ও আদানপ্রদান অনিবার্যভাবে ঘটে থাকে। স্বভাবতই সামাজিক কাঠামোর ক্ষেত্রেও এমনটাই ঘটে, কারণ সভ্যতা ও সামাজিক ব্যবস্থার মধ্যে যোগসূত্র বর্তমান। সামাজিক কাঠামোর এমন সংজ্ঞা নির্ণয় করা কঠিন যা সর্বজন গ্রাহ্য। সমাজবিজ্ঞানীরা তাঁদের নিজ নিজ দৃষ্টিভঙ্গি থেকে এটিকে ব্যাখ্যা করেছেন। যেমন ব্রাউন মনে করেন, সামাজিক কাঠামো হল প্রাতিষ্ঠানিকরূপে সংজ্ঞায়িত এবং নিয়ন্ত্রিত সম্পর্কের মধ্যে মানুষের একটা ব্যবস্থা (an arrangement of persons in relationship institutionally defined and regulated)। আবার কার্ল ম্যানহ্যাম-এর মতে সামাজিক কাঠামো হল মিথস্ক্রিয়াকারী শক্তি সমূহের জাল (The wëb of interacting social forces)। অন্যদিকে সমাজ বিজ্ঞানী ট্যলকট পারসন্সের মত অনুসারে সামাজিক কাঠামো হলো পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং সামাজিক ধাঁচ, মর্যাদা এবং ভূমিকা যা প্রত্যেক ব্যক্তি গোষ্ঠীর মধ্যে ধারণা করে থাকে।

ব্যক্তি সমষ্টিকে নিয়েই গঠিত হয় সমাজ। তারা পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে সামাজিক মিথস্ক্রিয়ায় (Social interaction) যুক্ত হয়। এই প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে মানুষ এক নির্দিষ্ট মর্যাদা ভোগ করে এবং সেই অনুসারে ভূমিকা পালন করে। আবার ভূমিকা ও মর্যাদার সঙ্গে যুক্ত থাকে অধিকার। যুক্ত থাকে নীতিগত বাধ্যকতাগুলিও (obligations)। এই সামাজিক মিথস্ক্রিয়াই প্রতিষ্ঠান, গোষ্ঠী, সমষ্টি এবং সংঘের জনক। সামাজিক মিথস্ক্রিয়া না

থাকলে এ ধরনের সামাজিক এককগুলির (Social units) সৃষ্টিই হত না। এই সব সামাজিক এককগুলিই সামাজিক কাঠামোকে পরিপুষ্ট করে বা সামাজিক কাঠামোর উপাদান।

এবার আমরা গ্রামীণ বনাম শহুরে সামাজিক কাঠামো, অবস্থা ও চিন্তাধারার পার্থক্যগুলি বোঝবার চেষ্টা করব। গ্রাম জীবনের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল যে, প্রকৃতির সঙ্গে তার নিবিড় সম্পর্ক থাকে। একজন গ্রামবাসী যে কাজই করুক না কেন তাকে প্রকৃতির উপর নির্ভর করতে হয়। প্রকৃতিকে বাদ দিয়ে তার জীবন জীবিকা সম্ভব নয়। শহরবাসীর কাছে যেমন শিল্প ও শিল্পায়ন, গ্রামবাসীর কাছে তেমনই প্রকৃতি ও প্রাকৃতিক সম্পদ। প্রকৃতি তার বন্ধু, প্রকৃতি তার শত্রু। শহর ও গ্রামের মধ্যে আর একটি উল্লেখযোগ্য পার্থক্য হলো যে গ্রামের মানুষকে বিভিন্ন ধরনের কাজে যুক্ত থাকতে হয়। শহরে কাজের ক্ষেত্র তুলনায় সীমিত। সাধারণতঃ একজন মানুষ একটি নির্দিষ্ট কাজেই যুক্ত থাকে। এই উৎপাদন প্রণালীর বিশেষীকরণ বা Specialization of job শহর জীবনের অঙ্গ। অবশ্য উন্নত দেশে গ্রামেও এই বিশেষীকরণ দেখা যায়। পুরুষের মত মহিলাদেরও গ্রামে নানা ধরনের দায়িত্ব পালন করতে হয়। চাষের বিভিন্ন ধরনের কাজ, খামার ও গোয়ালের কাজ, জ্বালানী ও জলসংগ্রহের কাজ, গৃহস্থালীর কাজ ইত্যাদি। যদিও এদেশের বহুগ্রামে এখন পরিবর্তিত জীবনধারা এক বাস্তবচিত্র তবু দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে বিশেষীকরণ এখনো প্রচলিত ব্যবস্থা হয়ে ওঠেনি।

বিবাহ, ধর্মাচরণ, জীবিকা, আনন্দোৎসব, জীবনযাপনের ধরন—সবই পারিবারিক এবং সামাজিক পরম্পরার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। শহর জীবনে পরম্পরার প্রভাব এত গভীর নয়। সামাজিক বন্ধনের মাত্রায় বিস্তর পার্থক্য রয়েছে গ্রাম ও শহরের মধ্যে। ফলে সামগ্রিকভাবেই আচরণগত পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। চিন্তা ও দৃষ্টিভঙ্গীর ক্ষেত্রে, সচেতনার হারে, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে, কর্মে নিযুক্ত হওয়ার সম্ভাবনার মধ্যেও শহর ও গ্রামের মধ্যে লক্ষণীয় মাত্রায় পার্থক্য বর্তমান। বছরের কিছু কিছু সময় গ্রামবাসীদের কাজের চাপ যথেষ্ট বেশি থাকে আবার কোন কোন সময় তা একেবারেই হাল্কা হয়ে যায়। অনেক সময় সম্পূর্ণ কর্মহীন হয়েও কাটাতে হয়। শহরের ক্ষেত্রে এ ধরনের অবস্থার সৃষ্টি হয় না। স্বভাবতঃই সেখানে আয়ের ক্ষেত্রে একটা স্থায়িত্ব থাকে, গ্রামের শ্রমজীবি মানুষের যা থাকে না।

চিন্তাধারা বা দৃষ্টিভঙ্গীর ক্ষেত্রেও নানা পার্থক্য লক্ষ করা যায়। সঞ্চয়, পরিবার পরিকল্পনা, পরিবারের ধরন, নারীশিক্ষা, সাক্ষরতা, মহিলাদের সামাজিক অবস্থান, টিকাকরণ, বিবাহের বয়স, পণ বা যৌতুক প্রথা ইত্যাদি বিষয়গুলির ক্ষেত্রে শহর এবং গ্রামীণ মানুষের চিন্তা বা দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে পার্থক্য বিদ্যমান।

৩.২ প্রাচীন ও আধুনিক সামাজিক কাঠামো

প্রাচীন সমাজে সামাজিক জীবন এক নির্দিষ্ট ধারায় প্রবাহিত হয়। সুদূর অতীতে স্থিরীকৃত নিয়ম কানুনের উপর ভর করে চলে সমাজ জীবন। একটি আদিম সমাজের নিয়মকানুন এবং প্রচলিত আচার ব্যবস্থার সঙ্গে আর একটি আদিম সমাজের নিয়মকানুন ও আচার ব্যবস্থার মধ্যে মিল ও অমিল দুইই থাকা স্বাভাবিক। বিবাহপ্রথা, ডাইনি এবং ঝাড়ফুঁকে বিশ্বাস, পরিবারের কাঠামো, সমাজের নেতৃত্বগ্রহণ ও পালন পদ্ধতি, নারীর অবস্থান, ধর্মাচরণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে কিছু কিছু পার্থক্যের মধ্যেও সাযুজ্যই বেশি প্রকট। কিন্তু আধুনিক সামাজিক কাঠামো বা প্রচলিত ব্যবস্থার সঙ্গে তার বিস্তর অমিল। যেমন আধুনিক সমাজে বহুবিবাহ প্রথা অচল, বিয়ের বয়স তুলনামূলকভাবে বেশী, সন্তান সংখ্যা কম, নারীর অবস্থান উন্নততর, ডাইনী বা ঝাড়ফুঁক জাতীয় কুসংস্কার থেকে মুক্ত, শিক্ষা ও চেতনার স্তর উন্নত। আর্থিক ক্ষেত্রেও এই পার্থক্য অত্যন্ত স্পষ্ট। আদিম সমাজে চাষাবাদ, গোপালন, কুটীর শিল্প ইত্যাদি অত্যন্ত প্রাচীন পন্থায় করা হয়ে থাকে। আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য তাদের নাগালের বাইরে। আধুনিক সমাজে শিল্পায়ন,

বিশ্বায়নের প্রভাব পড়ার ফলে আর্থিক স্থায়িত্ব এবং উন্নতি দুইই ঘটেছে বা ঘটে চলেছে। প্রাচীন সমাজে ভোগ্যবস্তুর চাহিদা কম, উৎপাদন খুব একটা বাজারকেন্দ্রিক নয়, আদান-প্রদান ব্যবস্থা জোরালো নয়। অন্যদিকে আদিম সমাজ ব্যবস্থায় সামাজিক ও পারিবারিক বন্ধন অত্যন্ত শক্তিশালী। সামাজিক ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দেওয়ার দায়িত্ব বর্তায় সাধারণতঃ বংশ পরম্পরায়। আধুনিক সমাজে এ রকম প্রথার অস্তিত্ব নেই। খাদ্যাভাস এবং সংস্কৃতি ক্ষেত্রেও এই দুই সমাজের মধ্যে পার্থক্য বিদ্যমান। চিরাচরিত প্রথায় সম্মিলিত উদ্যোগে স্বতঃস্ফূর্ততার মধ্য দিয়ে আদিম সমাজে সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকলাপ [illegible]াজিত হয়। আধুনিক সমাজে বাণিজ্যিক বিনোদন ব্যবস্থা প্রচলিত রয়েছে।

৩.৩ আদিবাসী সামাজিক কাঠামো

আদিবাসী সমাজের সামাজিক কাঠামো গ্রাম এবং শহরের সামাজিক কাঠামো থেকে অনেকাংশে পৃথক, আবার আদিম সমাজের কাঠামোর সঙ্গে তার সাযুজ্য অনেক। কারণ আদিম সমাজের বৃহৎ অংশই আদিবাসী সম্প্রদায়ভুক্ত। তাদের সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক বন্ধনগুলি প্রকৃতির সঙ্গে যুক্ত। Ecology তাদের অস্তিত্ব ও পরিচয়ের ধারক। প্রকৃতি ও আদিম সমাজ অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত। ভ্রাম্যমান চাষ (Shifting cultivation), ঝুম চাষ, জঙ্গল থেকে সংগৃহীত ফল-ফুল-বন্য পশুপাখি তাদের খাদ্য যোগানের সূত্র। এছাড়া জ্বালানী, বাড়ি তৈরীর সরঞ্জাম, ভেষজ ওষুধ ইত্যাদিও জঙ্গল থেকে সংগৃহীত হয়।

আদিবাসীদের সামাজিক কাঠামো স্বভাবতই প্রভাবিত হয়েছে তাদের জীবনযাত্রার ধরন থেকে। তাদের সমাজ অত্যন্ত দৃঢ়বন্ধ। সামাজিক নিয়মকানুনগুলি সাধারণতঃ সকলে বিনা বাক্যব্যয়ে মেনে চলে। পরম্পরাগত নেতৃত্ব প্রথা মেনে চলা হয়। বিবাহ এবং অন্যান্য অনুষ্ঠানে সমাজের বা সমষ্টির সকলে অংশ নেয়।

৩.৪ পরিসমাপ্তি ঃ

সাধারণভাবে আলোচনা করতে গেলে বলা যায়, যে কোন ধরনের সমাজেই পরিবার একটি গুরুত্বপূর্ণ একক হিসাবে বিবেচিত হয়। প্রজনন, নিরাপত্তাদান, উৎপাদন, সামাজিকীকরণ ইত্যাদি বিভিন্ন চাহিদা পূরণের মাধ্যমে সামাজিক ব্যবস্থা বজায় থাকে। পরিবারের মতই গুরুত্বের দাবি রাখে গ্রাম, শ্রেণি, জাতি এবং জ্ঞাতিত্ব বা Kinship। মানুষের সার্বিক জীবন-যাত্রার সঙ্গে এইসব প্রতিষ্ঠানগুলিও অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত। জীবনের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য কয়েকটি বিষয় যেমন নির্দিষ্ট আদর্শমান (norms), মূল্যবোধ (values), ভূমিকা (roles), অধিকার (rights), বাধ্যবাধকতা (obligations) এবং অবস্থান (status) ইত্যাদি উপরোক্ত সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্য দিয়ে প্রতিফলিত হয়।

পরিবার নানা রকমের হতে পারে যেমন একক পরিবার (Nuclear family), যৌথ পরিবার (Joint family) এবং সম্প্রসারিত পরিবার (Extended family)। শহুরে সমাজে যেমন প্রথম ধরনের পরিবারের সংখ্যা বা অনুপাত বেশি তেমনি গ্রামীণ বা আদিবাসী ইত্যাদি সমাজে দ্বিতীয় ও তৃতীয় ধরনের পরিবারের প্রচলন বেশি। একক পরিবার বলতে সেই পরিবারকে বোঝায় যেখানে কোন দম্পতি তাদের অবিবাহিত সন্তানদের নিয়ে বসবাস করে। যৌথ পরিবার আবার গড়ে উঠে রক্তের সঙ্গে সম্পর্কিত বিভিন্ন মানুষকে নিয়ে যেমন কয়েকটি দম্পতি, তাদের বাবা-মা এবং সন্তান-সন্ততি। এই ধরনের পরিবারে বংশানুক্রমিক গভীরতা থাকে বেশি। যৌথ পরিবার আর্থিকভাবে স্বনির্ভর সংগঠন বা প্রতিষ্ঠান হিসাবে প্রতিষ্ঠিত। তিন বা ততোধিক প্রজন্মের বসবাস উপযোগী এই ধরনের পরিবার এখনো গ্রাম সমাজে যথেষ্ট সংখ্যায় বর্তমান। সম্প্রসারিত পরিবার যৌথ পরিবারের থেকেও বৃহৎ কারণ সেখানে নিকট আত্মীয়ের মধ্যেও কেউ কেউ বসবাস করে।

সামাজিক নানা পরিবর্তনের সঙ্গে তাল রেখে পারিবারিক কাঠামোতেও কিছু পরিবর্তন আসছে। ক্রমশঃ একক পরিবার গঠনের দিকে ঝোঁক বাড়ছে। শহরীকরণ এবং শিল্পায়নের ধাক্কায় যৌথ বা সম্প্রসারিত পরিবারের সংস্কৃতি ধীরে ধীরে দুর্বল হচ্ছে। গ্রাম সমাজেও বর্তমানে একক পরিবারের হার তুলনায় বেশি। নিকট ভবিষ্যতে তা অনেক বেশি হয়ে ওঠার সম্ভাবনা।

জ্ঞাতিত্বও সব ধরনের সমাজে অস্তিত্ব বিস্তার করে রয়েছে। জ্ঞাতিত্বের উৎস রক্তের বন্ধন এবং বৈবাহিক বন্ধন। পিসেমশায়, মেসোমশায়, ভগ্নিপতি, শ্যালক, একই বংশ থেকে উদ্ভূত ভাইবোনেরা জ্ঞাতি বলে চিহ্নিত হন। জ্ঞাতি সম্পর্ক তৈরি করার ক্ষেত্রে অবশ্য সমাজে সমাজে কিছু পার্থক্য থাকা স্বাভাবিক। ভৌগলিক এলাকা ভেদে, জাতি ভেদে, ধর্মভেদে এই পার্থক্যগুলি সূচিত হয়। যাইহোক, জ্ঞাতিও আমাদের সামাজিক জীবনে এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে।

আমাদের ভারতীয় সামাজিক কাঠামোর আর একটি গুরুত্বপূর্ণ একক হিসাবে চিহ্নিত হয়ে আছে জাতি। এটি জন্মভিত্তিক এবং অপরিবর্তনীয়। বিভিন্ন জাতির সদস্যদের সামাজিক ক্ষেত্রে কিছু কিছু আচার-বিচার মেনে চলতে হয়। জাতি প্রথার সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলি হলো ঃ

(ক) এর সদস্যপদ জন্মসূত্রে নির্ধারিত হয় এবং তা অপরিবর্তনীয়।

(খ) জাতিভিত্তিক কিছু নির্দিষ্ট পেশা থাকে।

(গ) এর ভিত্তিতে সমাজে স্তর নির্ণয় হয়ে থাকে।

(ঘ) সাধারণতঃ নিজ জাতির মধ্যেই বিবাহ বিধি প্রচলিত।

(ঙ) দৈনন্দিন জীবনযাত্রার ক্ষেত্রে কিছু কিছু বিধি নিষেধ পালন করা।

(চ) কিছু স্বাতন্ত্র্যকে ধরে রাখা।

পারিবারিক কাঠামোতে যেমন লক্ষণীয় পরিবর্তন আসছে বা এসেছে তেমান জাতি ব্যবস্থাতেও কিছু কিছু পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। এক্ষেত্রে শিল্পায়ন, নগরায়ন, শিক্ষাবিস্তার, ভূমি সংস্কার, সংবিধান, সংরক্ষণ নীতি, রাজনৈতিক দল, ধর্মীয় সংগঠন, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, সরকারি উন্নয়নমূলক উদ্যোগ সবকিছুরই অবদান রয়েছে। জাতির ক্ষেত্রে একটি বাস্তব অবস্থা হল, নিজ স্বার্থরক্ষার প্রেক্ষিতে জাতির সদস্যদের মধ্যে একতা ভাব এবং জাতিতে জাতিতে দলাদলির মনোভাব।

মানুষের সমাজে শ্রেণী (Class) আর এক স্বীকৃত একক। জাতি এবং শ্রেণী একে অপরের সঙ্গে সংযুক্ত। মূলতঃ ব্রিটিশদের শাসনকালে সামাজিক শ্রেণী বিভাজন প্রকট হয়। ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থা কেন্দ্রিক এই শ্রেণীগুলি হল

(ক) জমিদার শ্রেণী

(খ) প্রজা শ্রেণী

(গ) কৃষি মজুর শ্রেণী

স্বাধীনোত্তর কালে দেশীয় সরকারের উদ্যোগে যে ভূমি সংস্কার (Land Reforms) এবং গ্রামোন্নয়ন প্রকল্প (Rural Development Projects) গ্রহণ করা হয় তা শ্রেণী প্রথার ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন সাধন করে। সবুজ বিপ্লব ও (Green Revolution) এক্ষেত্রে কিছু ভূমিকা পালন করেছে। মোটামুটিভাবে বলা যায়, স্বাধীনোত্তর কালে শ্রেণী সুস্থিত ছিল না। সেখানে উর্দ্ধমুখী অথবা অধোমুখী পরিবর্তন ঘটেছে। কিছু মানুষ যেমন নতুন ভূস্বামী শ্রেণীভুক্ত হয় তেমনি অনেক ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষী ভূমিহীন কৃষি মজুরে পরিণত হয়।

গ্রাম হলো আর একটি সামাজিক কাঠামো। এটি অপরিবর্তনীয় সত্তা। অতীতে গ্রাম ছিল স্বয়ংসম্পূর্ণ। নিজের চাহিদা নিজেদের সীমানার মধ্য থেকেই মেটানোর তাগিদ ছিল গ্রামবাসীদের। পরনির্ভরশীলতার ভাবনা ছিল অনুপস্থিত। সেই একই অবস্থা বর্তমানে বজায় আছে এমনটা বলা যায় না। একদা বিচ্ছিন্নভাবে থাকা গ্রামগুলি বর্তমানে সেই বিচ্ছিন্নতা কাটিয়ে উঠে পরস্পর পরস্পরের উপর নির্ভরশীল হয়ে উঠছে। এখন অন্যান্য গ্রাম ও শহরের সঙ্গে আন্তসম্পর্ক দৃঢ়মূল হয়ে চলেছে। অবশ্য এ বিষয়ে ভিন্নমতও আছে। সেই মত অনুযায়ী গ্রাম কখনো বিচ্ছিন্ন ছিল না। ব্যবসা বাণিজ্য, সামাজিক সম্পর্ক স্থাপন, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় ক্রিয়াকলাপ, তীর্থযাত্রী ইত্যাদিকে কেন্দ্র করে পারস্পরিক যোগাযোগ ছিল সর্বকালেই। বর্তমানে যোগাযোগ ব্যবস্থা বৃদ্ধি এবং আধুনিকীকরণের ফলে তার মাত্রা অবশ্য বৃদ্ধি পেয়েছে বা যোগাযোগ ও পারস্পরিক নির্ভরতা অনেক নিবিড় হয়েছে।

এসব সত্ত্বেও গ্রাম এক গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক একক হিসাবে আজও তার পরিচয় বহন করছে। গ্রামকে কেন্দ্র করেই সেখানে বসবাসকারী মানুষের অন্যতম প্রাথমিক পরিচিতি। এখানেই গ্রামবাসীদের শ্রেণীগত, জাতিগত পরিবারগত সম্পর্কের সৃষ্টি হয়। সেই সম্পর্ক প্রতিযোগিতা এবং সহযোগিতার, আধিপত্য বিস্তার এবং স[illegible]ের শত্রুতা এবং বন্ধুত্বের। তবে বৈচিত্রময় ভারতবর্ষে গ্রামীণ সামাজিক কাঠামো এবং তার পরিবর্তনের গতিপ্রকৃতি কখনো এক হতে পারে না। অঞ্চলভেদে তা ভিন্ন হওয়াই স্বাভাবিক।

৩.৫ অনুশীলনী

১। ভারতের গ্রামীণ সামাজিক কাঠামো সম্পর্কে বিস্তারিত আলোকপাত কর।

২। বিভিন্ন ধরনের পরিবর্তনের ধাক্কায় ভারতের সামাজিক কাঠামোয় কী কী মুখ্য পরিবর্তন ঘটেছে?

একক ৪ □ পরিবার, বিবাহ, জাতি, ধর্মীয় গোষ্ঠী, লিঙ্গ ইত্যাদি ভারতীয় সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলিতে পরিবর্তন (Change in Indian Social Institutions-Family, Marriage, Caste, Religious Groups and Gender)

গঠন

৪.১ পরিবার

৪.২ বিবাহ

৪.৩ জাতিভেদ

৪.৪ ধর্মীয় সম্প্রদায়

৪.৫ লিঙ্গ বৈষম্য

৪.৬ অনুশীলনী

৪.১ পরিবার

সভ্য সমাজের অপরিহার্য অঙ্গ হল পরিবার। সভ্যতার শুরু পরিবার সৃষ্টির সাথে সাথেই। মানুষের আদিমতম শারীরিক চাহিদা যৌনসংসর্গের জন্য পুরুষ ও নারী একত্রিত হয়। একসঙ্গে থাকার সেটি ছিল প্রথম পদক্ষেপ। দ্বিতীয় জৈবিক তাড়না হল ক্ষুধা। জৈবিক ক্ষুধা প্রশমনের জন্য মানুষ ফলমূল ও জল সংগ্রহ করত, যা বিবর্তনের সাথে সাথে একসময় অন্যতম অর্থনৈতিক কর্মে গিয়ে দাঁড়াল। মানুষ চাষবাস করে, প্রয়োজনীয় সামগ্রী উৎপাদন করে স্থায়ী হল। সেই স্থায়িত্ব বোধ নিয়ে এল যৌনজীবনেও স্থায়িত্ব। প্রজনন হয়ে উঠল প্রয়োজনীয় বিষয়। সন্তানসন্ততির যথাযোগ্য ভরণপোষণের জন্য যে স্থায়ী বসতি ও অর্থনৈতিক বা উৎপাদনজনিত কাজকর্ম জরুরি হয়ে পড়ল তার থেকে উদ্ভব হল পরিবার— মানুষের সর্বপ্রথম সামাজিক একক।

বিভিন্ন বয়সের নারীপুরুষ যখন একত্রিত হয়ে থাকে এবং একে অন্যের ওপর ভরসা করার এক সম্পর্ক গড়ে ওঠে, তাকে আমরা এক পারিবারিক একক বলতে পারি। সেভাবে একটি পারিবারিক একক চেনার জন্য পরবর্তী বৈশিষ্ট্যগুলি খুঁজতে হবে।

১। একই গৃহে বসবাস ও এক হাঁড়িতে রান্না। সাধারণভাবে দম্পতির সন্তান সন্ততি জন্মাবার পরই তাদের একত্রে বসবাসকে পরিবারের সংজ্ঞা দেওয়া যায়। সমাজে দু'ধরনের পরিবার দেখা যায়— যৌথ পরিবার ও ক্ষুদ্র বা অনু পরিবার। বর্তমানে বিভিন্ন কারণে অনু পরিবারের সংখ্যাই বেশি। তবে গ্রামাঞ্চলে তিন বা চার পুরুষের একসাথে থাকা পরিবারের চলটাই আগে বেশি ছিল বর্তমানে যা অনেকটাই কমে এসেছে। ভারতবর্ষে পিতৃতান্ত্রিকও মাতৃতান্ত্রিক উভয় ধরনের পরিবারই দেখতে পাওয়া যায়। তবে পিতৃকেন্দ্রিক পরিবারের সংস্কৃতিই প্রাধান্য পেয়েছে কিন্তু বিভিন্ন প্রদেশের কিছু উপজাতি ও কেরালার নাম্বুদ্রিপাদদের মধ্যে মায়ের পরিবারকে কেন্দ্র করে পরিবার গড়ে ওঠে।

২। শ্রমবিভাগ ঃ প্রয়োজনের তাগিদেই সমাজে শ্রমবিভাগ গড়ে ওঠে। প্রাকৃতিকভাবে পুরুষদের শারীরিক গঠন সবল হবার ফলে পুরুষেরা সাধারণতঃ খাদ্য যোগাড় বা উপার্জন করে আনে আর স্ত্রী-রা রন্ধন ও বন্টনের ব্যবস্থা

করে। সন্তানের দেখাশোনাও মেয়েরাই করে। এভাবে নির্দিষ্ট কর্মবন্টনের মাধ্যমে পরিবারের ভিত মজবুত হয়ে উঠেছিল। পুরুষেরা গৃহস্থালির কিছু কাজ করতে পারলেও, প্রাকৃতিক নিয়মে শিশুদের দেখাশোনা করতে মায়েরাই ভাল পারেন। সন্তানদের স্বাবলম্বী করে তোলার জন্যও এক মজবুত পারিবারিক বন্ধন প্রয়োজন।

৩। শিশু থেকে বড় হয়ে ওঠার ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের সুযোগ সুবিধার প্রয়োজন হয়। পারিবারিক কাঠামোর মধ্যে বড় হলে ছেলেমেয়েদের সেই চাহিদাগুলোর পরিপূরণ ঘটে। তারা শিক্ষা-দীক্ষা এবং সম্পত্তির অধিকারী হয়। সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ শুধুমাত্র পারিবারিক কাঠামোর মধ্যেই সম্ভব।

৪। পরিবার ব্যবস্থার কারণে যৌন-জীবন সংযত ও সীমিত থাকে। বিবাহ পরিবারের এক প্রধান ভিত্তিভূমি। যৌন সম্পর্কে স্থায়িত্ব না এলে অর্থাৎ বিবাহ না হলে পরিবার সম্ভব নয় এবং পরিবার না থাকলে নতুন প্রজন্মের সামাজিক পরিচয় থাকে না।

বিভিন্ন কারণে পারিবারিক কাঠামো ও পারিবারিক জীবন যাপনে যথেষ্ট পরিবর্তন এসেছে। গ্রামের কৃষিভিত্তিক সমাজ-ব্যবস্থার পরিবর্তনে বড় পরিবারের প্রয়োজনীয়তা কমেছে। কৃষি একটি পারিবারিক অর্থনৈতিক কাজ, বড় পরিবার হলে কৃষিকাজে সুবিধা হয়। ফলে বাঁধনটা খুব শক্ত হয়। পরিবারের কর্তার প্রভাব পরিবারে অধিক মাত্রায় থাকে। অপরদিকে বিভিন্ন পেশায় নিযুক্ত মানুষ নিজ নিজ উপার্জনের উপর নির্ভরশীল ও পরিবারে যে কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবার ক্ষেত্রে সে স্বাধীন। শিল্পভিত্তিক সমাজব্যবস্থায় প্রতিটি মানুষ একে অন্যের থেকে বিচ্ছিন্ন। তাই ছোট পরিবারের উৎপত্তি। পরিবারের সদস্যদের মানসিকতাও সমূলে বদলে গেছে এবং এই শিল্পভিত্তিক সমাজব্যবস্থায় বৃদ্ধরা প্রায় বোঝার মত।

আবার একান্নবর্তী পরিবারের কতকগুলি উপকারিতা আছে। শুধুমাত্র বার্ধক্যেই নয়; অসুখে-বিসুখে, বিপদ-আপদে এবং কর্মহীনতার পরিস্থিতিতে বাবা মা, ছেলেমেয়েরা এবং ভাইয়েরা যদি একসাথে থাকে, তাহলে সুবিধা অসুবিধা ভাগ করে নেয়। তিন বা চার প্রজন্মের একান্নবর্তী পরিবার অনেকটা আদিবাসীদের জীবন দর্শনের মত। এতে বংশরক্ষা হয় এবং এক পরম্পরা থাকে। একটি পরিবার সাধারণতঃ চার রকমের সম্পর্কের ওপরে বেঁচে থাকে। সেগুলি হলো— যৌন, প্রজননিক, অর্থনৈতিক ও শৈক্ষিক। এই সব কিছুর মূলে থাকে সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক আচার আচরণ।

বলা হয়েছে যে, শিশুর জন্মের সাথে সাথে একটি পরিবার সংগঠিত হয়। ত্রটি ন্যূনতম পারিবারিক একক। কিন্তু সন্তানহীন দম্পতি কি পরিবার নয় এবং দত্তক সন্তান কি পরিবারের একজন হতে পারে না? এই বিষয়ে চিন্তাভাবনার পরিবর্তন ঘটেছে। সাধারণত তিন ধরনের পরিবার আছে বলে সমাজবিদ্‌রা মনে করেন।

১। দাম্পত্য জীবন থেকে উদ্ভূত অর্থাৎ Conjugal family । মূলতঃ এই ধরনের পরিবার সম্বন্ধেই আলোচনা করা হয়েছে।

২। Consanguine family অর্থাৎ রক্তের সম্পর্কিতদের দ্বারা গঠিত-যেমন 'মাতৃজনিত' বা Matrilineal family, যেখানে মা এবং তার আপন ভাই এর প্রাধান্য থাকে। এই ধরনের পরিবার জন্মসূত্রে আবদ্ধ, বিবাহসূত্রে নয়।

৩। বিস্তৃত পরিবার বা Extended family অর্থাৎ পিতা ও মাতার (রক্ত সম্পর্কের) ভাই বোন এবং তাদের সন্তান-সন্ততিদের দ্বারা গঠিত পরিবার।

৪.২ বিবাহ

যে কোন পরিবার গঠনের মূলে আছে বিবাহ। দম্পতি ও শিশু ব্যতিরেকে কোন পরিবার হয় না। চারবন্ধু একত্রে ঘনিষ্ঠভাবে বসবাস করলেও তাকে পরিবার বলা যাবে না। বিবাহের রীতি-নীতি, আচার-আচরণ বিভিন্ন দেশে, সমাজে এবং সংস্কৃতিতে আলাদা। আমাদের ভারতে ততরকমের বিবাহ প্রথা আছে, যতরকমের আছে গোষ্ঠী বা সম্প্রদায় (Community)। সামাজিক ও পারিবারিক রীতি-নীতির ক্ষেত্রে জাতি, ভাষা ও ধর্মের ভেদ খুব বড় ভেদ। হিন্দু ও খ্রিস্টানদের জন্য বিবাহ এক পবিত্র বন্ধন, যা ঈশ্বরের নামে প্রতিজ্ঞা করে প্রতিষ্ঠিত হয়। ইসলাম ধর্মালম্বীদের কাছে বিবাহ একটি চুক্তি বা Contract। তবে একটি বিষয়ে প্রতিটি ধর্মাবলম্বী একমত— প্রজনন বা বংশরক্ষাই বিবাহের মূল উদ্দেশ্য।

আদিমকালে বিবাহ বন্ধন ছাড়াই যৌন বন্ধন হোত। পিতামাতা ও সন্তানরা একটি পরিবারের মত একসঙ্গে থাকত, খেত, কাজকর্ম করত, উন্নতির চেষ্টা করত এবং ত্রকে অপরের উপরে নির্ভরশীল ছিল সর্বতোভাবে। স্থায়ী বসবাস ও সভ্যতা পত্তনের সঙ্গে সঙ্গে বিবাহ ও স্থায়িত্বের প্রয়োজনীয়তা বোধ করা হয়েছে। তবে অর্থনৈতিক ও বিভিন্ন কারণে বিভিন্ন ধরনের বিবাহের চল হয়েছে— (১) শুধুমাত্র একের সঙ্গে বিবাহ (২) একাধিক নারীর সঙ্গে একটি পুরুষের বিবাহ এবং (৩) একাধিক পুরুষের সঙ্গে একটি নারীর বিবাহ। প্রথমটি স্বাভাবিক যৌনবাসনা থেকে উদ্ভুত। Monogamy দাম্পত্য সম্পর্ক স্থায়িত্ব ও দৃঢ়তা আনে। (২) Polygyny-র প্রয়োজন হয়েছিল সে যুগে যখন যুদ্ধ-বিদ্রোহ মানুষের দৈনন্দিন জীবনের প্রায় অঙ্গ হয়ে পড়েছিল। পুরুষেরা হাজারে হাজারে মারা গেলে নারীরা অসহায়, আশ্রয়হীন হয়ে পড়ত। বিবাহ তাদের ভরণপোষণের সুব্যবস্থা দিত, দিত নির্ভয় আশ্রয়। (৩) চাষের জমি যেখানে অল্প, জমি উত্তরাধিকারসূত্রে উত্তরোত্তর ভাগ হলে যেখানে জমির উৎপাদন ক্ষমতা কমে যাবে, সেখানে Polyandry-র প্রয়োজন এসে পড়ে। একাধিক ভাইয়ের যদি একটিই স্ত্রী থাকে, তাহলে চাষের জমি ভাগ হবার সম্ভাবনা থাকে না। (৪) কিছু আদিবাসীদের মধ্যে 'দল বিবাহ' বা Group Marriage-এর চলনও দেখা যায়, যেখানে ভাইয়েরা মিলে অন্য পরিবারের বোনদের একসাথে বিবাহ করে। (৫) বিবাহের মাধ্যমে দু'টি বিবদমান পরিবারের মধ্যে সৌহার্দপূর্ণ সম্পর্কও সৃষ্টি হয়। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এই ধরনের বিবাহ দেখা গেছে। অমুসলমানদের বন্ধু করে রাখবার উদ্দেশ্যে আকবর এই হাতিয়ারের ব্যবহার করেছিলেন।

বর্তমান যুগের অনু বা Nuclear পরিবার ব্যবস্থায় বিবাহের স্থায়িত্বও ক্রমশঃ কমে আসছে। অনুপরিবারের প্রতিটি সদস্য আত্মকেন্দ্রিক। সামাজিক নিয়মে স্বামী-স্ত্রী এক সঙ্গে বসবাস করলেও অনেকক্ষেত্রে একে অপরের উপরে অর্থনৈতিকভাবে নির্ভরশীল নয়। অনেকক্ষেত্রে সন্তানরা ক্রেশে বড় হচ্ছে, শিশুবয়স থেকেই তারা বাবা-মার উপরে অনেক কম নির্ভরশীল। অর্থনৈতিক স্বাধীনতা এবং আত্মকেন্দ্রিকতার ফলে পারিবারিক বন্ধন ক্রমশঃ শিথিল হয়ে পড়ছে। সাম্প্রতিককালে বিবাহ বিচ্ছেদের ঘটনা ক্রমশঃ বাড়ছে। বর্তমানে পশ্চিমী সভ্যতার অনুকরণে আমাদের সমাজে সংখ্যায় কম হলেও 'Live Together' (একত্রে বসবাস) ব্যবস্থাও শুরু হয়েছে।

৪.৩ জাতিভেদ (Castism)

ভারতে বর্ণাশ্রম প্রথা ছিল। এই প্রথার ফলে ভারতীয় সমাজে জাতপাত ব্যবস্থার সৃষ্টি হয়। উত্তরাধিকার সূত্রে এক বিশেষ জাতিভুক্ত হয় প্রতিটি হিন্দু। মা-বাবার জাতিগত পরিচয়, কর্ম বা চেষ্টার দ্বারা বদলানো যায় না। বর্তমান সমাজে একজন ব্রাহ্মণ হয়তো জুতোর দোকানে কাজ করছে ও তথাকথিত এক অস্পৃশ্য মুচি বিদ্যালয়ে পড়াচ্ছে।

তবু ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণই থেকে যায় এবং উচ্চবর্ণোচিত মর্যাদা পায় এবং নিম্নবর্ণের শিক্ষকের কাছ থেকে বিদ্যাগ্রহণ করতেও উচ্চবর্ণের ছাত্রছাত্রীরা কিছুটা সঙ্কোচ বোধ করে। জাতিগত পরিচয় সহজে বদলানো যায় না। Class বা শ্রেণী জাতিভেদের মতোই অমানবীয় এবং মানুষের সর্বাঙ্গীন উন্নতির পথে এক বিশেষ বাধা। সভ্যতার বিবর্তনের ফলে মানুষ তার জাতিগত সামাজিক অবস্থান থেকে উন্নতি ঘটাচ্ছে। কিন্তু শ্রেণী পরিচয় বদলে যায় একটি মানুষের কর্ম ও সাফল্যের ফলে বা দোষ বা গাফিলতির ফলে। এমন দৃষ্টান্ত বর্তমান বাস্তববাদী ও কর্মবাদী পৃথিবীতে খুব বেশি বিরল নয়। উল্টোটাও হচ্ছে উচ্চশ্রেণীর জমিদার ও রাজাদের ক্ষেত্রে। কিন্তু এক নিম্নবিত্ত প্রাক্তন জমিদার বা রাজা তার জন্মসূত্রে প্রাপ্ত বর্ণ পরিচয় হারায় না। শ্রেণী থেকে বহিষ্কৃত হলেও জাত থেকে বহিষ্কৃত হয় না। বিবাহ বা যে কোনও সামাজিক আদান-প্রদান, জাতিগত প্রথা অনুযায়ীই হয় এবং সাধারণতঃ অন্য জাতে বিবাহ হয় না। পরিবার গঠনের ক্ষেত্রে নিজ পছন্দের মর্য্যাদা তেমন দেওয়া হয় না। বিবাহকে নিছকই এক প্রয়োজনীয় অনুষ্ঠান বা প্রতিষ্ঠান বলে মেনে নেওয়া হয়। পৃথক পৃথক জাতির ধমনীতে পৃথক পৃথক রক্ত বয়ে চলেছে বলে দাবি করা হয়।

কিন্তু বর্তমানে, বেশ কয়েক দশক ধরে এই 'রক্তীয় বিশুদ্ধতার' ধারণার পরিবর্তন ঘটেছে। শিক্ষা ও অর্থনৈতিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মানসিকতার পরিবর্তন হয়েছে। শুধু যে বিভিন্ন মতে বিবাহ হচ্ছে তা নয়, বিভিন্ন ভাষাভাষী ও বিভিন্ন সংস্কৃতির ধারকদের মধ্যেও দাম্পত্য সম্পর্ক গড়ে উঠছে। পৃথিবীর বিভিন্ন জাতি ও ধর্মাবলম্বীর মধ্যেও এই পারিবারিক বন্ধন গড়ে উঠছে। এর ফলে পারিবারিক জীবনে যে কিছু প্রতিকূল পরিবেশ গড়ে উঠছে তা নয়। বরং মানুষ মানুষকে আরও বুঝতে শিখছে, আরও জানতে চাইছে। বিভিন্ন সংস্কৃতি সম্বন্ধে আমাদের যে ধারণা এবং বোধশক্তি জন্মাচ্ছে, তা বিশ্বমানববোধ জাগিয়ে তুলতে সাহায্য করছে। সমাজে বিভিন্ন ক্ষেত্রে অগ্রগতি মানুষকে জাতপাত শ্রেণীর সংকীর্ণ ধারণার উর্ধ্বে এনে প্রত্যেককেই অনেক কাছাকাছি এনে দিয়েছে।

কিন্তু রাজনীতিক ক্ষেত্রে জাতিভেদ ও ধর্মভেদ বা সাম্প্রদায়িকতা এখন মৌরুসীপাট্টা গেড়ে বসেছে। সংসদে বা বিধানসভাগুলিতে স্থান গ্রহণের লড়াই জাতি বা জনগণের স্বার্থের চেয়ে বিভিন্ন জাতের উদ্দেশ্যসিদ্ধি ও আর্থিক লাভের বিষয় প্রাধান্য পাচ্ছে। জাতিভেদবোধটা আরও বেশি সর্বব্যাপী হয়ে দাঁড়িয়েছে। শূদ্র ও অস্পৃশ্যদের প্রতি অত্যাচার ও অবিচার এখন সামাজিক গণ্ডী ছাড়িয়ে রাজনৈতিক রূপ নিয়েছে। জাতিভেদ থেকে জন্ম নিয়েছে প্রধানতঃ দু'টি শ্রেণী। এই শ্রেণীবিভাগের মনোবৃত্তি ছড়িয়ে পড়েছে পৃথিবীর সর্বত্র। ধনী ও গরীব, উন্নত বা অনুন্নত, সাদা ও কালো এই ধরনের দু'টি শ্রেণীবিভেদ বিশ্ব রাজনীতির মজ্জায় মজ্জায় ঢুকে গেছে। ভৌগলিক বিভাজনও হয়েছে উত্তর ও দক্ষিণ গোলার্ধের মধ্যে কারণ অস্ট্রেলিয়া ব্যতিরেকে প্রায় সকল উন্নত ও সাদা চামড়ার দেশগুলির অবস্থান উত্তর গোলার্ধে। চীন ও জাপানও প্রায় সেই 'বিশিষ্ট সভ্যতায়' ঢুকে গেছে। রুশদেশ অর্থনৈতিক ভাবে না এগোতে পারা সত্ত্বেও বিশিষ্ট শ্রেণীভুক্তই রয়েছে।

তবে ভারতবর্ষের দলিতদের মতো সারা পৃথিবীর দলিতরাও সংঘবদ্ধ হয়ে উঠছে ধীরে ধীরে। দক্ষিণ গোলার্ধ মানচিত্রের নিচের অংশে থাকে বলে বাস্তবে তলায় থাকতে রাজী নয়। আফ্রিকাতে বর্ণবিদ্বেষের অবসান ঘটেছে। দলিত মানুষেরাও প্রগতির পথে এগিয়ে চলেছে। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে আইন করে বর্ণবিদ্বেষ শেষ করে দেওয়া হচ্ছে। ভারতেও অস্পৃশ্যতা বা জাতবিচারকে দণ্ডনীয় অপরাধ বলা হয়েছে। যে কোনও বঞ্চিত বা নির্যাতিত মানুষ আইনের দ্বারস্থ হতে পারে এবং ন্যায় বিচার পাবার অধিকারী। বঞ্চনা ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে জনমত প্রবল উন্নত দেশগুলির বিশ্বময় শাসন। অনুন্নত বা উন্নতিশীল দেশগুলির উপরে যখন ঋণের বোঝা চাপিয়ে দিয়ে শাসনের চাবিকাঠি নিজের হাতে রেখে দেওয়া কার্য্যকরী হচ্ছে না পুরোপুরিভাবে, তখন সামরিক আক্রমণ করে সম্পূর্ণরূপে

নিজের কব্জায় রাখবার চেষ্টা চলছে। সম্প্রতি আফগানিস্থান ও ইরাককে সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত করেও মানুষের স্বাধীনতা স্পৃহাকে ধ্বংস করে ফেলা যায় নি। ইরাকের নিপীড়িত জনগণের ক্ষোভ প্রকটভাবে বেরিয়ে এসেছে। নির্যাতন ও প্রতিবাদের স্রোতকে বন্ধ করা যায় না। যতই নির্যাতিত হোক্, ভয় দেখানো হোক্, নির্যাতিত মানুষ একদিন না একদিন প্রতিবাদ জানাবেই।

কৃষিভিত্তিক গ্রামীণ সভ্যতা থেকে আমরা ক্রমশঃই এগিয়ে চলেছি শিল্পভিত্তিক-নাগরিক সভ্যতার দিকে। জাতিভেদ কিছুটা পেশাগত প্রভেদকেও বোঝাত। জাতভিত্তিক পেশার ক্ষেত্রে সামাজিক সচলতার (Social mobility) কোন জায়গা ছিল না। সেগুলি ছিল গ্রামকেন্দ্রিক সভ্যতার পেশা। শহরের ছবিটা সম্পূর্ণতঃ আলাদা। শহরে বিভিন্ন শিল্পে কাজের ক্ষেত্রে গুরুত্ব পায় শিক্ষা, জ্ঞান ও কুশলতা। তাই শহুরে সভ্যতায় জাতিভেদ তার গ্রামীণ মৌলিক ধাঁচে বেঁচে থাকতে পারে না। তবে মানুষের মনের ভেতর থেকে জাতপাতের ধারণা, বিশ্বাস একেবারে চলে যায় নি।

৪.৪ ধর্মীয় সম্প্রদায়

জ্ঞানোন্মেষের শুরু থেকেই মানুষ তার আবির্ভাবের রহস্য, অতীন্দ্রিয় সত্ত্বার সঙ্গে তার সম্পর্ক, জীবন সম্পর্কিত দর্শন, মৃত্যু পরবর্তী জীবন সম্পর্কে জিজ্ঞাসার উত্তরের জন্য নিয়ত চেষ্টা চালিয়ে গেছে। এই সমস্ত কৌতুহল মেটানোর জন্য কতিপয় ব্যক্তি নিজেদেরকে নিয়োজিত করেছেন এর উত্তর খোঁজার জন্য, তৈরী করেছেন ধর্মীয় নির্দেশ এবং চেষ্টা করেছেন আচার অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সেই সত্যে পৌঁছানোর জন্য। এই আচার-অনুষ্ঠান ও তৎ সংশ্লিষ্ট ভূমিকা ও নির্ধারিত আচরণগুলিকে একত্রে 'ধর্ম' বলা হয়ে থাকে। এইভাবে বিভিন্ন প্রবক্তা ভিন্ন ভিন্ন ধারণা ও আচার-অনুষ্ঠানের কথা বলেছেন এবং সাধারণ মানুষ সেই মত, পথে বিশ্বাস করে অনুগামী হয়েছে। ফলে সমাজে সৃষ্টি হয়েছে বিভিন্ন ধর্ম অনুরাগী, ধর্মীয় মতাবলম্বী মানুষ। যার ফলশ্রুতি বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায় যেমন হিন্দু, মুসলিম, খ্রিস্টান, শিখ, জৈন ইত্যাদি। প্রতিটি ধর্ম-সম্প্রদায়ের নেতৃস্থানীয় কিছু মানুষ সংকীর্ণস্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য, ক্ষমতা কায়েম রাখার জন্য ধর্মের অপব্যাখ্যা করে সেই বিশেষ ধর্ম সম্প্রদায়ের মানুষকে ভুল পথে চালনা করে থাকে। প্রকৃতজ্ঞানী ও পণ্ডিতরা যুগে যুগে বলে গেছেন যে ধর্মে ধর্মে মূলতঃ কোন ভেদ নেই, কারণ প্রত্যেকটি ধর্ম মূলতঃ একই কথা বলে—ভ্রাতৃত্ব, প্রেম, সত্য, সাধুতা, কর্তব্যনিষ্ঠা, পরোপকার, আত্মত্যাগ ইত্যাদি। তবু নতুন ধর্মের পত্তনের সময় প্রতিষ্ঠিত ধর্মের প্রতি অবজ্ঞা ও ঘৃণা দেখা গেছে, শান্তি ও প্রেমের নতুন বার্তাবহকে মেরে ফেলবার চেষ্টা চলেছে। প্রেম ও ভ্রাতৃত্বের স্থানে বিদ্বেষ ও ঘৃণা জন্ম নিয়েছে। ধর্মবিদ্বেষ বা সাম্প্রদায়িকতা মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। এই বিদ্বেষের কারণে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে কত 'ধর্মযুদ্ধ' অর্থাৎ ধর্মবিরোধী যুদ্ধ হয়েছে। তার রেশ আজও চলে আসছে। হিটলার ইহুদীদের শেষ করে দিতে চেয়েছিলেন; আজ ইহুদীরা চাইছে প্যালেস্টাইনের মুসলমানদের পর্যদস্তু করতে। আমেরিকায় 'ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার' ধ্বংস হয়ে যাবার পর পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে মুসলমান সমাজের প্রতি কিছুটা বিদ্বেষ ভাব লক্ষ করা গেছে। সারা বিশ্বে বিভিন্ন ধর্মের মৌলবাদীরা ভীষণভাবে মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। এটি নিঃসন্দেহে সাধারণ মানুষের সুস্থভাবে জীবন যাপন করার পক্ষে বাধাস্বরূপ। ভারতীয় সংবিধানের প্রস্তাবনায় ভারতকে 'ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র' বলা হয়েছে। এবং আমাদের প্রথম মৌলিক অধিকারটি হল সকলের সমানাধিকার। সংবিধানে আমাদের Equality বা সমানতার ভাবনা প্রবল। তাই মৌলিক অধিকারগুলির অন্তর্গত নিজের ধর্মপালনের অধিকারের সঙ্গে সঙ্গে এও লেখা রয়েছে যে 'জাতিধর্ম-লিঙ্গ ইত্যাদি নির্বিশেষে' ভারতের প্রতিটি নাগরিক সমান অধিকার পাবে। সে অধিকার যে কোনও বিষয়েই হোক না কেন—শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কর্মসংস্থান, ন্যায়বিচার বা অন্য কিছু। সেই সঙ্গে একথাও লেখা রয়েছে প্রতিটি ধর্মাবলম্বী তার ইচ্ছামতো ধর্মীয় শাসন ও আচার-আচরণ মানবে। সরকার বা অন্য কোন সম্প্রদায় তাতে বাধা দিতে পারবে না।

ভারতবর্ষে, দুর্ভাগ্যবশতঃ, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে মাঝে মাঝে বিরোধ বেঁধে যাওয়া এক বাস্তব ঘটনা। আবার এক ধর্মের মধ্যেও বিভিন্ন দলে দলাদলি রয়েছে। শৈব বৈষ্ণবকে সহ্য করতে পারে নি, শিয়ারা সুন্নীদের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে দ্বন্দ্বে। আবার এমনও দেখা গেছে- খুব কম সংখ্যায় নয়-যারা কোন ধর্মেই বিশ্বাসী নয়, কিন্তু জাতিভেদে বিশ্বাসী।

পশ্চিমের দেশগুলিতে শিল্পায়ন, নগরায়ন এবং শিক্ষার উন্নতির সাথে সাথে ধর্মবিশ্বাস, বিশেষ করে ধর্মের গোঁড়ামি সাধারণ মানুষের মধ্যে কমে এসেছে। বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মনও ধীরে ধীরে যুক্তিবাদী হয়ে উঠছে। কিন্তু ভারতবর্ষে পরিবর্তনের সেই গতি তুলনায় কম। যতই শিল্পায়ন ও বিশ্বায়ন হতে থাকুক না কেন, ভারতীয় সমাজে ব্যাপক নিরক্ষরতা, কর্মহীনতা থাকার জন্য গোঁড়ামি প্রবলভাবে যেন দানা বেঁধে রয়েছে। অন্ধ ধর্ম বিশ্বাস, যার সঙ্গে গোঁড়ামি এবং অসহিষ্ণুতা আসতে বাধ্য, মানুষকে অন্ধ করে দেয়, বাস্তব থেকে সরিয়ে আনে।

সুতরাং অন্ধবিশ্বাসকে দূরে সরিয়ে রেখে, যুক্তিনিষ্ঠ মন নিয়ে নিজ ধর্মের আচার অনুষ্ঠান মেনে চলা সেই সঙ্গে অপর ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া এটাই মানবধর্ম। কিছু সংগঠন এই মনোভাবে বিশ্বাসী। তারা যখন খরা, বন্যা, ভূমিকম্প, সুনামী ইত্যাদি প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সময় সাধারণ মানুষের জন্য ত্রাণ কাছে যুক্ত হন তখন তা কোন নির্দিষ্ট ধর্মীয় গোষ্ঠীর জন্য করেন না। শিক্ষা, স্বাস্থ্য ইত্যাদি পরিষেবা দানের ক্ষেত্রেও কোন বাছবিচার থাকে না। সর্বধর্ম সমন্বয়ের সূত্রে মানুষকে সমন্বিত করার আদর্শ মেনে চলার সংস্কৃতি সেখানে। এই সহমত যদি সমস্ত ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে সঞ্চারিত হয়; তাহলেই ভারতবর্ষের মত বহু ভাষাভাষী, বহু ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মানুষ শান্তিপূর্ণভাবে একত্রে বসবাস করতে পারবেন।

৪.৫ লিঙ্গ বৈষম্য (Gender Discrimination)

নর ও নারীর (বহুল জনপ্রিয় আদম ও ঈভ্) পৃথিবীতে আবির্ভাব সৃষ্টিকে ধরে রাখার জন্য। নারী ও পুরুষের মধ্যে প্রভেদ মূলতঃ শারীরিক। কিন্তু উভয়ে, উভয়ের পরিপূরক। সভ্যতার শুরুতে নারী পুরুষের মধ্যে সামাজিক বিভেদ সেইভাবে ছিল না। পুরুষ ও নারীর মধ্যে প্রভেদ কৃষিভিত্তিক সভ্যতার পত্তন থেকেই। কৃষি কাজের ফলে মানুষ পেতে লাগল প্রয়োজনের চেয়ে অতিরিক্ত খাদ্য, যা সংগৃহীত করে রাখবার প্রয়োজন হল। এই বাড়তি শস্য বা খাদ্য নিয়ে লাগল দ্বন্দ্ব। প্রতিটি পরিবারই চায় এই বাড়তি খাদ্য এবং অন্যান্য বস্তুর উপর অগ্রাধিকার। সৃষ্টি হল সম্পত্তির লড়াই। শুরু হল মানুষে মানুষে বিভেদ, বিদ্বেষ ও দ্বন্দ্ব।

এই বিভাজন ও দ্বন্দ্ব এসে পড়ল নারী ও পুরুষের মধ্যেও। সন্তানকে ৯ মাস ধরে গর্ভে ধারণ করে জন্ম দেওয়া এবং জন্মের পর মাতৃদুগ্ধ দিয়ে তার যথাযথ প্রতিপালন কেবলমাত্র নারীই করতে পারে। এই গুরদায়িত্বের জন্যই নারী স্বাভাবিকভাবে পুরুষের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। পুরুষ এই দুর্বলতার সুযোগটি পুরোপুরি কাজে লাগায়। সমাজে পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা বেশি থাকায় পুরুষ নারীকে নির্দিষ্ট গণ্ডীর মধ্যে বেঁধে রাখতে চেয়েছে। তাই নানা নিয়ম কানুনের বন্ধনে তাকে বাঁধা হয়েছে এবং সম্পত্তি ও স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। পুরুষ নিজেকে নারীর প্রভু বলে প্রতিষ্ঠিত করেছে, তার পরিচয়ই যেন নারীর পরিচয়। বিবাহ একটি বিশেষ বন্ধন, যা পুরুষের আরোপিত। বিভিন্ন ধরনের বিবাহের প্রথাও পুরুষ নিজের প্রভুত্ব বজায় রাখতে প্রচলন করেছে। পুরুষের বহুবিবাহ বা Polygyny-তে স্বাভাবিকভাবেই নারী পুরুষের দাসী হয়ে থাকে। তার কোন স্বাধীনতা থাকে না। কিন্তু Polyandry বা নারীর বহু বিবাহ প্রথাতেও নারীকে নিছকই পণ্যবস্তু বানিয়ে রাখা হয়।

নারী ছাড়া পুরুষের কোন অস্তিত্ব নেই। বংশবৃদ্ধি হবে না, মানবসভ্যতা টিকে থাকবে না। কিন্তু নারীকে পুরুষের অধীনে বেঁধে রাখবার নানাবিধ ব্যবস্থা হয়েছে। নারীর শারীরিক, মানসিক, বৌদ্ধিক-জ্ঞানের তেমন কোন মূল্য দেওয়া হয়নি। তারা শিক্ষার আলো থেকে অনেকাংশে বঞ্চিত থেকেছে। বুদ্ধি ও দক্ষতা প্রয়োগের সুযোগ সেভাবে হয়নি। শিশুঅবস্থা থেকেই তাদের বোঝানো হয় যে পুরুষের চেয়ে তারা সব দিক থেকে হীন ও অক্ষম। স্ত্রী শুধু স্বামীর অধীন নয়, সে তার সম্পত্তি বিশেষ।

শিক্ষা ও সভ্যতার অগ্রগতির ফলে সমাজে মেয়েদের সক্রিয় ভূমিকাকে আজ স্বীকৃতি দেওয়া হচ্ছে। নারীর শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হলে শিক্ষা ও অন্যান্য সুযোগের ফলে বহু নারী প্রমাণ করে চলেছেন যে তাঁরা পুরুষের চেয়ে কোন অংশেই কম নন। উপযুক্ত সুযোগ না পাওয়ায় তেমন আত্মবিশ্বাস তাঁদের ছিল না। কিন্তু বর্তমানে বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাঁরা সাফল্য এবং আত্মবিশ্বাস অর্জন করে চলেছেন। নারী ঘর-বার দুই-ই দক্ষভাবে সামলায়। ঘরে মায়ের ভূমিকা যথাযথভাবে পালন করার সঙ্গে সঙ্গে বহু নারী বাইরে উপার্জনের সঙ্গে যুক্ত এবং উপার্জিত অর্থে সংসারের বিভিন্ন প্রয়োজন মেটায়। শুধুমাত্র ঘরের দৈনন্দিন কাজ বা অবসর সময়কে কাজে লাগিয়ে আয় বাড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে সমাজ পরিচলানার কাজে সক্রিয় অংশগ্রহণ শুরু করেছেন। সম্প্রতি ৭৩ এবং ৭৪ তম সংবিধান সংশোধন সমাজের এক তৃতীয়াংশ মহিলাদের সংসদীয় গনতন্ত্রে সক্রিয় অংশগ্রহণের সুযোগ প্রতিষ্ঠিত করেছে। মহিলারা পঞ্চায়েতের বিভিন্ন স্তরে এবং পৌরসভায় প্রধান ও সদস্যা হিসাবে কাজ করছেন। বিধানসভা, লোকসভা, রাজ্যসভা অথবা রাজ্য এবং কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভার সদস্যা হিসাবেও তাদের ক্রমশঃ বেশি সংখ্যায় ভূমিকা পালন করার ঘটনা ঘটে চলেছে।

কিন্তু এর পাশাপাশি বিপরীত চিত্রটি সমাজকে এখনো প্রবলভাবে নাড়া দেয়। বিভিন্নভাবে নারী নির্যাতন বা নারীর উপর অপরাধমূলক ঘটনা ক্রমেই বেড়ে চলেছে। সাম্প্রতিক তথ্যে দেখা যাচ্ছে ভারতে প্রতিদিন গড়ে ১৪০ জন মহিলা গার্হস্থ্য অত্যাচারের শিকার, প্রায় ৫০ শতাংশ মহিলা নিজ পরিবারে হিংসার শিকার। কন্যা ভ্রূণ হত্যা চলছে, নারী ও বালিকা বিভিন্ন গণিকালয়ে বিক্রি হচ্ছে, কর্ম জগতে বহু মহিলা যৌন নির্যাতনের শিকার হচ্ছেন। আবার মহিলারা তাদের উপর সংঘটিত অত্যাচার বেশিরভাগ ক্ষেত্রে স্বাভাবিকভাবে মেনে নেন। বর্তমানে একটি পরিসংখ্যানে দেখা যাচ্ছে যে ভারতবর্ষে প্রায় ৮০ শতাংশ মহিলা পারিবারিক নির্যাতনের বিরুদ্ধে ঘরের বাইরে মুখ খোলেন না এবং সর্বোপরি ৭৫ শতাংশ মহিলা তাদের ওপর যে কোন ধরনের অন্যায় বা হিংসাকে খুব স্বাভাবিক বলে মনে করেন কারণ পুরুষশাসিত সমাজব্যবস্থায় মেয়েদের মজ্জায় এই ভ্রান্ত বিশ্বাসটি ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে যে পুরুষ কৃত অত্যাচার যথাসম্ভব সহ্য করে নিতে হয়।

সমাজকে সুস্থভাবে এগিয়ে নিয়ে যেতে হলে পুরুষ ও নারী উভয়কে যথাযোগ্য মর্যাদা দেওয়া প্রয়োজন, সুযোগ দেওয়া প্রয়োজন। এই সহজ সত্যটি বোঝা দরকার। কঠিন সত্যটি হল উন্নতিশীল দেশগুলিতে মহিলারা সমাজে মর্যাদা পান না কারণ আর্থিকভাবে তারা বলীয়ান নন। সুতরাং শিক্ষা ক্ষেত্রে, স্থানীয় স্বায়ত্ব শাসনের ক্ষেত্রে অধিকার প্রতিষ্ঠিত হলে লিঙ্গ বৈষম্য বহুলাংশে কমবে। তবে লিঙ্গবৈষম্যকে একেবারে নির্মূল করবার জন্য মহিলাদের অর্থনৈতিকভাবে স্বনির্ভর হয়ে উঠতে হবে। পুরুষদেরও দৃষ্টিভঙ্গী স্বচ্ছ হওয়া প্রয়োজন। কারণ আমাদের দেশে যে কোন চাষের কাজে মেয়েদের ৫০ শতাংশের বেশি অবদান কিন্তু তার প্রাপ্য স্বীকৃতি নেই। কোন দেশ বা সমাজ প্রকৃতই উন্নতির পথে হাঁটতে চাইলে নারীকে পুরুষের মত সমান সুযোগ এবং সম্মান দিতে হবে। পুরুষকে সেজন্য তার দৃষ্টিভঙ্গী যেমন বদলাতে হবে তেমনি নারীকেও সচেষ্ট হতে হবে তাদের অবস্থানগত পরিবর্তনে।

৪.৬ অনুশীলনী

১। পরিবার বলতে কী বুঝি? পরিবারের মূল বৈশিষ্ট্যগুলি ব্যাখ্যা কর।

২। লিঙ্গ বৈষম্য কী এবং কেন? এই বৈষম্য কমিয়ে আনতে গেলে কী করা দরকার?

৩। জাতিভেদ কীভাবে ঘটেছে এবং ভারতীয় সমাজে তার প্রভাব কী?

৪। 'বিবাহ' বিষয়ে একটি নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধ লেখ।

একক ৫ □ বিশ্বায়নের প্রভাব-আর্থিক, সাংস্কৃতিক, সামাজিক ও পারিবারিক গঠন কাঠামোয়। উন্নয়নের কু-প্রভাব-জীবনধারণের জন্য স্থানচ্যুতি ও দেশান্তরে গমন (The effect of globalization on economic, cultural, social and family structures. The adverse effects of development displacements and migration for livelihood).

গঠন

৫.১ বিশ্বায়ন সম্পর্কে ধারণা

৫.২ বিশ্বায়নের সংজ্ঞা

৫.৩ বিশ্বায়নের প্রভাব

৫.৩.১ আর্থিক গঠন কাঠামোয়

৫.৩.২ সাংস্কৃতিক গঠন কাঠামোয়

৫.৩.৩ সামাজিক গঠন কাঠামোয়

৫.৩.৪ পারিবারিক গঠন কাঠামোয়

৫.৪ উন্নয়নের কু-প্রভাব

৫.৪.১ জীবনধারনের জন্য স্থানান্তরিত হওয়া বা অন্যস্থানে গমন

৫.৫ উপসংহার

৫.৬ অনুশীলনী

৫.৭ প্রস্তাবিত পাঠ্য

৫.১ বিশ্বায়ন সম্পর্কে ধারণা

পৃথিবীব্যাপী তথ্য-প্রযুক্তি ও ব্যবসা বাণিজ্যের নজীরবিহীন অগ্রগতি, মুক্তবাণিজ্য, খোলা বাজারনীতি, অপরিসীম সুযোগ, পারস্পরিক সহযোগিতা, বোঝাপড়া ও সর্বক্ষেত্রে প্রতিযোগীতার পরিবেশ ক্রমেই বিশ্বায়ন ধারণাকে স্বচ্ছ করেছে। বিশ্বায়নের তাপ অনুভূত হয়েছে অনন্ত সুযোগ, সীমাহীন আকাঙ্খা ও চাহিদা, তীব্র প্রতিযোগিতা, শঙ্কা ও মানসিক চাপের ভেতর দিয়ে। গত দুই দশক ধরে বিশ্বায়ন বিষয়টিকে নিয়ে বিভিন্ন বিষয়ের (different disciplines) গবেষক, শিক্ষক, বুদ্ধিজীবী ও ব্যবহারিকগণ তাদের মত করে নানা গবেষণা, আলোচনা, ব্যাখ্যা ও ধারণা দিয়েছেন, যেগুলো এদের নিজ নিজ ক্ষেত্রের দৃষ্টিকোণ ও ভাবনার আলোকে আলোকিত। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ধারাবাহিক অগ্রগতির ফলে আমরা আজ বিশ্বায়নের যুগে বাস করছি। মানব সভ্যতার ছেদহীন যাত্রাপথে বিশ্বায়ন একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ ধারণা যা প্রতীকরুপে একটি উন্নত ভবিষ্যতের জন্যে অঙ্গীকার ও আগ্রহ তৈরী করে এবং ভৌগলিক সীমাবদ্ধতার সীমা ছাড়িয়ে এক-বিশ্বধারণার জন্ম দেয়।

৫.২ বিশ্বায়নের সংজ্ঞা

অর্থনীতিবিদ হেরিস্ (১৯৯৩), বিশ্বায়নের সংজ্ঞা নির্দেশ করে বলেছেন—'এটি বিকাশশীল আন্তর্জাতিকতার পরিপ্রেক্ষিতে পণ্যদ্রব্য ও পরিষেবার উৎপাদন, বন্টন ও বিপণন'।

লজ্ (১৯৯৫) বলেন, 'বিশ্বায়ণ একটি পদ্ধতি যার দ্বারা বিশ্বের মানুষ সততই তাদের জীবনের বিভিন্ন দিক গুলির— সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি এবং পরিবেশ এর মাধ্যমে পরস্পরের সাথে সংযুক্ত হচ্ছে, এবং এটি ক্রমেই বাড়ছে। সমাজবিজ্ঞানীরা বিশ্বায়নের আলোচনায় বেশি জোর দিয়েছেন একক (Single) বিশ্ব সত্তা বা একক বিশ্ব অস্তিত্বে বিশ্বাসী মানুষদের মধ্যে পারস্পরিক মিতস্ক্রিয়ার (interaction) সুযোগ ও তার গভীরতা ও তীব্রতার উপর। সমাজ বিজ্ঞানী ওয়াটার (১৯৯৫), বিশ্বায়নের সংজ্ঞা নির্দেশ করে বলেছেন, 'এটি একটি সামাজিক পদ্ধতি যাতে সমাজ ও সংস্কৃতির ভৌগলিক বাধা-সকল ক্রমেই পিছু হটছে এবং মানুষ দ্রততার সাথে সেটা বুঝতে পারছে বা এ ব্যাপারে সচেতন হচ্ছে। রবার্ট্সন বলেন, 'বিশ্বায়ন একদিকে যেমন বিশ্বকে সংকুচিত করছে তেমনি সামগ্রিকভাবে বিশ্ব সম্পর্কে মানুষের আত্মজ্ঞানকে আরো সমৃদ্ধ করছে'।

রাষ্ট্রসংঘ (United Nation) বিশ্বায়নের একটি সংজ্ঞা দিয়েছেন এইভাবে যে এটি একটি ধারণা, যা প্রথমতঃ জাতীয় সীমা অতিক্রম করে বেড়ে চলা পণ্যদ্রব্য ও সম্পদের একটি প্রবাহ এবং দ্বিতীয়তঃ এর ফলে উদ্ভুত প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোগুলির বিস্তৃত আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক কাজকর্ম ও লেনদেনের নিয়ন্ত্রিত একটি ব্যবস্থা (network)'।

৫.৩ বিশ্বায়নের প্রভাব

৫.৩.১ আর্থিক গঠন কাঠামোয় ঃ

বিশ্বায়নের প্রভাব ভারতীয় অর্থনীতিতে দীর্ঘমেয়াদী, কিছুটা দ্রুত এবং তীব্র। গত দুই দশকে সমগ্র ভারতীয় জীবনে, ধীরে অথচ নিশ্চিতভাবে বিশ্বায়িত অর্থনীতির অনুপ্রবেশ ও প্রসার এক কথায় তাৎপর্যপূর্ণ, যা বিশ্বায়নেরই ফল। বিশ্বায়নে যেমন আছে সুফল, তেমনি স্থানবিশেষে আছে কিছু কুফলও। এখানে সামগ্রিক ভাবে ভারতীয় অর্থনীতির গঠন কাঠামোয় বিশ্বায়ন কি প্রভাব ফেলেছে তাই দেখব। ভারতীয় অর্থনীতি ছিল মূলতঃ মিশ্র অর্থনীতি, যেখানে রাষ্ট্রায়ত্ব শিল্প সংস্থার পাশাপাশি, ব্যক্তি মালিকানায় কিছু দেশীয় সংস্থা, দেশীয় প্রযুক্তির ব্যবহার আর ছিল মুখ্যতঃ আভ্যন্তরীণ বাজার নির্ভর ব্যাণিজ্য, কৃষি নির্ভর গ্রামীণ অর্থনীতি ও এর সাথে যুক্ত ক্ষুদ্র ও কুটীর শিল্প। বর্তমানে বিশ্বায়নের কারণে ভারতীয় বাজারে বৈদেশিক মুদ্রার বিনিয়োগ বৃদ্ধি পেতে শুরু করেছে। অধিক সুযোগ ও বিনিয়োগকৃত অর্থের অধিক মুনাফা বা ফেরত (return) পাওয়ার সম্ভাবনায় বিভিন্ন প্রদেশে আন্তর্জাতিক বিনিয়োগকারীগণের মাধ্যমে দেশব্যাপী মুদ্রার যোগান ও প্রবাহ চলছে। দেশের মানুষ সহজেই অন্যদেশে বৃত্তি, গবেষণা, পড়াশুনা, বাণিজ্য কিংবা ভ্রমণে যেতে পারছে। নিয়মকানুনের শিথিলতা ও নানা সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে। বিশ্বায়নের প্রভাবে ব্যক্তি মালিকানায় নতুন নতুন শিল্প-কারখানা পরিষেবা সংস্থা, ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্র উন্মুক্ত হচ্ছে। রাষ্ট্রায়ত্ব শিল্প সংস্থার সংখ্যা কমছে। তথ্য-প্রযুক্তি, বৈদ্যুতিন যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রসার ঘটছে। দেশের একপ্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে বা বিদেশে একনিমেষে সহজেই যোগাযোগ করা সম্ভব হচ্ছে। শিক্ষিত, দক্ষ, মেধাবী মানুষের সামনে অর্থ উপার্জনের নানা পথ খুলে গিয়েছে। প্রতিযোগিতা বেড়েছে জীবনের সর্বক্ষেত্রে। মহিলাদের কাজের সুযোগ বেড়েছে। একই পরিবারের পুরুষ ও মহিলা উভয়েই উপার্জনের জন্য কাজে বেরোচ্ছে। মহিলারাও

পুরুষদের সাথে সর্বক্ষেত্রে সমান অধিকার ভোগ করার সুযোগ পাচ্ছে। শহরের মানুষের পারিবারিক গড় আয় বৃদ্ধি পেয়েছে। জিনিসপত্রের দাম বেড়েছে। সংসারের খরচ বেড়েছে। গ্রামীণ অর্থনীতিতে পরিবর্তন এসেছে-নতুন প্রযুক্তি, নতুন মুনাফা ভাবনা, কৃষিকে লাভজনক করা, বাজারমুখী উৎপাদন ভাবনা এসব কৃষি ক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তন ঘটাচ্ছে। কৃষিক্ষেত্রে বিনিয়োগ বাড়ছে। কৃষিপণ্যের রপ্তানি বাড়ছে (ফুল, ফল, ভেষজ গাছ, মাশরুম ইত্যাদি) দেশীয় ক্ষুদ্র ও কুটীর শিল্প বহুজাতীক সংস্থাগুলির সাথে অসম প্রতিযোগিতার মুখোমুখী হয়েছে। আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যের লাইসেন্স, নিয়মকানুন সরলীকৃত হয়েছে। বৈদেশিক মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবহারের ক্ষেত্রে নিয়মকানুন শিথিল হয়েছে। আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বৃদ্ধি পেয়েছে। অত্যাবশ্যকীয় জিনিসপত্র, ওষুধ ইত্যাদির দাম বেড়ে গিয়েছে। ব্যবসা ও বাণিজ্যের প্রসারে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা বা প্রদর্শনী হচ্ছে বিভিন্ন দেশে। ভারতীয় অর্থনীতির গঠন কাঠামোয় এভাবেই নিশ্চিত এবং দ্রুততায় পরিবর্তন সংগঠিত হচ্ছে যা বিশ্বায়নের প্রভাবকে সুনিশ্চিত ভাবে স্বীকার করে।

৫.৩.২ সাংস্কৃতিক গঠন কাঠামোয় ঃ

বিশ্বায়নের প্রভাবে ভারতে পশ্চিমী সংস্কৃতির প্রসার ঘটেছে। পশ্চিমী সংস্কৃতির অনুকরণ শুরু হয়েছে। এক মিশ্র সংস্কৃতির চর্চা শুরু হয়েছে। স্বদেশী ও আঞ্চলিক সংস্কৃতির চর্চায় ভাটা পড়েছে। মানুষ এখন আঞ্চলিক ও স্বদেশী সংস্কৃতির গন্ডি পেরিয়ে বিশ্বসংস্কৃতির স্বাদ্ গ্রহণ করছে। দূরদর্শন, সংবাদপত্র এ ব্যাপারে সহায়ক মাধ্যম হিসাবে সক্রিয় ভূমিকা নিচ্ছে। বিভিন্ন দেশের মধ্যে সাংস্কৃতিক আদান-প্রদান বেড়েছে। বিদেশি সিনেমা, চিত্র, ভাস্কর্য, সঙ্গীত উৎসব বা প্রদর্শনীর আসর যেমন দেশের বিভিন্ন প্রদেশে অনুষ্ঠিত হচ্ছে তেমনি তা দেশের সীমা ছাড়িয়ে অন্য দেশে পাড়ি দেচ্ছে। শিল্পী, চিত্রপরিচালক, অভিনেতা, অভিনেত্রী, লেখক, সাহিত্যিক, সাংবাদিক, খেলোয়াড়, মডেল নারী কিংবা পুরুষ সকলেই সমাদৃত হচ্ছে সকল দেশে। খাদ্য, পোশাক, বেশভূষায় পরিবর্তন এসেছে। এসব ক্ষেত্রে আঞ্চলিক সীমাবদ্ধতার পরিবর্তে আন্তর্জাতিক বিশ্বজনীন দৃষ্টিভঙ্গী তৈরী হচ্ছে। আঞ্চলিক ভাষা গুরুত্ব হারাচ্ছে। আন্তর্জাতিক ভাষা ইংরেজির প্রাধান্য বৃদ্ধি পাচ্ছে। মানুষের মূল্যবোধ, মানসিকতা, পাল্টাচ্ছে। নারী বা বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিদের প্রতি শ্রদ্ধা, সম্মান, উপযুক্ত মর্যাদা দানের মানসিকতা কমছে। মানুষ এখন অনেক বেশি স্বাধীন। তার নিজস্ব সুখ, আনন্দ, ভালোলাগা অনুসারে জীবন নির্বাহ করার ঝোঁক বাড়ছে। সমাজ-সংস্কৃতির ধারা বা ঐতিহ্যকে তোয়াক্কা না করে কুসংস্কার, জাতিভেদ, ধর্মীয় গোঁড়ামী কমে আসছে। বুদ্ধির বিকাশ ঘটছে অনেক ক্ষেত্রে। যুক্তিবাদী মন তৈরী হয়েছে। অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জোরালো হচ্ছে। মানুষে মানুষে খুনোখুনী, হিংসা (যা নানা প্রতিযোগিতার ফসল) কমানোর প্রয়াস শুরু হয়েছে বিশ্বজুড়ে। কিছু মানুষ শান্তির সন্ধানে পথ খুঁজছে। মানবতা, ন্যায় বিচার, মানব অধিকার নিয়ে অনেকেই সরব হচ্ছে। এ সবই বিশ্বায়নের প্রভাবে সাংস্কৃতিক গঠন কাঠামোয় পরিবর্তনের ফল।

৫.৩.৩ সামাজিক গঠন কাঠামোয় ঃ

ভারতীয় সমাজে দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা সামাজিক সম্পর্কের যে জটিল জালিকাটি প্রবাহিত ছিল বিশ্বায়নের প্রভাবে আজ সেখানে লক্ষণীয় পরিবর্তন এসেছে। সামাজিক আচার, রীতিনীতি ধরন ধারণে সেই পরিবর্তন লক্ষণীয়। সামাজিক ক্রিয়ার প্রকৃতিতে যেমন পরিবর্তন এসেছে তেমনি মানুষে মানুষে পারস্পরিক বোঝাপড়ার (interaction) ধরন ও পদ্ধতিতেও এসেছে বিরাট পরিবর্তন। সামাজিক দায়বদ্ধতা, কর্তব্য, দায়িত্ব বিষয়ে মানুষ ক্রমেনই উদাসীন হয়ে যাচ্ছে। সে ব্যক্তিকেন্দ্রিক হয়ে উঠছে। অনেক বেশি ব্যক্তি স্বাধীনতা ভোগ করছে। প্রতিবেশীর সুখ দুঃখের অংশীদার হওয়ার আগ্রহ কমছে। সামাজিক ঐক্য, সঙ্ঘবদ্ধতা কমছে। পরিবার ছোট হয়েছে

বা হচ্ছে। সমাজে বা পরিবারে নারী পুরুষ সমান অধিকার অর্জনের জন্য সওয়াল করছে। অসৎ আচরণ, উচ্ছৃঙ্খলতা, অসৎ উপায় অবলম্বন, অসাধুতা, মিথ্যাচার ইত্যাদি সামাজিক ব্যাধি-মাথা চাড়া দিচ্ছে। সমাজে বয়ঃজ্যেষ্ঠ নারী পুরুষকে শ্রদ্ধা, সম্মান, মর্যাদা দেওয়া সামাজিক প্রথা বলে আর তেমন গণ্য হচ্ছে না।

৫.৩.৪ পরিবারের গঠন কাঠামোয় ঃ

সমাজ একটি বৃহত্তর মানবগোষ্ঠী। আর পরিবার হল ঐ বৃহত্তর মানবগোষ্ঠীর একটি ক্ষুদ্র বা প্রাথমিক গোষ্ঠী। কতকগুলি পরিবার নিয়েই সমাজ। এই পরিবার আবার একটি প্রাথমিক সামাজিক সংগঠনও বটে। এ হল একটি সার্বিক প্রতিষ্ঠান। কিন্তু বিশ্বায়নের প্রভাবে এই প্রতিষ্ঠানটিতে নানা পরিবর্তন সংগঠিত হয়েছে। যৌথ পরিবার প্রথা অবলুপ্ত হওয়ার পথে। একই পরিবারের বিভিন্ন মানুষ বিভিন্ন পেশার বা কাজের সাথে যুক্ত হওয়ার কারণে দুরে বা বাইরে যেতে হচ্ছে। একই পরিবারের বিভিন্ন সদস্যদের বিভিন্ন অঙ্কের আয়ের কারণেও যৌথ পরিবার ভেঙ্গে ক্ষুদ্র পরিবার তৈরী হচ্ছে। পরিবারের মহিলা, পুরুষ উভয়েই অর্থ উপার্জনের জন্য কাজে যাচ্ছে। শিশুপালন, গৃহ কার্য্য শিশুর শিক্ষা সবকিছুই বেতনভুক ব্যক্তির উপর ন্যস্ত করা হচ্ছে। পরিবারের নারী পুরুষ সকলেই সমান অধিকার, ব্যক্তিস্বাধীনতা ভোগ করার চেষ্টা করছে। পরিবারের যে কোন সিদ্ধান্ত, পরিবারের সদস্যদের সাথে আলোচনা সাপেক্ষে গ্রহণ করা হচ্ছে। মা, বাবা, ও তাদের নাবালক পুত্র বা কন্যাকে নিয়ে ছোট ছোট পরিবার। বিবাহের মাধ্যমে যে স্থায়ী পরিবার গঠিত হয় সেই বিবাহেও নানা পরিবর্তন সংগঠিত হয়েছে। দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন হয়েছে। স্বামী, স্ত্রী ও তাদের এক বা দুজন শিশুকে নিয়ে যে পরিবারের অস্তিত্ব, অনেক ক্ষেত্রেই বিশ্বায়নের কারণে আজ অনেকে পরিবার শিশুর আগমনকে অবাঞ্ছিত মনে করছে। নারী পুরুষ নিজেদের প্রয়োজনে (জৈবিক ও মানসিক কারণে) একত্রে বসবাস করার প্রবণতাও দেখা যাচ্ছে। এখানে একত্রে বাস করাটাই বড় কথা, কোন স্থায়ী পরিবারের বা বিবাহ নামক আচার ব্যবস্থার কোন প্রয়োজন নেই। নারী পুরুষ দুজনেই সর্বদা ব্যস্ত। সময়, কাজ, তাদের মানসিক ও জৈবিক প্রয়োজন ইত্যাদি সম্পর্কে সচেতন। এই প্রয়োজনগুলি মিটলেই হল অন্য কিছু দরকার নেই এমন এক মানসিকতার জন্ম হচ্ছে। এভাবেই ভারতীয় পরিবারের গঠন কাঠামোটি বিশ্বায়নের কারণে পরিবর্তিত হচ্ছে। পরিবর্তনগুলি—

ক. পরিবার ছোট হচ্ছে।

খ. পরিবারের দায়িত্ব, কর্তব্যের প্রথাগত ধারণাটির পরিবর্তন হচ্ছে।

গ. পরিবার পিছু সন্তান/সন্ততির সংখ্যা হ্রাস পাচ্ছে।

ঘ. শহরাঞ্চলে গৃহকর্ম, সন্তানপালন, সন্তানের শিক্ষা ইত্যাদি কাজে বেতনভুক ব্যক্তিকে নিযুক্ত করা হচ্ছে।

ঙ. পরিবারের নারী পুরুষ সকলেই অর্থ উপার্জনে বাড়ির বাইরে বোরোচ্ছে। চাহিদা বেড়েছে সুতরাং আয় বাড়াতে হবে—এই মানসিকতা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

চ. পরিবারের নারী পুরুষ উভয়েই সমান অধিকার, সমান স্বাধীনতা ভোগ করার অবস্থা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

ছ. পরিবারে বয়ঃজ্যেষ্ঠ অবসরপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের গুরুত্ব কমে আসছে।

জ. বৃদ্ধাশ্রমের সংখ্যা (old age home) বাড়ছে।

ঝ. পরিবারের অভিভাবকেরা অনেক ক্ষেত্রে পুত্র/কন্যাদের বিবাহের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেন না বা নেওয়ার প্রয়োজন পড়ে না।

ঞ. অর্থ উপার্জনে বা জীবন ধারণের জন্যে পরিবারের সদস্যদের স্থানান্তর বা অন্যস্থানে গমন জরুরি হয়ে দেখা দিয়েছে।

৫.৪ উন্নয়নের কু-প্রভাব

৫.৪.১ জীবন ধারণের জন্য স্থানান্তরিত হওয়া বা অন্যস্থানে গমন ঃ

বিশ্বায়নের কারণে বিশ্বের উন্নত দেশগুলিতে শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, গবেষণা, বৃত্তি, অধিক উপার্জন, অনেক আকাঙ্খা পূরণের সুযোগ দেশের শিক্ষিত, দক্ষ, মেধাবী যুবক যুবতীকে বিশেষভাবে আকর্ষণ করে। এই আকর্ষণের টানে একদিন জীবনধারণের জন্যে তারা বিদেশে পাড়ি দেয়। এ ভাবে 'ব্রেনড্রেন' শুরু হয়। যে মস্তিষ্ক দেশের অগ্রগতিতে বিশেষ ভূমিকা নিতে পারত, দেশের অগ্রগতিকে ত্বরান্বিত করতে পারত তা ভিন্নদেশে চালান হয়। এছাড়া, গত দুই দশক ধরে বিশ্বায়নের প্রভাবে দেশে উন্নয়ন কর্মকাণ্ড ও নতুন উন্নয়ন ভাবনা এক বিশেষ গতি লাভ করেছে। সাধারণ মানুষ উন্নয়নের এই চাকচিক্যে ও বৈভবে বিশেষে আকর্ষণ অনুভব করছে। যদিও দেশে যে কর্মকাণ্ড সংগঠিত হয়েছে বা হচ্ছে এবং এর ফলে যে নতুন নতুন কেম্পানি, অফিস কাছারি, কলকারখানা, অনেক কাজের সুযোগ, অনেক উপার্জনের সুযোগ, বিনোদনের ব্যবস্থা, চাহিদা বা আকাঙ্খার যোগান তৈরী হয়েছে দেশের সব প্রান্তে তা সমান ভাবে হয়নি। দেশের এক রাজ্য (State) থেকে অন্য রাজ্যে, এক শহর থেকে আর এক শহরে, শহর থেকে বিভিন্ন গ্রামগুলিতে এই হওয়া আর না হওয়ায় অনেক তফাৎ। আর এই তারতম্যের ফলে গ্রামের সাধারণ মানুষ গ্রাম ছেড়ে শহরমুখী হয়েছে। শহরের মানুষ এক শহর ছেড়ে অন্য এক শহরে, এক রাজ্য ছেড়ে অন্য রাজ্যে জীবনধারণের জন্যে স্থানান্তরিত হচ্ছে।

নতুন নতুন কলকারখানা, অফিস বাড়ি, বিনোদন পার্ক, উন্নত বিপণনশালা, উন্নত আবাসন প্রকল্প, মেগাসিটি, নতুন নতুন সড়কপথ, ইত্যাদির জন্য আরো অনেক অনেক জমির প্রয়োজন হচ্ছে। আর সে জমি পেতে সাধারণ মানুষের বাসভূমি, বসতবাটি, কৃষিখামারের উপর টান পড়ছে। সে উচ্ছেদ হচ্ছে। এসব ছেড়ে তাকে জীবনধারণের জন্যে অন্যস্থানে যেতে হচ্ছে। অনেক ক্ষেত্রে গ্রামীণ অর্থনীতি, সামাজিক অবস্থা, রাজনৈতিক পরিস্থিতি খারাপ হওয়ার কারণে মানুষ স্থানান্তরিত হচ্ছে বা অন্যস্থানে চলে যাচ্ছে। এ সবই ঘটছে বিশ্বায়নের পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষ প্রভাবে।

৫.৫ উপসংহার

বিশ্বায়নের প্রভাবে ভারতীয় অর্থনীতি, সংস্কৃতি, সমাজ ও পারিবারিক জীবনে ও তার গঠনকাঠামোয় এক বিশেষ পরিবর্তন সংগঠিত হয়েছে বা হচ্ছে। তথ্য-প্রযুক্তি, বৈদ্যুতিন যোগাযোগ, শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধির সাথে সাথে সাংস্কৃতিক আদান-প্রদান, বিদেশি বিনিয়োগ, মুক্ত বাজারনীতি, সামাজিক রীতিনীতি ও প্রথা পরিবর্তন, যৌথ পরিবার ভেঙ্গে ছোট পরিবার, পরিবারের নারী-পুরুষ উভয়েরই অর্থ উপার্জনে ব্যস্ততা, সুযোগ, সহযোগিতা, চাহিদা, প্রতিযোগিতা, নতুন মূল্যবোধ, মানসিকতা, সবকিছু অর্থ মূল্যে বিচার ইত্যাদি এক আমূল পটপরিবর্তনের পূর্বাভাস, যদিও এই পরিবর্তনের সব কিছুই মানুষের কাছে মঙ্গলময় নয়। এই পরিবর্তনের কারণে জীবন ধারণের প্রয়োজনে মানুষকে বাধ্য হয়ে স্থানান্তরিত হতে হচ্ছে, যেতে হচ্ছে অন্যকোন স্থানে। অনেক ক্ষেত্রে উন্নয়নের স্বার্থে তাকে উচ্ছেদ হতে হচ্ছে ভিটে মাটি থেকে। সেজন্য বলা যায়, বিশ্বায়ন সারা বিশ্বব্যাপী নানা কল্যাণকর ও অকল্যাণকামী পরিবর্তনকে দ্রুততার সঙ্গে বাস্তবায়নের এক ব্যবস্থা বা অনুঘটক।

৫.৬ অনুশীলনী

১। বিশ্বায়ন কী? বিশ্বায়নের কারণে ভারতে কী কী পরিবর্তন সংগঠিত হয়েছে যা ভারতের অগ্রগতিকে ত্বরান্বিত করেছে?

২। ভারতীয় অর্থনীতিতে বিশ্বায়নের প্রভাব আলোচনা কর।

৩। ভারতীয় সমাজ ও সাংস্কৃতিক গঠনকাঠামোয় বিশ্বায়নের প্রভাব আলোচনা কর।

৪। ভারতীয় সমাজ, সংস্কৃতি ও পারিবারিক জীবনে বিশ্বায়নের কু-প্রভাব কী? ব্যাখ্যা কর।

৫.৭ প্রস্তাবিত পাঠ্য (Suggested reading)

১। Globalization of Business-Abbas J. Ali, Jaico Publishing House.

২। সমাজদর্শন—প্রমোদবন্ধু সেনগুপ্ত। ব্যানার্জী পাবলিসার্স

৩। Sociology-Morris Ginsberg.

একক ৬ □ সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর উপর আধুনিকীকরণ ও নগরায়নের প্রভাব (The influence of Modernization and Urbanization on the socio-economically depressed sections)

গঠন

৬.১ আধুনিকীকরণ ও নগরায়ন সম্পর্কিত ধারণা
৬.২ আধুনিকীকরণ ও নগরায়নের সংজ্ঞা
৬.৩ সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর উপর আধুনিকীকরণ ও নগরায়নের প্রভাব
 ৬.৩.১ অর্থনৈতিক প্রভাব
 ৬.৩.২ সামাজিক প্রভাব
 ৬.৩.৩ সাংস্কৃতিক প্রভাব
৬.৪ অনুশীলনী
৬.৫ প্রস্তাবিত পাঠ্য

৬.১ আধুনিকীকরণ ও নগরায়ন সম্পর্কিত ধারণা

পশ্চিম ও তৃতীয় উভয় বিশ্বের সমাজবিজ্ঞানী, পরিকল্পনাবিদ্ ও রাজনীতিবিদ্দের মনে প্রথম 'আধুনিকীকরণ' সম্পর্কিত ধারণার জন্ম দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর। যদিও তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলি এটিকে বিবর্তনের পথে একটি 'অবস্থা হিসাবে দেখতে চেয়েছেন, যখন পশ্চিমী সমাজ একে 'আধুনিক' আখ্যা দিয়েছেন। হ্যারিসন (Harrison) বলেন, তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলি পশ্চিমের এই আধুনিক ধারণাকে অনুকরণ ও অনুসরণ করেছে কারণ পশ্চিম এর মাধ্যমে তৃতীয় বিশ্বকে একটি নতুন উন্নয়ন ধারণা দিয়েছে। কিছুক্ষেত্রে গতানুগতিক সামাজিক চিন্তায় তৈরী ফাটলই একদিন হয়ত এই উন্নয়ন ও আধুনিক ধারণার জন্ম দিয়েছিল। আধুনিকীকরণ বোঝার জন্য অতি গুরুত্বপূর্ণ হল আধুনিক মানুষ কি সেটা বোঝা। এ্যালেক্স ইনকিলেস (Alex Inkeles) আধুনিক মানুষ বলতে বলছেন, যার মধ্যে নতুন অভিজ্ঞতা লাভের জন্য প্রস্তুতি (readiness) আছে এবং পরিবর্তন ও আবিষ্কারকে গ্রহণ করার জন্য আছে একটি খোলা মন (Openness)-সেই হল আধুনিক মানুষ। একজন ব্যক্তিকে আধুনিক বলা যায় তখনই যখন সে পুরানো চিরাচরিত প্রযুক্তি ও মূল্যবোধকে অন্ধ অনুসরণ না করে নতুন প্রযুক্তি ও মূল্যবোধকে গ্রহণ করে জীবনকে চালিত করে। পক্ষান্তরে, কোন ব্যক্তি যখন পুরানো চিরাচরিত প্রযুক্তি, সামাজিক রীতিনীতি ও মূল্যবোধকে ধরে চলে তখন তাকে পশ্চাৎবর্তী বা অনগ্রসর (backward) ব্যক্তি বলা হয়। আর ঐ ধরনের জনগোষ্ঠীকে বলা হয় পশ্চাৎবর্তী বা অনগ্রসর জনগোষ্ঠী বা সম্প্রদায় (Backward Community)। এরা নিজেদের বিকশিত করার যথেষ্ট সুযোগ পায় নি, বিশেষতঃ আর্থিক, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, বাসস্থান প্রভৃতি ক্ষেত্রে ফলে এখনো এরা অনেকেই অনগ্রসর ও অনুন্নত থেকে গেছে। সরকারী নীতি, পরিকল্পনা ও প্রকল্পের মাধ্যমে সরকার বা কিছু বেসরকারি প্রতিষ্ঠান দেশের এই অনগ্রসর মানুষদের সামাজিক ও রাজনৈতিক সচেতনতা এবং আর্থিক উন্নতির মাধ্যমে

বিকাশসাধন ও আধুনিকমনস্ক করে তুলতে চেয়েছে। ফলে দীর্ঘদিনের চিরাচরিত ধ্যানধারণা, চিন্তাভাবনায় কিছুটা পরিবর্তন এসেছে। মানুষ আধুনিকমনস্ক হয়ে উঠছে। সে অভ্যস্ত হয়ে উঠছে নতুন জীবনযাত্রার ধরনে-খাদ্যগ্রহণে, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, স্বাস্থ্য সচেতনতায়, উন্নত বাসস্থান, আধুনিক পোশাকে, নতুন প্রযুক্তি, কৃষি কিংবা শিল্প-বাণিজ্য ক্ষেত্রের উদ্ভাবিত নতুন পদ্ধতি-প্রকরণে, আধুনিক উন্নত পরিবহন ব্যবস্থা, বৈদ্যুতিন যোগাযোগ ব্যবস্থা কিংবা নতুন সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিষেবা গ্রহণে। চিন্তার জগতেও পরিবর্তন এসেছে-পুরানো মূল্যবোধ, রীতিনীতি, আচার-ব্যবহারেও তার প্রতিফলন ঘটেছে। এভাবেই আধুনিকীকরণের শর্তগুলি পূরণ হয়েছে ধীরে ধীরে অথচ নিশ্চিতভাবে। একটি সমাজের আধুনিকীকরণ নির্ভর করে দ্রুততার (speed) উপর, যে দ্রুততায় সে নিজেকে রূপান্তরিত করে ও খাপ খাওয়ায় নতুন পরিবেশে। জেনিস ব্রুনহেস (Jeenes Brunhes) তাঁর মানব ভূগোল (Human Geography) গ্রন্থে বলেছেন, আমাদের চারপাশের সবকিছুই পরিবর্তনশীল অবস্থায় আছে, কোন কিছুই স্থির নয় (Everything around us is in a state of change, nothing is stable)। সমাজ রূপান্তরের পদ্ধতি জড়িত এর বাইরের ও ভেতরের উভয় বিষয়ের সাথে (The process of transformation of a society involves both the exogenous and the endogenous factors)। গিলিন এবং গিলিন (Gillin & Gillin) বলেন, 'স্থানভেদে সামাজিক পরিবর্তনের তারতম্য হয় গৃহীত জীবনযাত্রার ধরনে'। সুতরাং পুরানো জীবনযাত্রার ধরনে পরিবর্তন ও নতুন জীবনযাপনের ধরনে অভ্যস্ত হয়ে ওঠাই হল আধুনিকীকরণ।

নগরায়ন ধারণা কিছুটা প্রাচীন। শিল্প বিপ্লবের পরবর্তীকালে শিল্পায়নের ফলশ্রুতিস্বরূপ নগরায়নের ব্যাপ্তি ও প্রসার। শিল্পায়নের ফলে হস্তচালিত যন্ত্রপাতি ব্যবহারের পরিবর্তে বিদ্যুৎ চালিত মেশিন ও যন্ত্রপাতির ব্যবহার শুরু হয়েছিল। এর হাত ধরেই নতুন প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে তৈরি হয় কলকারখানা, অফিসকাছারী। গড়ে ওঠে কলকারখানায় উৎপাদিত দ্রব্যের বাজার, দোকানপাট, কাজের সুযোগ। দু-চারজন করে গ্রামের মানুষ কাজের জন্য গ্রাম থেকে এই সব কলকারখানায়, অফিসকাছারী, দোকানপাটের অঞ্চলে, শিল্প-বাণিজ্যকেন্দ্রে আসতে শুরু করে। প্রশাসন নতুন সংস্কৃতির নানা প্রয়োজন-বাসস্থান ইত্যাদি নানা নাগরিক সুযোগসুবিধা মেটাতে সচেষ্ট হয়। গড়ে ওঠে নগর। নাগরিক সুযোগ-সুবিধা প্রসারিত হয়। এভাবেই শুরু হয় নগরায়ন। প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে নগরায়ন ধারণা। ভারতবর্ষে নগরায়ন পদ্ধতি শুরু হয়েছিল বিশেষতঃ ইংরেজ শাসনকালে এবং তা আরো গতি পায় দেশে গত ৫০ বছরে শিল্পায়নের কাজের জন্য যা সুগভীর প্রভাব ফেলে সকল স্তরের মানুষের সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গী ও সামাজিক আচার ব্যবস্থা (social institutions)-গুলির উপর। নতুন অর্থনৈতিক সম্পর্ক, ধর্মনিরপেক্ষতা, ক্ষীণ হয়ে আসা জাতিপ্রথা (caste system), পরিবারের ধারণা-যৌথ পরিবারের চেনা ছবিটা বদলে গিয়ে অনু পরিবারের ধারণা, অসবর্ণ বিবাহ ইত্যাদি নগরায়নের কারণে প্রস্ফুটিত হতে লাগল। গ্রামের মানুষের জনসংখ্যা হ্রাসের অনুপাতে নগরের জনসংখ্যাবৃদ্ধি পেতে লাগল। নগরে বসবাসকারী মানুষের জনসংখ্যার ঘনত্ব বৃদ্ধি পেল, নতুন নগরি-মূল্যবোধ তৈরী হল, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, যোগাযোগ, যানবাহন ব্যবস্থায় পরিবর্তন এল, কাজের সুযোগ তৈরী হল। এভাবেই নতুন এক নগরায়ন ধারণা প্রতিষ্ঠালাভ করল।

৬.২ আধুনিকীকরণ ও নগরায়নের সংজ্ঞা

রজার্স (Rogers) আধুনিকীকরণের সংজ্ঞা দিয়ে বলেছেন : এটি একটি পদ্ধতি যার দ্বারা ব্যক্তি পরিবর্তিত হয় গতানুগতিক জীবনযাত্রা থেকে আরো জটিল, প্রযুক্তির দিক দিয়ে উন্নত এবং দ্রুত পরিবর্তনশীল জীবনযাত্রার ধরনে (Rogers defined modernization as 'the process by which individuals change from a traditional way of life to a more complex, technologically advanced and rapidly changing style of life)। রজার্স অবশ্য এ কথাও বলেছেন যে আধুনিকীকরণ শুধু যে উপকারী তা নয়, এর দ্বারা যন্ত্রণা বা সমস্যাও আসতে

পারে। ব্ল্যাক (Black) বলেছেন : আধুনিকীকরণ একটি পদ্ধতি যেটি একইসাথে গঠনাত্মক ও ধ্বংসাত্মক যা মানুষকে নতুন সুযোগ ও সুবিধা দেয় মানুষের স্থানচ্যুতি ও কষ্টের মূল্যে (It is a process that is simultaneously creative and destructive, providing new opportunities and prospects at a high price in human dislocation and suffering)। হ্যারিসন (Harrison) আধুনিকীকরণ ও উন্নয়ন নিয়ে আলোচনাকালে বলেছেন, আধুনিকীকরণ একটি পদ্ধতি যা পরিবর্তন আনে, মনে হয় এটি একটি বিবর্তন-এক অবস্থা থেকে আর এক অবস্থায়, যার দুটোই বাস্তব ধারণাসম্মত (It is a process which involves a change, perhaps an evolution-from one state to another, both of which may be real or idealised)। যোগেন্দ্র সিংহ (Yogendra Singh) আধুনিক সমাজকে প্রবহমান/চিরাচরিত (traditional) সমাজ থেকে আলাদা করেছেন এইভাবে যে, আধুনিক সমাজের মত চিরাচরিত সমাজের ক্রিয়াশীল মূল্যবোধ যথেষ্ট সক্রিয় ও প্রভাববিস্তারী নয়। মেথা ভি. আর. (Metha V. R.), আধুনিকীকরণের সংজ্ঞা দিয়েছেন 'রাজনৈতিক বিকাশ' সম্পর্কের পরিপ্রেক্ষিতে। তিনি মনে করেন আধুনিকীকরণ আদর্শ বা মতাদর্শগত দৃষ্টিভঙ্গীর উপর নির্ভরশীল। ভারতবর্ষে রাজনৈতিক বিকাশ ও আধুনিকীকরণের উপর লেখকের বিভিন্ন লেখা থেকে একটি সাধারণ গৃহীত দৃষ্টিভঙ্গী প্রকাশ পেয়েছে তা হল এটি একটি প্রযুক্তিগত ধারণা যা একটি স্থির পথে এগিয়ে গেছে জনসংখ্যা সম্পর্কিত কতকগুলি পরিবর্তনের ফলে (it is a technological concept which proceeds along a fixed route as a result of certain demographic changes)। ডাঃ এস. সি. দুবে (Dr S C Dubey) বলেন, 'আধুনিকীকরণ অবশ্যই একটি পদ্ধতি, গতানুগতিক (traditional) বা অনেকটা গতানুগতিকের মত একটি অবস্থা থেকে (order) কিছুটা আকাঙ্খিত প্রযুক্তি এবং এর সাথে যুক্ত সমাজের গঠন, মূল্যবোধ, সামাজিক অনুপ্রেরণা ও রীতিনীতিতে গমন। ডাঃ দুবে বলেন, আধুনিকীকরণ অনুকরণ করার মত কোন সহজ পদ্ধতি নয় বা ভাসাভাসা বিচ্ছিন্ন বৈশিষ্ট্য ও উপাদানের সমষ্টি বা আরো কোন উন্নত দেশের বৈশিষ্ট্যসমূহ নয়-এটি ঠিক হয় যুক্তিসাপেক্ষে ও পর্যায়ক্রম অনুসারে এবং বিস্তারিত সাংস্কৃতিক রীতিনীতির সাথে মিল রেখে যেখানে মূল্যবোধের পরিবর্তন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

নগরায়নের সংজ্ঞা নির্ণয় করা অত্যন্ত জটিল কাজ। অনেকেই নগর ও নগরায়ন নিয়ে আলোচনা করলেও নগরায়নের সঠিক ব্যাখ্যা দিয়ে উঠতে পারেন নি কারণ পৃথিবীর নানা দেশে এর প্রকার ও প্রকৃতির রকমফের আছে। নগরায়নকে আলাদা করা হয়েছে এর বিশেষ জীবনযাত্রার ধরনে যা অনেকটা আধুনিক জীবনযাত্রার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। অধ্যাপক বারজেল (Prof.Bergel) নগরায়নের সংজ্ঞা দিয়ে বলেন এটি গ্রামীণ অঞ্চল থেকে নগর অঞ্চলে রূপান্তরের একটি পদ্ধতি (Process of transforming rural into urban area)। জনসংখ্যার অর্থনৈতিক কাঠামোর (economic composition of population) উপর এই পদ্ধতির প্রবল প্রভাব। এটি গ্রামীণ জনসংখ্যার হ্রাস ও সেই অনুপাতে নগর জনসংখ্যার বৃদ্ধি ঘটায়। গোষ্ঠী জীবনযাত্রার উদ্দেশ্যে নগরায়ন নতুন ও সামাজিক মনোভাব ও সামাজিক আচার ব্যবস্থা তৈরী করে। জিস্ট এবং হালবার্ট (Gist & Halbert) মনে করতেন নগরায়ন অনেক বেশী তাত্ত্বিক ধারণা।

৬.৩ সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর উপর আধুনিকীকরণ ও নগরায়নের প্রভাব

৬.৩.১ অর্থনৈতিক প্রভাব :

আধুনিক ও নগরায়নের ফলে অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর অনেক মানুষই তাদের পুরানো গতানুগতিক পেশার পরিবর্তে নতুন নানা পেশায় নিযুক্ত হয়েছে। দারিদ্রের কারণে গ্রাম থেকে নগরমুখী হয়েছে বিভিন্ন কাজের সুযোগ

গ্রহণ করার জন্য। নগরে আসা এইসব মানুষের কিছুটা আর্থিক স্বচ্ছলতা আসে। এই সব পরিবারে নারী ও পুরুষ উভয়ের মধ্যে কাজের মাধ্যমে অর্থ উপার্জনের সমান তাগিদ লক্ষ করা যায়। সংসারে আয় বাড়াতে মহিলারাও কাজ করতে বাড়ির বাইরে যায়। এর ফলে আয় যেমন বাড়ে তেমনি ছেলেমেয়ের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পোশাক-পরিচ্ছদ, বাসস্থান ইত্যাদি ক্ষেত্রে খরচও বেড়েছে আগের থেকে।

কৃষিক্ষেত্রে নতুন প্রযুক্তি ও নতুন পদ্ধতির ব্যবহার শুরু হয়েছে। উৎপাদন বাড়ানো ও আরো আয় বাড়ানোর বিষয়ে সচেতন হওয়ার জন্য এরা প্রশিক্ষণ নিচ্ছেন। আবার অনেকে নিজের বাসস্থান থেকে নগরায়নের কারণে উৎখাত হয়েছেন, নতুন রাস্তা, যোগাযোগ ব্যবস্থা, পরিবহণ ব্যবস্থা সম্প্রসারিত হয়েছে, কলকারখানা, খামারবাড়ি, বাণিজ্যকেন্দ্র তৈরীর জন্য এই উৎখাত মেনে নিয়ে বিকল্প বাসস্থানের সন্ধানে এঁরা উদ্বাস্তু হয়েছেন। অর্থনৈতিক শ্রেণিবৈষম্য বেড়েছে। মহিলা ও শিশু-কিশোর শ্রমিক বেড়েছে। অর্থনৈতিক কারণে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশেও মাথা গুঁজে বেঁচে থাকতে হচ্ছে রোজগার করার জন্য, খেয়ে-পরে বেঁচে থাকার জন্য। অর্থনৈতিক ক্রমবিভাজন (hierarchy) বাসস্থান ক্রমবিভাজনের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ।

৬.৩.২ সামাজিক প্রভাব :

১. স্থানান্তরগমন ও স্থানচ্যুতি ঘটেছে।

২. জাতিগত পেশার পরিবর্তে দক্ষতা, যোগ্যতা অনুসারে যে কোন পেশায় মানুষ যুক্ত হতে পারছে।

৩. জাতিভেদ প্রথা অনেকটাই কমে এসেছে।

৪. অসবর্ণ বিবাহ সমাজ ও পরিবার মেনে নেওয়ার পথে এগোচ্ছে।

৫. অভিভাবকদের দ্বারা দেখাশুনা করে বিবাহের পরিবর্তে নিজেদের পছন্দ করা বিবাহ স্বীকৃতি পাচ্ছে।

৬. শিক্ষা, ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য বিষয়ে সচেতনতা বাড়ছে।

৭. অর্থনৈতিক শ্রেণিবৈষম্য বেড়েছে।

৮. পরিবার ছোট হয়েছে, যৌথ পরিবার ভেঙ্গে ছোট অনু পরিবার তৈরী চলেছে।

৯. পোশাক-পরিচ্ছদে আধুনিকতার ছাপ পড়ে চলেছে দ্রুততার সঙ্গে।

১০. সহজ সরল জীবনযাত্রার পরিবর্তে নগরের চাকচিক্য ও আধুনিক নগরী-মূল্যবোধের প্রভাব পড়ছে।

১১. আত্মকেন্দ্রিক, গোষ্ঠীস্বার্থ বিষয়ে উদাসীন থাকার প্রবণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

১২. বাসস্থানকে ঘিরে অস্বাস্থ্যকর, নোংরা পরিবেশ তৈরী হচ্ছে স্বল্প জায়গার কারণে। এভাবেই নগরে বস্তি অঞ্চল তৈরী হচ্ছে।

৬.৩.৩ সাংস্কৃতিক প্রভাব :

১. আধুনিক ও নগরের মূল্যবোধের সঙ্গে নিজেদের মিলিয়ে নেওয়ার প্রবণতা বাড়ছে।

২. বিভিন্ন প্রকার অর্থকরী বিনোদনের ব্যবস্থা বেড়ে চলেছে।

৩. নানা ধরনের নেশার সামগ্রী সহজলভ্য হয়েছে।

৪. ধর্মীয় সংকীর্ণতা, আচার, সংস্কার, ইত্যাদি ক্রমশঃ পরিবর্তিত হচ্ছে ও ধর্মসহিষ্ণুতা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

৫. কর্তব্যবোধের চাইতে অধিকারবোধ সম্পর্কে বেশি সচেতনতা আসছে।

৬. নৈতিকতা, সহানুভূতি, সামাজিক দায়বদ্ধতা হ্রাস পাওয়ার লক্ষণ স্পষ্ট হচ্ছে।

৬.৪ অনুশীলনী

১। আধুনিকীকরণ ও নগরায়ন ধারণা সম্পর্কে তোমার মতামত বিশদভাবে আলোচনা কর।

২। আধুনিকীকরণ কাকে বলে? নগরায়ন কী? ভারতবর্ষে নগরায়নের সূচনা মোটামুটি কবে থেকে এবং কী ভাবে?

৩। অনগ্রসর সম্প্রদায়ের উপর আধুনিকীকরণ ও নগরায়নের অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা কর।

৪। আধুনিকীকরণ ও নগরায়নের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রভাব ব্যাখ্যা কর।

৬.৫ প্রস্তাবিত পাঠ্য (Suggested Reading)

1. Sociology–S. Sachdev.
2. The Other Side of Development–K.S. Shukla.
3. Adult Education and Modernization–Dr Madan Singh, State Resource Cente, U.P.
4. Population and Development–B N Ganguli.
5. Learning : The Treasure Within-Report of UNESCO of the International Communication on Education for the Twentyfirst Century.
6. Poverty and Social Change with a reappraisal–Tarlok Singh.
7. Urbanization and Family Change-M.S. Gore.

একক ৭ □ সমসাময়িক সামাজিক সমস্যা-চোরাচালান, শিশু ও বয়স্ক ব্যক্তি (বৃদ্ধ/বৃদ্ধা) নির্যাতন, অপরাধজনক কাজ, কিশোর বয়সে অপরাধ এবং যুব অস্থিরতা (Contemporary social problems-trafficking, child and elderly persons' abuse, criminality, juvenile delinquency and youth unrest)

গঠন ঃ

৭.১ সামাজিক সমস্যার সংজ্ঞা ও তার প্রকৃতি

৭.২ সামাজিক সমস্যার প্রতিকার

৭.৩ চোরাচালান (আন্তঃরাজ্য ও আন্তর্দেশীয়)

৭.৪ শিশু ও বয়স্ক ব্যক্তি (বৃদ্ধ/বৃদ্ধা) নির্যাতন

৭.৫ অপরাধজনক কাজ

 ৭.৫.১ অপরাধের সংজ্ঞা

 ৭.৫.২ অপরাধের কারণ

৭.৬ কিশোর বয়সে অপরাধ

 ৭.৬.১ কিশোর অপরাধ ও অপরাধের কারণ

 ৭.৬.২ ভারতে কিশোর অপরাধ ও তার প্রতিকার

৭.৭ যুব অস্থিরতা/অসন্তোষ/চাঞ্চল্য

৭.৮ সম্ভাব্য প্রশ্ন

৭.৯ প্রস্তাবিত পাঠ্য

৭.১ সামাজিক সমস্যার সংজ্ঞা ও তার প্রকৃতি

জীবন যেমন ধারাবাহিক খাপখাওয়ানো ও পুনরায় খাপখাওয়ানোর একটি পদ্ধতি, সমাজও ঠিক তেমন। যখন সমাজের বিভিন্ন অংশ সঠিকভাবে একে অন্যের সাথে সঙ্গতি রেখে চলে তখন তাকে আমরা ভাল সমাজ বলি। আর যখন অসঙ্গতি দেখা দেয়, অথবা পরিবর্তিত পরিস্থিতির ফলে সমাজের ভারসাম্য নষ্ট হয় তখন সামাজিক সমস্যার সৃষ্টি হয়। সামাজিক অনিয়ম সমাজের সদস্যদের সম্পর্কের ভাঙ্গানের বা খারাপ হওয়ার ফলে তৈরী হয় এবং চূড়ান্ত পর্বে সেটিই সামাজিক সমস্যা হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে। কিছু সমাজবিজ্ঞানী সামাজিক সমস্যার সংজ্ঞা এভাবে দিয়েছেন :

ব্যবহারের ধরন (Behaviour patterns) বা একটি অবস্থা, যা সমাজের বহু সদস্যের কাছে আকাঙ্খিত নয়। এই সমাজবিজ্ঞানীরা মনে করেন যে, এর প্রতিকার বা সমস্যা তৈরীর সুযোগ কমানোর জন্য সংশোধন নীতি, নানা প্রকল্প ও পরিষেবা অত্যন্ত জরুরি। ই. বি. র‍্যব এবং জি. জে. সিজনিক (E. B. Raob & G. J. Seiznick)

সামাজিক সমস্যার অত্যন্ত যথার্থ ও বিস্তৃত সংজ্ঞা দিয়ে বলেছেন যে সামাজিক সমস্যা হচ্ছে মানুষের সম্পর্ক যা প্রবলভাবে বাধা দেয় সমাজকে, যা বহু মানুষের প্রকৃত উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে বাধা দেয় বা ধ্বংস করে। সুতরাং সামাজিক সমস্যা হল সমাজের কল্যাণ বা সামাজিক প্রগতির পথে অন্তরায় (Social problems are the conditions threatening the well-being of society)। লরেন্স কে. ফ্রাঙ্ক (Lawrence K. Frank) আমেরিকান জার্নাল অফ সোসিওলজিতে সামাজিক সমস্যা প্রবন্ধে সামাজিক সমস্যার সংজ্ঞা দিয়ে বলেছেন যে, সমাজের বহু সংখ্যক ব্যক্তির অযৌক্তিক ব্যবহারের ফলে উদ্ভূত অসুবিধা যা আমরা শোধরাতে বা দূরীভূত করতে সচেষ্ট হই, তাকেই সামাজিক সমস্যা বলে (Any difficulty of misbehaviour of a fairly large number of persons which we wish to remove or correct)। রিচার্ড সি. ফুলার ও রিচার্ড আর. মেয়ার্স (Richard C. Fuller and R. R. Meyers) সামাজিক সমস্যার বিষয়ে বলেন, এটি একটি অবস্থা যা সমাজের সংখ্যাগুরু শ্রেণিলালিত সামাজিক কিছু নিয়মকানুন থেকে সরে আসা (a condition which is defined by a considerable number of persons as a deviation from social norm which they cherish)। ল্যান্ডবার্গ বলেন, সামাজিক সমস্যা হচ্ছে অগ্রহণযোগ্য দিকে যে কোন ব্যবহারের এতটা বিচ্যুতি যা জনসমষ্টির সহ্যের সীমা অতিক্রম করে (A social problem is any deviant behaviour in a disapproved direction of such a degree that it exceeds the tolerance limit of the community)।

সামাজিক সমস্যা কতগুলি পরিস্থিতি বা অবস্থা যা সমাজের কাছে ভয়ের বা সমাজের প্রগতির পথে বাধাস্বরূপ। সুতরাং একে প্রতিরোধ বা অপসারিত করাই দরকার। সামাজিক সমস্যাজনিত পরিস্থিতি তৈরী হয় অনেক মানুষের দ্বারা। সমাজ সবসময় একসুরে বাঁধা থাকে না (harmonious)। সমাজে নানা মানুষ একে অপরের বিরুদ্ধাচরণ বা শত্রুতা বা সন্দেহেরও সম্মুখীন হয়। সুতরাং সমাজে নানা ক্ষেত্রে সদ্ভাবের অভাব যেমন দেখা দেয় তেমনি আবার সহাবস্থানও দেখা যায়। সমাজবিজ্ঞানীদের উদ্দেশ্য হলো সমাজের এই খাপ না খাওয়ানোর কারণগুলি অনুসন্ধান করে এর প্রতিবিধান দেওয়া।

সামাজিক সমস্যার বিষয়গত উপাদান :

একটি নির্দিষ্ট পরিস্থিতি কি সামাজিক সমস্যা? না কি এটা অনেকটা বিষয়গত বিচারের বিষয়? কোন একটি সমাজ একটি বিশেষ পরিস্থিতিকে তার সমস্যা হিসাবে দেখতে পারে কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে সব সমাজই সেই পরিস্থিতিকে তাদের সমস্যা হিসাবে দেখবে। আবার একই সমাজ আজ যাকে তার সমস্যা বলে দেখছে, অবস্থা ও দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তনের কারণে আগামিকাল তাকেই সেভাবে নাও দেখতে পারে। কোন সমাজে মানুষের চিন্তায় যদি কোন পরিস্থিতিকে সমস্যা হিসাবে ধরা হয় তাহলে তা কোন সমস্যাই নয়। যদিও সেটি দার্শনিক (philosopher) বা বাইরের জগতের বিজ্ঞানীদের কাছে সমস্যা হলেও হতে পারে। যেমন প্রাচীন গ্রীসে পতিতাবৃত্তি সামাজিক সমস্যা হিসাবে গণ্য হয় নি। সেখানে পতিতার উপার্জনে ধর্মীয় মন্দির তৈরী ও রক্ষণাবেক্ষণ হতো। প্রাচীন ভারতীয় জাতিভেদ প্রথাও কোন সামাজিক সমস্যা হিসাবে বিবেচিত হয় নি। বিভিন্ন জাতি বংশপরম্পরায় সামাজিক মর্যাদা পেত এবং সব জাতির জন্য কাজ নির্দিষ্ট ছিল। ক্রীতদাস প্রথা (Slavery) আমেরিকায় কখনো সামাজিক সমস্যা হিসাবে মনে করা হয়নি। এভাবে নির্দিষ্ট পরিস্থিতি বা অবস্থা কখনই সামাজিক সমস্যা হিসাবে দেখা দেয় না যতক্ষণ পর্যন্ত না নৈতিকভাবে তা ভুল বলে সমাজের বেশিরভাগ মানুষ মত প্রকাশ করছে। সামাজিক সমস্যার এই বিষয়গত ধরন বা প্রকৃতি (Nature) সত্ত্বেও সার্বজনীন ও স্থায়ী কিছু সামাজিক সমস্যা বর্তমান। যেমন যুদ্ধ (war) অপরাধ (Crime), বেকারত্ব (Unemployment) এবং দারিদ্র্য (Poverty) মুখ্য সামাজিক সমস্যা হিসাবে পরিগণিত হয় সমস্ত সমাজে। অস্পৃশ্যতা ভারতবর্ষে একটি সামাজিক সমস্যা হিসাবে প্রতিভাত হয়েছে যখন মানুষ বুঝেছে যে এটা সামাজিক ঐক্যের (Social Unity) অন্তরায়।

৭.২ সামাজিক সমস্যার প্রতিকার

সভ্যতার ঊষালগ্ন থেকেই মানুষ চেষ্টা করে চলেছে বিভিন্ন পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে উদ্ভূত সমস্যার সমাধান খুঁজে সামাজিক সুস্থিতি বজায় রাখতে। সামাজিক সমস্যা সমাধানে দুটি পদ্ধতির কথা উল্লেখ করা যেতে পারে : (১) প্রতিকারক (remedial) ও (২) প্রতিরোধক (preventive)। আধুনিক মানুষ সামাজিক সমস্যাকে অলৌকিক বা অতিপ্রাকৃত (supernatural) ক্ষমতা দিয়ে বোঝার চেষ্টা করে না বরং সে সব সমস্যাকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীতে বিশ্লেষণ করে অত্যন্ত বাস্তবসম্মত এবং অনেক বেশি কার্যকরীভাবে তার প্রতিরোধ ও প্রতিকারে সচেষ্ট হয়। এর মধ্যে প্রতিকারক (remedial) পদ্ধতি সমস্যার কারণ খোঁজার পরিবর্তে সমস্যার লক্ষণ ও ফলাফল বিচার করে কাজ করে। আর প্রতিরোধক (preventive) পদ্ধতি কষ্টকর অনুসন্ধান বা গবেষণা চালিয়ে এর গভীরে নিহিত কারণগুলিকে খুঁজে তার সমাধানে এগিয়ে যায়। অবশ্যই যদি সামাজিক সমস্যার মূল উৎসগুলিকে বন্ধ করা যায়, তা হলে সেটাই হবে সবচেয়ে ভালো সমাধান। কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি অনুসরণ করা সম্ভব হয় না। ফলে প্রতিকারক পদ্ধতিই বহুল ব্যবহৃত সমাধান। সমাজ পুনর্গঠনকারী বা সংস্কারকগণ নানা সামাজিক সমস্যার সমাধান খুঁজেছেন। সাধারণ মানুষ থেকে পন্ডিত, পেশাদার ব্যক্তি প্রত্যেকেই এই দুই পদ্ধতির কোন না কোনটিকে ব্যবহার করে সমস্যার সমাধান খুঁজেছেন। কিছু সংস্কারক 'শিক্ষা'কে সকল সামাজিক সমস্যার সমাধান হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। এ. ই. উইজেন (A. E. Wiggian) বেশিরভাগ সামাজিক অসুস্থতার সমাধান হিসাবে মানবকুলের জৈব (biological) উন্নতির কথা বলেছেন যা শারীরিক ও মানসিকভাবে অসমর্থ মানুষের বৃদ্ধিকে বাধা দেয়। কার্ল মার্কস্ (Karl Marx) ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে আমাদের সকল সমস্যার কারণ হিসাবে দেখিয়ে 'কমিউনিজম্'কে বেশিরভাগ সমস্যার একমাত্র সমাধানের পথ বলে অভিহিত করেছেন। ওয়ার্ড (Ward) সার্বজনীন শিক্ষা ও জ্ঞানের বিস্তারকে শতাব্দীতে (millennium) পদার্পণের প্রধান উপায় হিসাবে চিহ্নিত করেন। সরোকিন (Sorokin) মনে করতেন মানবজাতির মুক্তি বা পরিত্রাণ আসবে আধ্যাত্মিক মূল্যবোধ ও আধ্যাত্মিক আদর্শ অনুসরণের মাধ্যমে। টয়েনবি (Toynbee) মনে করতেন ধর্মের প্রকৃত সত্য মূল্যই হলো এই পৃথিবীতে সমস্ত রকম হানাহানি দূর করা এবং এই পৃথিবীকে ঈশ্বরের রাজত্বে পরিণত করা।

সামাজিক সমস্যার ধরন, ব্যাপ্তি ও গভীরতা যুগ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত হয়। বর্তমান সময়ে যে সব সামাজিক সমস্যা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য সেগুলি হলো নেশায় আসক্তি, দেহ ব্যবসায়, নারীঘটিত অপরাধ, অর্থনৈতিক অপরাধ, পণ ও যৌতুক প্রথা, শিশু শ্রমিক, কিশোর অপরাধী, বৃদ্ধ-বৃদ্ধার সমস্যা, ভিক্ষাবৃত্তি, অনাথ, বেকারত্ব ইত্যাদি। এই সমস্যাগুলির কয়েকটি সম্পর্কে এখানে আলোচনা করা হলো।

৭.৩ চোরাচালান

যে কোন দেশের ক্ষেত্রেই চোরাচালান একটি অতি ভয়াবহ সামাজিক সমস্যা। ভারতবর্ষেও এই সমস্যাটি প্রকট, কারণ কি আন্তঃরাজ্য কি আন্তর্দেশীয় উভয় ধরনের চোরাচালানই এখানে বিদ্যমান। দেশের মধ্যে এক রাজ্য থেকে আর এক রাজ্যে চোরাপথে নানা দুর্মূল্য সামগ্রী, ভাস্কর্য, চিত্রকলা, স্থাপত্যের নিদর্শন, বিভিন্ন নেশার সামগ্রী যথা হেরোইন, ব্রাউন সুগার, হোয়াইট সুগার, গাঁজা, ভাঙ, আফিম, মদ এবং সর্বোপরি শিশু এবং নারীপাচারও হয়ে থাকে। আইনতঃ নিষিদ্ধ এই সব কাজ কিছু মানুষ সামাজিক রীতিনীতি ও মূল্যবোধকে উপেক্ষা করে, প্রশাসনের চোখ এড়িয়ে গোপনে করে চলেছেন। নেশা সুস্থ সবল শুভবুদ্ধিসম্পন্ন যুবকযুবতীকে সমাজের মূলস্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন করে তার জীবনে চরম বিপর্যয় ডেকে আনে। সাংসারিক অশান্তি, জীবনে আশানুরূপ সাফল্য না পাওয়া, বেকারত্ব, একাকীত্ব, হতাশা ইত্যাদি কারণে অনেক মানুষ ড্রাগের নেশায় আসক্ত হচ্ছে। চোরাপথে ড্রাগ আমদানি

করে ড্রাগ বিক্রেতা বানিয়ার দল কি দরিদ্র, কি ধনী নির্বিশেষে ঐ সব হতাশাগ্রস্ত যুবকযুবতীর কাছে তা বিক্রি করে মুনাফা করছে। যুবকযুবতীরাই শুধু যে নিজেদের এভাবে সর্বনাশ ডেকে আনছে তা নয়, এর সাথে সাথে এদের সংসারকেও বিপন্ন করে তুলেছে। গোটা সমাজ এইভাবেই বিপন্ন ও অবক্ষয়ের পথে এগিয়ে যাচ্ছে।

আন্তর্দেশীয় চোরাচালান একদেশের মূল্যবান সামগ্রী-সোনা ও অন্যান্য ধাতু ও ধাতুদ্রব্য, ভাস্কর্য, চিত্রকলা প্রভৃতি এবং ড্রাগ, শিশু ও নারী অন্যদেশে পাচার ও বিক্রি করছে। শিশুকে দিয়ে শ্রম ও নারীকে দিয়ে দেহব্যবসা করানোর জন্য এরা চড়া দামে তাদের বিক্রি করে থাকে। আজ তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলি থেকে এভাবেই আরবদেশগুলিতে ও পশ্চিমের অনেক দেশে শিশু ও নারী পাচার হচ্ছে। উপযুক্ত শিক্ষা এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় সুযোগ বৃদ্ধি করে, যুবকযুবতী, নারী ও শিশুদের উপযুক্ত নাগরিক হিসাবে গড়ে তুলে তাদের দেশের মূলস্রোতের সঙ্গে যুক্ত রেখে এ সমস্যা থেকে মুক্তি পাওয়া যেতে পারে। এজন্য সর্বস্তরে সকল মানুষকে সচেতন করা ও সক্রিয়, সুসভ্য নাগরিক হিসাবে তার দেশের প্রতি যে দায়িত্ব ও কর্তব্য আছে সে সম্পর্কে তাদের ওয়াকিবহাল করানো অতি জরুরি।

৭.৪ শিশু ও বয়স্ক (বৃদ্ধ/বৃদ্ধা) নির্যাতন

শিশু ও বয়স্ক ব্যক্তিদের উপর শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন একটি গুরুতর সামাজিক সমস্যা। ইদানিংকালে এই সমস্যাটি কি উন্নত দেশে, কি অনুন্নত বা উন্নয়নশীল দেশে সর্বত্রই সমাজজীবনে এক গভীর ক্ষতের সৃষ্টি করছে। যথেষ্ট সংখ্যক শিশু, সে মেয়ে কিংবা ছেলে, বয়স্ক ব্যক্তি সে মহিলা কিংবা পুরুষ নির্যাতন, অত্যাচার ও যন্ত্রণার শিকার হচ্ছে সমাজের কিছু মানুষের অমানবিক ব্যবহারের জন্য। যেহেতু এরা শিশু ও বয়স্ক বৃদ্ধ বা বৃদ্ধা তাই এদের প্রতিবাদের সাহস, মনের জোর ও শারীরিক সক্ষমতা তেমন থাকে না। বরঞ্চ অন্যের উপর নির্ভরতা থাকে অনেক বেশি। ফলে এই অবস্থার সুযোগ নিয়ে এদের উপর নির্যাতন ও অত্যাচার করা হয়। এদের বাধ্য করা হয় এক যন্ত্রণাময় জীবনযাপনে। শিশুদের দিয়ে জোর করে নানা ধরণের শ্রম আদায় করা, শিশুকে অপহরণ করে মোটা অর্থ দাবি করা, দাবি পূরণের জন্য শিশুর উপর নির্যাতন করা ও বহুক্ষেত্রে তাকে মেরে ফেলা ইত্যাদি ঘটে থাকে। শিশুর উপর নির্যাতনের অন্যান্য ক্ষেত্রগুলি হলো অত্যল্প মাইনে দেওয়া, যৌন নির্যাতন করা, নিরাপত্তাহীনতা, অস্বাস্থ্যকর কাজের পরিবেশ ও থাকার ব্যবস্থা, বিপজ্জনক কাজে নিযুক্তি, যদিও Employment of Children Act, 1938-এ এই ধরনের কাজে তাদের নিযুক্তি নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

ভারত সমেত তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে এই সমস্যা যথেষ্ট গভীর। এই সমস্যা সমাধানের জন্য সরকার, আইন রক্ষাকারী সংস্থা, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান সকলকে একযোগে কাজ করতে হবে। নিম্নলিখিত কয়েকটি ক্ষেত্রে নজর দিলেই অবস্থার উন্নতি ঘটতে পারে।

- বিপজ্জনক কাজে তাদের নিয়োগ সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করা।
- নিম্নতম পারিশ্রমিক নিশ্চিত করা।
- প্রতিদিন যাতে অন্ততঃ বারো ঘন্টা বিশ্রাম পায় সে বিষয়ে ব্যবস্থা নেওয়া।
- প্রয়োজনীয় সামাজিক নিরাপত্তা দান।
- বাধ্যতামূলক শিক্ষার ব্যবস্থা।
- কাজের এবং থাকার পরিবেশে নিম্নতম মান বজায় রাখা।
- স্বাস্থ্য, শিক্ষা, ক্রীড়া, বিনোদন, প্রশিক্ষণ, ইত্যাদি মৌলিক পরিষেবার সুযোগ দান।

বয়স্কদের ক্ষেত্রে নির্যাতনের ধরন একটু অন্যরকম। তাদের অবজ্ঞা করা, হেয় করা, অপমানসূচক ও আপত্তিজনক কথা বলা, আর্থিকভাবে নিঃস্ব করে রাখা ইত্যাদি। পরিবারে তারা অপাঙক্তেয় সেটা তাদের নানাভাবে বুঝিয়ে দেওয়া, এমনকি কখনো কখনো শারীরিক নির্যাতন, জোরপূর্বক তাদের কাছ্ থেকে শ্রম আদায় করা, অভুক্ত রাখা, বিশ্রামের সুযোগ না দেওয়া, সবরকম স্বাধীনতা কেড়ে নেওয়া, ইত্যাদি। আধুনিকীকরণ, নগরায়ন, বিশ্বায়নের সাথে সাথে এই সব নির্যাতন ও যন্ত্রণা আরো প্রকট হচ্ছে। দ্রুততার সঙ্গে পুরানো মূল্যবোধ, সামাজিক রীতিনীতি পাল্টে যাচ্ছে। মানবিকতা প্রতি মুহূর্তে লাঞ্ছিত হচ্ছে। নানা সামাজিক সমস্যা তৈরী হচ্ছে। সমাজের সবচেয়ে দুর্বল যে শিশু ও বয়স্ক ব্যক্তি তাদের সুবিধা-অসুবিধা, ভালো লাগা-মন্দ লাগাগুলি সহানুভূতির সাথে, শ্রদ্ধার সাথে দেখতে হবে এই ভাবনাটাও যেন ক্রমশঃ দুর্বল হচ্ছে। একটি শিশু সঠিকভাবে বেড়ে উঠলে সেও পৃথিবীকে, মানব সভ্যতাকে কিছু কল্যাণকর উপাদান উপহার দিতে পারে, কিংবা বয়স্ক ব্যক্তিও ফুরিয়ে যান নি, তাঁরাও তাঁদের সাধ্যমত যতদিন সক্ষম ছিলেন ততদিন পরিবার ও সমাজকে কিছু দিয়েছেন এবং এখনো উপদেশ, পথনির্দেশ, আশীর্বাদ ও উৎসাহ দিয়ে সাহায্য করতে পারেন। সুতরাং কি শিশু, কি বয়স্কব্যক্তি কারো উপরই নির্যাতন ও অত্যাচার করে বৃহত্তর সমাজের ক্ষতি করা উচিত নয়। আমরা মনে রাখি না যে আমরাও শিশু ছিলাম, আবার আগামীদিনে আমরাও বৃদ্ধ হব।

৭.৫ অপরাধমূলক কাজ

৭.৫.১ অপরাধের সংজ্ঞা

'অপরাধ'- এই সামাজিক সমস্যাটি প্রতিটি সমাজেই আছে। সমাজভেদে সেই সমাজের পরিপ্রেক্ষিতে অপরাধও নানারকম। অপরাধ তুলনাসাপেক্ষ। সি ড্যারো-র (C., Darrow) সংজ্ঞা অনুসারে আইনের চোখে নিষিদ্ধ বা অবৈধ কাজ যার জন্য আইনে শাস্তির নির্দেশ বর্ণিত আছে ('Crime is an act forbidden by the law of the land and for which penalty is prescribed')। বারনেস (Barnes) ও টেকটারস্ (Tecters) এর মতে অপরাধ একটি সমাজবিরোধী ব্যবহারের ধরন যা সাধারণ মানুষের আবেগকে ধ্বংস করে, যা দেশের আইন বর্জনীয় বলে নির্দেশ দেয়।

যেহেতু সকল সমাজে ভাল (right) ও মন্দ (wrong) ধারণা এক নয় এবং সকল সমাজে পরিবর্তন একই সময়ে সংগঠিত হয় না, সেহেতু অপরাধের ধরন বা ধারণা, অপরাধ ব্যবহার (Criminal behaviour) বিভিন্ন সমাজে বিভিন্ন। তাই অপরাধ আপেক্ষিক (relative), নির্দিষ্ট ও নিশ্চয় নয় (absolute)। অপরাধকে আধুনিক সভ্যতা ও উন্নত সমাজের একটি বৃহত্তর সামাজিক 'বিস্ময়/আশ্চর্য ঘটনা' বলা হয়।

আদিম সমাজেও অপরাধ ছিল, কিন্তু অপরাধ তখন এমন একটি প্রকট সামাজিক সমস্যা হিসাবে চিহ্নিত ছিল না। আদিম সমাজে ব্যক্তিগত ব্যবহারকে কার্যকরীভাবে নিয়ন্ত্রণ করার অনেক বেশি ক্ষমতা ছিল মানুষের। কতিপয় মানুষ যারা সামাজিক নিয়মনীতিকে অবজ্ঞা, উপেক্ষা করত তাদের সেই উপেক্ষা কখনই গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের কাছে ভয়ের কারণ হয়ে ওঠেনি। আধুনিক সমাজে অনেক মানুষ এবং তার অনেক শ্রেণিবিভাগ। তার ব্যবহারের উপর নিয়ন্ত্রণ খুবই কম। ফলে আধুনিক সমাজে অপরাধজনিত কাজ অনেক গুন বেশি সংঘটিত হচ্ছে। কালোবাজারী, কর ফাঁকি দেওয়া (আয়কর ও বিক্রয়কর), চোরাচালান, ঘুষ নেওয়া, ভেজাল মেশান, অপহরণ, শিশু বা নারী পাচার, ভ্রূণ হত্যা, ভিক্ষাবৃত্তি, চৌর্যবৃত্তি ইত্যাদি সবই অপরাধ যা আধুনিক সমাজের সমস্যা হিসাবে সমাজবিজ্ঞানীরা উল্লেখ করেছেন।

৭.৫.২ অপরাধের কারণ ঃ

আধুনিক অপরাধবিজ্ঞান অপরাধের কারণ হিসাবে একটি নয়, অনেকগুলি কারণের যোগফল হিসাবে দেখেছে। সংক্ষেপে কারণগুলি এইভাবে ব্যাখ্যা করা যায় :

(অ) **বংশগত কারণ** (Hereditary)

কিছু অপরাধবিজ্ঞানী মনে করেন বংশগত কারণে অনেক সময় অপরাধ সংগঠিত হয়। অর্থাৎ যে প্রবৃত্তিটি এর পেছনে কাজ করে সেটি বংশগত। অপরাধীর মধ্যে কিছু শারীরিক (physical) মানসিক (mental) বৈশিষ্ট্য দেখা যায় যেগুলি বংশ পরম্পরায় পরবর্তী প্রজন্মে সঞ্চারিত হয় এবং একটি অনুকূল পরিবেশে আত্মপ্রকাশ করে।

(আ) **শারীরিক গঠন** (Physiological)

লম্বরোসো (Lombroso) একজন ইতালিয়ান অপরাধবিজ্ঞানী। তাঁর মতে শরীরের গঠন ও মানসিক নানা অস্বাভাবিকতা লক্ষ করে অপরাধী চিহ্নিত করা যায়। শরীরের ঐ বিশেষ গঠন ও মানসিক অস্বাভাবিকতাই তাকে ঠেলে দেয় অপরাধের পথে।

(ই) **মানসিক ও মনস্তাত্ত্বিক কারণ** (Mental and Psychological)

বিজ্ঞানী বার্ট (Burt) বলেছেন, অপরাধের কারণ মুখ্যতঃ মনস্তাত্ত্বিক (Psychological)-দুর্বল মনের, অস্বাভাবিক প্রকৃতির মানুষের মধ্যে অপরাধপ্রবণ ব্যবহার (Criminal behaviour) লক্ষ করেই তিনি একথা বলেন। হেলি ও ব্রুনার (Healy and Bronner) বলেছেন অপরাধী অস্থির আবেগের (emotionally unstable) ও অশান্ত আবেগের (emotionally disturbed) মানুষ। এবং এর কারণ কোন পূর্ব দুঃখজনক অভিজ্ঞতা। এই মনস্তাত্ত্বিক কারণের জন্য অনেকে অপরাধী হয়। আবার কোন ব্যক্তির মনের আশা যখন স্বাভাবিক পথে পূরণ হয় না তখন সেই অসন্তুষ্টি থেকে অপরাধ প্রবণতা তৈরী হয়।

পরিস্থিতি বা পরিবেশের কারণেও মানুষ অপরাধ করে থাকে। যেমন :

(অ) **পারিবারিক অবস্থা** (Family Condition)

পরিবারের পরিবেশ ও আর্থিক অবস্থা, পরিবারের আকার, পরিবারে ঝগড়া-বিবাদ-এসবের কারণে মানুষ অপরাধমুখী হয়। অত্যন্ত দারিদ্র্য, বাসস্থানের অপ্রতুলতা, অমানবিক পরিবেশ, পরিবারের সদস্যদের মধ্যে ক্ষতিকর সম্পর্ক ইত্যাদি অবস্থা মানুষকে অনেক সময় বাধ্য করে অপরাধজনক কাজে যুক্ত হয়ে পড়তে।

(আ) **সঙ্গদোষ** (Companionship)

সামাজিক বাতাবরণ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কার সাথে বন্ধুত্ব, কাদের সাথে মেলামেশা, এর ওপর নির্ভর করে খারাপ বা ভালো হওয়া। অপরাধীদের সাথে মিশলে অপরাধী হওয়ার প্রবণতা তৈরী হয়।

(ই) **শিক্ষা** (Education)

শিক্ষা মানুষকে সচেতন করে, নিজ সিদ্ধান্ত গ্রহণে সমর্থ করে। শিক্ষার আলোর ও সুযোগের অভাবে মানুষ অপরাধী হতে পারে। নিজেকে সঠিকভাবে গড়ে তুলতে পারে না। অপরাধে সামিল হয়ে পড়ে।

(ঈ) **জনসমষ্টির অবস্থা** (Community condition)

কোন একটি বিশেষ গোষ্ঠীর বা সম্প্রদায়ের মানুষ যদি অপরাধের সঙ্গে জড়িত থাকে তাহলে সেই গোষ্ঠীর অন্য কিছু সদস্যের মধ্যেও অপরাধপ্রবণ হয়ে পড়ার সম্ভাবনা থাকে।

(উ) **সিনেমা, আধুনিক পশ্চিমী মূল্যবোধ** (Cinema and Western Values)

এই সমস্ত বিষয়ের প্রভাব মানুষকে অপরাধমূলক কাজে জড়িয়ে ফেলতে সাহায্য করে।

৭.৬ কিশোর বয়সে অপরাধ

৭.৬.১ কিশোর বয়সে অপরাধ ও তার কারণ ঃ

শিল্পোন্নয়ন ও নগরায়নের সাথে সাথে আধুনিক সমাজে কিশোর বয়সে অপরাধ একটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক সমস্যা হিসাবে দেখা দিয়েছে। এই বয়সে অপরাধ নিয়ে অনেকে বিশদ আলোচনা করেছেন। সমাজবিজ্ঞানী ডাঃ সুশীল চন্দ তাঁর নিজের দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতার আলোকে এই সমস্যাটিকে দেখতে চেয়েছেন। নৈতিক ও আইনি বাধ্যবাধকতা সকল দেশে, সকল কালে সমান নয়। তার কারণ, কিশোর বয়সে অপরাধও এক ধরনের হয় না, বা একইভাবে সংঘটিত হয় না। ছোট ছোট অপরাধ থেকে শুরু করে নানা গুরুতর অপরাধেও তারা জড়িত থাকে।

'ন্যাশান্যাল প্রোবেশন অ্যাসোসিয়েশন অফ দি ইউনাইটেড স্টেট্স্' কিশোর বয়সে অপরাধের সংজ্ঞা দিয়ে বলেছেন :

(অ) একটি শিশু যখন কোন আইনকে ভাঙ্গে (সেই দেশের),

(আ) একটি শিশু যখন তার মাতাপিতা, অভিভাবকদের শাসনের বাইরে এবং তাঁদের অমান্য করে,

(ই) একটি শিশু যখন অভ্যাসবশতঃ বাড়ি বা স্কুল থেকে পালায়,.

(ঈ) একটি শিশু যখন অভ্যাসবশতঃ নিজেকে নির্বাসিত, আহত ও নিজের নৈতিকতা ও স্বাস্থ্যকে বিপদের মুখে ঠেলে দেয় এবং অন্যদেরও বিপদে ফেলে, তখন তাকে কিশোর অপরাধী বলে।

ফ্রেডল্যান্ডার (Friedlander) কিশোর অপরাধীর সংজ্ঞা দিয়ে বলেছেন, আইনের বাইরে কোন কিশোর যখন অসদাচরণ করে, তখন তাকে কিশোর অপরাধী বলে। কিশোর অপরাধ এমন একটি কাজ যা কিশোরকে বিচারশালার আঙ্গিনায় ঠেলে দেয় ঐ কাজের শাস্তি কি হবে তা ঠিক করার জন্য।

কিশোর বয়সে অপরাধের কারণ :

(ক) **মনো-জৈবিক কারণ** (Psycho-biological Factors)

এই মনো-জৈবিক কারণগুলি আমরা *বংশগত, শরীরবৃত্তিয়, মানসিক বা মনস্তাত্বিক*— এই তিনভাগে ভাগ করতে পারি।

বংশগত কারণে অপরাধের প্রবৃত্তি শিশু বা কিশোরদের মনে জাগতে পারে। বংশগত প্রবৃত্তি শিশু ও কিশোরদের মধ্যে অপরাধমূলক কাজের প্রবণতা বৃদ্ধি করে।

শরীরবৃত্তিয়-শরীরের গঠন ও মানসিক অস্বাভাবিকত্ব নির্দেশ করে অপরাধ প্রবণতা। ঐ শারীরিক গঠন কাঠামো ও মনের অস্বাভাবিকত্ব অপরাধের কারণ হতে পারে।

মানসিক বা মনস্তাত্বিক-দুর্বল মনের, অস্বাবাবিক প্রকৃতির, অশান্ত আবেগের শিশু-কিশোর অপরাধপ্রবণ হতে পারে। এদের এই অস্থিরতা বা অশান্ত ভাব কোন কষ্টকর অভিজ্ঞতা থেকে তৈরী হয়। মনের বিশেষ ইচ্ছা স্বাভাবিক পথে পূর্ণ না হলে অপরাধ করার প্রবণতা বাড়ে অসন্তুষ্টি থেকে।

(খ) **পরিবেশ বা পরিস্থিতির কারণে**

কারণগুলি—

(অ) ***অর্থনৈতিক দুরবস্থার জন্য***—তীব্র দারিদ্র্যের কারণে অপরাধজনক কাজের দিকেও প্রবণতা জন্মে।

(আ) ***শিক্ষার অভাব***—সঠিক শিক্ষা ও শিক্ষার সুযোগ না পাওয়ায় শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত হয়ে অপরাধ জগতের দিকে পা বাড়ায়। বিপথগামী হয়। শিক্ষা পেলে সঠিক পথে, মূলস্রোতের সাথে এক হয়ে সুন্দর জীবন গড়তে পারত।

(ই) ***পরিবারের অবস্থা***—পরিবারের ভাঙ্গান, পরিবারের নানা সমস্যা, বিবাদ, ঝগড়া, অশান্তি ইত্যাদির কারণে পরিবারের শিশু-কিশোর বিপথগামী হতে পারে, অপরাধের সাথে নিজেকে যুক্ত করতে পারে।

(ঈ) ***সঙ্গীর কারণে***—ভুল সঙ্গী বা অপরাধের সাথে যুক্ত কিশোর বা যুবককে সঙ্গী বা সহচর হিসাবে গ্রহণ করা, তার সাথে মেলামেশা করা ইত্যাদির মাধ্যমে অপরাধের প্রতি আগ্রহ বাড়ে।

(উ) ***সামগ্রিক অবক্ষয় ও অধঃপতনের কারণে***—শিশু ও কিশোরদের অপরাধ প্রবণতা বাড়তে পারে সামগ্রিক সামাজিক অবক্ষয় ও অধঃপতনের কারণে।

(ঊ) ***সিনেমা, থিয়েটারের কারণে***—সিনেমা, থিয়েটার, সংবাদপত্রে অপরাধ বিষয়ে উপস্থাপন ও নানা তথ্য পরিবেশন শিশু-কিশোরদের মধ্যে অপরাধপ্রবণতা বাড়িয়ে দিতে পারে।

৭.৬.২ ভারতে কিশোর বয়সে অপরাধ ও তার প্রতিকার

আমাদের দেশে আরো অন্যান্য সামাজিক সমস্যার সাথে কিশোর অপরাধও একটি গুরুতর সামাজিক সমস্যা। ১৯৬৪ সালে জি. সি. দত্ত 'সেমিনার অন সোস্যাল ডিফেন্স'-এ লিখেছিলেন, ভারতের শিল্পোন্নয়নের সাথে সাথে কিশোর অপরাধ অত্যন্ত দ্রুততায় ভয়ঙ্কর একটি সামাজিক বিপদ হিসাবে আত্মপ্রকাশ করছে যা অনেক পশ্চিমী দেশের মত গ্রামকেও গ্রাস করছে সমানভাবে। ভারতে কিশোর অপরাধের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি মহারাষ্ট্র, মধ্যপ্রদেশ, তামিলনাড়ু রাজ্যে আর কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের মধ্যে দিল্লী সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। যদিও পশ্চিমী দেশগুলির মত অবস্থা আমাদের দেশে এখনো হয় নি। কিন্তু কিশোর অপরাধীর সংখ্যা বা কিশোরদের দ্বারা সংঘটিত অপরাধের সংখ্যা এ দেশেও ক্রমবর্ধমান।

সরকার নানা ব্যবস্থা নিচ্ছেন এদের অপরাধ প্রবণতা থেকে স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনার জন্য। ১৮৭৬ সালে রিফর্মেটরি স্কুল অ্যাক্ট চালু হয় এবং ১৮৮৭ সালে তার অ্যামেন্ডমেন্ট হয়। এটিই ছিল কিশোর অপরাধকে দূর করার প্রথম সুপরিকল্পিত সরকারি পদক্ষেপ। ১৯১৯-২০ সালে কিশোর অপরাধীদের শুদ্ধির জন্য ভারতীয় জেল কমিটি (Indian Jails Committee) তৈরী করা হয়েছিল। ১৯২০ সালে শিশু আইন (Children Act), বরস্ট্যাল আইন (Borstal Act)-কে স্থান দেওয়া হয় বাংলা, বম্বে, মাদ্রাজ ও কোচিনের স্ট্যাট্যুট বইয়ে (Statute Book in Bengal, Bombay, Madras and Cochin)। ১৯৫৪ সালে হায়দ্রাবাদে পাশ হয় প্রবেশন অ্যাক্ট (Probation Act)। পরবর্তীকালে কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকারগুলিকে বিভিন্ন সময়ে কিশোর অপরাধকে প্রতিরোধ করার জন্য ব্যবস্থা নিতে পরামর্শ দেয় যার ৫০% খরচ কেন্দ্রীয় সরকার বহন করার সম্মতি জানায়। ফলে সমস্ত রাজ্যই কিশোর অপরাধ দমনে বিশেষ আইনি ব্যবস্থা প্রণয়ন করে। স্বীকৃত স্কুল (Certified School), বরস্ট্যাল স্কুল (Borstal School), রিম্যান্ড হোম (Ramand Home), হোস্টেলের সুযোগ ইত্যাদি তৈরী হয়।

কিশোর আদালত (Juvenile Court) : ভারতে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মত কিশোর অপরাধের বিচারের জন্য আলাদা আদালত-জুভেনাইল কোর্ট-তৈরী হয়।

রিফর্মেটরী স্কুল (Reformatory School) তৈরী হয় কিশোর অপরাধীদের মূলস্রোতে ফেরানোর জন্য। এর সাথে স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলিও ধীরে ধীরে এগিয়ে আসে অপরাধী কিশোরদের স্বাভাবিক নাগরিক হিসাবে গড়ে তোলার জন্য সরকারের সঙ্গে হাত মেলাতে।

৭.৭ যুব অস্থিরতা/অসন্তোষ/চাঞ্চল্য (Youth Unrest)

যে কোন দেশের কাছেই যুবশক্তি হলো অন্যতম বড় সম্পদ। দেশকে পরাধীনতা থেকে মুক্ত হওয়ার সংগ্রামে, নিরাপত্তারক্ষায়, উন্নয়নে, আকস্মিক বিপর্যয় মেকাবিলায় যুবসমাজ উদ্দীপ্ত ভূমিকা পালন করার ইতিহাস রচনা করেছে সব দেশে। ভারতবর্ষও এর ব্যতিক্রম নয়। সে জন্যই স্বামী বিবেকানন্দ যুবশক্তিকে শিব-শক্তির সঙ্গে তুলনা করেছেন। উদ্দীপনা, ঝুঁকি নেবার ক্ষমতা, আদর্শবাদিতা, স্বপ্নদর্শন, কল্যাণকাজে আগ্রহ—এ সবই যুবোচিত বৈশিষ্ট্য।

কে যুবক-যুবতী তা নির্দিষ্ট করার মাপকাঠি হল বয়স। বিভিন্ন দেশে এই বয়ঃসীমা বিভিন্ন রকমের। ভারতবর্ষে ১৫-৩৫ বৎসরের মধ্যে থাকা মানুষকে যুবক-যুবতী হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। দেশের মোট জনসংখ্যার একের তিন ভাগের মত মানুষ এই বয়ঃসীমার অন্তর্গত।

যুব সমাজ গঠনমূলক কাজে যেমন যুক্ত হতে পারে তেমনি ধ্বংসাত্মক কাজেও সামিল হতে পারে। বস্তুতঃপক্ষে যে কোন ধরনের শক্তির চরিত্রই তাই। যদি তাকে ঠিকপথে চালিত করা যায় তবে তা কার্যকরী ভূমিকা পালনে সহায়ক হয়, অন্যথায় তার অপচয় হয় বা ধ্বংসাত্মক কাজে ব্যবহার হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এতৎসত্ত্বেও যুবশক্তিকে সর্বাত্মকভাবে ব্যবহার করা প্রায় কোন দেশেই সম্ভব হয় না। ভারতবর্ষে এই অবস্থা যথেষ্টই বেদনাদায়ক।

বর্তমানকালে, যুবসমাজে অস্থিরতা লক্ষ্যণীয়ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং আমরা প্রতিনিয়ত নানা অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে চলেছি। যুব অস্থিরতা এখন নতুন মাত্রা পেয়েছে। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে প্রতিনিয়ত তার প্রতিফলন লক্ষ্য করছি। যে সব সমস্যার লক্ষণ বিশেষভাবে নজর কাড়ে তা হলো :

★ ক্রমবর্ধমান বেকারত্ব বা প্রচ্ছন্ন বেকারত্বজনিত সমস্যা।

★ খেলাধুলা এবং সুস্থ বিনোদনের সুযোগের অভাব।

★ জীবনযুদ্ধে তীব্র প্রতিযোগিতা।

★ নানা অপরাধমূলক কাজে যুক্ত হয়ে পড়া।

★ হতাশা ও অসহায়ত্বের শিকার হওয়া।

★ বিভিন্ন স্বার্থান্বেষী ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর দ্বারা exploited হওয়া।

★ প্রকৃত দিকনির্দেশ পাওয়ার মত পরিবেশের অভাব বোধ করা।

এসব সমস্যার পিছনে যে সব কারণ বর্তমান তার মধ্যে মুখ্য কারণগুলি হলো :

- উপযুক্ত শিক্ষাব্যবস্থার অভাব
- পারিবারিক কাঠামো দুর্বল হয়ে পড়া
- নৈতিক বন্ধন ছিঁড়ে পড়ার মত পরিবেশ
- চরিত্রগঠনের উপযোগী উপাদান/আদর্শের অভাব
- সাংস্কৃতিক অবক্ষয়
- উন্নয়নের ক্ষেত্রে এলাকাভিত্তিক ভারসাম্যহীনতা

- স্বনিয়োগের অপরিমিত সুযোগ
- কুটিরশিল্পের দুর্দশা
- সৃষ্টিধর্মী তাগিদ (Creative urge) পূর্ণ হওয়ার সুযোগের অভাব
- খেলাধূলা, বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ ইত্যাদির অযথাযথ ব্যবস্থা।

এই যুব অস্থিরতা যত প্রকট ও ব্যাপ্ত হয়েছে এবং দেশের প্রগতিতে যুবসমাজের সক্রিয় যোগদানের প্রশ্নটি যত বেশী অনুভূত হয়েছে ততই সরকার, বেসরকারি সংগঠন, ব্যক্তিগত ক্ষেত্র (Private Sector) ইত্যাদি এ বিষয়ে নানা পরিকল্পনাগ্রহণ এবং রূপায়নে সচেষ্ট হয়েছে।

এই পটভূমিতেই ভারত সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রকের উদ্যোগে একটি জাতীয় যুবনীতি গৃহীত হয়েছে। তার উদ্দেশ্য হলো—

- সমাজের জন্য যুবক-যুবতীরা কি করতে পারে তা নির্ণয় করা এবং সে কাজে তাদের যুক্ত করা।
- সমাজকে সেভাবে সক্ষম করা যাতে যুবক-যুবতীদের ব্যক্তিত্ব গঠন এবং আর্থিক-সামাজিকভাবে কার্যকরী করে তোলার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় ভূমিকা পালন করতে পারে।

উপরোক্ত দুই উদ্দেশ্যপূর্তির জন্য নানা কর্মসূচীও গ্রহণ করা হয়েছে, যার মধ্যে প্রধান হলো :

- নেহরু যুব কেন্দ্র
- জাতীয় সেবা প্রকল্প
- জন শিক্ষণ সংস্থান
- স্বর্ণ জয়ন্তী রোজগার যোজনা
- সুসংহত গ্রামীণ উন্নয়ন প্রকল্প
- যুব আবাস প্রকল্প, ইত্যাদি।

তাদের বিশেষভাবে চিহ্নিত একটি গোষ্ঠী হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিন ১২ই জানুয়ারীকে যুব দিবস হিসাবে পালনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। তাদের অধিকতর দায়িত্ব দেওয়ার জন্যও সব ধরনের সংগঠনই প্রয়াসী। সমাজে চাপদানকারী গোষ্ঠী (Pressure Group) হিসাবে যাদের অবস্থান, শেক্সপিয়ার যাদের বলেছেন 'Wild', তাদের সামাজিক দায়বদ্ধতা এবং আর্থিক ক্রিয়াশীলতা বৃদ্ধি ঘটিয়ে, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে উপযোগী ভূমিকাপালনে ব্রতী করে তুলে যুবক-যুবতীদের অস্থিরতা নিরসনে সমবেত প্রচেষ্টা চলছে এমনটা বলা যায়।

৭.৮ সম্ভাব্য প্রশ্ন

১। সামাজিক সমস্যা কাকে বলে? তার প্রকৃতি বা কীরূপ?

২। সামাজিক সমস্যা কীভাবে প্রতিকার করা সম্ভব?

৩। চোরাচালান, শিশু ও বয়স্ক ব্যক্তি নির্যাতন-এগুলি সামাজিক সমস্যা কেন?

৪। অপরাধের সংজ্ঞা কী? ভারতে কিশোর অপরাধ ও তার প্রতিকার কীভাবে সম্ভব নিজের ভাষায় লেখ।

৭.৯ প্রস্তাবিত পাঠ্য (Suggested Reading)

1. An Introduction to Sociology–D. R. Sachdeva
2. Sociology–Dinesh Chandra Bhattacharya
3. Sociology of Deviation in India–Dr Sushil Chandra
4. Contemporary Social Problems in India–Bela Dutta Gupta
5. New Horizon in Criminology–Barnenes & Tecters

একক ৮ □ সামাজিকীকরণ, সামাজিক বিচ্যুতি এবং সামাজিক নিয়ন্ত্রণ (The Process of Socialisation, Deviance and Social Control)

গঠন :

৮.১ সামাজিকীকরণ
৮.২ সামাজিক বিচ্যুতি
৮.৩ সামাজিক নিয়ন্ত্রণ

৮.১ সামাজিকীকরণ (Socialisation) :

আমরা প্রতিটি মানুষ একজন সামাজিক জীব। কিন্তু জন্ম থেকেই আমরা সামাজিক হয়ে উঠি না। মানুষ শিশু হয়ে জন্মগ্রহণ করে একটি পরিবারে এবং ক্রমে সে পূর্ণাঙ্গ মানুষ এবং সমাজের অন্যতম একজন সদস্য হয়ে ওঠে একটি বিশেষ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে। একজন সদ্যজাত পরিবার নামক একটি সামাজিক সঙ্ঘে (Social group) জন্মগ্রহণ করে ক্রমে অন্যান্য বিভিন্ন সামাজিক সঙ্ঘের মূল্যবোধগুলির আত্মিকরণ করে সামাজিক সত্ত্বায় বা সামাজিক জীবে পরিণত হয়ে ওঠে— এই বিশেষ প্রক্রিয়াটিকেই সমাজতত্ত্বের ভাষায় সামাজিকীকরণ বলে। জর্জ, এইচ মিড বলেছেন— মানুষ ব্যক্তি হয়ে ওঠে সামাজিক প্রভাবের ফলেই এবং এগুলিই যে অন্যদের সঙ্গে বিনিময় করে (a man "becomes a person on a result of social influences which he shares with others)। প্রাথমিক ভাবে শিশু একটি পরিবারে জন্মায় পরবর্তী পর্যায়ে অন্যান্য সামাজিক সংঘ (social groups) যেমন সমবয়স্ক প্রতিবেশী, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, খেলাধূলা বা সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান, কর্মক্ষেত্র ইত্যাদির সংস্পর্শে আসে এবং প্রভাবিত হয়। এই বিভিন্ন সামাজিক সংঘের প্রচলিত রীতি, ধ্যানধারণা, চিন্তাভাবনা, মূল্যবোধ, আচার ব্যবহার দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হয়। বিপরীতভাবে সমাজের দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে সামাজিক জীব হিসাবে প্রতিটি মানুষের কতকগুলি সামাজিক ভূমিকা যেমন পরিবারে পুত্র/কন্যা, মা/বাবা, দাদা/ভাই ইত্যাদি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র/শিক্ষক, সমবয়স্কদের বন্ধু কর্মক্ষেত্রে কর্মচারী/ব্যবস্থাপক ইত্যাদি সামাজিক ভূমিকাগুলি যথাযথভাবে পালনের ক্ষেত্রে সামাজিকীকরণ একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

৮.২ সামাজিক বিচ্যুতি (Social Deviance) :

সামাজিক জীব বা সমাজের সদস্য হিসাবে আমরা প্রত্যেকেই সামাজিক রীতিনীতি, সামাজিক বিধি, সামাজিক অনুশাসন মেনে চলি। কিন্তু সমাজের কিছু সদস্য-কখনো জ্ঞানতঃ বা কখনো ইচ্ছাকৃতভাবে ঐ সমস্ত নিয়মকানুন না মেনে বিসদৃশ আচরণ করে সামাজিক স্থিতাবস্থা বা অন্যান্য সদস্যদের নিরাপত্তা বিঘ্নিত করে তোলে—এই অবস্থাকেই সামাজিক বিচ্যুতি বলা হয়। সমাজতাত্ত্বিক এফ, ই, মেরিল বলেছেন যে, তিনিই স্বাভাবিক মানুষ যিনি যথার্থ ভূমিকা পালন করেন যেটি তার সামাজিক সংঘ (social group) তাঁর কাছে আশা করে। বিপথগামী মানুষ সামাজিক সংঘের রীতি থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়েন এবং ওঁর ব্যবহার যথার্থভাবে অনুমান করা সম্ভব হয় না।

(The normal person is the one who plays the roles that his group considers appropriate for him. .... The deviant is the person who departs from group norms & whose behaviour can not be adequately predicted)

যারা সামাজিক বিধি ভাঙেন সমাজের আইনে তাদের শাস্তির ব্যবস্থা আছে। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে দেখা যায় যে কিছু সামাজিক বিচ্যুতি সামাজিক মূল্যবোধে গভীরভাবে প্রভাব ফেলে না বা সামাজিক স্থিতাবস্থাকে তেমনভাবে বিঘ্নিত করে না সেখানে সমাজ থেকে খুব জোরালো প্রতিরোধ আসে না অথবা বিচ্যুৎকারী বা বিপদগামীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হয় না, অর্থাৎ এক্ষেত্রে কোন অপরাধমূলক কাজে লিপ্ত হয়ে পড়ে না। যেমন, কোন উৎসব অনুষ্ঠানে কেউ কেউ নেশা করে অল্পবিস্তর মাতলামি করে। কিন্তু কোনক্রমেই তারা সাময়িক মাতলামির সীমা অতিক্রম করে অশালীন কাজকর্ম বা অপরাধমূলক কাজে যুক্ত হয়ে পড়ে না। কিন্তু কিছু মানুষ সংগঠিত ভাবে স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে সামাজিক রীতিনীতি, অনুশাসন বহির্ভূত আচরণ করে সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে। সেইক্ষেত্রে তাদের বিরুদ্ধে সমাজ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে দ্বিধা করে না।

সমাজতাত্ত্বিক আর, কে, মার্টন এই প্রসঙ্গে বলেছেন যে কোন একটি বিশেষ উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার বৈধ উপায়গুলি অত্যন্ত সীমিত অথবা সীমিত প্রেরণা (motivation) বা ইচ্ছা— ফলে মানুষ যে কোন ভাবে তার উদ্দেশ্য চরিতার্থ করতে চায়— সে ভাবে না যে সে কোন অন্যায় করছে। এই অবস্থাকেই বিখ্যাত সমাজতাত্ত্বিক ডুর্কহেইম বিধিহীনতা ('anomie' বা normlessness) বলে উল্লেখ করেছেন। এইরকম বাতাবরণেই সামাজিক বিচ্যুতি লক্ষ করা যায়।

আলবার্ট কোহেন, মার্টনের বিচ্যুতি ব্যবহার সম্পর্কিত তত্ত্বকে পরিবর্ধিত করে বলেছেন— সামাজিক কাঠামো ও সামাজিক মনস্তাত্ত্বিক বিষয়গুলিকে গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করার প্রয়োজন আছে সামাজিক বিচ্যুতি আলোচনা করার ক্ষেত্রে।

৮.৩ সামাজিক নিয়ন্ত্রণ (Social Conrol)

মানুষ স্ব-তাগিদে সমাজের সৃষ্টি করেছিল। মানুষ চরিত্রগতভাবে নিজস্ব প্রয়োজনে বিভিন্ন সামাজিক সংঘে বা গোষ্ঠীতে (social groups) থাকে। সমাজের সকলেই যাতে মিলেমিশে, স্বাচ্ছন্দ্যে থাকতে পারে তার জন্যই তৈরী হয়েছিল সামাজিক রীতি, সামজিক বিধি, অনুশাসন ইত্যাদি। কেউ যেন কারো অধিকার ক্ষুণ্ণ না করতে পারে এ সব প্রচলনের উদ্দেশ্য ছিল তাই। সামাজিক স্থিতাবস্থা যাতে বিঘ্নিত না হয় বা অন্যভাবে বলা যায় যে সমাজের সদস্যদের সামাজিক রীতি, বিধি লঙ্ঘন করে অপরের অসুবিধার সৃষ্টি করা থেকে বিরত করার জন্য সামাজিক রীতি, আইন, ধর্ম, শিক্ষা, সামাজিক নীতি ইত্যাদি সামাজিক নিয়ন্ত্রক হিসাবে কাজ করে।

সামাজিক নিয়ন্ত্রণ যাতে সঠিকভাবে প্রয়োগ করা যায় তার জন্য-সমাজে কতকগুলি প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাও সৃষ্টি করা হয়েছে। সেগুলি হল এইরকম—

প্রাথমিকভাবে পরিবার তার সদস্যদের নিযন্ত্রণের মাধ্যমে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে চালিত করে। সাধারণভাবে পরিবারের বরিষ্ঠ সদস্যরাই নিয়ন্ত্রক হিসাবে কাজ করেন। মূলতঃ পিতামাতাই সন্তানদের সামাজিক-সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে পরিচিত করে তোলেন এবং আদর্শ আচার ব্যবহার সম্পর্কে তাদের তৈরী করেন।

পরবর্তী ক্ষেত্রে প্রতিবেশী পরিবারগুলি বিভিন্ন পরিবারের সদস্যদের ব্যবহার, বিধি নিয়ন্ত্রণে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে।

ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলিও কতকগুলি অনুশাসনের মাধ্যমে মানুষকে সকলের কল্যাণের কাজের জন্য ঈশ্বরের আশীর্বাদ বা অপরের অনিষ্ট সাধনের জন্য অভিশাপ ইত্যাদি ভাবনা মানুষের মনের মধ্যে প্রবিষ্ট করানোর মাধ্যমে মানুষের ব্যবহারকে নিয়ন্ত্রণ করে।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহও মানুষের জ্ঞানবৃদ্ধির মাধ্যমে ব্যক্তিগত ও সামাজিক চাহিদা পরিপূরণের ব্যবস্থা করে। প্রকৃতপক্ষে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি শৈশব অবস্থা থেকেই সামাজিক মূল্যবোধ, সামাজিক রীতি-নীতি সম্পর্কে দীক্ষিত করে যেটি মানুষের মনে দৃঢ় ভাবে গেঁথে যায়।

পরিশেষে সমাজের সবথেকে কার্যকরী নিয়ন্ত্রক রাষ্ট্র, আইন, পুলিশ, সশস্ত্র বাহিনী ও জেলব্যবস্থার মাধ্যমে মানুষকে নিয়ন্ত্রণ করে।

দ্বিতীয় ভাগ ঃ ভারতীয় অর্থনৈতিক ব্যবস্থা

একক ১ ❑ আর্থ-সমাজ ব্যবস্থার বিভিন্ন রূপ সম্পর্কে ধারণা

একক ২ ❑ অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্বন্ধীয় প্রধান প্রধান তত্ত্বসমূহের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

একক ৩ ❑ ভারতীয় অর্থনীতির কয়েকটি দিক

একক ৪ ❑ ভারতের পরিকল্পনা

একক ৫ ❑ উন্নয়নের লক্ষ্য ও সমস্যা

একক ১ □ আর্থ-সমাজ ব্যবস্থার বিভিন্ন রূপ সম্পর্কে ধারণা (Concepts and brief account of Feudalism, Capitalism, Socialism, Mixed Economy and Welfare State)

গঠন

১.১ সামন্ততন্ত্র (Feudalism)
১.২ ধনতন্ত্র (Capitalism)
১.৩ সমাজতন্ত্র (Socialism)
১.৪ মিশ্র অর্থনীতি (Mixed Economy)
১.৫ কল্যাণমূলক রাষ্ট্র (Welfare State)
১.৬ অনুশীলনী (Exercise)

১.১ সামন্ততন্ত্র (Feudalism)

'সামন্ততন্ত্র' হল ইংরেজি 'ফিউডালিজম্‌' (Feudalism)-এর বাংলা প্রতিশব্দ। 'Feudalism' শব্দটি এসেছে লাতিন 'fedum' বা 'feudum' থেকে, যার অর্থ হল 'fee' বা 'fief'[1]। অর্থাৎ সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা হল ভূ-সম্পত্তি নির্ভর বা কৃষিভিত্তিক এক সমাজ-ব্যবস্থা, যা আধুনিক বস্তু-সভ্যতা তথা শিল্পায়ন শুরু হওয়ার আগে মধ্যযুগে পশ্চিম ইউরোপের বিভিন্ন দেশে বিকাশ লাভ করেছে।

কৃষিভিত্তিক সামন্ততান্ত্রিক সমাজের পিরামিড কাঠামোটি উঁচু-নিচু স্তরে বিভক্ত ছিল। সর্বোচ্চ স্তরে ছিলেন রাজা। রাজাই ছিলেন দেশের সমস্ত জমির মালিক। তিনি তাঁর অনুগত ভূস্বামী বা সামন্তদের মধ্যে জমি বিলি করতেন। সামন্তরা তাঁদের জমি আবার উপ-সামন্তদের মধ্যে বিলি করতেন। এইভাবে কয়েক স্তর পর্যন্ত জমি বণ্টন হত। সর্বনিম্ন স্তরে থাকত ভূমিদাসেরা। ভূমিদাসরাই ছিল সামন্ততান্ত্রিক সমাজের ভিত্তি। এই সামন্ততান্ত্রিক সমাজের উৎপাদন-কাঠামো ছিল কৃষিনির্ভর।

সামন্ততন্ত্রের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যগুলি হল নিম্নরূপ :

(ক) সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থায় উৎপাদনের মূল উপায় বা উপকরণ হল জমি। এই জমির মালিকানা রাজার হাতে, তিনি সামন্তপ্রভু। রাজা এই জমি তাঁদের বণ্টন করতেন, তাঁরা হল ভূমিদাস। এরকম সামন্তপ্রভু, জমিদার-কৃষক-ভূমিদাস-এই দুই প্রধান শ্রেণিতে সামন্ততান্ত্রিক সমাজ বিভক্ত ছিল।

(খ) ভূমিদাসেরা সামন্তপ্রভুর জমিতে চাষ করত কিন্তু জমির মালিকানা তাদের ছিল না। সামন্তপ্রভুরা তাদের কাছ থেকে উৎপন্ন ফসলের একটা বড় অংশ কর হিসাবে আদায় করত। তারা কোনো স্বাধীন জীবিকা গ্রহণ করতে পারত না। ভূমিদাসদের সামন্তপ্রভুর জমি ছেড়ে অন্যত্র যাওয়ার অধিকার ছিল না। তারা কোনো রকম স্বাধীনতা ভোগ করত না; তারা ছিল সামন্তপ্রভুদের সম্পত্তির মতো। এইভাবে ভূমিদাসদের শোষণ করা হত।

[1] দ্রষ্টব্য : Encyclopaedia Britannica

কাছ থেকে যে শ্রম বা ফসল আদায় করত, তাকে সামন্ততান্ত্রিক খাজনার রূপ বলা যায়। পরবর্তীকালে যখন পণ্য উৎপাদন বা বিনিময়ের বিকাশ ঘটল, তখন ভূমিদাসদের নগদ টাকায় খাজনা মেটাতে হত।

(গ) সামন্ততান্ত্রিক সমাজে প্রধান উপজীবিকা ছিল কৃষি। তবে সে-সময় চাষের ধরন ছিল অনুন্নত। ফসলের পরিমাণ ছিল সামান্য। উৎপন্ন ফসলের অধিকাংশই মনিব আত্মসাৎ করত।

(ঘ) সামন্তযুগে সকলেই প্রায় শস্যোৎপাদন করত বলে শস্য বিনিময় বা বিক্রয় করা যেত না। এ রকম অর্থনৈতিক কাঠামো সরল অর্থনীতি নামে পরিচিত।

(ঙ) সামন্তযুগে অধিকাংশ লোকই গ্রামে বাস করত। এই গ্রামগুলিকে বলা হত ম্যানর। প্রতিটি ম্যানরে একজন জমিদার বা ভূ-স্বামী থাকত।

(চ) এ সময় কৃষিকার্যের পাশাপাশি হস্তশিল্পও প্রচলিত ছিল। তবে শিল্পজাত দ্রব্যাদি স্থানীয় কারিগরেরাই তৈরী করত। বাইরের আমদানি করা জিনিস কমই ব্যবহার করা হত। ফিউডাল যুগে প্রথমদিকে ম্যানর বা গ্রামগুলি ছিল স্বয়ংসম্পূর্ণ।

সামন্ততন্ত্রে ভাঙ্গন ঃ

মধ্যযুগের শেষের দিকে নানান পরিবর্তনের ঢেউ সামন্ততন্ত্রের বুকে আঘাত হানে। প্রথমেই শহরের আবির্ভাবের কথা বলতে হয়। গোড়ার দিকে ইউরোপে শহর খুব কমই ছিল। সে-সময় হস্তশিল্প থেকে কৃষি আলাদা হয়ে যায়নি। কালক্রমে কৃষি থেকে হস্তশিল্প পৃথক হয়ে পড়ল এবং শ্রমবিভাগ দেখা দিল। বিকাশের এই ধাপ থেকেই শহর গড়ে উঠতে লাগল। হস্তশিল্পী বা কারিগরেরা এইসব শহরে ছোট ছোট কারখানা খুলে উৎপাদিত দ্রব্যকে তারা পণ্যরূপে বাজারে বিক্রয় করত।

এই পরিস্থিতিতে ফিউডাল যুগের প্রথম দিকে গ্রামগুলির যে চরিত্রবৈশিষ্ট্য ছিল তার বদল হতে শুরু করল। সে-সময় গ্রামগুলির সঙ্গে বাইরের যোগ ছিল ক্ষীণ। কিন্তু শহরের কারিগরদের কাজের বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে হস্তশিল্পজাত নানা জিনিস আশপাশের গ্রামবাসীরা কিনতে আরম্ভ করে। তার বদলে শহুরবাসীরা কিনত গ্রামে উৎপন্ন খাদ্যদ্রব্য। এর ফলে ছোট ছোট বাজার এবং মাঝে মাঝে বড় বড় মেলাও দেখা দিতে লাগল। ধীরে ধীরে বিনিময়ের প্রথা এইভাবে বাড়তে থাকল। মধ্যযুগের শেষের দিকে অন্তর্দেশীয় বাণিজ্যেরও সূত্রপাত ঘটে। স্বাভাবিকভাবেই সমাজে তখন বণিক বা ব্যবসায়ীদের প্রাধান্য বৃদ্ধি পেতে থাকল। বলা বাহুল্য, মধ্যযুগের শেষের দিকের এই বণিকরাই পরবর্তীকালের ধনিক শ্রেণীর পূর্বগামী।

পঞ্চদশ শতাব্দী নাগাদ আরও পরিবর্তন এল। নতুন নতুন জলপথ আবিষ্কৃত হল এবং উপনিবেশ স্থাপন হতে লাগল। ফলে বাণিজ্যের আরও বিকাশ ঘটতে লাগল। একদিকে যখন এইভাবে বাজারের বিস্তৃতি ঘটে চলেছিল, তখন উৎপাদন পদ্ধতিতেও গুণগত পরিবর্তন এল। হস্তশিল্পের দ্বারা বর্ধিত চাহিদা মেটানো সম্ভব হয় না, তাই যান্ত্রিক শক্তির প্রয়োজন দেখা দিল। কারখানা-ব্যবস্থার উদ্ভব ঘটল। বণিকদের পুঞ্জিভূত ধনরাশি বা মার্চেন্ট ক্যাপিটাল উৎপাদনে নিয়োজিত হল।

এই সময় বণিক-স্বার্থের সঙ্গে সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থায় দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। সামন্ততান্ত্রিক প্রথা বণিক শ্রেণির স্বার্থের প্রতিকূল ছিল। এদের প্রয়োজন ছিল মুক্ত শ্রমিক, সামন্তপ্রভুদের প্রবর্তিত শুল্ক ও করের অবসান এবং বাজারের সম্প্রসারণের পথে যাবতীয় বাধা-বিপত্তির অপসারণ। সুতরাং উদীয়মান বুর্জোয়া শ্রেণি সামন্তপ্রথার উৎপাদন সম্পর্ক ভেঙে ফেলে ধনতান্ত্রিক উৎপাদন সম্পর্ক গড়ে তোলার জন্য চাপ সৃষ্টি করে।

সামন্তপ্রথা অন্য একটি দিক থেকেও প্রতিরোধ-প্রতিবাদের সম্মুখীন হয়। এই প্রতিবাদ-প্রতিরোধ আসে সামন্তপ্রথায় শোষণ ও অত্যাচার প্রপীড়িত ভূমিদাসদের পক্ষ থেকে। কৃষক বিদ্রোহ দেখা দেয় ফ্রান্সে, ইংল্যান্ডে, ইতালীতে, জার্মানীতে।

এইভাবে সব কিছু মিলে সামন্তপ্রথার অবসান এবং ধনতান্ত্রিক উৎপাদন-প্রথা গড়ে উঠবার পরিবেশ সৃষ্টি হল।

১.২ ধনতন্ত্র (Capitalism)

একটি সমাজ-ব্যবস্থা হিসেবে ধনতন্ত্র বা পুঁজিবাদ (Capitalism) এখন পৃথিবীর এক বিশাল অংশে বর্তমান রয়েছে। বলা যায় যে, গত তিনশো বছর হল পৃথিবীতে ধনতন্ত্রের যুগ।

মোটামুটিভাবে বলা যায় যে, যে সমাজে উৎপাদন-যন্ত্রগুলি ব্যক্তিগত অধিকারে থাকে এবং যেখানে একমাত্র লাভের জন্যই পণ্য তৈরী হয়, এরূপ সমাজেই ধনতান্ত্রিক বা পুঁজিবাদী বা ক্যাপিটালিস্ট (Capitalist) সমাজ বলতে পারি। কার্ল মার্কসের মতে, সামন্ততন্ত্রের পরবর্তী ও সমাজতন্ত্রের পূর্ববর্তী স্তরই হল ধনতন্ত্র বা পুঁজিবাদের স্তর।

ধনতান্ত্রিক বা পুঁজিবাদী সমাজ-ব্যবস্থার চরিত্র-লক্ষণ বা বৈশিষ্ট্যগুলি নিম্নে আলোচনা করা হল।

(ক) এরূপ সমাজের প্রথম বৈশিষ্ট্য হল পণ্য উৎপাদন (Commodity Production)। এখানে দ্রব্য উৎপাদন করা হয় বাজারে বিনিময়ের উদ্দেশ্যে। এই ব্যবস্থায় কোন দ্রব্যকে পণ্য বলে পরিগণিত হতে হলে তার বিনিময় মূল্য (Exchange Value) থাকতে হবে।

(খ) ধনতান্ত্রিক বা পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থার মূল লক্ষ্য হল লাভ বা মুনাফাকে বাড়িয়ে তোলা। এই লাভ বা মুনাফাকে উদ্বৃত্ত (surplus) বলা হয়। মার্কসের মতে, শ্রমিক তার শ্রমশক্তি দিয়ে এই উদ্বৃত্ত সৃষ্টি করে। শ্রমিক যে শ্রম দান করে, তার একটা অংশ হল ক্রীত শ্রম (paid labour)। এর জন্য সে মজুরী পায়। শ্রমের অপর অংশ হল অতিরিক্ত বা উদ্বৃত্ত শ্রম (surplus labour)। এই উদ্বৃত্ত শ্রমের জন্য শ্রমিক কিছু পায় না। তাই এই শ্রমটিকে অ-ক্রীত শ্রম (unpaid labour) বলে। মালিক এই উদ্বৃত্ত-মূল্যকে মুনাফা হিসাবে আত্মসাৎ করে।

(গ) পুঁজিবাদ সমাজ মূলতঃ দুটি বিপরীত শ্রেণিতে বিভক্ত-ধনিক শ্রেণী ও শ্রমিক শ্রেণী। এরূপ সমাজে উৎপাদনের প্রধান উপাদানগুলি ধনিকদের সম্পত্তি; তাদের হাতেই রয়েছে জমির কর্তৃত্ব, কাঁচা মাল, যন্ত্রপাতি, অর্থবল ইত্যাদি। অন্যদিকে, মজুরদের উৎপাদনযন্ত্রে কোন অধিকার নেই। তারা বিত্তহীন নিঃস্ব শ্রেণী। তাদের একমাত্র সম্পত্তি হল দৈহিক শক্তি। বেঁচে থাকার জন্য এই দৈহিক শক্তি তারা মালিকদের কাছে বেচতে বাধ্য হয়।

(ঘ) যে উদ্বৃত্ত-মূল্য মালিকশ্রেণী অর্জন করে, তার ব্যবহারের মধ্য দিয়ে ধনতন্ত্রের এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য পরিস্ফুট হয়। এই উদ্বৃত্ত-মূল্যের কিছুটা তারা নিজেদের প্রয়োজন মেটাতে ব্যয় করে, আর বাকিটা মূলধন বা পুঁজিতে পরিণত করে এবং এর সাহায্যে অধিক শ্রম নিয়োগ করে আরও অধিক উদ্বৃত্ত-মূল্য সৃষ্টি করে। এই বাড়তি উদ্বৃত্ত-মূল্য পুঁজির পরিমানকে আরও বৃদ্ধি করে। উৎপাদন আরও সম্প্রসারিত হয়।

(ঙ) পুঁজিবাদী ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য হল উৎপাদন পদ্ধতির অবিরাম পরিবর্তন। পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় প্রতিটি পুঁজিপতিরই লক্ষ্য সর্বাধিক মুনাফা অর্জন করা। এখানে প্রত্যেককেই নিত্য নতুন কৌশলে প্রতিযোগিতায় জয়ী হবার জন্য সচেষ্ট থাকতে হয়। ফলে এখানে নিয়ত উৎপাদনকে উন্নততর পর্যায়ে তোলার চেষ্টা চলতে থাকে। সেজন্য উৎপাদিকাশক্তির দ্রুত এবং অবাধ বিকাশ সম্ভব হয়। এই কারণে মার্কস পুঁজিবাদী অর্থনীতিকে ঐতিহাসিকভাবে প্রগতিশীল আখ্যা দিয়েছেন।

(চ) শ্রম সাশ্রয়মূলক (labour saving) যন্ত্রের প্রবর্তন পুঁজিবাদীদের আর এক বৈশিষ্ট্য। এই সব যন্ত্রের ব্যবহার শ্রমিকদের একটা অংশকে উৎপাদন থেকে বহিষ্কৃত করে এবং ব্যাপক বেকারি অভাব-অনটন বাড়ে। এই অবস্থা পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে মানুষের মনে অসন্তোষ ও বিক্ষোভের জন্ম দেয়।

(ছ) এই ব্যবস্থায় অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ব্যক্তির পূর্ণ স্বাধীনতা থাকে। ব্যক্তির অর্থনৈতিক কার্যকলাপে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপের মাত্রা অতি নগণ্য।

(জ) এই ব্যবস্থায় সমাজের তিনটি মূল অর্থনৈতিক সমস্যার-কি কি দ্রব্য উৎপাদিত হবে, কিভাবে উৎপাদিত হবে এবং কাদের জন্য উৎপাদিত হবে—সমাধান দাম ব্যবস্থা নামক "অদৃশ্য হস্তে"র দ্বারা সম্পাদিত হয়।

পুঁজিবাদের সঙ্কট ঃ

- পুঁজিবাদে পুঁজিবাদির পুঁজি বৃদ্ধি পেলেও শ্রমিক শ্রেণীর অবস্থার ক্রমাবনতি ঘটতে থাকে। তাদের ক্রয়ক্ষমতা কমতে থাকে। এই অবস্থায় সমাজে অধিক চাহিদার সৃষ্টি হয় না। এর ফলে অত্যুৎপাদন (over production) বা স্বল্পভোগের (under consumption) সমস্যা দেখা দেয়।
- পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদন-ব্যবস্থা এবং বন্টনের রীতির মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্বের বীজ লুকিয়ে থাকে। পুঁজিবাদ লক্ষ লক্ষ মানুষকে কলে কারখানায় সংগঠিত করে উৎপাদন-প্রক্রিয়াটিকে সামাজিক করে তোলে। কিন্তু উৎপাদনের ফল আত্মসাৎ করে কতিপয় মালিক। সামাজিকভাবে যা উৎপাদন হয়, তা হয়ে দাঁড়ায় ব্যক্তিগত সম্পত্তি। ফলে পুঁজিবাদে শ্রেণী বিরোধ বা শ্রেণী সংঘাত অনিবার্য হয়ে ওঠে।

এই দ্বন্দ্বের নিরসন ঘটতে পারে তখনই যখন সামাজিকভাবে সৃষ্টি উৎপাদনের ফলও সমাজের সম্পত্তিতে পরিণত হয়। উৎপাদনের ফল ও সমাজের যন্ত্রাদির উপর সামাজিক মালিকানা প্রতিষ্ঠার মধ্যেই এটা সম্ভব। এর জন্য প্রয়োজন পুঁজিবাদ থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণ।

১.৩ সমাজতন্ত্র (Socialism)

কার্ল মার্কসের স্তরতত্ত্বে ধনতন্ত্রের পরবর্তী স্তর হিসেবে সমাজতন্ত্রের উল্লেখ আছে। অবশ্য মার্কসের আগেও কেউ কেউ সমাজতান্ত্রিক ধ্যান-ধারণার কথা বলেছেন। এ প্রসঙ্গে বিশেষ করে ইংল্যান্ডের রবার্ট ওয়েনের নাম উল্লেখ করতে হয়। তবে ওয়েনের সমাজতন্ত্রকে বলা হয়েছে ইউটোপিয়ান সমাজতন্ত্র। ওয়েনের চিন্তার ত্রুটি এই যে, কোন্ সামাজিক শক্তি নতুন সমাজের স্রষ্টা হবে বা কি ধরনের রাজনৈতিক কর্মপন্থা এই পরিবর্তন আনবে-এর হদিশ পাওয়া যায় না ইউটোপিয়ান সমাজতন্ত্রে। এই কাজটা হাসিল করল মার্কসবাদ। মার্কস দেখালেন যে, শ্রমিকশ্রেণী বৈপ্লবিক উপায়ে পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদন-প্রণালীর জায়গায় সমাজতন্ত্র আর সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠা করবে। সাম্যবাদী বা কমিউনিস্ট সমাজ প্রবর্তন হল শ্রমিক শ্রেণীর বিপ্লবের চরম লক্ষ্য। কিন্তু এই ধরনের সমাজব্যবস্থা বিপ্লবের অব্যবহিত পরেই গঠন করা সম্ভব হয় না। সেজন্য সাম্যবাদী সমাজ পূর্ণাঙ্গরূপে গড়ে তোলার আগে সমাজতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে হবে। অর্থাৎ মার্কসীয় তত্ত্বে সমাজতন্ত্র বলতে ধনতন্ত্র ও সাম্যতন্ত্রের মধ্যবর্তী ক্রান্তিকালীন পর্বকে বোঝায়।

এখন সমাজতন্ত্রের বৈশিষ্ট্যগুলি নিয়ে আলোচনা করা যাক। এই বৈশিষ্ট্যগুল হল :

(১) সমাজতন্ত্রে ব্যক্তিগত মালিকানার অবসান ঘটানো হয় এবং পরিবর্তে উৎপাদনের উপায়সমূহের উপরে সামাজিক মালিকানা প্রতিষ্ঠা করা হয়। এই সামাজিক মালিকানাকে বলা হয় সমাজতন্ত্রের অস্তিত্বের প্রধান উপাদান, তার মূল স্তম্ভ।

(২) সুষম অর্থনৈতিক বিকাশের স্বার্থে পরিকল্পনা (Planning) হয়ে ওঠে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য। পরিকল্পনার সাহায্যে উৎপাদনের উপায়গুলিকে দক্ষভাবে ব্যবহার করা সম্ভব হয় এবং জাতীয় অর্থনীতির বিভিন্ন শাখাগুলির মধ্যে যেমন— মূলধনী দ্রব্য ও ভোগ্যপণ্য উৎপাদনের মধ্যে, শিল্প ও কৃষির মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষা করা হয়।

(৩) পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় ব্যক্তিগত মালিকানাধীন উৎপাদনের লক্ষ্য হল মুনাফা অর্জন। কিন্তু সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় উৎপাদনের স্বাভাবিক লক্ষ্য হল মানুষের প্রয়োজন মেটানো।

(৪) সমাজতন্ত্রে উৎপন্ন দ্রব্য বন্টনের নীতি হল : 'প্রত্যেকের কাছ হতে তার সামর্থ্য অনুযায়ী, প্রত্যেককে তার কাজ অনুযায়ী' ('From each according to ability, to each acording to work')-এর অর্থ, লোকে ক্ষমতা অনুযায়ী কাজ করবে এবং কাজের গুণ ও পরিমাণ অনুসারে সামাজিক উৎপাদনের অংশ ভোগ করবে।

সমাজতন্ত্রের পরবর্তী স্তরে, অর্থাৎ সাম্যবাদী স্তরে, আয় বন্টন নীতির পরিবর্তন ঘটে। সাম্যবাদী স্তরে সমাজে উৎপাদন বৃদ্ধির ফলে এমন প্রাচুর্যের সৃষ্টি হয় যাতে যার যেমন প্রয়োজন, তাকে তা দেওয়া সম্ভব হয়। সেক্ষেত্রে উৎপন্ন দ্রব্য বন্টনের নীতিটি হয় : 'প্রত্যেকের কাছ হতে তার সামর্থ্য অনুযায়ী, প্রত্যেককে তার প্রয়োজন অনুযায়ী' ('From each according to his ability, to each according to need')।

(৫) পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় গ্রাম ও নগরের মধ্যে বা কৃষি ও শিল্পের মধ্যে এবং কায়িক ও বৌদ্ধিক শ্রমের মধ্যে যে প্রভেদ বা দ্বন্দ্বমূলক সম্পর্ক লক্ষ্য করা যায়, সমাজতন্ত্রে মূলগতভাবে সেরূপ প্রভেদ বা দ্বন্দ্বমূলক সম্পর্ক থাকে না। বরং প্রতিটি ক্ষেত্রে গড়ে ওঠে বন্ধুত্বপূর্ণ সহযোগিতার সম্পর্ক। বলশেভিক বিপ্লবের পর সোভিয়েত রাশিয়ায় এই জিনিস লক্ষ্য করা গেছে[২] তবে শ্রমিকশ্রেণি ও কৃষকশ্রেণী বা শ্রমজীবী ও বুদ্ধিজীবী-এদের মধ্যে মূলগত প্রভেদগুলির বিলুপ্তি ঘটলেও কিছু কিছু ক্ষেত্রে পার্থক্য থাকতে পারে।[৩]

উপরে সমাজতন্ত্রের যে-সব বৈশিষ্ট্যের কথা বলা হয়েছে, সেগুলি মূলতঃ অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্য। কিন্তু অর্থনৈতিক ক্ষেত্র ছাড়াও সাংস্কৃতিক ও নৈতিক ক্ষেত্রেও সমাজতন্ত্র কিছু বিশেষত্বের দাবি রাখে। সমাজতান্ত্রিক আদর্শ গুণগতভাবে পুঁজিবাদী মতাদর্শ থেকে পৃথক। পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় ব্যক্তির স্বার্থ অধিক প্রাধান্য পায়। কিন্তু সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সমষ্টিগত স্বার্থই প্রধান বিবেচ্য। সমাজতন্ত্রের লক্ষ্য মানুষের দৃষ্টিভঙ্গীর বদল, ব্যক্তিকেন্দ্রিক থেকে তাকে সমাজমুখী করে তোলা। বলা বাহুল্য, এই পরিবর্তন আনা সহজ কথা নয়। এই পর্যায়ে উন্নীত হতে হলে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রকে এক দীর্ঘ ও কঠিন প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। মতাদর্শগত সংগ্রামকে দীর্ঘায়িত করতে হবে। মার্কসবাদী তাত্ত্বিকদের মধ্যে মাও-সে-তুং এই বিষয়টির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন।

১.৪ মিশ্র অর্থনীতি (Mixed Economy)

বর্তমান যুগে আমরা মিশ্র অর্থনীতির কথা বলে থাকি। কিন্তু ধারণাটির প্রচলন খুব বেশি দিন হয়নি। অষ্টাদশ বা উনবিংশ শতাব্দীর ধ্রুপদী বা ক্ল্যাসিক্যাল ধনবিজ্ঞানীরা তাঁদের রচনায় এই অর্থ-ব্যবস্থাটির কথা উল্লেখ করেননি। ঐ সময়ে যে ভাবধারাটির প্রচলন ছিল, তা হল এই যে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ব্যক্তির পূর্ণ স্বাধীনতা থাকবে এবং রাষ্ট্র

(২) দ্রষ্টব্য : J V Stalin, Economic Problems of Socialism in the USSR (1972), পৃষ্ঠা ২৫-২৭।

(৩) J V Stalin, প্রাগুক্ত বই, পৃষ্ঠা ২৫-২৭।

ব্যক্তির আর্থিক কার্যকলাপে হস্তক্ষেপ করবে না। তা হলে দেশ বাধাবন্ধহীন অগ্রগতির পথে এগিয়ে যাবে। এই পথ হল ধনতান্ত্রিক উন্নয়নের পথ। কিন্তু ১৯৩০-এ ধনতান্ত্রিক দুনিয়া যখন এক ভয়াবহ মন্দার কবলে পতিত হল, তখন বোঝা গেল যে, ধনতান্ত্রিক উন্নয়নের পথ সর্বদা মসৃণ না-ও হতে পারে। বিখ্যাত ইংরেজ অর্থনীতিবিদ লর্ড কীনস্ (Lord Keynes) মন্দাজনিত পরিস্থিতির বিশ্লেষণ করে দেখালেন যে, এই অবস্থা থেকে উদ্ধার পেতে হলে রাষ্ট্রকে সক্রিয় হতে হবে। তবে কীনস্ সার্বিক রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের সমর্থক ছিলেন না। তিনি মনে করতেন কর্তৃত্বপরায়ণ রাষ্ট্র ব্যক্তির স্বাধীনতা ও উদ্যমের বিনাশ ঘটায়। ধনতন্ত্রে ব্যক্তির স্বাধীনতা থাকে, প্রতিযোগিতার পরিবেশ বিরাজ করে এবং ফলে উৎপাদন-ব্যবস্থায় দক্ষতা আসে। সেজন্য কীনস্ চাইতেন ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার মৌল নীতিগুলি বজায় থাকুক; তবে তার কুফলগুলি যাতে এড়ানো যায় সেজন্য প্রয়োজনানুগ রাষ্ট্রীয় তদারকি ও তত্ত্বাবধানও প্রয়োজন। অর্থাৎ কীনসীয় চিন্তাধারায় বিশুদ্ধ ধনতন্ত্র ও বিশুদ্ধ সমাজতন্ত্রের মাঝামাঝি আর্থিক ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা লক্ষ্য করা যায়। বলা যেতে পারে যে, মিশ্র অর্থনীতির ধারণাটির উৎপত্তি ঘটে কীনস্-এর এইসব চিন্তাভাবনা থেকেই। বলা হয় যে, এই ব্যবস্থায় ধনতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের গুণগুলি বজায় রেখে এদের ত্রুটিগুলি পরিহার করা সম্ভবপর হয়।

বৈশিষ্ট্য :

১। মিশ্র অর্থনীতির সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ কাঠামোগত বৈশিষ্ট্য হল এই যে, এই ধরনের অর্থ-ব্যবস্থায় বেসরকারি উদ্যোগ এবং সরকারি উদ্যোগের সহাবস্থান ঘটে। কয়েকটি ক্ষেত্রে (যেমন কৃষি বা ক্ষুদ্র ব্যবসায়ে) বেসরকারি উদ্যোগের পূর্ণ বিকাশের সুযোগ থাকে। আবার অন্যান্য অনেক ক্ষেত্রে বেসরকারি উদ্যোগ সীমিতভাবে কাজ করার সুযোগ পায়। অন্যদিকে, কিছু কিছু ক্ষেত্রে (বিশেষতঃ যেসব ক্ষেত্রগুলি জাতীয় জীবনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হয়, সেগুলিতে) বেসরকারি উদ্যোগের প্রবেশাধিকার নিষিদ্ধ হয়। এই ক্ষেত্রগুলিতেও সরকারি ও বেসরকারি যৌথ উদ্যোগও লক্ষ্য করা যায়।

২। মিশ্র অর্থনীতির অপর উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল এই যে, এই ধরনের অর্থনীতিতে পরিকল্পনার একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকে। মিশ্র অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় সরকারি উদ্যোগগুলির জন্য একটি নির্দিষ্ট পরিকল্পনা থাকে। পাশাপাশি বেসরকারি ক্ষেত্রকেও সরকার নানা সুযোগ-সুবিধা ও উৎসাহ দিয়ে দিক-নির্দেশ প্রদান ও নিয়ন্ত্রণ করে থাকেন। এইভাবে মিশ্র অর্থনীতিতে সরকার একটি সংযুক্ত অর্থনৈতিক পরিকল্পনা (integrated economic planning) রচনা করে থাকেন, যেখানে বেসরকারি উদ্যোগের জন্যও একটি নির্দিষ্ট ভূমিকা চিহ্নিত থাকে।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, মিশ্র অর্থনীতির পরিকল্পনা আর সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির পরিকল্পনা এক নয়। সমাজতান্ত্রিক দেশে অর্থনীতির প্রতিটি অংশে রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব কার্যকরী হয়। এখানে পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষের আদেশ-নির্দেশকে অমান্য করার উপায় নেই। কিন্তু মিশ্র অর্থনীতিতে সরকারি ক্ষেত্রের বাইরে এরূপ বাধ্যবাধকতা একরকম অনুপস্থিত। এখানে পরিকল্পনাকারকদের ফতোয়া নির্দেশসূচক (indicative), আবশ্যিক নয়। পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষের নির্দেশ বেসরকারি ক্ষেত্র কতখানি মান্য করে এবং সামাজিক স্বার্থে নির্ধারিত লক্ষ্যসমূহে পৌঁছাতে বেসরকারি উদ্যোগ কতখানি আন্তরিক মিশ্র অর্থনীতির পরিকল্পনার কার্যকারিতা তার উপর অনেকখানি নির্ভর করে।

ভারতের প্রসঙ্গ :

মিশ্র অর্থনীতির যে কোন আলোচনায় ভারতের প্রসঙ্গ উল্লেখ করতেই হয়। ভারত হল মিশ্র অর্থনীতির এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। স্বাধীনতার পরই দেশের কর্ণধাররা একথা উপলব্ধি করেছিলেন যে, দেশের দ্রুত উন্নতি করার জন্য

পরিকাঠামো গড়ে তুলতে হবে এবং মূল ও ভারী শিল্পের বিকাশ ঘটাতে হবে। কিন্তু এসবের জন্য অনেক সম্পদ বিনিয়োগের প্রয়োজন হয়। তাছাড়া এই বিনিয়োগে প্রতিদান (rate of return) হয় স্বল্প। স্বাভাবিকভাবেই মুনাফা সর্বোচ্চায়নের নীতি (Principle of Profit Maximization) দ্বারা তাড়িত বেসরকারি উদ্যোগ এই ক্ষেত্রগুলিতে আকৃষ্ট হয় না। কাজে কাজেই সরকারি উদ্যোগে পরিকাঠামোর উন্নয়ন করতে হবে বা মূল ও ভারী শিল্প গড়ে তুলতে হবে। সেজন্য ভারতে সরকারি উদ্যোগে বিদ্যুৎ, সেচ, সড়ক, রেলপথ, পরিবহণ প্রভৃতি পরিকাঠামোর উপাদানগুলি গড়ে তোলার প্রচেষ্টা শুরু হয়। রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে শিল্পের ভিত্তিকে দৃঢ় করার জন্য ১৯৪৮ সালে এবং পরে ১৯৫৬ সালে শিল্পনীতি ঘোষণা করা হয়। এই শিল্পনীতিগুলির দ্বারা সচেতনভাবে শিল্পের ক্ষেত্রে সরকারি উদ্যোগকে প্রসারিত করা হয়। মূল ও ভারী শিল্পে এবং জাতীয় জীবনে গুরুত্বপূর্ণ শিল্পগুলিতে রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব বলবৎ করা হয়। জাতির আর্থিক জীবনেও উল্লেখযোগ্যভাবে রাষ্ট্রের অনুপ্রবেশ ঘটে। ১৯৬৯ সালে সরকার বড় বড় চৌদ্দটি ব্যাংককে জাতীয়করণ করেন। ১৯৮০ সালে আবার ৬টি ব্যাংক রাষ্ট্র অধিগ্রহণ করেণ। এইভাবে কি শিল্পব্যবস্থায়, কি অর্থ-ব্যবস্থায় সরকারি উদ্যোগের সীমানা বর্ধিত হয়ে ওঠে।

পরিশেষে একটা প্রশ্ন। আমরা জানি সমাজতন্ত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল উৎপাদন যন্ত্রের সামাজিকীকরণ। ভারতবর্ষের ক্ষেত্রেও ক্রমবর্ধমান রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রের প্রসারণ সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের সমাজ গঠনে সহায়ক হবে বলে কোন কোন মহল থেকে দাবী করা হয়। প্রশ্নটা হল : এই দাবী কতটা যুক্তিসঙ্গত? এ দেশে অবশ্যই সরকারি ক্ষেত্রটির উল্লেখযোগ্য প্রসার ঘটেছে। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে প্রসারিত সরকারি ক্ষেত্রের দৌলতে এ দেশ সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের সমাজ গঠনে সমর্থ হয়েছে। বস্তুতঃ অধ্যাপক সুখময় চক্রবর্তীর কথায়, মিশ্র অর্থনীতি অনুসরণ করার ইঙ্গিত এটা নয় যে তার লক্ষ্য হল সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের সমাজ গঠন।[৪] সমাজতন্ত্র সাম্যের দ্যোতক। কিন্তু ভারতে সরকার মিশ্র অর্থনীতি ও পরিকল্পিত উন্নয়নের পথ গ্রহণ করলেও দেশে অসাম্য কমেনি বা আয়-বন্টনের ব্যবধান কমেনি বা মুষ্টিমেয় মানুষের হাতে ধন-সম্পদ কেন্দ্রীভূত হওয়ার প্রক্রিয়াতে ছেদ পড়েনি। বেসরকারি ক্ষেত্রের ক্রিয়াকলাপকে নিয়ন্ত্রিত করে এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ করে সরকার এই অবস্থার প্রতিকার করবেন—সাধারণ মানুষের এই প্রত্যাশা পূরণ হয়নি। সমাজতন্ত্রের সুফল লাভের সম্ভাবনা জনগণের নিকট স্বপ্নই থেকে গেছে।

১.৫ কল্যাণমুখী রাষ্ট্র (Welfare State)

কল্যাণমুখী রাষ্ট্রের ধারণাটি খুব বেশি প্রাচীন নয়। রাষ্ট্র সম্বন্ধে প্রাচীন ধারণাটি হল এই যে রাষ্ট্র মূলতঃ নাগরিকদের জীবন ও সম্পত্তির নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করবে। অর্থাৎ রাষ্ট্রের চরিত্র হবে মূলতঃ 'পুলিসি' এবং তার কার্যাবলী সীমিত থাকবে জনগণের জীবন ও সম্পদকে নিরাপদ করে তোলার ক্ষেত্রটিতে। রাষ্ট্র সম্বন্ধে এই দর্শনের পরিবর্তন দেখা গেল বিশ শতকে। নাগরিক জীবনের হিতসাধনেও রাষ্ট্রের একটি দায়িত্ব আছে-এরূপ এক মতাদর্শ গড়ে উঠল এই সময়ে। এর পিছনে যে কারণটি কাজ করেছিল তা হল : বিশ শতকে এসে মানুষ দেখল যে পুঁজিবাদ ধনোৎপাদনের ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটালেও সমাজে অসাম্য বৃদ্ধি করে এবং শোষনভিত্তিক এই সমাজ-ব্যবস্থায় জনগণের এক বিপুল অংশকে অস্বচ্ছলতা তথা অনটনের মধ্যে দিনাতিপাত করতে হয়। এই পরিপ্রেক্ষিত

(৪) "..adherence to a mixed economy does not imply that it will grow into what many people once thought to be its rationale, i.e., a socialist pattern of society".

– S. Chakravarty, "Policy Making in Mixed Economy-the Indian Case" in P. R. Brahmananda and V. R. Panchamukhi (eds.) The Development Process of the Indian Economy (1987), p. 731.

মানুষকে রাষ্ট্রের ভূমিকা সম্বন্ধে নতুন করে চিন্তা করতে উদ্বুদ্ধ করে এবং এই অবস্থা থেকে কল্যাণমুখী রাষ্ট্রের ধারণাটির উৎপত্তি ঘটে।

কল্যাণমুখী রাষ্ট্রের সংজ্ঞা হিসাবে বলা যায় যে রাষ্ট্র তার নাগরিকদের জন্য এক বিস্তৃত সামাজিক নিরাপত্তার কর্মসূচী গ্রহণ করে এবং যার ফলে নাগরিকরা রাষ্ট্রের কাছ হতে বার্ধক্য, বেকারি, দারিদ্র্য, দুর্ঘটনা প্রভৃতি অবস্থায় সাহায্য পেয়ে থাকে তাকে বলা হয় কল্যাণমুখী রাষ্ট্র। স্পষ্টতঃই কল্যাণমুখী রাষ্ট্রে রাষ্ট্রের কর্মপরিধি বিস্তৃত হয়। এক মানবিক বোধের দ্বারা চালিত হয়ে রাষ্ট্র সমাজ-জীবনের বিভিন্ন কল্যাণমুখী দায়িত্ব সম্পন্ন করে।

কতকগুলি মৌল নীতি দ্বারা কল্যাণমুখী রাষ্ট্র চালিত হয়। এগুলি হল :

(ক) প্রতিটি নাগরিকের জন্যই ন্যূনতম সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের বিধান করা রাষ্ট্রের কর্তব্য।

(খ) রাষ্ট্রের হাতে যে সম্পদ ও উপকরণ থাকে, তার দ্বারা নাগরিকদের প্রতি রাষ্ট্রের উপরোক্ত কর্তব্যটুকু সমাধান করা সম্ভব।

(গ) যে-সব ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত উদ্যোগ ব্যর্থ হবে, সেই সব ক্ষেত্রে রাষ্ট্র অবশ্যই সক্রিয় হয়ে ওঠার অধিকারী।

(ঘ) কল্যাণমুখী রাষ্ট্র নাগরিকদের মধ্যে সমতা স্থাপনের লক্ষ্যে কাজ করে না, বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে প্রয়োজন অনুসারে নাগরিকদের সাহায্য করে থাকে। এই প্রয়োজনের জন্য নাগরিকদের ব্যক্তিগত দয়া-দাক্ষিণ্যের ওপর নির্ভর করার প্রয়োজন হয় না।

কল্যাণমুখী রাষ্ট্র কার্যক্ষেত্রে কতখানি নাগরিকদের কল্যাণ সাধন করতে সমর্থ হবে, তা অনেকগুলি বিষয়ের উপর নির্ভরশীল। প্রথমত, দেশের জাতীয় আয় পর্যাপ্ত না হলে অধিক মাত্রায় কল্যাণমূলক কর্মসূচী বাস্তবায়িত করা সম্ভব হয় না। সুতরাং যথার্থভাবে কল্যাণমুখী রাষ্ট্র হতে হলে উৎপাদন এবং আয়ের যথোচিত বৃদ্ধি দরকার। দ্বিতীয়ত, কল্যাণমুখী রাষ্ট্র গড়ে তুলতে হলে সেই রাষ্ট্রের নাগরিকদের স্ব স্ব ক্ষেত্রে দায়িত্বশীল হতে হবে। দেশকে সমৃদ্ধ করে তোলার জন্য তাদের উদ্যোগী হতে হবে। তাদের সুনাগরিক হয়ে উঠতে হবে। রাষ্ট্রকে করপ্রদানের ক্ষেত্রে তাদের মধ্যে যেন শৈথিল্য না থাকে। কর হল সরকারের রাজস্ব এবং নাগরিকরা কর ফাঁকি দিলে সরকার আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং কল্যাণমূলক কর্মসমূহ ঠিকভাবে সম্পাদন করতে সমর্থ হয় না। তৃতীয়ত, জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারকে স্তিমিত করা দরকার। জনসংখ্যা যদি ক্রমাগত উচ্চহারে বৃদ্ধি পেতে থাকে, তাগলে যে-কোন রাষ্ট্রের পক্ষেই কল্যাণমূলক সেবাকার্যাদি পরিচালনা করা কষ্টকর হয়ে উঠবে। চতুর্থত, দেশের প্রশাসনকে জনমুখী ও সংবেদনশীল হতে হবে। তা নইলে ঈপ্সিত জনগোষ্ঠীর কাছে কল্যাণমূলক কর্মসূচীর সুফল পৌঁছাবে না। পরিশেষে, রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার আনুকুল্যে প্রয়োজনীয় সেবাকার্যাদি অনায়াসলভ্য হয় বলে মানুষের মধ্যে উদ্যমহীনতা দেখা দিতে পারে। কল্যাণমুখী রাষ্ট্রকে এই দিকটির প্রতি সতর্ক থাকতে হবে।

কল্যাণমূলক রাষ্ট্রের উদাহরণ :

বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে ইংল্যান্ডেই প্রথম সুচিন্তিতভাবে কল্যাণমূলক রাষ্ট্রের কর্মসূচী গৃহীত হয়। ১৯৪২ সালে 'বিভারিজ রিপোর্ট' (Beveridge Report) এর প্রতিবেদনই ছিল এই কর্মসূচীর ভিত্তি। তদনুসারে যে সামাজিক নিরাপত্তার প্রকল্প কার্যকর করা হয় তার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয় বেকার ভাতা, বিধবা ও বৃদ্ধদের পেনশন, বিনামূল্যে চিকিৎসা ও বিদ্যালয়ে শিক্ষা ও উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে বৃত্তি ইত্যাদি। সুইডেন, নরওয়ে এবং ডেনমার্কেও নাগরিকদের কল্যাণের জন্য বিবিধ ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে। পাশ্চাত্যের অন্যান্য উন্নত দেশেও সরকারের তরফে নানারূপ কল্যাণমূলক কর্মসূচী প্রবর্তন হয়েছে। ভারতের ক্ষেত্রে সংবিধানের নির্দেশাত্মক নীতিগুলি (Directive Principles) প্রকৃতপক্ষে কল্যাণমুখী কার্যক্রম অনুসরণ করারই নির্দেশ। সংবিধানের ৩৯ এবং ৪১ নম্বর ধারায় কল্যাণমূলক

কার্যগুলিকে বিশদ করা হয়েছে। ভারতে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা শুরু হওয়ার পর কেন্দ্রীয় সরকার এবং বিভিন্ন রাজ্য সরকার আইন প্রবর্তন করে নানারূপ কল্যাণমূলক কার্যক্রম চালু করে।

কল্যাণমূলক রাষ্ট্রের ভবিষ্যত :

এ যাবৎ কল্যাণমূলক রাষ্ট্রের উপাদান নিয়ে অথবা এরূপ রাষ্ট্রের কল্যাণমূলক কার্যাবলীর পরিধি বা বিস্তৃতি নিয়ে মতভেদ দেখা দিয়েছে। কিন্তু নীতিগতভাবে কল্যাণমূলক রাষ্ট্রের ধারণাটি তেমন কোন বড় ধরনের চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়নি। বিশ শতকের আশির দশক পর্যন্ত এরূপ অবস্থাই চলছিল। তারপর থেকেই কিন্তু 'কল্যাণমূলক রাষ্ট্র-দর্শন' বা 'Welfarism' একটি নীতি হিসাবে সমালোচনার বিষয় হয়ে উঠল। বিশ শতকের শেষের দিকে পূর্বতন সোভিয়েত রাষ্ট্রের পতন এবং সমাজতন্ত্রের প্রভাব-হ্রাস কল্যাণমূলক রাষ্ট্রের গুরুত্ব খর্ব করতে সাহায্য করে। যে গ্রেট ব্রিটেন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় থেকে কল্যাণমূলক কর্মসূচীর পরিধি উত্তরোত্তর প্রসারিত করেছিল, সেই গ্রেট ব্রিটেনেই শতাব্দীর সমাপ্তি-পর্বে 'লৌহ-মানবী' (Iron Lady) মার্গারেট থ্যাচারের নেতৃত্বে কল্যাণমূলক রাষ্ট্রের কর্মপরিধিকে সঙ্কুচিত করার প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গেল। শুধু থ্যাচারের ব্রিটেনে এককভাবে নয়, একই জিনিস লক্ষিত হল অন্যত্রও। এই সময় এক বিশেষ অর্থনৈতিক দর্শন ব্যাপকভাবে ক্রিয়াশীল হয়ে ওঠে। এই দর্শনের মূল কথা হল রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের ফলে অদক্ষতা আর অপচয় ঘটে এবং নিয়ন্ত্রণ অপেক্ষা বিনিয়ন্ত্রণই (deregulation) শ্রেয়তর। এই দর্শন কল্যাণমূলক রাষ্ট্রের ধারণাটিকে ক্রমে ক্রমে অনভিপ্রেত করে তুলতে সাহায্য করে। দেশে দেশে কল্যাণমূলক প্রকল্পগুলির কাট-ছাঁট শুরু হয়ে গেল। আমাদের ভারতবর্ষেও মোটামুটি একই জিনিস দেখা গেল। আর্থিক সংস্কারের দীর্ঘ ছায়ায় 'Welfarism' ম্রিয়মান হয়ে পড়ার উপক্রম হল। তবে সম্প্রতি ভারতীয় রাজনীতিতে যে পালাবদল ঘটেছে, তার প্রভাবে উপরোক্ত প্রক্রিয়াটি খানিক বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে।

১.৬ অনুশীলনী

১। সামন্ততন্ত্র কী? তার বৈশিষ্ট্যগুলি ব্যাখ্যা কর।

২। 'ধনতন্ত্র' এবং 'সমাজতন্ত্র' শব্দগুলি কী অর্থ বহন করে। এই দুই ব্যবস্থার মধ্যে পার্থক্যগুলি উল্লেখ ও ব্যাখ্যা কর।

৩। কল্যাণমূলক রাষ্ট্র কোন্ কোন্ নীতির দ্বারা পরিচালিত হয়? সাধারণ নাগরিকের জীবনে এর প্রভাব কী?

একক ২ □ অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্বন্ধীয় প্রধান প্রধান তত্ত্বসমূহের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি (Brief Introduction to Major Theories of Economic Growth)

গঠন

২.১ অ্যাডাম স্মিথের উন্নয়ন-তত্ত্ব

২.২ রিকার্ডোর উন্নয়ন-তত্ত্ব

২.৩ কার্ল মার্কসের উন্নয়ন-তত্ত্ব

২.৪ হ্যারড-ডোমার উন্নয়ন তত্ত্ব

২.৫ লুইস মডেল-অফুরান শ্রমশক্তির সাহায্যে আর্থিক উন্নয়ন

২.৬ লাইবেস্টাইন-এর 'একান্ত সর্বনিম্ন প্রচেষ্টা (Critical Minimum Effort) তত্ত্ব

২.৭ জোর ধাক্কা তত্ত্ব (Theory of Big Push)

২.৮ লেনসন তত্ত্ব-স্বল্প আয়ের ভারসাম্য ফাঁদ (Low Level Equilibrium Trap)

২.৯ সুষম (balanced) বনাম অসম (unbalanced) উন্নয়ন তত্ত্ব

২.১০ অনুশীলনী

আর্থিক প্রগতির সূচনা ও বিকাশ কি ভাবে ঘটানো সম্ভব হয় এবং প্রগতির কোন ধারা অবলম্বনে দারিদ্র্য ও অনুন্নতির পর্যায়কে অতিক্রম করে উন্নয়ন লাভ করে মানুষের জীবনযাপনের মানকে উন্নত স্তরে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়, এ সম্বন্ধে অর্থশাস্ত্রে বিবিধ তত্ত্ব পরিলক্ষিত হয়। এদের মধ্য থেকে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ কিছু তত্ত্ব সংক্ষিপ্তাকারে নিম্নে আলোচনা করা হল।

২.১ অ্যাডাম স্মিথের উন্নয়ন-তত্ত্ব

১৭৭৬ সালে প্রকাশিত হয় অর্থশাস্ত্রের জনক হিসেবে পরিচিত অ্যাডাম স্মিথের বিখ্যাত বই 'জাতিসমূহের সম্পদের প্রকৃতি ও কারণ অনুসন্ধান' (An Inquiry into the Nature and the Causes of the Wealth of Nations)। বইটির নামকরণ থেকেই বোঝা যাচ্ছে যে উন্নয়ন বা প্রগতির কারণ অনুসন্ধান ছিল অ্যাডাম স্মিথের অন্যতম লক্ষ্য।

স্মিথের উন্নয়ন-তত্ত্বে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদানের অবতারণা করা হয়। উন্নয়নের ক্ষেত্রে স্মিথ শ্রমিকের উৎপাদনশীলতা ও পুঁজি সঞ্চয়ন তথা বিনিয়োগ-বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তার কথা বললেন। শ্রমিকের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্য চাই অধিক পরিমানে শ্রম-বিভাজন। শ্রম-বিভাজনের ফলে বিশেষ কাজে শ্রমিক দক্ষ হয়ে ওঠে; তার সময়ের সঙ্কুলান হয়, সে যন্ত্রের ব্যবহার করতে পারে যথাযথ। কিন্তু পুঁজির স্বল্পতা থাকলে শ্রম-বিভাজনের সুফল লাভ করা যায় না। সেজন্য পুঁজি ক্রমাগত বাড়িয়ে যেতে হবে অর্থাৎ বিনিয়োগের হার বৃদ্ধি করে যেতে হবে। পুঁজি সঞ্চয়নের উপর অত্যধিক জোর প্রদান অ্যাডাম স্মিথের চিন্তাধারার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এ থেকেই তিনি অধিক সঞ্চয়ের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। তিনি মনে করতেন সঞ্চয়কারী মানুষ সমাজের হিতকারী। উল্টোদিকে, যারা অমিতব্যয়ী তারা জাতির ক্ষতি করে।

স্মিথের তত্ত্বে পুঁজি সঞ্চয়নের হার হ্রাস পেলে উন্নয়নের গতি শ্লথ হয়। আরও একটি কারণে উন্নয়ন সীমিত হতে পারে। তা হল : বাজারের সংকোচন। এ বিষয়ে স্মিথের বিখ্যাত উক্তি স্মরণ করা যেতে পারে : বাজারের পরিধি শ্রমবিভাগকে সীমিত করে। বাস্তবিক বাজার না বাড়লে চাহিদা বাড়ে না, আর চাহিদার আকর্ষণ না থাকলে অধিক উৎপাদনে উৎসাহ থাকে না। স্বাভাবিকভাবেই তখন শ্রমবিভাগ, বিশেষায়ন, বিনিয়োগ -সব কিছুই শ্লথ হয়। এ কারণেই বাজার সংকুচিত হয় - এরূপ যে কোন নীতি বা কার্যের বিরোধী ছিলেন স্মিথ। অন্তর্দেশীয় পণ্য চলাচলের ক্ষেত্রে যে কোন রূপ বাধানিষেধ আরোপ তাঁর অপছন্দ ছিল। তিনি Laissez faire বা অবাধ বাণিজ্য-নীতির সমর্থক ছিলেন।

২.২ রিকার্ডোর উন্নয়ন-তত্ত্ব

অ্যাডাম স্মিথের পরবর্তী বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ হলেন ডেভিড রিকার্ডো। রিকার্ডোর মতে উৎপাদন নির্ধারণকারী তিনটি উপাদান হল : জমি, শ্রম এবং পুঁজি বা মূলধন।

জমির ক্ষেত্রে বলা যায় যে, সমাজের দৃষ্টিকোণ থেকে জমির যোগান হল সীমাবদ্ধ। একটা স্তরে পৌঁছানোর পর জমির যোগান আর বাড়ানো যায় না। সেই অবস্থায় একই পরিমাণ জমিতে অধিকমাত্রায় শ্রম ও মূলধন নিয়োগ করে উৎপাদন বৃদ্ধি করতে হয়। তাতে মোট উৎপাদন বৃদ্ধি পায়, কিন্তু প্রান্তিক উৎপাদন ক্রমশঃ হ্রাস পায়।

শ্রমের ক্ষেত্রে শ্রমিকদের মজুরির হার তাদের নিম্নতম জীবনযাত্রার মান দ্বারা নির্ধারিত হয়। এই মজুরি শ্রমিকের স্বাভাবিক দাম (natural price of labour), যার সাহায্যে সে কায়ক্লেশে জীবনধারণ করতে পারে। কোন নির্দিষ্ট সময়ে মজুরির হার নিম্নতম জীবনযাত্রার পক্ষে প্রয়োজনীয় মজুরির হার অপেক্ষা বেশি বা কম হতে পারে। কিন্তু দীর্ঘকালীন ভিত্তিতে মজুরির হার স্থির থাকে।

মূলধন বা পুঁজির যোগান আসে পুঁজিপতিদের কাছ থেকে। মূলধন বা পুঁজি বলতে রিকার্ডো আবর্তনশীল পুঁজিকে বুঝতেন। এই আবর্তনশীল পুঁজির পরিমান শ্রমিকদের জন্য বরাদ্দ ফান্ড বা Wages Fund এর সমান। পুঁজিপতিদের এই পুঁজির উৎস হলো মুনাফা।

মুনাফা বাড়লে পুঁজি বাড়ে। এর ফলে শ্রমিকদের জন্য বরাদ্দকৃত ফান্ডের পরিমান বাড়ে। তখন অধিক মজুরিপ্রদান সম্ভব হয়। মজুরি বাড়লে জনসংখ্যা বাড়ে। কারণ বর্ধিত আয় দিয়ে বেশি সংখ্যক সন্তান প্রতিপালন সম্ভব হয়। এদিকে জনসংখ্যা অধিক হওয়ায় খাদ্যের জন্য চাহিদা বাড়ে। খাদ্যশস্যের চাহিদা বাড়লে খাদ্যশস্যের দাম বাড়ে, কারণ তখন খাদ্যশস্য উৎপাদন করা সম্ভব হয় কেবলমাত্র নিম্নমানের জমি থেকে, কিংবা একই জমিতে একাধিক বার চাষ করে (যার দরুন প্রান্তিক উৎপন্নের পরিমাণ কমতে থাকে)। খাদ্যশস্যের উৎপাদন বৃদ্ধির এই দুই পদ্ধতির যেটাই গ্রহণ করা হোক না, খাদ্যশস্য উৎপাদনের ব্যয় কিন্তু বেড়ে যায়। তখন, খাদ্যশস্যের এই দামবৃদ্ধি আসল মজুরিকে চিরাচরিত নিম্নস্তরে নামিয়ে আনে। কিন্তু টাকার অঙ্কে পূর্বাপেক্ষা এখন মজুরির হার বেশি। এর কারণ হল খাদ্যশস্যের দাম-বৃদ্ধি, যার ফলে জীবনধারণের জন্য শ্রমিকদের এখন বেশি অর্থ দরকার হয়ে পড়ে। যাই হোক, মজুরি বৃদ্ধির ফলে মুনাফার হার সংকুচিত হয়।

রিকার্ডোর তত্ত্বে মুনাফার ক্রম-সংকোচন উদ্বেগের বিষয়। কারণ সে ক্ষেত্রে পুঁজি সঞ্চয়ন হ্রাস পাবে, শ্রমিকের চাহিদা কমবে অর্থাৎ শ্রমিকের নিয়োগ আর বাড়বে না এবং তার মজুরিও ন্যূনতম প্রয়োজনের স্তরে স্থির থাকবে। এই অবস্থাকে বলা হয় নিশ্চল অবস্থা (Stationery State)।

রিকার্ডোর মতে যান্ত্রিক অগ্রগতি শ্রমিকের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করলে নিশ্চল অবস্থা কিছুটা বিলম্বে আসতে পারে, কিন্তু যান্ত্রিক উন্নয়ন দিয়ে এই অবস্থা থেকে রেহাই পাওয়া যাবে না। বিদেশ থেকে যথেষ্ট শস্য আমদানি করে শস্যের দুষ্প্রাপ্যতা দূর করলেই এই অবস্থা থেকে পরিত্রাণ পাওয়া সম্ভব। কারণ তা হলে বেঁচে থাকার জন্য যে ন্যূনতম মজুরি শ্রমিকদের দিতে হয়, তার পরিমান কমবে। তাহলেই পুঁজি সঞ্চয়ন বাড়বে এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রসার ঘটবে। এরূপ চিন্তাধারার জন্য রিকার্ডো অবাধ বাণিজ্য-নীতির সমর্থক ছিলেন।

সমালোচনা :

রিকার্ডোর তত্ত্বের সমালোচনা করে বলা হয়েছে যে রিকার্ডো-বর্ণিত নিশ্চল অবস্থা অবধারিত না-ও হতে পারে। যাঁরা এরূপ কথা বলেন, তাঁরা তাঁদের বক্তব্যের সমর্থনে পাশ্চাত্য ধনতান্ত্রিক দেশগুলির ইতিহাসের কথা উল্লেখ করেন। এ সমস্ত দেশে সম্পদ ও পুঁজির ক্রমাগত বৃদ্ধির ফলে শ্রমিকের হাতে উন্নত ধরনের যন্ত্র তুলে দেওয়া সম্ভব হয়েছে। এর ফলে শ্রমিকের উৎপাদনশীলতা ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়েছে এবং উৎপাদন-ব্যয় হ্রাস পেয়েছে। এই ঘটনা রিকার্ডো-বর্ণিত নিশ্চল অবস্থা আবির্ভাবের পথে অন্তরায় সৃষ্টি করেছে। তবে জনসংখ্যাবৃদ্ধি যে উন্নয়নের পথে একটা বড় বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে, রিকার্ডোর এই বক্তব্য আজও অধিকাংশ স্বল্পোন্নত দেশের ক্ষেত্রে সমানভাবে সত্য।

২.৩ কার্ল মার্কসের উন্নয়ন-তত্ত্ব

একটি পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে কিরূপ ক্রিয়াকলাপ ঘটে এবং পরিণামে সেই অর্থনীতি কিরূপ অবস্থায় পৌঁছায়, কার্ল মার্কসের রচনায় তার বিশদ বিবরণ আছে।

মার্কসের মতে, একজন পুঁজিপতির উদ্দেশ্য হল উৎপাদন থেকে উদ্বৃত্ত-মূল্য অর্জন। এ প্রসঙ্গে মার্কসের অতি পরিচিত একটি সূত্রের উল্লেখ করা যায়। সূত্রটি M-C-M' রূপে চিহ্নিত। পুঁজিপতি M বা অর্থ দিয়ে কাজ শুরু করে। এর দ্বারা সে উৎপাদনের জন্য শ্রমশক্তি ও অন্যান্য উপকরণ ক্রয় করে। এগুলিই হল C1 শেষে C সহযোগে উৎপন্ন চূড়ান্ত পণ্যকে বাজারে বিক্রয় করে পুঁজিপতি M' পরিমাণ অর্থ ফিরে পায়। M' ও M-এর পার্থক্যই হল পুঁজিপতির উদ্বৃত্ত-মূল্য। কিভাবে সৃষ্টি করে এই উদ্বৃত্ত-মূল্য। মার্কস বললেন, শ্রমিক তার শ্রমমূল্য হিসাবে যে মজুরি পায় তার পরিমাণ কম। নিজের ও তার পরিবারের ভরণ-পোষণের জন্য যেটুকু প্রয়োজন, সেই ন্যূনতম পরিমাণই হল তার শ্রমমূল্য। অথচ তার উৎপাদনশীলতা এর থেকে বেশি। শ্রমমূল্য অপেক্ষা অধিক উৎপাদনের পরিমাণটুকুই হল উদ্বৃত্ত-মূল্য। এই উদ্বৃত্ত-মূল্য আত্মসাৎ করে পুঁজিপতি। এটাই তার মুনাফা।

মার্কসের মতে, পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে উন্নয়নের চালিকাশক্তি হল পুঁজি সঞ্চয়ন। পুঁজিপতি মালিক যে উদ্বৃত্ত-মূল্য শ্রমিকদের কাছ হতে আহরণ করে, তার মোটা অংশই সে বিনিয়োগ করে উৎপাদনের ক্ষেত্রে। উৎপাদনের স্থলে অধিক পুঁজির অনুপ্রবেশের ফলে শ্রমিকের উৎপাদনশীলতা বাড়ে। ফলে আরও অধিক উৎপাদন, আরও অধিক উদ্বৃত্ত-মূল্য এবং আরও অধিক পুঁজির বিনিয়োগ। কিন্তু অগ্রগতির এই পথে বাধা আসতে পারে। উৎপাদন বাড়লে শ্রমিকের চাহিদাও বাড়ে। এ কারণে যদি শ্রমিকের মজুরি বেড়ে যায়, তাহলে উদ্বৃত্ত-মূল্য কমে যাবে। সে ক্ষেত্রে পুঁজি সঞ্চয়ন বা উৎপাদন-বৃদ্ধিতে অন্তরায় সৃষ্টি হবে। কিন্তু পুঁজিপতি শ্রেণি মজুরি বৃদ্ধি আটকাতে চেষ্টা করবে। তারা যন্ত্রের ব্যবহার বাড়িয়ে বেকারের সংখ্যা বৃদ্ধি করবে এবং এই বেকারবাহিনীর চাপে মজুরি ঊর্ধ্বগামী হতে পারবে না।

তবুও মার্কসীয় তত্ত্ব অনুযায়ী পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় সঙ্কট দেখা দেবে। আর এই সঙ্কট আসবে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার অন্তর্নিহিত বৈপরীত্য থেকে। এখানে মুনাফা যে হারে বৃদ্ধি পাবে, মজুরি সে হারে বাড়বে না। আয়ের এই

অসম বন্টন থেকে চাহিদার ঘাটতি এবং বাজারের সঙ্কোচন দেখা দেবে। ক্রমে মালিকশ্রেণি ও শ্রমিকশ্রেণির দ্বন্দ্ব তীব্র হয়ে উঠবে। এই অবস্থায় বিপ্লবের ক্ষেত্র প্রস্তুত হবে এবং পরিণামে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার পতন ঘটবে।

সমালোচনা :

ঐতিহাসিক বিচারে মার্কসের ভবিষ্যদ্বাণী অভ্রান্ত বলে পরিগণিত হয় নি। পুঁজিবাদী অর্থনীতি যে বিপর্যয়ের মুখে পড়েনি তা নয়। কিন্তু সঙ্কট এরূপ তীব্র আকার ধারণ করেনি যা পুঁজিবাদী ব্যবস্থার পতন আনতে পারে। বস্তুতঃ পৃথিবীর উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতে আয় বাড়ার সাথে সাথে শ্রমিকদের জীবনযাত্রার মানও বেড়েছে এবং এসব দেশে আয়বন্টনের বৈষম্য তেমন প্রকটভাবে বৃদ্ধি পায়নি। ফলে পৃথিবীর উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতে সেরূপ শ্রেণীবৈরিতা দেখা যায়নি যা শ্রেণীসঙ্ঘর্ষের পথ ধরে ধনতন্ত্রের পতন ঘটাতে পারে।

২.৪ হ্যারড-ডোমার উন্নয়ন তত্ত্ব

কোন সূত্র ধরে প্রগতির প্রসার ঘটে বা কি অবস্থায় উদ্যোক্তা বা উৎপাদকরা সন্তুষ্ট বা পরিতৃপ্ত হয়— এসব প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায় স্যার রয় হ্যারড বা ইভসে ডোমার-এর উন্নয়ন-তত্ত্বে।

এ প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হল হ্যারড প্রদত্ত মৌলিক সমীকরণটি। বলা যেতে পারে যে সমীকরণটিতে উন্নয়নের সারসত্য প্রকাশ পেয়েছে। উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন বাড়তি মূলধন দ্রব্য। আয়ের যে অংশ ভোগে না ব্যয়িত হয়ে সঞ্চয়ের রূপ নেয়, তা থেকেই ঘটে মূলধনবৃদ্ধি। এই বাড়তি মূলধনের প্রতিটি ইউনিট থেকে বাস্তবে যতখানি উৎপাদন-বৃদ্ধি ঘটে, তা মূলধনের প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা সূচিত করে। কোন এক কালখন্ডে উৎপাদনবৃদ্ধি আসলে সেই সময়-সীমায় সৃষ্ট মূলধন এবং মূলধনের প্রান্তিক উৎপাদনশীলতার গুণফল। সঙ্কেতের আকারে প্রকাশ করলে বলা যায়—

যদি ধরা হয় Gy = উৎপাদনবৃদ্ধির হার

$s = S/Y$ = সঞ্চয়-আয় অনুপাত

$v = k/y$ = প্রান্তিক মূলধন-উৎপাদন অনুপাত

(অতএব $1/v = Y/k = f$ প্রান্তিক উৎপাদন-মূলধন অনুপাত, যা মূলধনের প্রান্তিক উৎপাদনশীলতার সূচক)

তাহলে, হ্যারড প্রদত্ত মৌলিক সমীকরণটির রূপ হল—

$$Gy = s.1/v = s/v$$

হ্যারডের উপরোক্ত সমীকরণ থেকে জানা যায় যে, v এর মান নির্দিষ্ট থাকলে s বা সঞ্চয়-আয় অনুপাত বৃদ্ধি পেলে উৎপাদন বৃদ্ধির হার বাড়ে এবং s অপরিবর্তিত থাকলে যদি v বৃদ্ধি পায় তাহলে উৎপাদন বৃদ্ধির হার হ্রাস পায়। v বা প্রান্তিক মূলধন-উৎপাদনের অনুপাত জানা থাকলে একটি বিশেষ উৎপাদন-বৃদ্ধির হার (Gy) অর্জন করতে হলে সঞ্চয়ের অনুপাত কতখানি হওয়া প্রয়োজন সমীকরণটির থেকে তাও অনায়াসে জানা যায়।

হ্যারড তাঁর উন্নয়ন তত্ত্বে Warranted rate of growth বা অভিপ্রেত উৎপাদনবৃদ্ধির হারের কথা বলেছেন। অভিপ্রেত উৎপাদনবৃদ্ধির হার হল সেই হার যে হারে মূলধনী দ্রব্যের মজুতের পূর্ণ ব্যবহার ঘটে এবং উৎপাদকরা তৃপ্ত থাকে। তারা তখন এই হারের পুনরাবৃত্তি ঘটাতে সচেষ্ট হয়।

মোটামুটি একই ধারণার পরিচয় মেলে ডোমারের তত্ত্বে। ডোমার-তত্ত্বে মূলধনবৃদ্ধির একটি বিশেষ ফলের উপর জোর দেওয়া হয়েছে। তা হল এই যে, মূলধনবৃদ্ধি সমাজের উৎপাদনী শক্তি প্রসার ঘটায়। এই বর্ধিত

উৎপাদনীশক্তির পূর্ণ ব্যবহার প্রয়োজন যাতে অর্থনীতির মধ্যে উদ্বৃত্ত উৎপাদন ক্ষমতার সমস্যা না দেখা দেয়। এর জন্য চাহিদার বৃদ্ধি প্রয়োজন। সুতরাং ডোমারের মতে আর্থিক প্রগতির সাথে সাথে এমনভাবে বিনিয়োগ বৃদ্ধি প্রয়োজন যাতে অর্থনীতিতে পূর্ণ নিয়োগ অবস্থা বিরাজ করে। অর্থাৎ অলস বা উদ্বৃত্ত উৎপাদন ক্ষমতার অস্তিত্ব না থাকে।

অনুন্নত দেশের ক্ষেত্রে হ্যারড-ডোমার তত্ত্বের কার্যকারিতা :

হ্যারড-ডোমর তত্ত্বে যে বিষয়টি গুরুত্ব পেয়েছে, তা হল মূলধনবৃদ্ধিজনিত কারণে উৎপাদনবৃদ্ধি পেলে ঐ উৎপাদনের সমতুল চাহিদা আছে কি না। প্রয়োজন হল পর্যাপ্ত চাহিদার। এখানে মূলধনের সহজলভ্যতা কোন সমস্যা নয়। মূলধন বর্তমান; তার ব্যবহারের জন্য দরকার যথেষ্ট চাহিদা। স্পষ্টতঃই হ্যারড-ডোমার মডেল অনুন্নত দেশের পক্ষে প্রযোজ্য নয়। এসব দেশের সমস্যা হল মূলধনের ঘাটতি। বর্তমান মূলধন-ভাণ্ডারের ব্যবহার অপেক্ষা কিভাবে এই ভাণ্ডারকে আরও সমৃদ্ধ করে তোলা যায় এবং যথোপযুক্তভাবে ব্যবহার করা যায়, তা-ই হল এই দেশগুলির প্রধান সমস্যা।

২.৫ লুইস মডেল-অফুরান শ্রমশক্তির সাহায্যে আর্থিক উন্নয়ন

এখন আমাদের আলোচ্য বিষয় হল অর্থশাস্ত্রে সুপরিচিত লুইস মডেল, যে মডেলটি অনুন্নত বা স্বল্পোন্নত দেশের বাস্তব পরিস্থিতির উপর ভিত্তি করে নির্মিত হয়েছে।

ডবলিউ আর্থার লুইস তাঁর তত্ত্বটি প্রকাশ করেন ১৯৫৪ সালে। তাঁর তত্ত্বে দেখানো হয় যে উদ্বৃত্ত শ্রমশক্তি বা অফুরান শ্রমের যোগান-যা একটি অনুন্নত অর্থনীতির দৃষ্টিগ্রাহ্য বৈশিষ্ট্য-তা দিয়ে আর্থিক উন্নয়ন ঘটানো সম্ভব। এটা প্রমাণ করার জন্য লুইস তাঁর আলোচনায় অনুন্নত দেশের অর্থনীতিকে দুটি ক্ষেত্রে বিভাজন করেছেন-একটি স্বল্প পরিসরযুক্ত শিল্পক্ষেত্র, যেখানে ধনতান্ত্রিক পদ্ধতিতে মূলধনের মালিকরা শিল্পোৎপাদন করে থাকেন; অন্যটি কৃষিক্ষেত্র, যেখানে কেবলমাত্র সনাতন পদ্ধতি অবলম্বন করে উৎপাদন-ক্রিয়া সম্পন্ন করা হয় এবং যেখানে প্রয়োজনের অতিরিক্ত লোক ভিড় করে থাকে এই কারণে যে তাদের জন্য অন্যত্র কর্মসংস্থানের সুযোগ নেই। তারা আপাত কর্মনিযুক্ত, কিন্তু আসলে তারা ছদ্ম-বেকার। উৎপাদনে তাদের অবদান তেমন কিছু নেই। অর্থনীতির পরিভাষায় বলা যায় যে তাদের প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা শূন্য। তবে এরাও কৃষক-পরিবারের সদস্য। উৎপাদনে এদের প্রয়োজন না হলেও এদের জন্যও অন্ন-সংস্থানের দরকার হয়। তাই এদেরও ভাগ থাকে উৎপন্ন ফসলে। বলা বাহুল্য এই ভাগ বা অংশ যৎসামান্য। জীবনধারণের ন্যূনতম প্রয়োজনটা এতে কোনরূপে মেটে। শহরাঞ্চলের শিল্পক্ষেত্রে যদি এর সামান্য অধিক মজুরি মেলে তাহলে সেখানেই তারা শ্রম প্রদান করবে।

সুতরাং লুইসের তত্ত্ব অনুযায়ী জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় সর্বনিম্ন মজুরি অপেক্ষা কিঞ্চিদধিক মজুরিতে শিল্পক্ষেত্রে শ্রমের যোগান-রেখাটি হবে অনুভূমিক। এই রেখা এই ইঙ্গিত দেয় যে একটি স্থিতিশীল মজুরীতে পর্যাপ্ত পরিমাণে শ্রমিক পাওয়া যাবে এবং শিল্পক্ষেত্রে অধিক শ্রমিক নিয়োগের জন্য অধিক মজুরি প্রদান করার প্রয়োজন হবে না। এই অবস্থায় লেখাচিত্রের সাহায্যে লুইস মডেলে দেখানো হয় যে শ্রম-নিয়োগ থেকে শিল্পপতি উদ্বৃত্ত অর্জন করবে এবং এই উদ্বৃত্তকে তারা উদ্যোগী পুনর্লগ্নী করবে। এর ফলে মূলধনের পরিমাণ বাড়বে এবং বর্দ্ধিত মূলধন শ্রমিকের প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা বাড়াবে। ফলতঃ শ্রমের নিয়োগ আরও বৃদ্ধি পাবে এবং আরও অধিক উদ্বৃত্ত অর্জিত হবে। এই উদ্বৃত্ত পুনর্লগ্নী হওয়ার ফলে মূলধনের আরও বৃদ্ধি ঘটবে, শ্রমিকের উৎপাদনশীলতা

আরও অধিক হবে, আরও অধিক শ্রমিক নিযুক্ত হবে, শিল্পপতির উদ্বৃত্ত আরও বৃদ্ধি পাবে এবং এই উদ্বৃত্তের পুনর্লগ্নী নতুন করে আর্থিক সম্প্রসারণ ঘটাবে। যতক্ষণ পর্যন্ত শিল্পক্ষেত্রে শ্রমের যোগান অফুরান হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত এই প্রক্রিয়া অবাধে চলবে।

তবে এই প্রক্রিয়া কয়েকটি বাধার সম্মুখীন হতে পারে। কৃষিক্ষেত্র থেকে আগত শ্রমের যোগান আর অফুরান থাকবে না, তখন তো অগ্রগতির পথ রুদ্ধ হবেই। কিন্তু শ্রমের যোগান যদি নিঃশেষ না-ও হয়, তবু অন্য কারণের জন্য অর্থনৈতিক সম্প্রসারণ বিঘ্নিত হতে পারে। উদাহরণ-স্বরূপ দু'টি কারণ উল্লেখ করা হল—

(ক) কৃষিক্ষেত্রে শ্রমিকের সংখ্যা হ্রাস পেলে কৃষি উৎপাদনে ভাগ বসায় এরূপ মানুষের সংখ্যা কম হবে এবং সেখানে গড় উৎপাদনের পরিমাণ বাড়বে। ফলে ওখান থেকে শিল্পক্ষেত্রে শ্রমিককে আকর্ষণ করতে হলে ঐ বর্ধিত উৎপাদনের তুলনায় অধিক মজুরি দিতে হবে। এর অর্থ, শিল্পক্ষেত্রে উদ্বৃত্তের পরিমান কমবে।

(খ) শিল্পে স্থানান্তরিত শ্রমিক শিল্পপতির জীবনযাত্রা প্রণালী অনুকরণে উৎসুক হতে পারে এবং অধিক মজুরি দাবী করে আন্দোলন করতে পারে। এর পরিণাম হিসাবে শিল্পে প্রদত্ত মজুরি বাড়তে পারে এবং উদ্বৃত্তের পরিমাণ তথা মূলধন গঠন সঙ্কুচিত হয়ে অগ্রগতি রোধ করতে পারে।

সমালোচনা :

কয়েকটি দিক থেকে লুইস মডেল সমালোচিত হয়েছে। যেমন—

- যে শ্রমিক কৃষিক্ষেত্র থেকে শিল্পের ক্ষেত্রে স্থানান্তরিত হবে, তা দক্ষতাহীন শ্রমিক। সে ধরনের শ্রমিকের শিল্পে নিযুক্তি কতখানি ফলপ্রসূ হবে? লুইস বলেছেন এ সমস্যা সাময়িক। প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা দ্বারা এ অসুবিধা দূর করা সম্ভব। কিন্তু প্রশিক্ষণের একটা ব্যয় আছে। তাছাড়া, বহু অনুন্নত অর্থনীতির অভিজ্ঞতা হল, দক্ষ শ্রমিকে রূপান্তরকরণ (Skill Formation) ব্যাপারটি অত সোজা নয়।
- লুইস ধরে নিয়েছেন যে অফুরান শ্রমশক্তিকে কাজে লাগানোর মত শিল্পপতি বা উদ্যোগী এইসব দেশে বর্তমান। কিন্তু ঘটনা হল, অনুন্নত দেশে পর্যাপ্ত সংখ্যায় এরূপ শিল্পপতির অভাব আছে।

লুইস ভেবে নিয়েছেন শিল্পক্ষেত্রে প্রস্তুত দ্রব্য সবই বিক্রী হয়ে যাবে। কিন্তু তা না-ও হতে পারে। শিল্পপতিরা নিজেরাই শিল্পজাত দ্রব্য সবটা ক্রয় করে নেবে-এরকম ভাবা যুক্তিযুক্ত নয়। অথবা বিদেশে এসব দ্রব্যের বাজার পাওয়া যাবে, তারও কোন নিশ্চয়তা নেই। আর দেশের অভ্যন্তরে কৃষিক্ষেত্রে যদি এসব জিনিস বিক্রি করতে হয় তাহলে কৃষিক্ষেত্রের উৎপাদনশীলতা বাড়াতে হয়। কৃষিক্ষেত্রে উৎপাদনশীলতা বাড়লে শিল্পক্ষেত্রে মজুরি বাড়বে। ফলে শিল্পে উদ্বৃত্ত সঙ্কুচিত হবে এবং শিল্পের সম্প্রসারণ ব্যাহত হবে। এইভাবে চাহিদার সঙ্কট লুইস-বর্ণিত অগ্রগতির প্রক্রিয়াকে বিপাকে ফেলতে পারে।

গুরুত্ব :

এসব সমালোচনা সত্ত্বেও লুইস মডেলের গুরুত্বকে অস্বীকার করা যায় না। একটি জনবহুল অনুন্নত দেশে কি ভাবে মূলধন গঠন করে অর্থনৈতিক অগ্রগতি সম্ভব লুইস মডেল তার সুন্দর বিশ্লেষণ করেছে। উন্নয়নের জন্য বিনিয়োগের অনুপাত যে ক্রমাগত বৃদ্ধি করা দরকার-এই প্রয়োজনীয় বিষয়টির দিকে লুইসের তত্ত্ব সুন্দরভাবে আলোকপাত করেছে।

২.৬ লাইবেনস্টাইন-এর 'একান্ত সর্বনিম্ন প্রচেষ্টা' (Critical Minimum Effort) তত্ত্ব

১৯৫৭ সালে হার্বি লাইবেনস্টাইন তাঁর একান্ত সর্বনিম্ন প্রচেষ্টা তত্ত্ব প্রকাশ করেন। এই তত্ত্বে লাইবেনস্টাইন দেখালেন যে, উন্নয়নের জন্য উদ্যোগ বা প্রচেষ্টা যদি একান্ত ন্যূনতম প্রয়োজনের অধিক হয়, তাহলে যে প্রক্রিয়া শুরু হবে তার ফলে অর্থনীতি এক ধারাবাহিক প্রসারণের পথে এগিয়ে যাবে। উদ্যোগ বা প্রচেষ্টা ন্যূনতম প্রয়োজনের অধিক হওয়ার অর্থ হল বিনিয়োগের পরিমাণ বাড়লে কেবল যে আয় বা সঞ্চয় বাড়বে তাই নয়, উৎপাদন বাড়বে এবং উৎপাদনবৃদ্ধির সাথে সাথে শ্রমবিভাগ বা বিশেষায়ন বৃদ্ধি পাবে। দক্ষতা বাড়বে। মূলধন-উৎপন্নের অনুপাত কমবে। শিল্পক্ষেত্রে ও সেবাক্ষেত্রের বিকাশ ঘটবে। সামাজিক চলনশীলতা (Social mobility) বাড়বে। পরিবর্তন মেনে নেওয়ার মানসিকতা জন্ম নেবে। রক্ষণশীল মনোভাব অপসৃত হতে থাকবে। অগ্রগতির এই পর্যায়ে জন্মহার হ্রাস পাবে এবং জনসংখ্যাবৃদ্ধির হারও কমে আসবে। যে সব সামাজিক ও প্রাতিষ্ঠানিক মূল্যবোধ অনড় ও রক্ষণশীল সমাজের অবলম্বন, সেগুলির শিকড় আলগা হতে থাকবে। বাজার মানসিকতা কাজ করতে শুরু করবে। অর্থ রোজগারে মানুষ উৎসাহ পাবে। উদ্যোগে ঝুঁকি নেওয়া, নতুন কৃৎকৌশলকে প্রয়োগ করা, শিল্পে দৈহিক শক্তির কর্মতেও আগ্রহ দেখানো-এইসব প্রবণতাগুলি সমাজে বিকশিত হতে থাকবে। এইভাবে উন্নয়নের সাহায্যকারী যে আর্থিক, সামাজিক, প্রাতিষ্ঠানিক বা সাংস্কৃতিক বাতাবরণ সৃষ্টি হবে, তার ফলে উন্নয়ন প্রক্রিয়া ক্রমপ্রসারণশীল হয়ে উঠবে। এই অবস্থা সৃষ্টির মূলে হল ন্যূনতম পরিমাণের একান্ত প্রয়োজনীয় বিনিয়োগ। সম্প্রসারণশীল অর্থনীতির সুফল লাভের জন্য এটাই শর্ত।

অন্যদিকে, বিনিয়োগের পরিমাণ যদি একটি ন্যূনতম নির্দিষ্ট পরিমাণের কম হয়, তাহলে উন্নয়নের বিরোধী বা উন্নয়নে বাধা প্রদান করে এরূপ শক্তিগুলি অধিকতর সক্রিয় হয়ে উঠবে। যেমন, সেক্ষেত্রে একক প্রতি উৎপন্নের জন্য মূলধনের পরিমাণ (বা মূলধন-উৎপন্ন অনুপাত) বেশি হতে পারে। আবার, জনসংখ্যা বৃদ্ধিও এক প্রতিকূল শক্তি হিসাবে কাজ করতে পারে। অথবা, উপার্জন বা সম্পদকে মূলধন-গঠনে নিয়োজিত না করে তাকে দৃষ্টিগ্রাহ্য ভোগ্যব্যয়ে (conspicuous expenditure) নিঃশেষ করার প্রবণতা অধিক হতে পারে, ইত্যাদি। উন্নয়নের প্রতিকূল এই পরিস্থিতি ঠেকাতে গেলে বিনিয়োগের পরিমাণকে একটি ন্যূনতম পরিমাণের অধিক করতে হবে। একমাত্র এইভাবেই উন্নয়নের সহায়তাকারী শক্তিগুলিকে উন্নয়ন বিরোধীশক্তিগুলির তুলনায় বেশি কার্যকরী করে অর্থনৈতিক সম্প্রসারণ সম্ভব।

সমালোচনা :

লাইবেনস্টাইন তত্ত্বটি ত্রুটিমুক্ত নয় বলে অনেকে অভিমত প্রকাশ করেছেন। যেমন, বলা হয়েছে যে, বিনিয়োগবৃদ্ধি ও উপাদনবৃদ্ধির সম্পর্কটি খুব সহজ নয় এবং এই সম্পর্কটি কেবলমাত্র মূলধন-উৎপাদন অনুপাত অনুযায়ী নির্ধারিত হয় না। উৎপাদন নামক ঘটনাটি কতখানি দক্ষতার সঙ্গে সংগঠিত হচ্ছে এটিও একটি অন্যতম নির্ণায়ক। উন্নয়নে বৈদেশিক সাহায্য বা আন্তর্জাতিক প্রভাবের বিষয়টিও লাইবেনস্টাইন তত্ত্বে স্থান পায়নি। তাছাড়া, মিন্টের মতে, ন্যূনতম বিনিয়োগ কিছু সময়ের জন্য আয়বৃদ্ধি ঘটালেও পরবর্তীকালে আয়বৃদ্ধির হার মন্থর হতে পারে। অর্থাৎ একবারমাত্র ন্যূনতম বিনিয়োগের আয়োজন ঘটালেই যে বিরামহীন সম্প্রসারণ ঘটবে এরূপ নাও হতে পারে।

তবে এসব সমালোচনা সত্ত্বেও লাইবেনস্টাইন তত্ত্বের গুরুত্বকে অস্বীকার করা যাবে না। আর্থিক উন্নয়ন এরূপ হওয়া উচিত যেন মাথাপিছু আয়বৃদ্ধি জনসংখ্যাবৃদ্ধির হারকে ছাড়িয়ে যায়। এইরূপ যদি লক্ষ্য হয় তাহলে একটা ন্যূনতম পরিমাণ বিনিয়োগ অবশ্যই প্রয়োজন। একথা সকলেই মানেন।

২.৭ জোর ধাক্কা তত্ত্ব (Theory of Big Push)

জোর ধাক্কা তত্ত্বের প্রবক্তা হলেন পি. এস. রোজেনস্টাইন রোডান। এই তত্ত্বের বক্তব্য হল : অল্প-অল্প বিনিয়োগ করে মন্থর গতিতে উন্নয়ন প্রচেষ্টা ফলপ্রসূ হয় না। প্রাথমিক বিনিয়োগ প্রচেষ্টা বড়মাত্রার হওয়া প্রয়োজন। অনুন্নত, অনড় অর্থনীতি তার ধাক্কাতেই গতিশীল হয়ে উঠবে এবং উন্নয়নের পথে চলতে থাকবে।

জোর ধাক্কার প্রয়োজনীয়তা কেন তার উত্তরে বলা হয় যে উন্নয়নের জন্য দরকার সামাজিক স্থির মূলধন সৃষ্টি। বিদ্যুৎ, পরিবহন, যোগাযোগ ইত্যাদি হল সামাজিক স্থির মূলধন। এইসব সামাজিক স্থির মূলধন গঠিত না হলে কোন দেশই উন্নতির পথে এগোতে পারবে না। এখন এগুলি খণ্ড খণ্ড করে গড়ে তোলা যায় না। একবার শুরু করে শেষ না করা পর্যন্ত এগুলির সুফল লাভ করা যায় না। স্বাভাবিকভাবেই এসব মূলধন গঠন করতে হলে বড় মাপের বিনিয়োগ দরকার। সামাজিক স্থির মূলধনের এরূপ চরিত্র বৈশিষ্ট্যের কারণে উন্নয়নের প্রারম্ভিক পর্যায়েই দরকার হয় বৃহদায়তন প্রকল্প।

তাছাড়া আরও একটি কারণ আছে। সম্প্রসারণশীল বাজার অর্থনৈতিক উন্নয়নের অন্যতম শর্ত। বাজার বা চাহিদা ছোট আয়তনের হলে উৎপাদিত দ্রব্য বিক্রি হবে না। তাহলে বিনিয়োগ বা শিল্পোদ্যোগ ব্যাহত হবে। অল্প বিনিয়োগের সাহায্যে একটিমাত্র উৎপাদন-প্রতিষ্ঠান স্থাপনের উদ্যোগ নিলে সে প্রচেষ্টা ফলপ্রসূ হবে না। তার কারণ সে ক্ষেত্রে ঐ উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানের বাজার সীমিত থাকবে। সেজন্য একসঙ্গে একাধিক উৎপাদন প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা প্রয়োজন। তাহলে বিভিন্ন উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানে নিযুক্ত কর্মীরা একে অপরের উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানে উৎপাদিত দ্রব্যাদি ক্রয় করবে। ফলে প্রতিটি উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানই নিজ দ্রব্যের প্রয়োজনীয় বাজার খুঁজে পাবে এবং এভাবে উন্নয়নের পথে সীমিত বাজারের প্রতিবন্ধকতা অপসারিত হবে। আর এভাবে একসঙ্গে একাধিক উৎপাদন-প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার জন্য প্রয়োজন হবে বৃহৎ মাপের বিনিয়োগ, অর্থাৎ প্রয়োজন জোর ধাক্কা।

সমালোচনা :

রোজেনস্টাইন-রোডানের উপরোক্ত তত্ত্বের বিরুদ্ধে সমালোচনাগুলি হল :

১. এই তত্ত্বে গোড়াতেই বিপুল পরিমাণ বিনিয়োগ নিয়োগের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু একটি অনুন্নত অর্থনীতি কোথা থেকে এই পরিমাণ বিনিয়োগের সংগ্রহ করবে, এই তত্ত্বে তার হদিশ নেই।

২. যথেষ্ট পরিমাণ বিনিয়োগ সংগ্রহ করলেই যে একটি অনুন্নত অর্থনীতিতে উন্নয়ন ঘটবে এমন কথা নয়। অনুন্নত অর্থনীতির অন্যান্য অসুবিধাও আছে। যেমন এখানে কারিগরি জ্ঞান নিম্নস্তরের; দক্ষ ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মী যথেষ্ট সংখ্যায় পাওয়া যায় না; সামাজিক-প্রতিষ্ঠানগত সাংস্কৃতিক প্রতিবন্ধকতাও বর্তমান। এই পরিস্থিতিতে একাধিক উন্নয়ন-প্রকল্পকে বাস্তবায়িত করা এসব দেশে সহজসাধ্য নয়।

৩. এই তত্ত্ব একসঙ্গে একাধিক শিল্প-প্রকল্প গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেয়। কিন্তু কৃষি-উন্নয়নের দিকটি এই তত্ত্বে অবহেলিত। অথচ কৃষিকে পশ্চাৎপদ রেখে শিল্প-উন্নয়নের প্রচেষ্টা সফল হবে না।

এইসব সমালোচনার যাথার্থ্য অস্বীকার করা যায় না। তথাপি এটা মানতে হয় যে রোডানের তত্ত্ব উন্নয়নের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে পাদপ্রদীপের আলোয় নিয়ে এসেছে। বিষয়টি হল এই যে, প্রাথমিকভাবে বিরাট এক উদ্যোগ ছাড়া আশানুরূপ শিল্পায়ন ঘটবে না। এই বক্তব্যের সঙ্গে অনেকেই একমত।

২.৮ নেলসন তত্ত্ব-স্বল্প আয়ের ভারসাম্য ফাঁদ (Low Level Equilibrium Trap)

১৯৫৬ সালে রিচার্ড আর. নেলসন তাঁর স্বল্প আয়ের ভারসাম্য ফাঁদ তত্ত্ব প্রচার করেন। এই তত্ত্বটির সাথে পূর্বে বর্ণিত লাইবেনস্টাইনের একান্ত প্রয়োজনীয় নিম্নতম প্রচেষ্টা তত্ত্বের এই জায়গায় মিল যে উভয় তত্ত্বেই উন্নয়নের জন্য একটা নিম্নতম পরিমাণ বিনিয়োগের প্রয়োজনীয়তার কথা বলা হয়েছে।

নেলসন-তত্ত্বে দেখানো হয়েছে যে অনুন্নত দেশে মাথাপিছু আয় খুবই নিম্নস্তরের। এই স্তরে মানুষ কায়ক্লেশে কোনক্রমে জীবনযাপন করে। তাছাড়া মাথাপিছু আয়ের এই নিম্নস্তরে আটকে পড়ে থাকার এক প্রবণতা দেখা দেয় এইসব দেশে। এ এক অনড়, স্থিতিশীল অবস্থা। ভারসাম্যসূচক এই অবস্থার পরিবর্তন ঘটানো সহজসাধ্য নয়। উন্নয়ন প্রচেষ্টা এখানে প্রতিকূলতার সম্মুখীন হয়। জনস্ফীতি নামক সমস্যাটিই হল এখানে প্রধান প্রতিবন্ধক। জাতীয় আয় বৃদ্ধির প্রচেষ্টা এসব দেশে ফলপ্রসূ হওয়ার সম্ভাবনা ক্ষীণ। কেননা জাতীয় আয় (Y) তথা উন্নয়ন বৃদ্ধি পেতে থাকলে এসব দেশে মৃত্যুহার দ্রুত কমতে থাকে। জন্মহারও কিছুটা হ্রাস পায়, কিন্তু মৃত্যুহার অধিকতর দ্রুত হ্রাস পায়। ফলে উন্নয়নের প্রারম্ভিক পর্যায়ে আয়বৃদ্ধির সাথে সাথে জনসংখ্যাও (P) বৃদ্ধি পেতে থাকে। 'P' এর দ্রুত বৃদ্ধির ফলে Y/P বা মাথাপিছু আয় হ্রাস পেতে থাকে এবং পরিণামে স্বল্প আয়ের ভারসাম্য স্তরে নেমে আসে। বৃহৎ প্রচেষ্টার মাধ্যমে মূলধন গঠন বা বিনিয়োগ যথেষ্ট বর্ধিত করে আয় বৃদ্ধির হারকে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার অপেক্ষা অধিকতর করতে সক্ষম হলে পরই মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি পাবে। এরূপ অবস্থায় স্বল্পোন্নত দেশের পক্ষে স্বল্প আয়-বিশিষ্ট ভারসাম্য-ফাঁদ থেকে বেরিয়ে আসা সম্ভব হবে।

এই ফাঁদ অতিক্রম করার উদ্দেশ্যে নেলসন কতকগুলি সুপারিশ করেছেন যেমন, (ক) পরিবারের আয়তন সীমিত করার জন্য জনসাধারণকে উৎসাহিত করা প্রয়োজন। (খ) সমাজের মধ্যে মিতব্যয়িতার আকর্ষণ বাড়ানো দরকার। তাহলে সঞ্চয় এবং অধিক মূলধন গঠন সম্ভব হবে। (গ) সরকার পরিকল্পনার মাধ্যমে বিনিয়োগ বৃদ্ধি করতে পারেন। (ঘ) বৈদেশিক মূলধন সংগ্রহের মাধ্যমেও বিনিয়োগ বৃদ্ধি সম্ভব। (ঙ) প্রযুক্তির উন্নয়ন ঘটিয়ে দেশের সম্পদ ব্যবহারে দক্ষতা এনে আয়বৃদ্ধি করা যেতে পারে, ইত্যাদি। এসব ব্যবস্থার ফলে অনুন্নতির ফাঁদ অতিক্রম করা সম্ভব হবে।

সমালোচনা :

ঐতিহাসিক তথ্য নেলসনের বক্তব্যকে সমর্থন করে না বলে অনেক পর্যবেক্ষক মত প্রকাশ করেছেন। যেমন, অধ্যাপক হ্যাগেন দেখিয়েছেন যে, আয়বৃদ্ধির পরিণামে জনসংখ্যাবৃদ্ধি সত্ত্বেও পশ্চিম ইউরোপে মাথাপিছু আয় উল্লেখযোগ্য হারে অগ্রগতি করেছে। স্বল্পোন্নত দেশের ক্ষেত্রেও সব সময় এরূপ পরিলক্ষিত হয়নি যে মাথাপিছু আয় খুব কম হলে জনসংখ্যাবৃদ্ধির হার অপেক্ষা মোট উৎপাদনবৃদ্ধির হার কম হয়। অর্থাৎ পরিসংখ্যানগত তথ্য নেলসন তত্ত্বের বিপরীত বলে কেউ কেউ মনে করেন। তবুও এ কথা মানতে হবে যে উন্নয়ন প্রসঙ্গে জনসংখ্যাবৃদ্ধি রোধের প্রয়োজনীয়তার দিকে নেলসন মডেল যে গুরুত্ব আরোপ করেছে তা যথার্থ।

২.৯ সুষম (balanced) বনাম অসম (unbalanced) উন্নয়ন তত্ত্ব

উন্নয়ন কৌশল কেমন হবে— সুষম (balanced) না অসম (unbalanced)-এ নিয়ে অর্থনীতিবিদদের মধ্যে মতপার্থক্য আছে। আমরা নীচে তত্ত্বদুটি সংক্ষেপে আলোচনা করছি।

সুষম উন্নয়ন তত্ত্বে এমন এক উন্নয়নের ধারা বা বিনিয়োগের ধাঁচের কথা বলা হয়েছে যাতে অর্থনীতিতে ক্ষেত্রীয় ভারসাম্য বজায় থাকে। যেমন, এই তত্ত্ব অনুযায়ী উন্নয়ন কৌশল এরূপ হওয়া উচিত যাতে বিভিন্ন শিল্প

সমূহের সুসামঞ্জস্য বিকাশ হয়। বিভিন্ন ধরনের অনেকগুলি শিল্প গড়ে তুললে সব শিল্পগুলি সব শিল্পের চাহিদা বৃদ্ধি করবে এবং বাজারের আয়তন বড় হবে। অর্থাৎ বিভিন্ন শিল্পের মধ্যে পরিপূরকতা বা নির্ভরশীলতার সম্পর্ক বর্তমান এবং এ-কারণে একাধিক শিল্প স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। কেবল যে বিভিন্ন শিল্পের মধ্যে পরিপূরকতার সম্পর্ক রয়েছে তা-ই নয়। কৃষি এবং ভোগ্যশিল্প ও মূলধনীদ্রব্যশিল্পের মধ্যেও পরিপূরকতার সম্পর্ক রয়েছে। সুষম উন্নয়ন তত্ত্বে এইসব ক্ষেত্রেরও উপর জোর দেওয়া হয়।

রোজেনস্টাইন, রোডান, রাগনার নার্কস, ডবলিউ. এ. লুইস প্রভৃতি অর্থনীতিবিদ সুষম উন্নয়ন তত্ত্বের প্রবক্তা।

অন্যদিকে, অসম উন্নয়ন তত্ত্বের প্রধান প্রবক্তা হলেন অ্যালবার্ট হার্শম্যান। হার্শম্যানের মতে, অনুন্নত দেশের পক্ষে উন্নয়ন কৌশল হিসাবে সুষম উন্নয়ন তথা ক্ষেত্রীয় ভারসাম্যের নীতি গ্রহণ না করে উচিত হবে অসম উন্নয়ন বা ইচ্ছাকৃত ভারসাম্যহীনতার পথ গ্রহণ করা। যেমন, সামাজিক স্থায়ী মূলধন ও প্রত্যক্ষ উৎপাদনশীল কার্য-অর্থনীতির এই দুটি ক্ষেত্রকে যুগপৎ উন্নত করার প্রচেষ্টা থেকে বিরত হয়ে যে-কোন একটি ক্ষেত্রকে বেছে নিতে হবে। ধরা যাক, সামাজিক মূলধনের ক্ষেত্রে বিনিয়োগ বৃদ্ধি করা হল। এর ফলে উৎপাদনে প্রয়োজনীয় কিছু সেবা (service) বা উপকরণ (input)-এর যোগান বৃদ্ধি পেল। এই ঘটনা বেসরকারি বিনিয়োগ বৃদ্ধিতে প্রণোদন যোগাবে। বেসরকারি উদ্যোক্তারা যে অতিরিক্ত সামাজিক মূলধন সৃষ্ট হল তার ব্যবহারে উৎসাহিত বোধ করবে। পরিণামে প্রত্যক্ষ উৎপাদনশীল কাজকর্ম নামক ক্ষেত্রটি উন্নত হবে এবং সামগ্রিকভাবে দেশ উন্নয়নের পথে অগ্রসর হবে।

তত্ত্ব দুটির কোনটিই সম্পূর্ণ ত্রুটিমুক্ত নয়। সুষম উন্নয়ন ধারা অনুসরণ করার অসুবিধা হল এই যে, এক সঙ্গে নানাবিধ ক্ষেত্রের উন্নয়ন করার মত সঙ্গতি বা সামর্থ্য অনুন্নত দেশগুলির নেই। এর জন্য যে পরিমাণ বিনিয়োগ, সামাজিক পরিকাঠামো, প্রযুক্তি, উপযুক্ত উদ্যোক্তা ও দক্ষ শ্রমিকের প্রয়োজন, সেসবের একান্ত অভাব দেখা দেয় এসব দেশে। আবার যদি অসম উন্নয়ন ধারা অবলম্বন করে ক্ষেত্রগত ভারসাম্যহীনতার পথে আমরা অগ্রসর হই, তাহলেও সমস্যা দেখা দেয়। যেমন যদি সামাজিক মূলধন সৃষ্টির উপর জোর দেওয়া হয়, তাহলে কিছু সুযোগ সৃষ্টি হয় এবং উদ্যোক্তারা ব্যক্তিগতভাবে কতখানি এই সুযোগের ব্যবহার করবে, দেশের অগ্রগতি তার উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। আবার যদি সামাজিক স্থির মূলধনের ক্ষেত্রটিকে উন্নত না করে প্রত্যক্ষ উৎপাদনশীল কাজকর্মে বিনিয়োগ বৃদ্ধি করা হয়, তাহলে কিছু সেবা (service) বা উপকরণের যোগানে অনটন দেখা দিতে পারে এবং এর ফলে মুদ্রাস্ফীতির সমস্যা জন্ম নিতে পারে।

উপসংহারে বলা যায়, সুষম এবং অসম উন্নয়ন তত্ত্ব দুটির বক্তব্য পরস্পরের বিপরীত প্রতীয়মান হলেও তাদের মূল অনুধারণা কিন্তু একই : অর্থনীতির বিভিন্নক্ষেত্রগুলি পরস্পরের সঙ্গে জড়িত। এক্ষেত্রে সুষম উন্নয়ন তত্ত্বের প্রতিবাদ্য হল যে কোন ক্ষেত্রকে বাদ দিয়ে বিচ্ছিন্নভাবে উন্নয়ন সম্ভব নয়। তাই সবগুলো ক্ষেত্রেরই একই সাথে উন্নয়ন করা দরকার। আর অসম উন্নয়ন তত্ত্বের বক্তব্য হল যে একটির উন্নতি হলে তারই টানে অন্য ক্ষেত্রগুলিতে আপনাআপনি উন্নয়ন হতে থাকবে।

ইতিহাস থেকে এ দুটি তত্ত্বের কোনটি ঠিক তার কোন পরিষ্কার উত্তর পাওয়া যায় না। ইংল্যান্ড প্রমুখ দেশগুলি সুষম উন্নয়নের পথে উন্নতিসাধান করেছে। আবার অসম উন্নয়নের পথে সোভিয়েট রাশিয়ার সাফল্যও অনস্বীকার্য। তবে একথা মনে রাখা দরকার যে অসম উন্নয়নের পথে এগোনোর দরুন দেশের অর্থনীতিতে যে চাপের সৃষ্টি হয় তার মোকাবিলা করার মতো শক্তিশালী সরকার না থাকলে এ পথে না যাওয়াই যুক্তিযুক্ত। তাছাড়া, অসম উন্নয়নের পথ ধরে উন্নয়নের প্রচেষ্টা শুরু করলেও মনে রাখতে হবে এরূপ প্রচেষ্টা একটা পর্যায় মাত্র। শেষ লক্ষ্য হল সুষম উৎপাদন-অবস্থায় পৌঁছনো বা ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা করা।

২.১০ অনুশীলনী

ক। অ্যাডাম স্মিথ এবং রিকার্ডোর উন্নয়ন তত্ত্বের সার কথাগুলি কী? উভয় তত্ত্বের মধ্যে পার্থক্যগুলি কী কী?

খ। অর্থনৈতিক উন্নয়নের লুইস মডেলটি ব্যাখ্যা কর।

গ। একান্ত সর্বনিম্ন প্রচেষ্টা তত্ত্বটি ব্যাখ্যা কর এবং তার শক্তি ও দুর্বলতার দিকগুলি উল্লেখ কর।

একক ৩ □ ভারতীয় অর্থনীতির কয়েকটি দিক (Different aspects of Indian economy)

গঠন

৩.১ জাতীয় আয় (National Income)

৩.২ জনসংখ্যা (Population)

৩.৩ দারিদ্র্য (Poverty)

৩.৪ কর্মহীনতা বা বেকারি (Unemployment)

৩.৫ নিরক্ষরতা (Illiteracy)

৩.৬ অনুশীলনী

৩.১ জাতীয় আয়

প্রাক্-স্বাধীনতাকালে ভারতবর্ষে জাতীয় আয়ের তেমন বৃদ্ধি ঘটেনি। বলা যায় যে, এ সময়ে জাতীয় আয় বৃদ্ধির ক্ষেত্রে প্রায় এক বন্ধাবস্থা বিরাজ করছিল। একটা হিসাব অনুযায়ী স্বাধীনতার পূর্বে এক দীর্ঘ সময় ধরে আট দশক জুড়ে— জাতীয় আয় বৃদ্ধির হার ছিল মোটে ০.৫%।*

স্বাধীন ভারতে পরিকল্পনা গৃহীত হওয়ার পর নিঃসন্দেহে অবস্থার পরিবর্তন হয়। তবুও প্রথম দিকের অগ্রগতি উল্লেখযোগ্য নয়। পরিকল্পনার প্রথম তিরিশ বছরের চিত্রটি হতাশাব্যঞ্জক। দশকওয়ারি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় পঞ্চাশের দশকে নীট জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধির যে হার ছিল, ষাটের দশকে তা হ্রাস পেয়েছে (৩.৮% থেকে ৩.৫%) এবং সত্তরের দশকেও এই নিম্নমুখী প্রবণতা অক্ষুণ্ণ থেকেছে। [সত্তরের দশকে জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধির হার ছিল মাত্র ৩.০%।] সামগ্রিকভাবে পরিকল্পনার তিরিশ বছরে (১৯৫০-৫১ থেকে ১৯৮০-৮১ -এই সময়ে) নীট জাতীয় উৎপাদনবৃদ্ধির হার ছিল মাত্র ৩.৪%।

জাতীয় উৎপাদনবৃদ্ধির হারে দৃষ্টিগ্রাহ্য পরিবর্তন দেখা দেয় আশির দশকে। এই দশকে নীট জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধির হার ৫% সীমাকে অতিক্রম করে। নব্বুই-এর দশকেও বৃদ্ধির হার ৫% এর উপর থাকে। এই অবস্থায় আশি আর নব্বুই দশক মিলিয়ে, অর্থাৎ ১৯৮০-৮১ থেকে ২০০০-১০০১ এই সময়ে, নীট জাতীয় উৎপাদনের গড়পড়তা বার্ষিক বৃদ্ধির হার দাঁড়ায় ৫.৫%।

সাম্প্রতিককালে এসে লক্ষ্য করা যায় যে নবম পরিকল্পনার সময় (১৯৯৭-২০০২ সময়ে) জাতীয় আয় বৃদ্ধি ঘটেছিল ৫.৩৫% হারে; তবে এই বৃদ্ধি স্থিরীকৃত লক্ষ্যমাত্রার (৬.৫%) চেয়ে কম ছিল।

২০০২-০৬ সালে যে দশম পরিকল্পনা শুরু হয়েছে, তাতে জাতীয় আয় বৃদ্ধির লক্ষ্য ধরা হয়েছে ৮%। তবে এই পরিকল্পনায় বাৎসরিক গড় জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধির হার ৭% অতিক্রম করবে কিনা সে বিষয়ে বিশেষজ্ঞগণ সন্দেহ প্রকাশ করেছেন।

অতঃপর মাথাপিছু জাতীয় আয় বৃদ্ধির বিষয়টি দেখা যাক। এক্ষেত্রে লক্ষ্য করা যায় যে, পরিকল্পনার প্রথম তিরিশ বছরে, ১৯৫০-৫১ থেকে ১৯৮০-৮১ পর্যন্ত সময়ে, মাথা পিছু জাতীয় আয় বৃদ্ধির হার ছিল ১.২%। স্বল্প আয়বৃদ্ধির এই হার, যাকে অধ্যাপক রাজকৃষ্ণ 'হিন্দু আয়বৃদ্ধির হার' বলে অভিহিত করেছেন, তা, অতিক্রম করা

* সূত্র : J. R. Hicks ও অন্যান্য, The Framework of the Indian Economy (1984) [Datt & Sundharam, Indian Economy (2005), পৃষ্ঠা ৩১ এ উদ্ধৃত।]

সম্ভব হয় আশির দশকে এসে। আশির দশকে মাথাপিছু আয়বৃদ্ধি ঘটে ৩.২ হারে। নব্বুই-এর দশকেও এই বৃদ্ধির হার তিনের উর্ধ্বেই থাকে এবং সামগ্রিকভাবে ১৯৮০-৮১ থেকে ২০০০-০১ সালের সময়সীমায় মাথাপিছু জাতীয় আয় বৃদ্ধি ঘটে ৩.৩ হারে।

পরিকল্পনাধীন সময়ে জাতীয় আয় ও মাথাপিছু আয়ের গতিপ্রকৃতির কিছু বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়

প্রথমত, পরিকল্পনাধীন সময়ে জাতীয় আয় ও মাথাপিছু আয় ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু জনসংখ্যাবৃদ্ধির দরুন-মাথাপিছু আয়ের বৃদ্ধি অনেক কম হয়েছে। সেইজন্য এক্ষেত্রে ধার্য লক্ষ্যমাত্রায় অনেক সময়ই পৌঁছান যায়নি।

দ্বিতীয়ত, জাতীয় তথা মাথাপিছু আয়ের গতি সুষম বা সুস্থির নয়, বরং বার বার ওঠা নামা করেছে। দীর্ঘ পাঁচ দশকের পরিকল্পনার মধ্যে অনেক বছরেই আগের তুলনায় কম হয়েছে কিংবা জনসংখ্যাবৃদ্ধির চেয়ে কম হয়েছে। মাথাপিছু আয়ের ক্ষেত্রেও এরকম ঘটেছে। এই ওঠানামার প্রধান কারণ হল কৃষি উৎপাদনের ওঠা নামা যা কিনা আজও অনেকাংশেই ভাল বৃষ্টিপাতের উপর নির্ভরশীল।

তৃতীয়ত, আগের দশকগুলির তুলনায় বিগত দুই দশকে জাতীয় ও মাথাপিছু আয়ের বৃদ্ধির হার ক্রমশঃ বাড়ছে।

চতুর্থত, জাতীয় আয়ের বন্টনে এখনও গভীর বৈষম্য বর্তমান।

পরিকল্পনাকালে জাতীয় আয়ের ক্ষেত্রগত বন্টনে যথেষ্ট পরিবর্তন হয়েছে। এই ক্ষেত্রগত বন্টন বলতে বোঝায় জাতীয় আয়ে অর্থনীতির বিভিন্ন ক্ষেত্রগুলির অবদান কত। এই জাতীয় অর্থনীতিকে প্রধানত তিনটি ক্ষেত্রে ভাগ করা হয় :

(ক) প্রাথমিক ক্ষেত্র (কৃষি, পশুপালন, মৎস্যচাষ, খনিজদ্রব্য উত্তোলন প্রভৃতি নিয়ে গঠিত)

(খ) মাধ্যমিক ক্ষেত্র (উৎপাদন শিল্প, নির্মাণ শিল্প ইত্যাদি এর অন্তর্গত)

(গ) ত্রৈত্রিক (Tertiary) ক্ষেত্র (যার মধ্যে পড়ে পরিবহণ, যোগাযোগ, ব্যাঙ্কিং ও অন্যান্য পরিষেবামূলক কার্যাদি)।

জাতীয় আয়ের **ক্ষেত্রগত পরিবর্তনের আলোচনায়** এলে আমরা লক্ষ্য করি যে, ১৯৫০-৫১ সালে আমাদের জাতীয় আয়ের অর্ধেকেরও বেশি আসত প্রাথমিক ক্ষেত্র (মূলত কৃষিক্ষেত্র) থেকে। ২০০১-০২ সালে দেখা যাচ্ছে, সমগ্র জাতীয় আয়ে প্রাথমিক ক্ষেত্রের অবদান এক-চতুর্থাংশের কাছাকাছি (২৩.৯%)। অর্থাৎ ভারতীয় অর্থনীতিতে প্রাথমিক ক্ষেত্রের গুরুত্ব হ্রাস পাচ্ছে। অন্যদিকে, ১৯৫০-৫১ সালে মাধ্যমিক ক্ষেত্রের অবদান ছিল প্রায় ১৫%; ২০০১-০২ সালে তা বৃদ্ধি পেয়ে এক-চতুর্থাংশের অধিক (২৬.৬%) হয়। এই সময়কালে সেবামূলক ক্ষেত্রটির অবদানও বৃদ্ধি পায়-২৮% থেকে প্রায় ৫০%। অর্থাৎ বর্তমান ভারতের জাতীয় আয়ের প্রায় অর্ধেক অংশের উৎপত্তি ঘটছে এই ক্ষেত্র থেকে। এটাও লক্ষণীয়, মাধ্যমিক (মূলত শিল্প ক্ষেত্র) এবং সেবামূলক ক্ষেত্র-যৌথভাবে এই দুটি ক্ষেত্রের অবদান তিন-চতুর্থাংশেরও অধিক।

পরিকল্পনাকালে মোট দেশীয় উৎপাদনে বিভিন্ন ক্ষেত্রের গড় অবদান (শতাংশ) :

ক্ষেত্র	১৯৫০-৫১ থেকে ১৯৫৯-৬০	১৯৬০-৬১ থেকে ১৯৬৯-৭০	১৯৭০-৭১ থেকে ১৯৭৯-৮০	১৯৮০-৮১ থেকে ১৯৮৯-৯০	১৯৯০-৯১ থেকে ২০০০-০১
প্রাথমিক	৫৬	৪৭.৮	৪২.৮	৩৬.৪	২৮.৬
মাধ্যমিক	১৬.০০	২১	২২.৮	২৫	২৭.১
ত্রৈত্রিক	২৮.২	৩১.৪	৩৪.৪	৩৮.৬	৪৪.৩

সূত্র— Uma Kapila-Indian Economy (2004 সংস্করণ)

জাতীয় আয়ের ক্ষেত্রগত বন্টনের যে চিত্র উপরে দেওয়া হল তা থেকে বলা যেতে পারে যে পরিকল্পনার সময়ে ভারতীয় অর্থনীতির কাঠামোগত পরিবর্তন ঘটেছে। পরিকল্পনার সময় সংগঠিত ক্ষেত্রে শিল্পের প্রসার ঘটেছে বলে মাধ্যমিক ক্ষেত্রটির গুরুত্ব বেড়েছে। তাছাড়া এই সময়ে যোগাযোগ ও পরিবহণ, ব্যাঙ্কিং, বীমা, প্রশাসন প্রভৃতি ক্ষেত্রের অগ্রগতি ঘটায় সামগ্রিকভাবে জাতীয় অর্থনীতিতে সেবামূলক ক্ষেত্রটির প্রাধান্যও বৃদ্ধি পেয়েছে। এইসব পরিবর্তন যে ইঙ্গিত দেয় তা হ'ল এই যে, ভারতীয় অর্থনীতির কাঠামোগত পরিবর্তন ঘটছে এবং মূলগতভাবে কৃষি অর্থনীতি না থেকে দেশ এক শিল্পভিত্তিক অর্থনীতির দিকে অগ্রসর হচ্ছে। এই অগ্রগতি অবশ্য মন্থর।

উপরোক্ত তালিকা থেকে দেখা যাচ্ছে যে এদেশে প্রাথমিক ক্ষেত্রের গুরুত্ব ক্রমাগত কমছে, কিন্তু শুরু থেকেই মাধ্যমিক ক্ষেত্রের তুলনায় ত্রৈত্রিক ক্ষেত্রে অবদান বেশি বাড়ছে। অনেকে একে 'একপেশে' (lopsided) উন্নয়ন আখ্যা দিয়েছেন। আবার অনেকের মতে এটা অর্থনৈতিক পরিকাঠামোর উন্নয়নেরই লক্ষণ।

মনে রাখা দরকার যে, আন্তর্জাতিক স্তরে তুলনা করলে আমাদের আয়বৃদ্ধির রেকর্ড তেমন আশাব্যঞ্জক নয়। অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে ভারতেরই মত যাদের অবস্থান, সেই সব দেশগুলি-যেমন চীন, দক্ষিণ কোরিয়া, থাইল্যান্ড বা মালয়েশিয়া প্রভৃতি আমাদের তুলনায় অধিক আয়বৃদ্ধি করতে সক্ষম হয়েছে। সুতরাং আমাদের আয়বৃদ্ধির হারকে আরও দ্রুততর করা দরকার। এজন্য কৃষি উন্নয়নের পাশাপাশি শিল্পায়নের কর্মসূচীকে আরও ব্যাপক করতে হবে।

৩.২ জনসংখ্যা

একথা সকলেরই জানা যে, ভারত পৃথিবীর অন্যতম জনবহুল দেশ। জনসংখ্যার দিক দিয়ে বিশ্বে প্রথম চীন; তারপরেই ভারতের স্থান। ২০০১ সালের লোকগণনা অনুযায়ী ভারতের জনসংখ্যা প্রায় ১০৩ কোটি (১০২৭ মিলিয়ন)। ভূ-পৃষ্ঠের মাত্র ২.৪ শতাংশ স্থান জুড়ে ভারতের অবস্থান; কিন্তু এই আয়তনে বসবাস করে বিশ্বের প্রায় ১৭ শতাংশ মানুষ।

ভারতে ১৯৫১ থেকে ১৯৮১ সাল পর্যন্ত— এই তিরিশ বছরে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ছিল সর্বাপেক্ষা বেশি। এই সময়ে জনসংখ্যাবৃদ্ধির হার ছিল সর্বাপেক্ষা বেশি। এই সময়ে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ছিল ২.১৫ শতাংশ। স্বাধীনতার পর ১৯৫১ সাল থেকে দেশে পরিকল্পনার সূত্রপাত হয়। এই সময় মহামারীজনিত মৃত্যুকে দমন করা হয়। স্বাস্থ্য-ব্যবস্থার প্রসার ঘটানো হয়। ফলে মৃত্যুহার দ্রুত কমতে থাকে এবং হাজারপ্রতি মৃত্যুহার ২৭থেকে ১৫ তে নেমে আসে। জন্মহার কিন্তু তেমন কমেনি ; প্রতি হাজারে জন্মহার কমে হয়েছে ৪০ থেকে মাত্র ৩৭। জন্মহার ও মৃত্যুহার হ্রাসের ক্ষেত্রে এরূপ বৈষম্যের কারণে পরিকল্পনার প্রথম তিরিশ বছরে (১৯৫১-১৯৮১ সময়সীমায়) জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার চরমে ওঠে। অনেকে একে 'শিল্প বিপ্লবে'র আগেই 'জনস্বাস্থ্য বিপ্লবে'র ফল বলে বর্ণনা করেছেন।

১৯৮১ এর পরবর্তী দু' দশকে অবশ্য জনসংখ্যাবৃদ্ধির হার শ্লথগতি হয়। এই সময় পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচীর উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয় এবং এর প্রভাবে জন্মহার বেশ হ্রাস পায়। ২০০০ সালে প্রতি হাজারে জন্মহার দাঁড়ায় ২৬। যদিও এই সময় মৃত্যুহার আরও কমে প্রতি হাজারে প্রায় ৯ এর কাছাকাছি দাঁড়ায়, তবুও জন্মহারের উল্লেখযোগ্য হ্রাসের কারণে ১৯৯১-২০০১ দশকে জনসংখ্যাবৃদ্ধির হার ২ এর নীচে নেমে ১.৯৩ হয়। তবুও এই হার যথেষ্ট বেশি। আমাদের প্রতিবেশী দেশ চীনে এই সময় জনসংখ্যাবৃদ্ধির হার মাত্র ১.১।

এ দেশে পরিকল্পনাকালে দ্রুত জনসংখ্যাবৃদ্ধির প্রধান কারণ হল, 'জন স্বাস্থ্য ব্যবস্থা'র অগ্রগতি, আধুনিক চিকিৎসাকৌশল আমদানি, স্বাস্থ্য সচেতনতার প্রসার, দুর্ভিক্ষ ও মহামারী প্রতিরোধ ইত্যাদি কারণে মৃত্যুর হার ক্রমশ

কমতে থাকলেও উচ্চ জন্মহার প্রায় অপরিবর্তিত রয়ে গেছে। এদেশে উচ্চ জন্মহারের পেছনে রয়েছে : (ক) প্রাকৃতিক কারণ (যথা উষ্ম আবহাওয়া), (খ) সামাজিক ও ধর্মীয় কারণ (যথা, যৌথ পরিবারপ্রথা, সর্বজনীন বিবাহ প্রথা, বাল্য বিবাহ, বহু বিবাহ, ধর্মীয় সংস্কার, শিক্ষার অভাব প্রভৃতি) (গ) জনসংখ্যাগত কারণ (যথা, সন্তানধারণের নিম্নতম ও উর্ধ্বতম বয়সসীমার মধ্যে যথেষ্ট ব্যবধান, বিবাহিত মহিলাদের উচ্চ সন্তানধারণক্ষমতা, জনসখ্যার মধ্যে সন্তান উৎপাদনক্ষম বয়সের লোকাধিক্য প্রভৃতি) এবং (ঘ) অর্থনৈতিক কারণ (যথা, শিশু শ্রমিকের কাজের সুযোগ, গণ দারিদ্র্য প্রভৃতি)।

ভারতবর্ষের জনসংখ্যা সম্বন্ধে আরও কিছু প্রাসঙ্গিক তথ্য হল :

(ক) শহরাঞ্চলে যতটা দ্রুত জন্মহার হ্রাস পাচ্ছে, গ্রামাঞ্চলে ততটা দ্রুত হ্রাস পাচ্ছে না। (খ) শিশুমৃত্যুর হার শহরাঞ্চলে যতটা দ্রুত হারে কমছে, গ্রামাঞ্চলে সেরূপ ঘটছে না। (গ) ভারতবর্ষের জনসংখ্যায় নারী-পুরুষ অনুপাতটির নিম্নমুখী প্রবণতা দেখা যায়। (ঘ) ভারতের জনসংখ্যার প্রায় ৩৬ শতাংশই হল শিশু দলভুক্ত যাদের বয়স চৌদ্দের নীচে। অর্থাৎ আমাদের জনসংখ্যার একটি বড় অংশ অনুৎপাদক শ্রেণিভুক্ত। (ঙ) ভারতের লোক সংখ্যার প্রায় ২৮% শহরবাসী। অর্থাৎ জনসংখ্যার প্রায় তিন-চতুর্থাংশ মানুষ গ্রামে বাস করেন। এর অর্থ, পরিকল্পনাধীন ভারতের শিল্পায়ন কর্মসূচী নগরায়নের উপর প্রান্তিক প্রভাব ফেলেছে। (চ) ভারতীয় জনগণের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ নিরক্ষর। এই নিরক্ষরতা আবার মহিলাদের মধ্যে প্রবলতর। ভারতীয় নারীদের মধ্যে প্রায় অর্ধেকই হল নিরক্ষর। (ছ) স্বাধীন ভারতে নিঃসন্দেহে জনগণের আয়ু বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০০১ সালে ভারতীয়দের প্রত্যাশিত আয়ু হল ৬৫ বছর। তবুও পৃথিবীর অন্যান্য অনেক দেশের সঙ্গে তুলনা করলে ভারতীয়দের প্রত্যাশিত আয়ু আপেক্ষিকভাবে কম বলেই পরিগণিত হয়।

জনসংখ্যার বৃদ্ধি ভারতকে *একাধিক সমস্যার* মধ্যে ফেলেছে। প্রথমত, এর ফলে দেশের মাথাপিছু জাতীয় আয় বৃদ্ধির হার কম থেকেছে। দ্বিতীয়ত, মাথা-পিছু কর্ষণযোগ্য জমির পরিমাণও হ্রাস পেয়েছে। মাথা-পিছু খাদ্যশস্যের পরিমাণও জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে কম থেকেছে। গ্রামঞ্চলে খাদ্যশস্যের বিক্রয়যোগ্য উদ্বৃত্তের পরিমাণ কমছে। তৃতীয়ত, ক্রমবর্ধমাণ জনসংখ্যা ভারতের বেকার সমস্যাকে তীব্রতর করে তুলেছে। চতুর্থত, জনসংখ্যার বৃদ্ধি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং আবাসনের ক্ষেত্রে সঙ্কট সৃষ্টি করেছে। পরিশেষে, ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার প্রয়োজন মেটাতে দেশের সম্পদের একটা বড় অংশ ভোগ্যদ্রব্যের উৎপাদনে নিয়োগ করতে হয়েছে; ফলে মূলধনীদ্রব্যের উৎপাদন কম হয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই এর বিরূপ প্রভাব পড়েছে দেশের আর্থিক প্রগতির উপর।

এই অবস্থায় ভারতের জনবৃদ্ধি রোধ করা যে আশু প্রয়োজন তা বলার অপেক্ষা রাখে না। এজন্য শিক্ষার, বিশেষতঃ স্ত্রী-শিক্ষার, প্রসারের সাথে সাথে পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচীকে আরও বিস্তৃত করা দরকার যাতে জন্মহার আরও হ্রাস পায় এবং আমাদের জনবৃদ্ধি একটা নিম্নতর স্তরে স্থিতিলাভ করে।

৩.৩ দারিদ্র্য

ভারত এক স্বল্পোন্নত দেশ। এখানে দরিদ্র মানুষের সংখ্যা বিশাল। *কারা এই দরিদ্র মানুষ?* নিঃসন্দেহে দরিদ্র মানুষ হল স্বল্পতম আয়ের মানুষ, যারা জীবন ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় সর্বনিম্ন ভোগ্যদ্রব্য থেকেও বঞ্চিত। ব্যাপক অর্থে দারিদ্র্য বলতে সামাজিক, রাজনৈতিক, আর্থিক ও বস্তুগত প্রয়োজন মেটানোর অক্ষমতাকে বোঝায়। কিন্তু উপযুক্ত মাপকাঠির অভাবে সাধারণভাবে শুধু প্রয়োজনীয় বস্তুগত সম্পদের বঞ্চনা বা অভাবের কথাই আলোচনা করা হয়।

দারিদ্র্যকে আবার দুভাবে ভাগ করা যায়— চরম ও আপেক্ষিক। চরম দারিদ্র্য হল শুধুমাত্র বেঁচে থাকার মতও অর্থের সংস্থান না থাকা। আপেক্ষিক দারিদ্র্য হল অন্যের তুলনায় কতটা গরিব তার পরিমাপ করা। এ দেশে চরম দারিদ্র্যের সমস্যাই বেশি গুরুত্বপূর্ণ। চরম দারিদ্র্য পরিমাপের ক্ষেত্রে প্রশ্ন হল : নিদেনপক্ষে সর্বনিম্ন ভোগ্যদ্রব্য-ব্যয়ের পরিমাণটা কতখানি হওয়া দরকার? পরিকল্পনা কমিশন ১৯৬২ সালে যে স্টাডি গ্রুপ (Study Group) গঠন করেন তাঁদের সিদ্ধান্ত হল এই সর্বনিম্ন ভোগ্যব্যয়ের পরিমাণ হল জনাপ্রতি মাসিক কুড়ি টাকা (১৯৬০-৬১ সালের দামস্তর অনুযায়ী)। পরবর্তীকালে এই ভোগব্যয়ের পরিমাণের পরিবর্তন করা হয়। পরিবর্তনটি করেন পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক ১৯৮৯ সালে নিযুক্ত একটি বিশেষজ্ঞ দল (Expert group)। ১৯৯৩ এর মাঝামাঝি এই শোষক দলের প্রতিবেদনটি প্রকাশিত হয়। এঁদের বক্তব্য হল ১৯৭৩-৭৪ সালের দামস্তর অনুযায়ী জনাপ্রতি মাসিক সর্বনিম্ন ভোগব্যয়ের পরিমাণ হওয়া দরকার গ্রামাঞ্চলে ৪৯.০০ টাকা এবং শহরাঞ্চলে ৫৭.০০ টাকা। যাঁরাই এই ভোগ্যব্যয় করতে সমর্থ হবেন না, তাঁরাই বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় তাপশক্তি (Calorie) সংগ্রহ করতে পারবেন না এবং এ কারণে তাঁদের দরিদ্র বলে পরিগণিত করতে হবে।

এখন প্রশ্ন : ভারতে *দরিদ্র মানুষের অনুপাত কত?* এ প্রসংগে আমরা বিভিন্ন হিসাব পাই। সব হিসাবগুলি উল্লেখ না করে আমরা সাম্প্রতিক কালের দুটি হিসাবের কথা উল্লেখ করি। এর মধ্যে একটি হিসাব নব্বই-এর দশকের মাঝামাঝি সময়ের (১৯৯৩-৯৪ সালের)। অপরটি ঐ দশকের শেষ বছরের (১৯৯৯-২০০০ সালের)। প্রথম হিসাবটি পাওয়া যাচ্ছে পরিকল্পনা কমিশনের কাছ হতে। তাঁদের মতে, ১৯৯৩-৯৪ সালে ভারতে দরিদ্র মানুষের অনুপাত হল ৩৬%। দশক শেষের হিসাবটির উৎস হল ৫৫ তম জাতীয় নমুনা সার্ভে (55th Round National Sample Survey)। এই পর্যালোচনাটিতে দারিদ্র্য পরিমাপের ক্ষেত্রে কিছু পদ্ধতিগত পরিবর্তন করা হয়েছে। যাই হোক, এই সূত্র থেকে জানা যায় যে, ১৯৯৯-২০০০ সালে দরিদ্র মানুষের অনুপাত হল ২৬%। এই পরিস্থিতিতে দশম পরিকল্পনার শেষ বছরে, ২০০৭ সালে, ভারতে দারিদ্র্য-অনুপাত হ্রাসের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে প্রায় বিশ শতাংশ (১৯.৩%)।

স্বাধীনতার পরে এদেশে বিভিন্ন সময়ে পি. ডি. ওঝা, প্রণব বর্ধন, দাণ্ডেকর ও রথ, বি. এস মিনহাস, গৌরব দত্ত প্রমুখ অর্থনীতিবিদরা দারিদ্র্য নিয়ে যে সব সমীক্ষা করেছেন সেগুলির ফলাফলের মধ্যে কতগুলি সাধারণ বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায় :

(ক) বছরের পর বছর দরিদ্র জনসংখ্যার মোট পরিমাণ বেড়েই চলেছে।

(খ) দারিদ্র্য সীমারেখার নীচে অবস্থিত জনসংখ্যার অধিকাংশই গ্রামবাসী।

(গ) গ্রামীণ দরিদ্র ব্যক্তিরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে মুক্ত (Open) বেকার না হলেও কম উৎপাদনশীল কর্মে রত।

(ঘ) শহরের দরিদ্র ব্যক্তিদের অধিকাংশই হয় কম মজুরিতে অসংঘটিত ক্ষেত্রে নিযুক্ত কিংবা স্বল্পমূলধন নিয়ে স্বনিযুক্ত কারবারে রত।

দারিদ্র্যের উপরোক্ত চিত্র আমাদের এক নিদারুণ সত্যের সম্মুখীন করে। তা হল এই যে, দেশের ২৬ কোটিরও বেশি মানুষ এতখানি দরিদ্র যে, এরা সর্বনিম্ন ভোগব্যয় করতেও অপারগ। *কেন এই দারিদ্র্য?* প্রথম কথা জনগণের একটা বড় অংশ স্বল্প নিয়োগ সমস্যায় (Problem of underemployment) আক্রান্ত। অর্থাৎ যথার্থ কর্মসংস্থানের অভাব হল আমাদের দারিদ্র্যের অন্যতম কারণ। নিরক্ষরতার ব্যাপকতার দরুন সমস্যাটি আরো গভীর হয়ে উঠেছে। দ্বিতীয় কারণ হল জনসংখ্যা বৃদ্ধি। জনবৃদ্ধির চাপ বিশেষ করে অনুভূত হয় গ্রামাঞ্চলে। সেখানে জমির উপরে চাপটা বাড়ে। বেকারি ও আধা-বেকারি বাড়ে। জনবৃদ্ধির ফলে খাদ্যশস্যের দামস্তরের উপরও একটি ঊর্ধ্বমুখী চাপ সৃষ্টি হয়। সব মিলিয়ে, জনবৃদ্ধি ভারতের দারিদ্র্যের সমস্যাটিকে তীব্র করে তুলেছে। তৃতীয়ত, ত্রুটিপূর্ণ পরিকল্পনাও

দারিদ্র্য-দূরীকরণের ক্ষেত্রে আমাদের ব্যর্থতার অন্যতম কারণ। তবে আমাদের দারিদ্র্যের প্রধান কারণটি প্রাতিষ্ঠানিক। আমাদের দেশের আর্থ-সামাজিক কাঠামোর মধ্যে এ কারণটি নিহিত। এই কাঠামোটি দৃষ্টিকটুভাবে বৈষম্যমূলক। এখানে আয়-উপার্জনকারী সম্পত্তির মালিকানা মুষ্টিমেয়র হাতে। এই পরিস্থিতিতে সম্পত্তি থেকে উদ্ভূত আয় সমাজে একটি বিশেষ জনগোষ্ঠীর হাতেই ক্রমাগত কেন্দ্রীভূত হতে থাকে। জনগণের একটা বড় অংশ উন্নয়ন প্রচেষ্টার সুফল থেকে বঞ্চিতই থেকে যায়।

তবে উপরোক্ত আর্থ-সামাজিক কাঠামোর ভেতরেও *দারিদ্র্য-দূরীকরণের জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ* নেওয়া যেতে পারে। এগুলি হল : ভূমি সংস্কার, কর্মসূচীকে ঠিকমত কার্যকর করা, প্রজা-চাষীকে রায়তী স্বত্ব প্রদান করা, ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষীকে যথেষ্ট ব্যাংক ঋণ দেওয়া; শিল্পায়ন প্রক্রিয়াকে বিকেন্দ্রিত করা, গ্রামাঞ্চলে সাম্প্রতিক কালের 'জাতীয় গ্রামীণ কর্মসংস্থান গ্যারান্টি আইন'টিকে যথাযথভাবে রূপায়িত করা, স্ব-নিযুক্তির ব্যবস্থা করা, ক্ষুদ্রশিল্পের উন্নয়নের উপর আরও অধিক গুরুত্ব আরোপ করা প্রভৃতি। সর্বোপরি সামাজিক উন্নয়ন প্রকল্পগুলি—যথা, পরিবারকল্যাণ, জনস্বাস্থ্য, সামাজিক নিরাপত্তা ও 'ন্যূনতম প্রয়োজন' প্রকল্প প্রভৃতি— যথাযথ রূপায়িত করা প্রয়োজন। এসব ব্যবস্থা গ্রহণ করলে ভারতবর্ষে, দারিদ্র্যের সমস্যাটি যে কিছু লঘু হয়ে উঠবে তাতে সন্দেহ নেই।

৩.৪ কর্মহীনতা বা বেকারি

আর পাঁচটা স্বল্পোন্নত দেশের মত ভারতেও কর্মহীনতা বা বেকারি এক বিশাল সমস্যা। তবে কর্মহীনতা বা বেকারীর সর্বজনগ্রাহ্য কোন পরিমাপ এ পর্যন্ত আমরা পাইনি। বেশ কয়েকটি হিসাব অবশ্য আমরা পাচ্ছি। এইসব হিসাবগুলির মধ্যে সবকটির কথা উল্লেখ না করে আমরা সাম্প্রতিককালের এক সরকারি সংস্থা-প্রদত্ত হিসাবের কথা বলি। এটির উৎস পরিকল্পনা কমিশন। দশম পরিকল্পনা রচনার সময় কমিশন এই হিসাবটি দেন। কমিশনের মতে, ২০০২ সালে ভারতবর্ষে কর্মহীনদের সংখ্যা হল সাড়ে তিন কোটির কাছাকাছি (৩৪.৮৫ মিলিয়ন)।

কমিশনের মতে, দশম পরিকল্পনার শেষে, ২০০৭ সালে দেশে বেকারের সংখ্যা ৪ কোটি ছাড়িয়ে যাবে (৪০.৪৭ মিলিয়ন)।* বলা বাহুল্য; জাতীয় আয় বৃদ্ধির হার ৮% ধরে দেশে কতখানি কর্মসংস্থান হবে তা আন্দাজ করে পরিকল্পনা কমিশন কর্মহীনদের এই হিসেবটা কষেছেন। কিন্তু আর্থিক প্রগতির হার যদি উদ্দিষ্ট লক্ষ্য ৮% এর কম হয় (বিশেষজ্ঞদের মতে যার সম্ভাবনা খুবই বেশি), তাহলে স্বাভাবিকভাবেই দশম পরিকল্পনার শেষে বেকারের সংখ্যা সাড়ে চার কোটি ছাড়িয়ে যাবে।

ভারতবর্ষের কর্মহীনতার প্রকৃতিটা কেমন? এদেশে কর্মহীনদের বড় অংশটাই গ্রামাঞ্চলে। গ্রামাঞ্চলে কৃষি এখনও মূলত বৃষ্টি-নির্ভর। সেচ-ব্যবস্থার প্রসার আশানুরূপ ঘটেনি। বেশির ভাগ জায়গাতেই এক ফসলের চাষ। এ অবস্থায় বছরে একটা দীর্ঘ সময়—৩/৪ মাস— কৃষকদের হাতে কোন কাজ থাকে না। এই বেকারত্বকে বলা হয় ঋতুগত বেকারত্ব (Seasonal Unemployment)। এ ছাড়া রয়েছে ছদ্ম বেকারত্ব (Disguised Unemployment)। এর অর্থ, কৃষিকর্মে যারা নিযুক্ত তাদের একটা বড় অংশই আসলে উদ্বৃত্ত। কৃষি থেকে তাদের সরিয়ে নিলেও কৃষি উৎপাদনে কোন হের ফের হবে না। এদের সংখ্যা কত তার অবশ্য কোন সঠিক, নির্ভরযোগ্য হিসেব নেই। গ্রামাঞ্চলের এই উদ্বৃত্ত শ্রমিক শহরে পাড়ি দিলে শহরে বেকারের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। শহরে শিল্প-শ্রমিকদের মধ্যেও বেকারত্ব (Industrial Unemployment) বর্তমান। তাছাড়া আছে শিক্ষিত শ্রেণির মধ্যে বেকারত্ব। এদের দেখা যায় মূলত শহরাঞ্চলে। এদের সংখ্যাও কম নয়।

---

* দ্রষ্টব্য : Misra & Puri, Indian Economy (2004), পৃষ্ঠা ৯৩৪, টেবিল ৪

কী কারণে এত বেকার? প্রথম কারণ অবশ্যই আমাদের জন সংখ্যা বৃদ্ধি। জনসংখ্যাবৃদ্ধির সাথে তাল রেখে শ্রমের যোগান বাড়ছে, বাড়ছে বেকারী। দ্বিতীয়ত, কর্মসংস্থানহীন অগ্রগতির (Jobless Growth) যে ধারা আমাদের দেশে লক্ষিত হয়, কর্মহীনতার সেটিও একটি কারণ। উৎপাদন বা আয়বৃদ্ধির অনুপাতে এদেশে কর্মসংস্থানের বৃদ্ধি ঘটছে না। তৃতীয়ত, উন্নয়নের ক্ষেত্রে আমরা সঠিক কৌশল গ্রহণ করিনি। শ্রমসুলভ ভারতবর্ষে শ্রম-নিবিড় উৎপাদন পদ্ধতির পরিবর্তে মূলধন-নিবিড় উৎপাদন পদ্ধতি গ্রহণের প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়।

পরিশেষে, আমাদের ত্রুটিপূর্ণ শিক্ষা-ব্যবস্থাও দেশে বেকারী সৃষ্টির জন্য অনেকাংশে দায়ী। আমাদের স্কুল-কলেজ থেকে যে হাজার হাজার যুবক-যুবতী বের হচ্ছে উৎপাদনের ক্ষেত্রে এদের উপযোগিতা যৎসামান্য। মিরডালের (Myrdal) কথায়, এরা 'ভুলধারায় শিক্ষাপ্রাপ্ত' ('Wrongly educated')। দেশের বেকারবাহিনীকে এরা স্ফীত করে চলেছে।

গৃহীত পদক্ষেপ :

আমাদের পরিকল্পনার রূপকারগণ দেশের বেকার সমস্যাটি অনুধাবন করে এই সিদ্ধান্ত করেন যে, শিল্পের বিকাশ ঘটিয়ে এবং শিল্পক্ষেত্রে মজুরির বিনিময়ে কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি করে সমস্যাটির সমাধান করা অতি দুরূহ ব্যাপার। কেননা, শিল্পক্ষেত্রে উৎপাদনবৃদ্ধি যে হারে ঘটে, নিয়োগ বৃদ্ধি ঘটে তার তুলনায় অতি স্বল্প হারে। পরিভাষা ব্যবহার করে এ ঘটনাকে বলা হয় : শিল্পক্ষেত্রের নিয়োগ স্থিতিস্থাপকতা অতি কম। এই অবস্থায় পরিকল্পনা নির্মাতারা দেশে বাড়তি কর্মসংস্থানের জন্য শিল্পোন্নয়নের উপর ভরসা না করে স্ব-নিযুক্তি ক্ষেত্রটির উপর জোর দেন। সত্তরের দশক থেকে এই উদ্দেশ্যে সরকার একাধিক স্ব-নিযুক্তি কর্মসূচী ঘোষণা করেন। এগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল :

(ক) আই. আর. ডি. পি. (I.R.D.P.)

(খ) এন. আর. ই. পি. (N.R.E.P.)

(গ) আর. এল. ই. জি. পি. (R.L.E.G.P.)

(ঘ) জহর রোজগার যোজনা (JRY)

(ঙ) স্বর্ণজয়ন্তী গ্রাম স্বরোজগার যোজনা (SGSY) এবং

(চ) এন. আর. ই. জি. (N.R.E.G.) প্রকল্প।

শেষোক্ত প্রকল্পটির কাজ ইতিমধ্যেই প্রাথমিক স্তরে ভারতের ১৫০টি দরিদ্রতম জেলায় শুরু হয়েছে। দেশের ৬০০টি জেলার সর্বত্রই এটি চালু হয়ে যাবে আগামী চার বছরে। এই প্রকল্পানুসারে দৈনিক ৬০ টাকা হিসাবে বছরে ন্যূনতম ১০০ দিনের কাজ প্রতি পরিবারে একজনকে দিতে সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তবে এই প্রকল্পের মাধ্যমে যাতে "সামাজিক সম্পদ" সৃষ্টি হয় সেদিকেও নজর রাখা উচিত।

'বেকারত্ব মোচন' আমাদের পরিকল্পনার অন্যতম ঘোষিত নীতি হলেও এক্ষেত্রে পরিকল্পনার ব্যর্থতা অনস্বীকার্য। সাম্প্রতিক কালে কৃষিভিত্তিক গ্রামীণ শিল্প বিকাশ ও প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণ করার জন্য সরকারিভাবে জোর প্রচেষ্টা শুরু হয়েছে। অবশ্য শেষোক্ত পদ্ধতির যৌক্তিকতা নিয়ে অনেকেই নানা সন্দেহ প্রকাশ করেছেন।

৩.৫ নিরক্ষরতা

সাধারণভাবে নিরক্ষরতার সংজ্ঞা হল যে কোন একটি ভাষায় পড়তে এবং লিখতে পারার অক্ষমতা। নিরক্ষরতা একটি সামাজিক ব্যাধি যার দ্বারা এদেশের জনসংখ্যার এক বিপুল অংশ আক্রান্ত। বহুকাল ধরে নিরক্ষর জনসাধারণ জমিদার, মহাজন ও অন্যান্য স্বার্থান্বেষী ব্যক্তিদের শোষণ, অত্যাচার ও প্রবঞ্চনার শিকার হয়ে সর্বস্বান্ত হয়েছে। একই সঙ্গে অফুরন্ত জ্ঞানভাণ্ডার থেকে বঞ্চিত হওয়ায় উপযুক্ত কর্মসংস্থানের সুযোগ হারিয়েছে। নিরক্ষরতার দরুন অমূল্য মানব সম্পদের পূর্ণব্যবহার না হওয়ায় জাতীয় অপচয় ঘটেছে।

দেশব্যাপী এই বিশাল নিরক্ষতার পেছনে অনেকগুলো কারণ রয়েছে। প্রথমেই উল্লেখ করা যায় গণদারিদ্র্যের কথা। ছেলেমেয়েদের স্কুলে না পাঠিয়ে কোথাও কাজ করতে পাঠালে কিংবা ঘরের কাজে লাগালে গরিবের সংসারে কিছুটা আর্থিক সাশ্রয় হয়। অপরদিকে, পড়তে পাঠালে কিছুটা অর্থব্যয়ের আশঙ্কা থাকে। এছাড়া গ্রামাঞ্চলে বিশেষ করে শিক্ষার ব্যাপারে সচেতনতার অভাব অনুভূত হয়। উপরন্তু, গ্রামের মাতব্বররা নীচু জাতের ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শেখাটা ভালো চোখে দেখেন নি। তাই জাতপাতের ব্যাপারটাও নিরক্ষরতার সঙ্গে জড়িয়ে গেছে।

অনেক ক্ষেত্রে কাছাকাছি স্কুল না থাকাটাও একটা কারণ। কিংবা হয়তো স্কুল আছে-কিন্তু শিক্ষক, স্কুলঘর, আনুষঙ্গিক সরঞ্জাম কিছুই নেই। ধরাবাঁধা সময়ে ছেলেমেয়েদের পড়তে পাঠানোও একটা সমস্যা। আবার দূরের স্কুলে মেয়েদের নানা কারণে অনেকেই পাঠাতে চান না। শিক্ষাদানের ব্যাপারটাও অনেক ক্ষেত্রেই দায়সারা গোছের হয়ে যাওয়ায় ছেলেমেয়েদের শেখার আগ্রহ কমে যায়। গ্রামাঞ্চলে শিক্ষিত বেকারত্বের অস্তিত্ব শিক্ষার প্রতি আগ্রহ কমে যাওয়ার আরেকটা কারণ। স্কুলে ভর্তি না হওয়ার মতোই 'স্কুল ছুটে'র সংখ্যাও এদেশে অত্যধিক।

স্বাধীনতার পরেই কিন্তু নিরক্ষরতা দূরীকরণের বিষয়টিকে যথেষ্ট গুরুত্ব সহকারে বিচার করেছিলেন আমাদের সংবিধান রচয়িতারা। সংবিধানের নির্দেশ মূলক নীতিতেই আছে, "রাষ্ট্র, এই সংবিধান প্রবর্তিত হওয়ার দশ বছরের মধ্যে দেশের সমস্ত শিশুদের ১৪ বছর বয়সে না পৌঁছানো পর্যন্ত নিখরচায় আবশ্যিক শিক্ষার বন্দোবস্ত করার উদ্যোগ নেবে"। বাস্তবে কিন্তু সংবিধান রচয়িতাদের এই স্বপ্ন পাঁচ দশক পরেও আজও অধরা রয়ে গেছে। এবার বাস্তবে কি হয়েছে তা পর্যালোচনা করা যাক।

এদেশে প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা থেকেই নিরক্ষরতা দূরীকরণের প্রচেষ্টা শুরু হয়েছে। এই প্রচেষ্টা মূলত দুটো ভাগে বিভক্ত (১) কম বয়েসী (6-11 বছর) ছেলেমেয়েদের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তার এবং বয়স্ক শিক্ষা বিস্তার।

প্রথম তিনটি পরিকল্পনায় প্রাথমিক শিক্ষাবিস্তারের জন্যে 'শিক্ষাখাতে' মোট ব্যয়বরাদ্দের যথাক্রমে ৫৫%, ৩৪% ও ৩৩% বরাদ্দ করা হয়। প্রধানত জোর দেওয়া হয়-জনবসতির কাছাকাছি প্রাথমিক স্কুল খোলার দিকে। এতদসত্ত্বেও, চতুর্থ পরিকল্পনার শুরুতে দেখা যায় যে মাত্র ৬২% ছেলেমেয়েদের প্রাথমিক স্কুলের আওতায় আনা গেছে। ইতিপূর্বে ১৯৬৮ সালে শিক্ষা সম্পর্কিত যে জাতীয় নীতি ঘোষিত হয়, তাতেও কিন্তু গ্রামাঞ্চলে শিক্ষাবিস্তারের জন্য আলাদাভাবে বিশেষ জোর দেওয়ার কথা বলা হয়নি। পঞ্চম পরিকল্পনায় 'ন্যূনতম প্রয়োজন প্রকল্পে'র মধ্যে নিরক্ষরতা দূরীকরণের কার্যসূচির উপরও জোর দেওয়া হয়। ১৯৮৬ সালে ঘোষিত শিক্ষা সম্পর্কিত জাতীয় নীতিতে নিরক্ষরতার দূরীকরণ কার্যসূচিতে স্ত্রী-শিক্ষা, অবহেলিত শ্রেণিদের শিক্ষা ও বয়স্ক শিক্ষা প্রসারের সঙ্গে 'বিধিমুক্ত শিক্ষা', শিক্ষার উপর যথেষ্ট জোর দেওয়া হয়।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে শিক্ষার জন্য ব্যয়বরাদ্দের পরিমাণ টাকার অংকে বাড়লেও পরিকল্পনার মোট ব্যয়বরাদ্দের শতাংশ হিসাবে কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই কমছে। যেমন, এইখাতে প্রথম পরিকল্পনায় মোট ব্যয়ের

৭.২% বরাদ্দ করা হয়-অথচ কমতে কমতে সপ্তম পরিকল্পনায় তা ৩.২% শতাংশে দাঁড়ায়। একইভাবে দেখা যায় যে প্রাথমিক শিক্ষার জন্য ব্যয়বরাদ্দ মোট শিক্ষার জন্য ব্যয়বরাদ্দের ১/৩ ভাগের বেশি হয়নি। এর ফলে প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার ও গুণগতমানের যে অবনতি ঘটেছে তা পরিষ্কার বোঝা যায় ১৮৮৭-৮৮ সালে প্রবর্তিত 'অপারেশন ব্ল্যাকবোর্ড প্রকল্প গ্রহণে। এই প্রকল্পে প্রাথমিক শিক্ষার ন্যূনতম পরিকাঠামো গঠনের ওপর যেভাবে জোর দেওয়া হয় তার মানে হ'ল যে এইগুলি এতাবৎ অবহেলিত ছিল।

এ দেশে বয়স্ক শিক্ষার ছবিটাও নিরাশাব্যঞ্জক। ২০০৫ সালের নভেম্বরে প্রকাশিত ইউনেস্কোর এক রিপোর্টে দেখা যায় যে বিশ্বের মোট বয়স্ক নিরক্ষরের ৪৬% ভারত ও চীনে। ভারতে দেখা যাচ্ছে যে গ্রামাঞ্চলে ১৫ বছরের বেশি বয়সের ৭৫% ভাগই নিরক্ষর এবং সার্বিক নিরক্ষতার হার প্রায় ৪৩%।

স্বাধীনতার পরে বয়স্ক নিরক্ষতার দূরীকরণের প্রচেষ্টা শুরু হয় মূলত গ্রাম পঞ্চায়েত, স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন ও সমাজ শিক্ষা কাউন্সিলগুলির মাধ্যমে। প্রথম পরিকল্পনায় এই উদ্দেশ্যে জাতীয়-বয়স্কশিক্ষা বোর্ড গঠিত হয়। সমষ্টি উন্নয়ন প্রকল্পে গ্রামস্তরের কর্মীদের (Village level workers) উপরও বয়স্ক শিক্ষার ভার দেওয়া হয়। গ্রামশিক্ষাদল, মহিলা সমিতি ও কৃষক সংগঠনগুলির সাহায্য এ বিষয়ে নেওয়া হয়। ১৯৭৮ সালে এক "জাতীয়-বয়স্কশিক্ষা প্রকল্প" গৃহীত হয় যার মুল উদ্দেশ্য ছিল ১৫-৩৫ বছরের সমস্ত বয়স্ককে ১৯৮৩-৮৮ সালের মধ্যে সাক্ষর করে তোলা। এই প্রকল্পের অন্তর্গত একটি গ্রামীণ কার্যকরী সাক্ষরতা প্রকল্প' প্রবর্তন করা হয়। যদিও এই প্রকল্পটি আসলে ইতিপূর্বে প্রবর্তিত 'কৃষকদের কার্যকরী সাক্ষরতা প্রকল্প' ও 'বিধিমুক্ত শিক্ষা প্রকল্পে'র সংযুক্তীকরণ মাত্র। বলা হয় যে, এই ধরনের প্রতিটি প্রকল্পের আওতায় ১০০ থেকে ৩০০টি বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র থাকবে এবং প্রতিটি শিক্ষাক্ষেত্রে জনা তিরিশ শিক্ষার্থী থাকবে। ইতিমধ্যেই ভারতে পাঁচশতাধিক এই ধরনের গ্রামীণ প্রকল্প রয়েছে।

১৯৮৮ সালে 'জাতীয় সাক্ষরতা মিশন" প্রবর্তিত হয় যার উদ্দেশ্য হল বয়স্কদের কার্য্যকরী (Functional) শিক্ষার ব্যবস্থা করার পাশাপাশি পরবর্তী স্তরে শিক্ষার ধারাবাহিকতা বজায় রাখার ব্যবস্থা করা। এই উদ্দেশ্যে গণ আন্দোলন গড়ে তোলা হবে যাতে সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলি, পঞ্চায়েতসমূহ, মহিলা মণ্ডল, নেহেরু যুব কেন্দ্র, জন শিক্ষণ সংস্থান জাতীয় সেবা প্রকল্প ও বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন অংশ নেবে।

নিরক্ষরতা দূরীকরণে সার্বিক প্রচেষ্টার ফলাফল কি হয়েছে তার একটি সংক্ষিপ্ত চিত্র নিম্নের তালিকায় দেওয়া হল—

সময়	সাক্ষরতার হার	স্ত্রী-সাক্ষরতার হার	পুরুষ সাক্ষরতার হার
১৯৫১*	১৮.৩	৮.৯	২৭.২
১৯৬১*	২৮.৩	১৫.৩	৪০.৪
১৯৭১*	৩৪.৫	২২.০	৪৬.০
১৯৮১*	৪১.৫	২৮.৫	৫৩.৮
১৯৯১	৫২.২	৩৯.৩	৬৪.১
২০০১	৬৫.৪	৫২.১	৭৫.৮

*এ সময়ের হিসাবে 5 বছরের বেশি বয়সের জনসংখ্যাকে ধরা হয়েছে। পরবর্তী সময়ে ৭বছরের বেশি বয়সের জনসংখ্যাকে ধরা হয়েছে।

সূত্র : R. Datta KPM Sundharam, Indian Economy, ২০০৪ সংস্করণ পৃষ্ঠা ৫৫।

সীমিত পরিসরের জন্যে উপরোক্ত তালিকায় অবশ্য সাক্ষরতার ক্ষেত্র গ্রাম ও শহরের চিত্র, তফশীলি জাতি ও উপজাতির শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্যগুলি আলাদাভাবে দেখানো হয়নি। যাইহোক, জনসংখ্যা সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্যের থেকে এদেশে সাক্ষরতার চিত্রে কিছু বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায় :

(ক) পরিকল্পনাকালে সাক্ষরতার হার ক্রমশ বাড়ছে।

(খ) সাক্ষরতার ক্ষেত্রে পুরুষদের তুলনায় মহিলারা বেশ পিছিয়ে আছে। নারীবৈষম্যের একটা দৃষ্টান্ত হিসাবে একে গণ্য করা যায়।

(গ) সাক্ষরতা ক্ষেত্রে শহরের তুলনায় গ্রামাঞ্চল অনেকটাই পিছিয়ে আছে।

(ঘ) নানা সুযোগ সুবিধা ঘোষণা করা সত্ত্বেও তফশিলী জাতি ও উপজাতির ক্ষেত্রে সাক্ষরতার হার নৈরাশ্যজনক। তফশিলী নারীদের মধ্যে সাক্ষরতার হার দশ শতাংশের নীচে।

(ঙ) সাক্ষরতার ক্ষেত্রে বিভিন্ন রাজ্যের সফলতার মাত্রা বিভিন্ন। ২০০১ সালে আদমশুমারী অনুযায়ী কেরালায় সাক্ষরতার হার ৯০-৯২% অথচ বিহারে তা ৪৭.৫৩%। সাক্ষরতার হার অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গের স্থান একাদশতম।

(চ) গ্রামাঞ্চলে প্রায় এক তৃতীয়াংশ পরিবারে কোন সাক্ষর ব্যক্তিই নেই।

সাম্প্রতিককালে 'সর্বশিক্ষা অভিযান', প্রাথমিক স্কুলগুলিতে আবশ্যিকভাবে 'দুপুরে খাবার' দেওয়ার নীতি ইত্যাদি প্রকল্পের সাহায্যে এই দশকের মধ্যেই নিরক্ষরতা দূরীকরণের এক ব্যাপক প্রচেষ্টা শুরু হয়েছে। দশম পরিকল্পনায় ঠিক করা হয়েছে যে ২০০৭ সালের মধ্যে সকল শিশুকে কমপক্ষে ৫ বছরের জন্য স্কুলে যেতে হবে। সাক্ষরতার হারকেও 65% থেকে 75% এ নিয়ে যাওয়া হবে। তবে সম্প্রতি 'প্রথম' নামক মুম্বাই ভিত্তিক একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সমীক্ষা সাক্ষরতার সাফল্য নিয়ে বিভিন্ন রাজ্য সরকারের দেওয়া তথ্যের সত্যতা নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেছে।

৩.৬ অনুশীলনী

১। ভারতের জাতীয় আয়ের ক্ষেত্রে পরিবর্তনের ধারাটি ব্যাখ্যা কর।

২। প্রয়োজনের তুলনায় জনসংখ্যা বৃদ্ধি কী ধরনের সমস্যা তৈরী করতে পারে?

৩। দারিদ্র্য বলতে কী বোঝ?, দারিদ্রের পিছনে মূল কারণগুলি কী?

৪। দেশে বেকারত্ব দূর করার জন্য কী কী কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে? এগুলি ফলপ্রসূ হওয়ার সম্ভাবনা কতখানি?

৫। নিরক্ষরতা বিষয়ে এক নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধ লেখ।

একক ৪ □ ভারতের পরিকল্পনা (Planning in India)

গঠন

৪.১ ভূমিকা
৪.২ শিক্ষাক্ষেত্র
৪.৩ আবাসন
৪.৪ স্বাস্থ্য
৪.৫ শ্রেণীগত/জাতিগত সমতা
৪.৬ অনুশীলনী

৪.১ ভূমিকা

তৎকালীন সোভিয়েট রাশিয়ায় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অভূতপূর্ব সাফল্যের দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হয়ে স্বাধীনতার পরেই এদেশেও পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার কথা ঘোষিত হয় এবং এই উদ্দেশ্যে ১৯৫০ সালে পরিকল্পনা কমিশন গঠিত হয়। ১৯৫১ সালে সরকারিভাবে প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা শুরু হয়। ২০০২ সাল থেকে দশম পঞ্চবার্ষিকী চলছে। মাঝে কয়েক বছর বিশেষ কিছু কারণে বার্ষিক পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছিল। উল্লেখ করা যেতে পারে যে স্বাধীনতার আগেও বেসরকারি কিছু পরিকল্পনা রচিত হয়েছিল যেগুলি কিন্তু কাগজে কলমেই থেকে গিয়েছিল, বাস্তবায়িত হয়নি।

আমাদের দেশে ধনতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার সংমিশ্রণে যে "মিশ্র অর্থনীতি" ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়েছে তাতে পরিকল্পনাকে হাতিয়ার করে নির্দিষ্ট কিছু আর্থ-সামাজিক উদ্দেশ্য পূরণ করার লক্ষ্য ধার্য করা হয়েছে। এই সমস্ত উদ্দেশ্যের অনেকগুলিই সংবিধানের "নির্দেশাত্মক নীতি"গুলির মধ্যে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছিল। সংবিধান রচয়িতাদের "সামাজিক ন্যায় ও সাম্যের ভিত্তিতে জনকল্যাণের" স্বপ্নের কথা স্মরণে রেখে পরিকল্পনায় দীর্ঘকালীন ভিত্তিতে রূপায়নের জন্যে যে সব প্রধান আর্থ-সামাজিক লক্ষ্যের কথা বলা হয় সেইগুলো হল :

(১) উৎপাদনের সর্বাধিক বৃদ্ধির মাধ্যমে জাতীয় ও মাথাপিছু আয়ের উচ্চস্তরে পৌছান।

(২) বেকারত্বের অবসান ঘটিয়ে দেশে পূর্ণ নিয়োগের ব্যবস্থা করা।

(৩) আয় ও সম্পদের বৈষম্য হ্রাস এবং

(৪) সামাজিক ন্যায়ের ভিত্তিতে শোষণমুক্ত সমাজব্যবস্থা গড়ে তোলা।

আর্থিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে লিঙ্গগত, শ্রেণীগত ও জাতিগত বৈষম্যের অবসান ঘটানোর জন্যে অর্থনৈতিক ভাবে অনগ্রসর শ্রেণীদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন ও সম্পত্তির পুনর্বন্টনের পাশাপাশি প্রকৃত শিক্ষার প্রসার ও জনসচেতনতার বিস্তারের প্রয়োজনীয়তা আমাদের পরিকল্পনায় বারংবার উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে পরিকল্পনা স্বয়ং কোন উদ্দেশ্য নয়— আমাদের মতো গণতান্ত্রিক দেশে নির্বাচিত সরকারের উপরোক্ত আর্থ-সামাজিক উদ্দেশ্যগুলি পূরণের এক হাতিয়ার মাত্র।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় যে আমাদের দেশে পরিকল্পনায় গৃহীত আর্থসামাজিক উদ্দেশ্যগুলির পিছনে "গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রে"র ধারণাটি কার্যকরী। এর তাৎপর্য হল এই যে কেবলমাত্র বৈষয়িক উন্নতির দ্বারা

মানবজীবন সমৃদ্ধ ও অর্থবহ হয়ে ওঠে না। অধিকতর দ্রব্য ও সেবাপ্রাপ্তির পাশাপাশি ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনের সার্বিক উন্নতির সমান সুযোগসুবিধা পাওয়া চাই। জন্ম, জাতপাত, ধর্ম ও শ্রেণী নির্বিশেষে সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ও আত্মিক উন্নতির সমান সুযোগ না থাকলে মানুষের অন্তর্নিহিত গুণাবলীর পূর্ণাঙ্গ বিকাশ সম্ভব হয় না-তাই সর্বাঙ্গীণ উন্নতিও ঘটে না। তাই আমাদের পরিকল্পনার মূল নীতি হল গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে পরিকল্পিত উন্নয়নের মাধ্যমে সমাজতন্ত্রের বিকাশ।

আর্থ-সামাজিক লক্ষ্যপূরণের জন্য এদেশে কৃষি, শিল্প ইত্যাদি অর্থনৈতিক ক্ষেত্রের উন্নতির সাথে সাথে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, আবাসন, লিঙ্গগত ও শ্রেণীগত সমতা ইত্যাদি বিষয়গুলির উপর সমান গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন। পরিকল্পনাকালে এই সবক্ষেত্রে গৃহীত ব্যবস্থাগুলি সংক্ষেপে আলোচনার আগে এদেশে পরিকল্পনার স্বরূপ ও পদ্ধতি সম্বন্ধে দু-এক কথা জেনে নেওয়া যাক।

প্রথমত, আমাদের অর্থনীতি 'মিশ্র' অর্থনীতি বলে এদেশের পরিকল্পনা ইঙ্গিতবাহী (indicative) বা নির্দেশাত্মক, বাধ্যতামূলক নয়। নির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রাপূরণের জন্য কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার, পরিকল্পনায় সেটুকুই নির্দেশিত থাকে, ব্যবস্থা গ্রহণ করা বাধ্যতামূলক নয়— বিশেষত বেসরকারি ক্ষেত্রের পক্ষে।

দ্বিতীয়ত, আমাদের পরিকল্পনা উন্নয়নমূলক, সংরক্ষণমূলক (Corrective) নয়। কিভাবে দেশবাসীর জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করা যায় তাই এর লক্ষ্য। ধনতান্ত্রিক দেশগুলির মতো বাণিজ্যচক্রের হাত থেকে দেশকে রক্ষা করা এর মূল লক্ষ্য নয়।

তৃতীয়ত, এদেশের পরিকল্পনা পদ্ধতি গণতান্ত্রিক, যদিও পরিকল্পনা রচনার প্রাথমিক দায়িত্বে থাকে পরিকল্পনা কমিশন। এর চেয়ারম্যান প্রধানমন্ত্রী। দেশের কৃতবিদ্য ব্যক্তিদের মধ্য থেকে ডেপুটি চেয়ারম্যান সহ কয়েকজনকে বেছে নেওয়া হয় পরিকল্পনা রচনার জন্য। কমিশনে বিভিন্নমন্ত্রকের সহায়তায় প্রথমে একটি মেমোরেন্ডাম তৈরী করে জাতীয় উন্নয়ন পরিষদে (National Development Council or NDC) পেশ করে। এই NDC তে সদস্য হিসাবে দেশের সমস্ত রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীরা উপস্থিত থাকেন। এঁদের সঙ্গে আলোচনার ভিত্তিতে একটি খসড়া পরিকল্পনা পার্লামেন্ট তথা দেশবাসীর সামনে পেশ করা হয়। এই খসড়া সম্পর্কে বিভিন্ন মতামত বিচার করেই তবে মূল পরিকল্পনাটি রচিত হয়। NDC ও কেন্দ্রীয় ক্যাবিনেটের অনুমোদন পাওয়ার পর পার্লামেন্টে অনুমোদিত হলে তবেই পরিকল্পনাটি গৃহীত হয়। রচনার পদ্ধতি তাই গণতান্ত্রিক। এ ছাড়া আমাদের পরিকল্পনাটি ক্ষেত্রভিত্তিক (Sectoral) নয়, সামগ্রিক এবং বিকেন্দ্রিক, কারণ রচনার কাজটি গ্রাম থেকে শুরু হয়ে ক্ষেপে ক্ষেপে কেন্দ্রেতে এসে শেষ হয়।

৪.২ শিক্ষাক্ষেত্র

এ বার আমরা পরিকল্পনা কালে শিক্ষাক্ষেত্রে গৃহীত ব্যবস্থাগুলি সংক্ষেপে আলোচনা করবো।

পরিকল্পনা কমিশনের মতে আমাদের মতো উন্নয়নশীল দেশে শিক্ষার বিস্তারের ফলে : (ক) উন্নয়ন বিঘ্নকারী সামাজিক-সাংস্কৃতিক শর্তগুলি (যথা, জাতপাতজনিত বৈষম্য, ভাগ্যনির্ভরতা, কুসংস্কার, গোঁড়া রক্ষণশীলতা প্রভৃতি) দুর্বল হয়ে পড়ে। (খ) স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধি পায় এবং ফল স্বরূপ শিশুমৃত্যু হার ইত্যাদি হ্রাস পায় (গ) পরিবার পরিকল্পনার ক্ষেত্রে অধিকতর সাফল্য আসে এবং জন্মহার হ্রাস পায়। (ঘ) কৃষিক্ষেত্রে উন্নততর প্রযুক্তির প্রবর্তন সম্ভবপর হয় এবং কৃষি-উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পায়। (ঙ) কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি পায়। (চ) শ্রমিকের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পাওয়ার দরুন আয়বৃদ্ধি ঘটে ও আয়বৈষম্য হ্রাস পায়। অধ্যাপক ডেনিসনের মতে অশিক্ষিত

ও শিক্ষিত শ্রমিকের মধ্যে আয়ের পার্থক্য প্রায় ৬০ শতাংশ। (ছ) দীর্ঘকালীন পরিপ্রেক্ষিতে কর্মদক্ষতা ও সাংগঠনিক নৈপুণ্য বৃদ্ধি পাওয়ার দরুন আর্থিক প্রগতি দ্রুততর হয়। অধ্যাপক সুল্‌জ্‌, সাকারোপাউলেস প্রভৃতি অর্থনীতি বিদ্‌গণের গবেষণা থেকে জানা যায় যে আর্থিক উন্নয়নে ঐতিহাসিকভাবে শিক্ষার অবদান বেশ উল্লেখযোগ্য। বিশ্বব্যাঙ্কের এক রিপোর্টে শিল্পখাতে বিনিয়োগের সামাজিক প্রতিদান প্রায় ১৯%-২০% বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

মানবিক মূলধনের বিকাশ, সামাজিক ন্যায়প্রতিষ্ঠা ও আর্থিক বৈষম্যের হ্রাসের ক্ষেত্রে শিক্ষার ভূমিকা আমাদের সংবিধানেও বারংবার উল্লেখিত হয়েছে। পূর্ববর্তী ব্লকে এ সম্বন্ধে সংবিধানের নির্দেশকমূলক নীতির কথা বলা হয়েছে। সংবিধানের ৭৩তম সংশোধনীতে ৬-১৪ বয়স্ক শিশুর শিক্ষার অধিকারকে মৌলিক অধিকারের স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে।

১৯৫১ সালে যখন পরিকল্পনা শুরু হয় সে সময়ে ভারতে ৮০%-র বেশি মানুষ ছিল নিরক্ষর। শিক্ষাক্ষেত্রে এই করুণ চিত্রের পরিপ্রেক্ষিতে পরিকল্পনার শুরু থেকেই যে সমস্যাগুলির সমাধানে জোর দেওয়া হয় সেগুলি প্রধানত হল : ৬-১৪ বছরের শিশুদের ক্ষেত্রে প্রাথমিক শিক্ষার প্রচলন; বয়স্কদের জন্য শিক্ষার ব্যবস্থা; নারী তথা পিছিয়ে পড়া জাতিদের মধ্যে শিক্ষার প্রসার; শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়ন এবং বৃত্তিমূলক শিক্ষার প্রসার। এ ছাড়া ছিল 'স্কুলছুট' এর সমস্যা ও 'ধারাবাহিকতা' বজায় রাখার সমস্যা।

পরিকল্পনাকালে উপরোক্ত সমস্যাগুলি সমাধানে যে সব সুব্যবস্থাগুলি গ্রহণ করা হয়েছে তার অনেকগুলিই ইতিপূর্বে "নিরক্ষরতা"র এককে আলোচিত হয়েছে। সমস্যা সমাধানে গৃহীত ব্যবস্থার-উল্লেখযোগ্যগুলি হ'ল : (ক) জনবসতির নিকটবর্তীস্থানে প্রাথমিক বিদ্যালয়-স্থাপন; (খ) জেলান্তরে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা বৃদ্ধি; (গ) ইঞ্জিনিয়ারিং ও মেডিক্যাল কলেজের বিস্তার; (ঘ) নতুন মহাবিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন (ঙ) বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণকেন্দ্র স্থাপন (চ) পিছিয়েপড়া শ্রেণীদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ (ছ) প্রথা বহির্ভূত শিক্ষার ব্যবস্থার প্রসার (জ) 'স্কুলছুট' নিবারণের জন্য 'মিড-ডে-মিল' জাতীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা (ঞ) সরকারি কর্মকাণ্ডের পাশাপাশি শিক্ষা ও জনসচেতনা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে বেসরকারি ও স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলিকে সামিল করা (ট) শিক্ষা সংক্রান্ত প্রশাসনিক ব্যবস্থার উন্নতি সাধন প্রভৃতি।

বিভিন্ন পরিকল্পনায় মোট জাতীয় উৎপাদন কত শতাংশ শিক্ষাখাতে ব্যয়িত হয়েছে তার একটি তালিকা নিম্নে দেওয়া হল।

	১৯৫১	১৯৭১	১৯৮১	১৯৯১	২০০১
মোট জাতীয় উৎপাদনের শতাংশ হিসাবে শিক্ষাখাতে ব্যয়	০.৬৮	২.৪	৩.০	৪.৩	৪.০০

দেখা যাচ্ছে যে জাতীয় উৎপাদনে অতি সামান্য অংশই শিক্ষাখাতে ব্যয়িত হয়। জাতীয় উৎপাদনের অন্ততঃ ৬% শিক্ষাখাতে ব্যয়ের পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রায় আজও পৌঁছাতে পারা যায় নি। শুধু তাই নয়, বিভিন্ন পরিকল্পনায় শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যয় বরাদ্দের কোন বৈজ্ঞানিক মানদণ্ড নেই। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে প্রথম পরিকল্পনায় এই খাতে মোট ব্যয় বরাদ্দের ৭২% বরাদ্দ ছিল অথচ সপ্তম পরিকল্পনায় তা কমে ৩.২% এ পৌঁছায় অর্থাৎ এই ক্ষেত্রে (ক) বিনিয়োগের প্রতিদান (খ) দক্ষশ্রমিকের প্রয়োজনীয় যোগান সুনিশ্চিত করা অথবা (গ) সংবিধান রচয়িতাদের স্বপ্নপূরণ-এই তিনটি মানদণ্ডের কোনটাই যথাযথভাবে গৃহীত হয়নি।

নিরক্ষরতা হ্রাস, বিভিন্ন ধরনের নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন, প্রশাসনিক কাঠামোর সংস্কার, উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তির অপর্যাপ্ত যোগান ইত্যাদির পরিপ্রেক্ষিতে পরিকল্পনাকালে অনেকাংশে সাফল্য দেখা গেলেও আজও উন্নত

দেশগুলির তুলনায় আমরা অনেক পিছিয়ে আছি। বয়স্ক শিক্ষা, স্ত্রীশিক্ষা ও অনগ্রসর জাতি ও উপজাতির শিক্ষাক্ষেত্রে আজও আমাদের অগ্রগতি হতাশাব্যঞ্জক। আজও প্রাথমিক শিক্ষাকেন্দ্রে গৃহ, পানীয় জল, প্রয়োজনীয়-আসবাবপত্র ইত্যাদির ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়নি। প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্তদের মধ্যে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উপর নির্ভরতা বৃদ্ধি পাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে সরকারের যে সাশ্রয় হওয়ার কথা তা যদি অনগ্রসর শ্রেণীর জন্য বরাদ্দ করা হত তাহলে শিক্ষার অগ্রগতি ত্বরান্বিত হত। এছাড়া, ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে ওঠা বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর শিক্ষার গুণগতমান সুনিশ্চিত করা দরকার। কিন্তু যতক্ষণ-না অপ্রয়োজনীয় ব্যয় কমিয়ে ফিসক্যাল ঘাটতি হ্রাস না সম্ভব হবে, ততদিন শিক্ষাখাতে যথোপযুক্ত ব্যয়বরাদ্দ সম্ভবপর হবে না।

৪.৩ আবাসন

মানুষের তিনটি প্রাথমিক প্রয়োজনের অন্যতম হল বাড়ি বা আবাসন। মানবিক সম্পদের বিকাশ ও গুণগতমান উন্নয়নের ক্ষেত্রে আবাসনের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। পরিকল্পনা কমিশনের মতে গৃহনির্মাণ প্রকল্প সমূহ পরিকল্পনার অনেকগুলি মূল উদ্দেশ্যসাধন করে ঃ 'আশ্রয়স্থল প্রদান করে, স্বাস্থ্য ও শিক্ষাগত লক্ষ্য পূরণে সাহায্য করে; কর্মসংস্থানবৃদ্ধি করে ও অর্থনৈতিক কাজকর্ম দেশব্যাপী ছড়িয়ে দেয়, জীবনযাত্রার মানের বৈষম্য কমিয়ে শহর ও গ্রাম এবং ব্যক্তিগত বিভেদ দূরীকরণের সাহায্য করে, এবং স্বেচ্ছাসঞ্চয় সৃষ্টি করে।'

আবাসন সমস্যার সমাধান উন্নয়নশীল দেশগুলির পক্ষে বেশ জটিল, কেননা আবাসানের একটি ন্যূনতম মান বজায় রাখতে গেলে গৃহনির্মাণের সাথে সাথে জল সরবরাহ ব্যবস্থা, শৌচালয় ও জঞ্জাল পরিষ্কার ব্যবস্থা, জলনিকাশি ব্যবস্থা, বিনোদন, বিদ্যুৎ ইত্যাদির ব্যবস্থাও করা দরকার। গ্রামাঞ্চলে আবার সনাতন প্রথা, জাতপাত, সম্প্রদায়গত ও পারিবারিক কাঠামোগত (যৌথ/একক) বিষয়গুলি এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে। অধিকাংশ গ্রামবাসীর আয়ের স্বল্পতা, প্রয়োজনীয়-অর্থসংগ্রহে অক্ষমতা, জমির তুলনায় দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধি, প্রজাস্বত্বের অনিশ্চয়তা এবং বাড়ি তৈরির উন্নততর উপকরণ সংগ্রহের অসুবিধাসমূহ গ্রামাঞ্চলের আবাসন সমস্যাকে দিনের দিন বাড়িয়ে তুলেছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, ১৯৬১ সালে পরিবারের সংখ্যার তুলনায় আবাসনের ঘাটতি ছিল যেখানে ৩৪ লক্ষ, ১৯৯১ সালে তা বেড়ে দাঁড়ায় ১৩৭ লক্ষে। এর মধ্যে আবার ৩৪ লক্ষ লোকের কোন বাড়িই ছিল না। জনসংখ্যাবৃদ্ধির দরুন বর্তমানে আরও ১১০ লক্ষ আবাসনের দরকার হবে।

আবাসনের আবার কাঠামো ও মালিকানা ভিত্তিক শ্রেণী বিভাগ আছে। কাঠামোগতভাবে আবাসনের চারটি শ্রেণী আছে ঃ (ক) পাকা (খ) আধাপাকা (গ) কাঁচা ও (ঘ) অব্যবহারযোগ্য কাঁচা। পাকা বাড়িতে বসবাসকারী পরিবারের সংখ্যা প্রায় ৪২%, আধাপাকাতে ৩১% এবং কাঁচাবাড়িতে ২৭%। কাঁচা বাড়িগুলি বেশির ভাগই গ্রামাঞ্চলে। অপর দিকে গ্রামাঞ্চলে বেশির ভাগই নিজস্ব মালিকানায়, ভাড়া বাড়ির সংখ্যা শহরাঞ্চলেই বেশি। কাঁচা বাড়ির ক্ষেত্রে সমস্যা হল নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ। আর ভাড়া বাড়ির ক্ষেত্রে সমস্যা হল পরিসেবা সংক্রান্ত ও অন্যান্য বিষয় নিয়ে ভাড়াটে-মালিক বিবাদ।

প্রথম তিনটি পরিকল্পনায় সাধারণভাবে গ্রামঞ্চলে গৃহনির্মানের ক্ষেত্রে কারিগরি সহায়তা ও কমখরচে বাড়ি তৈরির গবেষণার উপর জোর দেওয়া হয়। একই সঙ্গে ১৯৫৭ সালে 'গ্রামীণ-গৃহপ্রকল্পের মাধ্যমে ভূমিহীন কৃষি-শ্রমিকদের বাড়ি তৈরির জায়গা প্রদান এবং নির্বাচিত কিছু গ্রামে রাস্তা ও নর্দমা নির্মাণের কাজ শুরু হয়। চতুর্থ পরিকল্পনায় ১৯৭১ সালে 'গ্রামীণ বাড়ীর জমি তথা গৃহনির্মাণ প্রকল্প' গ্রহণ করা হয় যার মূল উদ্দেশ্য ছিল ভূমিহীন কৃষি-শ্রমিকদের বাড়ির জমির আইনগত অধিকার প্রদান এদের গৃহনির্মাণের জন্য আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা প্রদান। পঞ্চম পরিকল্পনার শেষে উক্ত প্রকল্পের মাধ্যমে ৭৭ লক্ষ পরিবারকে বাড়ির জমি প্রদান করা হয় এবং

৫৬০,০০০ গৃহ নির্মিত হয়। এই সময় থেকে আবাসন প্রকল্পকে "ন্যূনতম প্রয়োজনীয়তা" প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ষষ্ঠ পরিকল্পনায় যে ৬৮ লক্ষ ভূমিহীন কৃষককে তখনও ঐ প্রকল্পের আওতায় আনা যায়নি তাদেরও পুরোপুরি এর আওতায় আনার কথা বলা হয়।

আবাসনের ক্ষেত্রে লক্ষ্যমাত্রায় না পৌঁছাতে পারায় এই সমস্যার সমাধানে ৭ম পরিকল্পনায় এক সুসংহত কার্যক্রমের প্রয়োজনীয়তার উল্লেখ করা হয়। যাতে সরকারি ক্ষেত্রের পাশাপাশি বেসরকারি ক্ষেত্র, সমবায় ক্ষেত্র ও পারিবারিক ক্ষেত্রে অংশগ্রহণ করার উপর জোর দেওয়া হয়। ১৯৮৮ সালে জাতীয় হাউসিং পলিসি' ঘোষিত হয় যেখানে সরকারি ভূমিকাকে সহায়কের মধ্যে সীমিত রেখে বেসরকারি ভূমিকাকে অধিকতর গুরুত্ব দেওয়া হয়। বলা হয় যে, সরকারি ক্ষেত্রের কার্যক্রম শুধুমাত্র গবেষণা, জমিপ্রদান ও নির্বাচিত ক্ষেত্রে আর্থিক সহায়তার মধ্যে সীমিত রেখে বাকি কাজ অন্য ক্ষেত্রগুলির হাতে অর্পন করা দরকার। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় যে 'আবাসন' বিষয়টি রাজ্য সরকারের আওতাভুক্ত হওয়ায় কেন্দ্রীয় সরকারের ভূমিকা এক্ষেত্রে নীতিনির্ধারণ, ঋণ ও অর্থসাহায্য ইত্যাদির মধ্যে সীমিত-প্রকল্প রূপায়নের কাজটি রাজ্য সরকারের উপর ন্যস্ত।

১৯৮৫ সালে গ্রামীণ ভূমিহীন কৃষি শ্রমিক নিয়োগ নিশ্চয়তা প্রকল্পের (RLGEP) অংশ হিসাবে 'ইন্দিরা আবাস যোজনা' প্রবর্তিত হয়। এর সাহায্যে দরিদ্র তফশীলি জাতি ও উপজাতি এবং 'বন্ধন' (bonded) মুক্ত শ্রমিকের বাসস্থানের বন্দোবস্তের কথা হলা হয়। পরবর্তী কালে প্রকল্পটি জওহর রোজগার যোজনার অন্তর্গত হয়। বিভিন্ন রাজ্যসরকার আলাদাভাবে অনগ্রসর শ্রেণীর জন্য কিছু প্রকল্প নিয়েছে। যেমন, ঝাড়খণ্ড সরকারের 'দীনদয়াল' প্রকল্প। যে সমস্ত সংস্থাগুলি গৃহনির্মাণ প্রকল্পের সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট তাদের মধ্যে কতকগুলি হল— আবাসন ও শহর উন্নয়ন কর্পোরেশন (HUDCO), জেনারেল ইনস্যুরান্স কর্পোরেশন (G.I.C), ন্যাশনাল হাউসিং ব্যাঙ্ক (NHB), রষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক সমূহ প্রভৃতি। ১৯৭০ সালে প্রতিষ্ঠিত HUDCO প্রধানত অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল শ্রেণির জন্য গৃহনির্মাণে অর্থপ্রদান করে। GIC গ্রামাঞ্চলে গৃহনির্মাণ প্রকল্পে ঋণপ্রদান করে। সপ্তম পরিকল্পনায় প্রধানত আবাসনপ্রকল্প রূপায়নের অর্থসংগ্রহ এবং গৃহনির্মাণ ঋণদান সংস্থা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে সহায়তার উদ্দেশে NHB প্রতিষ্ঠিত হয়। রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলি, I.C.I.C.I. (Industrial Credit and Investment Corporation of India), I.D.B.I. (Industrial Development Bank of India) প্রভৃতি সংস্থা সুবিধাজনক শর্তে নিজেদের কর্মচারীদের এবং জনসাধারণকে ঋণপ্রদান করে।

গৃহনির্মাণের ক্ষেত্রে গবেষণা ও উন্নয়নমূলক কাজের জন্য উল্লেখযোগ্য কয়েকটি কেন্দ্রীয় সংস্থা হল— ন্যাশনাল বিল্ডিং অর্গানাইজেসন, রিজিওনাল হাউসিং ডেভেলাপমেন্ট সেন্টার, সেন্ট্রাল বিল্ডিং রিসার্চ ইনস্টিটিউট প্রভৃতি।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যে, 'রাজীব গান্ধী গ্রামীণ-বৈদ্যুতিকীকরণ প্রকল্প', 'দশলক্ষ কূয়া প্রকল্প', 'প্রধানমন্ত্রী সড়ক যোজনা' প্রকল্প, 'রাষ্ট্রীয় সমবিকাশ যোজনা' ইত্যাদি প্রকল্পগুলি উত্তম আবাসনের আনুষঙ্গিক প্রয়োজনীয়তা পূরণে সহায়ক হবে বলে আশা করা যায়।

শহরাঞ্চলে আবাসন প্রকল্পে বেসরকারি বিনিয়োগ ক্রমবর্ধমান হলেও গ্রামাঞ্চলে এই ধরনের উদ্যোগ বিশেষ দেখা যায় না। ফলে গ্রামাঞ্চলে আবাসনের ঘাটতি বর্তমানে প্রায় ২ কোটি ইউনিটের মতো। গ্রামীণ আবাসনের যে সব সমস্যাগুলির দিকে বিশেষভাবে নজর দেওয়া দরকার সেগুলি হল ঃ

(ক) গ্রামীণ পরিবেশের উপযোগী কম খরচে এমন গৃহনির্মাণ পদ্ধতি আবিষ্কার করা যেখানে স্থানীয় উপকরণের সাহায্যে গৃহনির্মাণ করা যাবে। দেশের ভৌগোলিক তথা আর্থ-সামাজিক পরিবেশের বিভিন্নতার ব্যাপারটাও এক্ষেত্রে নজর রাখতে হবে।

(খ) একই সাথে এই ধরনের নতুন পদ্ধতির যথোপযুক্ত প্রয়োগের উপযুক্ত প্রশিক্ষণ দেওয়া এবং এই ধরনের প্রযুক্তি গ্রহণের মানসিকতা গড়ে তোলাও জরুরি।

(গ) আবাসনের আনুষঙ্গিক পরিকাঠামো (যেমন, রাস্তা, বিদ্যুৎ, জলনিকাশি ব্যবস্থা ইত্যাদি) গড়ে তোলার দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

(ঘ) আবাসন প্রকল্পকে বিচ্ছিন্নভাবে না দেখে সার্বিক গ্রামীণ উন্নয়ন প্রকল্পের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসাবে গণ্য করা দরকার।

সর্বোপরি মনে রাখা দরকার যে সরকারি প্রকল্পগুলির রূপায়ণ যথাযথভাবে না হ'লে দরিদ্র ও অনগ্রসর শ্রেণির আবাসন সমস্যার সমাধান সুদূর পরাহত। বস্তুত সঠিক রূপায়ণের সমস্যাটি সার্বিকভাবে আমাদের পরিকল্পিত উন্নয়নের একটি প্রধান সমস্যা।

৪.৪ স্বাস্থ্য

স্বাস্থ্যের সঠিক সংজ্ঞা নিয়ে নানা মুনির নানা মত। এক্ষেত্রে সবচেয়ে কম বিতর্কিত সংজ্ঞাটি হল বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (WHO) প্রদত্ত সংজ্ঞা ঃ

"স্বাস্থ্য হল এমন একটি অবস্থা যে পূর্ণ শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক কুশলতা বজায় থাকে, কেবলমাত্র রোগহীনতা ও শারীরিক সক্ষমতা বজায় থাকাই যথেষ্ট হয়।" সুতরাং ব্যাপক অর্থে স্বাস্থ্যোন্নয়নের বিষয়টি আর্থ-সামাজিক ন্যায় ও বিকাশের সঙ্গে জড়িত। এই কারণে উন্নয়নের "মানবিক উন্নয়ন সূচক"-এর অন্যতম বিষয় হিসাবে স্বাস্থ্যকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

প্রকৃতপক্ষে স্বাস্থ্য ও উন্নয়ন অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। আর্থিক উন্নয়নের ফলে যেমন জনসাধারণের ক্রয়ক্ষমতা বাড়ে ও স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটে, তেমনি স্বাস্থ্যের উন্নতির ফলে কর্মক্ষমতা বাড়ে, গড় আয়ু বাড়ে ও স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটে, (ফলে জনসংখ্যার মধ্যে উৎপাদনক্ষম ব্যক্তিদের সংখ্যা বাড়ে), 'রোগজনিত কর্মসময়ের অপচয়' কম হয় ইত্যাদি। মানবিক সম্পদের বিকাশে সহায়তা করে বলে বর্তমানে এইখাতে ব্যয়কে বিনিয়োগ বলে ধরা হয়।

বর্তমানে বিশ্বে স্বাস্থ্য পরিষেবা সংক্রান্ত প্রধানত তিনটি মডেল দেখা যায়—আমেরিকান বা 'রেগান' মডেল, কিউবা বা 'ক্যাস্ত্রো' মডেল ও বৃটিশ মডেল।

আমেরিকান মডেলে গরিব ও বৃদ্ধদের জন্য নির্দিষ্ট কিছু সরকারি পরিষেবা ছাড়া গোটাটাই বেসরকারি ইনসুরেন্স কোম্পানি প্রদত্ত পরিষেবা। সেজন্যে ঐ দেশে বেসরকারি চিকিৎসা ও হাসপাতালের প্রাধান্য রয়েছে।

কিউবা মডেলে সমস্ত পরিষেবাটাই সরকারের তত্ত্বাবধানে সরকারি ইনস্যুরেন্স কোম্পানি দ্বারা সর্বসাধারণের কাছে পৌঁছায়।

ব্রিটিশ মডেলে সরকারিভাবে সর্বসাধারণের জন্য প্রায় নিখরচায় পরিষেবার পাশাপাশি বেসরকারি ইনস্যুরেন্স কোম্পানি ও বেসরকারি পরিষেবাও বর্তমান। এছাড়া, পরিষেবা সংক্রান্ত 'কানাডা মডেল'টিকে আমেরিকান ও কিউবা মডেলের সংমিশ্রণ বলা হয়।

পরিকল্পনার শুরু থেকেই আমাদের দেশে ব্রিটিশ মডেলটি অনুসৃত হলেও আমেরিকান মডেলের দিকে ঝোঁকার কিছুটা প্রবণতা দেখা যাচ্ছে।

পরিকল্পনার প্রাক্কালে অন্যান্য অনুন্নত দেশের মতই এদেশের জনস্বাস্থ্যের চিত্রটি ছিল করুণ। উচ্চ মৃত্যুহার (বিশেষত শিশুমৃত্যুহার), স্বল্প গড় আয়ু, অপুষ্টি ও দূষণজনিত রোগ, নিবারণযোগ্য সংক্রামক রোগের ব্যাপক প্রকোপ, স্বাস্থ্যবিধি সম্পর্কে অনীহা ও অসচেতনা প্রভৃতি সমস্যাগুলির ব্যাপকতা শুধু গ্রামাঞ্চলেই সীমিত ছিল না।

এই নিদারুণ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে প্রথম পরিকল্পনায় ১৯৪৩ সালে নিযুক্ত 'ভোরে কমিটি'র স্বাস্থ্যপরিষেবা সংক্রান্ত সুপারিশগুলি কার্যকরী করার প্রচেষ্টা শুরু হয়। কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী ১৯৫২ সালে প্রথম প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র স্থাপিত হয় এবং বৃহত্তর পরিষেবার জন্য পর্যায়ক্রমে ব্লক ও জেলাস্বাস্থ্য পরিষেবা কেন্দ্রের ব্যবস্থা গৃহীত হয়। একই সঙ্গে কয়েকটি সংক্রামক রোগের প্রকোপের ব্যাপকতা নিবারণের জন্য জাতীয় ম্যালেরিয়া নিয়ন্ত্রণ, জাতীয়-কুষ্ঠব্যাধি নিবারণ প্রকল্প ইত্যাদি গৃহীত হয়। উচ্চ জন্মহার নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে এই সময় জাতীয় পরিবার নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচীও গৃহীত হয়।

পরবর্তী পরিকল্পনাগুলিতেও দেশব্যাপী স্বাস্থ্য পরিসেবা সম্প্রসারণের সাথে সাথে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত স্বাস্থ্য কর্মী গড়ে তোলার দিকেও জোর দেওয়া হয়। ১৯৬১ সালে মুদালিয়র কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী জেলাহাসপাতাল-গুলির উন্নয়নের ও ভ্রাম্যমাণ ক্লিনিকের ব্যবস্থা গৃহীত হয়। তৃতীয় পরিকল্পনাকালে ১৯৬২ সালে জাতীয় যক্ষা নিবারণ প্রকল্প গৃহীত হয়। ১৯৬৬ সালে 'পরিবার নিয়ন্ত্রণ' কর্মসূচীকে পরিবর্ধিত করে এর সঙ্গে শিশু ও গর্ভবতী মায়েরও স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য 'পরিবার কল্যাণ' প্রকল্প গ্রহণ করা হয়।

চতুর্থ পরিকল্পনায় অপুষ্টিজনিত রোগ নিবারণের উদ্দেশ্যে 'কার্যকরী পুষ্টিকরণ' প্রকল্প, ভিটামিন 'এ'র স্বল্পতার দরুন অন্ধত্ব নিবারণ প্রকল্প ইত্যাদি কর্মসূচী গৃহীত হয়। ১৯৮১ সালে এই প্রকল্পটির নতুন নামকরণ করা হয় 'অন্ধত্ব নিবারণের জাতীয় কর্মসূচী'।

পঞ্চম পরিকল্পনায় বিভিন্ন স্বাস্থ্যপ্রকল্পগুলির সুসংহত রূপায়ণের জন্য 'বহু উদ্দেশ্যসাধক কর্মী' নিয়োগের উপর জোর দেওয়া হয়। ১৯৭৭ সালে জনস্বাস্থ্য প্রকল্পগুলির সঙ্গে জনগণের যোগসূত্র সাধনের জন্য "স্বাস্থ্যস্বেচ্ছাকর্মী' প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। 'পুষ্টিস্বাস্থ্য (Nutrition Health) শিক্ষা ও পরিবেশ পরিচ্ছন্নতা (Sanitation)' প্রকল্পের মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে স্বাস্থ্য সচেতনতার শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়। এই ধরনের স্বাস্থ্যশিক্ষার মূল উদ্দেশ্য হল যে জনসাধারণকে বিভিন্ন রোগ সম্পর্কে অবহিত করা, প্রাথমিক পর্যায়ে রোগ নির্ণয় সম্পর্কে ধারণা তৈরি করা, রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা সম্পর্কে জ্ঞানপ্রদান, সমাজে স্বাস্থ্যকর পরিবেশ গড়ে তোলার কার্যকরী উপায় সম্পর্কে অবহিত করা ইত্যাদি। পঞ্চম পরিকল্পনায় "ন্যূনতম প্রয়োজন" প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন স্বাস্থ্য প্রকল্পগুলিকে আনা হয়। ১৯৭৮ সালে 'টিকাকরণ কর্মসূচীর সম্প্রসারণ' প্রকল্প গৃহীত হয়।

১৯৭৮ সালে পূর্বতন সোভিয়েট রাশিয়ার আলমা-আটার (Alma-Ata) বিশ্ব সম্মেলনে যে প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা ঘোষণা করা হয় তাতে ভারতও ছিল অন্যতম স্বাক্ষরকারী দেশ। "সবারই জন্য স্বাস্থ্য" (Health For All)—এই ঘোষণা অনুযায়ী ২০০০ সালের মধ্যে সারা দেশে প্রতিটি পরিবারের কাছে প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিষেবা পৌঁছানোর লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হয়। এই স্বাস্থ্য পরিষেবার মধ্যে জনস্বাস্থ্য সম্পর্কিত শিক্ষা, উপযুক্ত পরিপুষ্টির খাদ্যের নিশ্চয়তা, পানীয় জল, শৌচাগার ও জলনিকাশীর ব্যবস্থা, পরিবার কল্যাণমূলক ব্যবস্থা, সংক্রামক ব্যাধি নিবারণের ব্যবস্থা, অত্যাবশ্যক ঔষধ সরবরাহ প্রভৃতি বিষয়গুলি অন্তর্ভুক্ত।

১৯৮৩ সালে জাতীয় স্বাস্থ্যনীতি ঘোষিত হয় যাতে স্বাস্থ্যকেন্দ্রের প্রসার, স্বাস্থ্যকর্মীদের প্রশিক্ষণ, পরিবেশদূষণরোধ প্রভৃতি ব্যবস্থা গ্রহণের পাশাপাশি উপজাতি অধ্যুষিত এলাকা, পার্বত্যঅঞ্চল ও অনুন্নত এলাকাগুলিতে স্বাস্থ্যপরিষেবা সম্প্রসারণের উপর বিশেষ জোর দেওয়ার কথা বলা হয়। সপ্তম পরিকল্পনায় এই উদ্দেশ্যে কতকগুলি লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হয়। সমতল এলাকা ও পার্বত্য/উপজাতি অধ্যুষিত এলাকা যথাক্রমে প্রতি ৫০০০ জন ও ৩০০০ জন পিছু একটি উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র; প্রতি ৩০,০০০ জন পিছু ও ২০০০০ জন পিছু একটি প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র; প্রতি ১ লাখ জন পিছু ও প্রতি ব্লকে একটি সমষ্টি (Community) স্বাস্থ্যকেন্দ্র স্থাপনের লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হয়।

পরবর্তী পরিকল্পনাগুলিতে কিন্তু জনস্বাস্থ্যের তুলনায় বেশি নজর দেওয়া হয় পরিবার কল্যাণ প্রকল্পের দিকে। একই সঙ্গে চিরাচরিত ও কম ব্যয়বহুল চিকিৎসা পদ্ধতিগুলির (যথা, আয়ুর্বেদিক, হোমিওপ্যাথি, ইউনানী ইত্যাদি) প্রসার ও উন্নতিকল্পে ব্যবস্থা নেওয়া হয়। "জাতীয় স্বাস্থ্য নীতি" অনুসারে স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলিকে স্বাস্থ্যপরিষেবা সম্প্রসারণ কর্মসূচীতে শামিল করার জন্য উৎসাহ ও সাহায্য প্রদান করা হয়। "পাল্‌স পোলিও" অভিযান ইত্যাদি কর্মসূচীতেও এদের সাহায্য নেওয়া হয়।

বেসরকারি স্বেচ্ছা সংগঠনের উদ্যোগে গৃহীত কতকগুলি উল্লেখযোগ্য প্রকল্প হল— জামগেড়ের গ্রামীণ স্বাস্থ্য প্রকল্প, AWARE (Action for Welfare and Awakening in Rural Environment) প্রকল্প, পশ্চিমবঙ্গের সিনি (CINI) পরিচালিত শিশু প্রকল্প, কেরালা ও কন্যাকুমারিকায় 'দশলক্ষ লোকের স্বাস্থ্য' প্রকল্প, মধ্যপ্রদেশের রায়গড়ে জনস্বাস্থ্য প্রকল্প প্রভৃতি। এছাড়া রামকৃষ্ণমিশন, ভারতসেবাশ্রম প্রমুখ ধর্মীয় সংগঠনগুলিরও জনসাধারণের জন্য স্বাস্থ্যপরিষেবার ক্ষেত্রে যথেষ্ট অবদান রয়েছে।

এবার এক নজরে দেখে নেওয়া যাক বিভিন্ন পরিকল্পনায় সরকারি খাতে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ খাতে কতটা ব্যয় করা হয়েছে ঃ

	(ক) পরিকল্পনায় মোট ব্যয়	(খ) স্বাস্থ্য খাতে ব্যয় (শতাংশ হিসাবে)	(গ) পরিবার স্বাস্থ্য ও পরিকল্পনা খাতে ব্যয় (শতাংশ হিসাবে)
প্রথম পরিকল্পনা (১৯৫১-৫৬)	১৯৬০ কোটি	৩.৩১	৩.৭৭
দ্বিতীয় পরিকল্পনা (১৯৫৬-৬১)	৪৬৭২ কোটি	৩.০১	৩.১২
তৃতীয় পরিকল্পনা (১৯৬১-৬৬)	৮৫৭৬ কোটি	২.৬৩	২.৯২
চতুর্থ পরিকল্পনা (১৯৬৯-৭৪)	১৫,৭৭৯ কোটি	২.১৩	৩.৮৯
*পঞ্চম পরিকল্পনা (১৯৭৪-৭৯)	৩৯,৪২৬ কোটি	১.৯৩	৩.১৮
ষষ্ঠ পরিকল্পনা (১৯৮০-৮৫)	১০৯,২৯২ কোটি	১.৮৫	৩.১২
সপ্তম পরিকল্পনা (১৯৮৫-৯০)	২১৮,৭৩০ কোটি	১.৬৯	৩.১২
অষ্টম পরিকল্পনা (১৯৯২-৯৭)	৪৩৪,১০০ কোটি	১.৭৫	৩.৪২
**নবম পরিকল্পনা (১৯৯৭-২০০১)	৬৩৫,০৭৩ কোটি	২.৫১	৪.১৪

***এই সব ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের পরিবর্তনের ফলে পরিকল্পনার সময়সীমা পরিবর্তিত হয়।**
****মাঝে কয়েক বছর বার্ষিকী পরিকল্পনা গৃহীত হয়।**
সূত্র ঃ নবম পরিকল্পনা (দ্বিতীয় খণ্ড); ইকনমিক সার্ভে (২০০২-০৩)।

উপরোক্ত তালিকা থেকে দেখা যাচ্ছে যে, (ক) স্বাস্থ্য ও পরিকল্পনা খাতে মোট ব্যায়ের পরিমাণ বাড়লে শতাংশ হিসাবে খুবই কম এবং (খ) পরিবার পরিকল্পনাখাতে ব্যয়ের পরিমাণ (অর্থাৎ (গ)-(খ) তুলনামূলকভাবে বেশি বাড়ায় স্বাস্থ্য খাতে কম শতাংশ ব্যয়িত হচ্ছে। স্বাস্থ্য পরিষেবা উন্নয়নের ক্ষেত্রে এই ব্যয় প্রয়োজনের তুলনায় খুবই কম। প্রয়োজনীয় অর্থসংগ্রহের উদ্দেশ্যে বর্তমানে উৎপাদনের উপর "স্বাস্থ্য সেস" বসানোর কথা ভাবা হচ্ছে।

এখন দেখা যাক, স্বাস্থ্য পরিষেবার ক্ষেত্রে কি ধরনের অগ্রগতি ঘটেছে। এক্ষেত্রে আমরা চারটি স্বাস্থ্য নির্দেশিকার সাহায্য নিচ্ছি : (ক) শিশুমৃত্যুর হার (খ) মৃত্যুহার ও জন্মহার (গ) গড় আয়ু (ঘ) প্রতি দশ হাজার জনের জন্যে রেজিস্টার্ড ডাক্তারে সংখ্যা। এই সব ক্ষেত্রে ১৯৫০ সাল থেকে প্রতি বিশ বছর অন্তর কি পরিবর্তন ঘটেছে তা নীচের তালিকায় দেখান হল।

স্বাস্থ্য নির্দেশিকা সমূহ	১৯৫০	১৯৭০	১৯৯০
শিশু মৃত্যুর হার	১৪০	১৩৬	৯৪
মৃত্যুহার	২৭.৪	১৪.৯	৯.৮
জন্মহার	৩৯.৯	৩৬.৯	২৯.৫
প্রতি দশ হাজার জনসংখ্যার জন্য রেজিস্টার্ড ডাক্তার	১.৭	২.৮	৪.৭
জন্মের পরই প্রত্যাশিত আয়ু			
(ক) পুরষ	৩২.৫	৪৬.৪	৫৮.৬
(খ) মহিলা	৩১.৭	৪৪.৭	৫৯.০
মোট	**৩২.১**	**৪৫.৬**	**৫৮.৭**

সূত্র : R. Dutta ও KPM. Sundharam : Indian Economy (২০০৪ সংস্করণ)।

উপরোক্ত তালিকা থেকে দেখা যাচ্ছে যে : (ক) শিশু মৃত্যুর হার কমছে (খ) সাধারণ মৃত্যুহার কমছে (গ) জন্মহার কমছে (ঘ) জনসংখ্যা পিছু ডাক্তারের সংখ্যা বাড়ছে (ঙ) গড় আয়ু বাড়ছে। অর্থাৎ আমাদের নির্দেশিকা অনুযায়ী স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটছে। একই সঙ্গে মনে রাখা প্রয়োজন এক্ষেত্রে অনেক ঘাটতি ও ত্রুটি রয়ে গেছে।

প্রথমত, মৃত্যুহার ও জন্মহারের ক্ষেত্রে উন্নত দেশগুলির ধারে কাছে আজও আমরা পৌঁছাতে পারিনি। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে যেখানে উন্নত দেশগুলিতে শিশুমৃত্যুর গড়পড়তা হার মাত্র ৬, সেখানে বর্তমানে এ দেশে তা হল ৬৯।

দ্বিতীয়ত, আমাদের দেশে স্বাস্থ্য পরিষেবায় নানাধরনের বিভিন্নতা— যথা গ্রাম-শহর ভিত্তিক, আয়গত ও লিঙ্গগত পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়।

মোট হাসপাতালের ৮৪% এবং রেজিস্টার্ড ডাক্তারের ৭৫% ভাগই শহরাঞ্চলে থাকায় শহরবাসীদের চিকিৎসার সুযোগ অনেক বেশি। তাছাড়া তুলনামূলকভাবে দারিদ্র্যসীমার নীচে অবস্থিত জনগণের মধ্যে গ্রামবাসীর সংখ্যা বেশি হওয়ায় তারা ব্যয়বহুল চিকিৎসার খরচও বহন করতে পারে না, উপরন্তু অপুষ্টিজনিত ও অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ জনিত রোগের সহজ শিকারে পরিণত হয়।

সমাজে সাধারণভাবে মহিলারা সমান মর্যাদা পায়না ও প্রায়শ অবহেলার বস্তু হয় বলে এদের মধ্যে রোগাক্রান্তের হার (Morbidity rate) ও মৃত্যুর হার পুরুষদের তুলনায় বেশি হয়।

তৃতীয়ত, স্বাস্থ্য পরিষেবার ফলাফলের ক্ষেত্রে যথেষ্ট রাজ্যগত বৈষম্য দেখা যায়। যেমন, কেরালায় শিশু মৃত্যুহার যেখানে মাত্র ১৩ সেখানে ওড়িশ্যায় তা ১১০।

চতুর্থত, আমাদের স্বাস্থ্য পরিষেবাকে সার্বিক বলা যায় না। স্বাস্থ্য পরিষেবা বলতে তিন ধরনের পরিষেবা বোঝায়— প্রতিরোধ বা নিবারণমূলক (Preventive), নিরাময়মূলক (Curative) এবং উন্নয়নমূলক (Promotional)। প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা হল যাতে রোগের সংক্রমণ না ঘটে সে জন্য আগে থেকেই টীকা প্রদান ইত্যাদি ব্যবস্থা নেওয়া। নিরাময়মূলক ব্যবস্থা হল রোগ নির্ণয় ও উপযুক্ত ওষুধ ইত্যাদির দ্বারা রোগনিরাময়ের ব্যবস্থা। উন্নয়নমূলক ব্যবস্থা হল জীবনযাত্রার পরিমাণগত ও গুণগত মানোন্নয়নের দ্বারা জনস্বাস্থ্যের উন্নতিসাধন করা। আমাদের ক্ষেত্রে পরিষেবায় প্রধানত নিরাময়মূলক ব্যবস্থার উপর জোর দেওয়া হয়।

পঞ্চমত, আমাদের স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলি বিশেষত— গ্রামীণ কেন্দ্রগুলি নানা সমস্যায় জর্জরিত বলে স্বাস্থ্য পরিষেবা দরিদ্র জনসাধারণের কাছে ঠিকমতো পৌঁছায় না। ডাক্তার ও অন্যান্য স্বাস্থ্যকর্মীর অপ্রাচুর্য, ওষুধপত্র ও অন্যান্য পরিকাঠামোর সমস্যা, স্বাস্থ্য কর্মীদের ব্যবহারে আন্তরিকতা, সহযোগিতা ও সহৃদয়তার অভাব ইত্যাদি কারণের জন্য এই অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। ফলে আজও অনেকক্ষেত্রে হাতুড়ে ডাক্তার, ওঝা, গুণিনরাই ভরসা হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাছাড়া, শহরাঞ্চলেও উপযুক্ত নজরদারির অভাবে ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে ওঠা ডাক্তারি-পরীক্ষাকেন্দ্র ও নার্সিংহোমগুলিতেও সঠিক ভাবে রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসা হয় না।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় যে, স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে আর্থিক উন্নয়নের ধনাত্মক প্রভাবের মতই কিছু ঋণাত্মক প্রভাবও আছে। শিল্পায়নের ফলে (ক) শ্রমিকদের মধ্যে কর্ম সংশ্লিষ্ট রোগ বৃদ্ধি পায়; (খ) পরিবেশ দূষিত হয়; (গ) কৃষিক্ষেত্রে কীটনাশক ঔষধের নির্বিচার ব্যবহারের কুফল দেখা দেয় (ঘ) সেচ ব্যবস্থার দরুন জলবাহিত ও পতঙ্গবাহিত রোগের বিস্তার ঘটে প্রভৃতি বিষয়গুলি স্বাস্থ্যের উপর কুপ্রভাব ফেলে।

সর্বোপরি মনে রাখা দরকার যে শুধুমাত্র স্বাস্থ্য পরিষেবার উন্নতি হলেই প্রকৃত অর্থে জনস্বাস্থ্যের উন্নয়ন ঘটবে না। তারজন্য দারিদ্র্য, বেকারত্ব, নিরক্ষরতা, যোগাযোগ ব্যবস্থা, মহিলাদের সামাজিক মর্যাদা প্রভৃতি বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক সমস্যাগুলির মোকাবিলার জন্য এক সুসংহত দৃষ্টিভঙ্গী ও আন্তরিক প্রচেষ্টার প্রয়োজন আছে।

৪.৫ শ্রেণীগত/জাতিগত সমতা

সমাজ বিজ্ঞানে, সমাজে শ্রেণী বিন্যাস বলতে এমন পদ্ধতি বোঝায় যার দ্বারা ব্যক্তিদের মধ্যে সম্মান, ধন ও ক্ষমতা আনুযায়ী বিভাজন করা হয়। এই বিভাজন পদ্ধতি অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, কর্মবন্টন, শিক্ষাদীক্ষা, ধর্মীয় ও সামাজিক রীতিনীতি ইত্যাদি নানা বিষয় দ্বারা প্রভাবিত হয়। সামাজিক স্তর বিন্যাস প্রধানত দুই ধরনের শ্রেণীগত ও বর্ণ বা জাতিগত। শ্রেণী বিন্যাসে শ্রেণীগুলি খোলামুখযুক্ত (openended), অপরদিকে জাতিগত বিভাজন আবদ্ধ (closed)। শ্রেণীবিন্যাস জন্মভিত্তিক নয় বরং অর্জিত অবস্থাভিত্তিক বলে এধরনের শ্রেণীবিন্যাস আবদ্ধ নয়। অপরদিকে, জাতিগত শ্রেণীবিন্যাস জন্মভিত্তিক বলে সেখানে শ্রেণীর সদস্যদের অবস্থা ধর্মীয় রীতি ইত্যাদি পূর্বনির্দিষ্ট বা আবদ্ধ।

মার্কস-এর মতে পূর্ণ সমাজতন্ত্রের আগে সমাজে প্রধানতঃ দুটি শ্রেণী থাকে-শোষক ও শোষিত। অর্থনৈতিকভাবে বর্তমানে প্রধানতঃ চার ধরনের শ্রেণী আছে-উচ্চবিত্ত বা ধনী, মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত ও দারিদ্র্যসীমার নীচে অবস্থিত জনগণ। দারিদ্র্যদূরীকরণের জন্য পরিকল্পনায় গৃহীত ব্যবস্থাগুলি ইতিপূর্বে 'দারিদ্র্য' সম্পর্কিত ইউনিটে-আলোচিত হয়েছে। এখানে আমরা তফশীলিজাতি ও উপজাতি নিয়ে আলোচনা করব।

প্রাচীনকালে আমাদের সমাজে সামাজিক পদমর্যাদার ক্রমঅনুসারে চার ধরনের জাতি (caste) দেখা যেত— ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র। জাতিগত বিন্যাসে যে কোন জাতির নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি দেখা যায় ঃ (ক) সমজাতীয় বিবাহপ্রথা (endogamy) (খ) জন্মভিত্তিক কর্ম, (গ) চিরাচরিত সামাজিক প্রথার বশবর্তীতা,

(ঘ) সমাজপতি বা মোড়লের আধিপত্য, (ঙ) জন্মগতভাবে নির্ধারিত সামাজিক পদমর্যাদা প্রভৃতি। নানাধরনের পরিবর্তনের যথা— ধর্মীয় আন্দোলন, বাণিজ্যিক অর্থনীতির প্রসার, সমাজ সংস্কারমূলক আন্দোলন, রাজনৈতিক আন্দোলন, শিক্ষাদীক্ষার প্রসার প্রভৃতি ফলে এই বর্ণভেদ প্রথা বর্তমানে অনেকটা শিথিল হলেও গ্রামাঞ্চলে বিশেষতঃ নিম্নবর্ণের ক্ষেত্রে আজও অনেকটাই সক্রিয়।

এখন দেখা যাক, 'তফশীলি জাতি' বলতে কি বোঝায়। 1936 সালে ব্রিটিশ সরকার প্রশাসনিক ও আইনগত দৃষ্টিভঙ্গীতে কিছু নিপীড়িত শ্রেণীকে 'তফশীলি' বলে চিহ্নিত করেন। এই শ্রেণিকে চিহ্নিত করার ভিত্তি হিসাবে (ক) ব্রাহ্মণ, ধোপা, নাপিত ইত্যাদির সেবা থেকে বঞ্চনা, (খ) শিক্ষা, কূয়ো ও রাস্তা ব্যবহার, মন্দিরে প্রবেশ ইত্যাদির অধিকার থেকে বঞ্চনা, (গ) অস্পৃশ্যতা ইত্যাদি মানদণ্ড ব্যবহার করা হয়। ভারতীয় সংবিধানে 341 নং ধারা অনুযায়ী রাষ্ট্রপতিকে কোন জাতিকে 'তফশীলি জাতি' ঘোষণার অধিকার দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ সংবিধান অনুযায়ী 'তফশীলি জাতির' চিহ্নিতীকরণ ঘটে।

'তফশীলি জাতির' জন্য কিছু সাংবিধানিক রক্ষাকবচ আছে। যথা—

(ক) শিক্ষাগত রক্ষাকবচ : 15(4) অনুচ্ছেদে তফশীলি জাতিদের শিক্ষার ক্ষেত্রে বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এদের জন্য আসন সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থার কথা উল্লিখিত আছে।

(খ) সামাজিক রক্ষাকবচ : 17 নং অনুচ্ছেদে তফশীলি জাতিদের প্রতি অস্পৃশ্যতার বিলোপ, 23 নং অনুচ্ছেদে বাধ্যতামূলক বা বেগার প্রথার অবসান, 24 নং অনুচ্ছেদে শিশুশ্রম নিবারণ, 25(2) অনুচ্ছেদে মন্দিরে প্রবেশাধিকার এবং 15(2) ধারা জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত সর্বস্থানে সমানাধিকার স্বীকৃত হয়েছে।

(গ) অর্থনৈতিক রক্ষাকবচ : সংবিধানে তফশীলি জাতির অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য রাষ্ট্রকর্তৃক বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণের কথা বলা হয়েছে। এইসঙ্গে সামাজিক অধিকার ও সবধরনের শোষণের হাত থেকে রক্ষার কথা ঘোষিত হয়েছে।

(ঘ) রাজনৈতিক রক্ষাকবচ : সংবিধানের 330, 332 ও 334 ধারায় লোকসভা, বিধানসভা প্রভৃতিতে তফশীলি জাতির জন্য আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থার কথা বলা হয়েছে।

(ঙ) কর্মসংস্থানজনিত রক্ষাকবচ : সংবিধানে অনগ্রসর শ্রেণীর বিশেষত তফশীলি জাতি ও উপজাতির জন্য কর্মক্ষেত্রে সংরক্ষণের কথা বলা হয়েছে।

সংবিধানের 338 নং অনুচ্ছেদে রাষ্ট্রপতিকে 'তফশীলি জাতির' জন্য কমিশনার নিয়োগের কথা বলা হয়েছে যাঁর দায়িত্ব হবে রক্ষাকবচগুলি ঠিকমতো কার্যকরী হচ্ছে কিনা সে সম্বন্ধে নজর রাখা ও রাষ্ট্রপতিকে অবহিত করা।

জনসংখ্যার প্রায় 15% হল এই 'তফশীলি জাতি' যারা অর্থনৈতিক ভাবে সবচেয়ে অনগ্রসর ও শোষিত এবং সামাজিক ভাবে সবচেয়ে নীচু জাতি। সবধরনের অপরাধের সহজতম শিকার হল এই 'তফশীলি জাতি'।

বেঁচে থাকার ন্যূনতম প্রয়োজন মেটানোয় অক্ষম এই জাতির প্রধান জীবিকা হল কৃষিশ্রমিক, প্রান্তিক চাষী, চর্মকার, মেথর ইত্যাদি। শিক্ষাদীক্ষার দিক থেকেও সবচেয়ে পিছিয়ে। সর্বভারতীয় সাক্ষরতার হার থেকে এরা অন্তত 20% পিছিয়ে থাকে। 'তফশীলি জাতির' মহিলাদের ক্ষেত্রে সাক্ষরতার হার মাত্র 11%।

তপশীলি উপজাতি (tribe) বা সাধারণ ভাষায় আদিবাসী বলতে বোঝায় সংবিধানের 342 অনুচ্ছেদে উল্লিখিত সম্প্রদায়কে। সাধারণতঃ এই শ্রেণীর অন্তর্গত করার ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির ওপর নজর দেওয়া হয়—

(ক) এদের পৃথক ভাষা, ধর্মীয় রীতিনীতি ও সাংস্কৃতিক আদিম জনজাতির বৈশিষ্ট্যময় হবে।

(খ) সমাজের মূল স্রোতের সঙ্গে এরা যোগসূত্রবিহীন।

(গ) শিক্ষায় ও অর্থনৈতিকভাবে এরা খুবই অনগ্রসর।

কোন উপজাতিকে তফশীলের অন্তর্ভুক্ত করার ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির ওপর ন্যস্ত।

সংবিধানে এদের জন্য নানা রক্ষাকবচের ব্যবস্থা রয়েছে। যেমন 46 নং অনুচ্ছেদে রাষ্ট্রকে এদের শিক্ষার ক্ষেত্রে সংরক্ষণ ও অন্যান্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণের কথা আছে। 164 নং অনুচ্ছেদে আদিবাসী অধ্যুষিত রাজ্যগুলিতে এদের কল্যাণের দিকে লক্ষ্য রাখার জন্য আলাদা মন্ত্রকের ব্যবস্থা আছে। এদের জন্য বিশেষ উন্নয়নমূলক কাজের জন্য প্রতি মন্ত্রকেরই একটি আলাদা দপ্তরের ব্যবস্থা আছে। সংবিধানের ষষ্ঠ তফশিল অনুযায়ী এই তফশিলের অন্তর্গত আদিবাসী-অধ্যুষিত অঞ্চলগুলির বিশেষ সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক স্বাধীনতা প্রদানের কথা বলা হয়েছে। জমিপ্রদান, বনাঞ্চল ও খালের ব্যবহার, ভূমিরাজস্ব, লাইসেন্স প্রদান ইত্যাদি নানাক্ষেত্রে স্বশাসিত কাউন্সিলের মাধ্যমে কাজকর্ম করার স্বাধীনতা ঐ সব অঞ্চলগুলিকে দেওয়া হয়েছে।

সারা ভারতে অঞ্চলভেদে নানাধরনের আদিবাসী আছে যাদের মধ্যে ধর্মীয় রীতিনীতি, বিবাহপ্রথা ইত্যাদি বিষয়ে যথেষ্ট পার্থক্য আছে। খাসি, গারো, ওঙ্গো, বিরহর, কোল, ভিল, মুণ্ডা, মারিয়া, কুরুম্ভ, কাদর, শবর প্রভৃতি নানাধরনের আদিবাসী সারা ভারতে পাহাড়ে পর্বতে, বনে জঙ্গলে, দ্বীপে, সমতটে ছড়িয়ে আছে। মোট জন সংখ্যার প্রায় 8% হল আদিবাসী বা তফশীলি উপজাতি।

এবার দেখা যাক পরিকল্পনাকালে তফশীলি জাতি ও উপজাতির উন্নয়নের জন্য কি কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। তফশীলি জাতি ও উপজাতির উন্নয়নের জন্য গৃহীত কতকগুলি ব্যবস্থায় কথা নিম্নে উল্লেখ করা হল।

দেশের সর্বত্র প্রাথমিক বিদ্যালয় ও প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের স্থাপনার মধ্যে নিরক্ষরতা দূরীকরণ ও স্বাস্থ্য পরিষেবার বিস্তার ঘটানোর সুফলও এদের মধ্যে পৌঁছোনোর ব্যবস্থা করা হয়, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তফশীলি জাতির জন্য 15% ও উপজাতির জন্য 7.5% আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। নানাধরণের স্কলারশিপ প্রদান ও অন্যান্য অনুদানের মাধ্যমে শিক্ষার ব্যাপারে উৎসাহ প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ষষ্ঠ-পরিকল্পনায় উন্নয়নের ক্ষেত্রে যাতে এরা সমানভাবে অংশগ্রহণ করতে পারে এবং উন্নয়নের সুফলের ভাগীদার সমানভাবে হয় সে জন্য বিশেষ উপাদান (component) পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। এর মাধ্যমে বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রয়োজনভিত্তিক নির্দিষ্ট প্রকল্পের মাধ্যমে পরিকল্পনার সুফল এদের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। প্রতিটি মন্ত্রকে এদের জন্য গৃহীত প্রকল্পগুলির অর্থ যোগানের দায়িত্ব নেয় রাজ্য সরকার, কেন্দ্রীয় সরকার, ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলি। বিভিন্ন রাজ্যে তফশীলি জাতি উন্নয়ন কর্পোরেশন স্থাপনের মাধ্যমে এদের মধ্যে সংগঠন নৈপুণ্য গড়ে তোলার পাশাপাশি এদের স্বনির্ভর করে তোলার জন্য অনুদান ও আর্থিক সংস্থানের ব্যবস্থা করা হয়। বেকারত্ব মোচনের জন্য জাতীয় গ্রামীণ কর্মসংস্থান প্রকল্প, গ্রামীণ ভূমিহীনদের কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্প ইত্যাদি নানাধরনের প্রকল্প নেওয়া হয়। 'বিশদফা' কর্মসূচীতে তফশীলি জাতির উন্নয়নের জন্য নানাধরনের প্রকল্প ঘোষিত হয়। 'জাতীয় হাউসিং নীতি' অনুযায়ী এদের বাড়ি তৈরির জমি ও গৃহ নির্মাণে আর্থিক সহায়তার ব্যবস্থা করা হয়। 'ইন্দিরা আবাস' যোজনায় এদের জন্য গ্রামাঞ্চলে বাসস্থান নির্মাণের ব্যবস্থা গৃহীত হয়। বিভিন্ন রাজ্য সরকারও পৃথকভাবে এদের জন্য প্রকল্প গ্রহণ করেছে। যেমন, ঝাড়খণ্ড সরকারের দীনদয়াল প্রকল্প।

কর্মক্ষেত্রে সরকারিক্ষেত্রে তফশীলি জাতি ও উপজাতির জন্য যথাক্রমে 15% ও 7.5% সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। লোকসভার 544 আসনের মধ্যে 79টি তফশীলি জাতি ও উপজাতির জন্য সংরক্ষিত। অনুরূপ

সংরক্ষণের ব্যবস্থা বিধানসভা ইত্যাদি ক্ষেত্রেও হয়েছে। সংবিধানের নির্দেশকমূলক নীতিতে সংরক্ষণের ব্যবস্থা দশ বছরের মধ্যে প্রত্যাহারের কথা থাকলেও 'মণ্ডল কমিশনের' সুপারিশ অনুযায়ী শুধু সংরক্ষণ বজায় রাখার কথাই বলা হয়নি বরং কিছু ক্ষেত্রে বাড়ানোর সুপারিশ করা হয়।

তফশীলি জাতি ও উপজাতির উন্নয়নের ক্ষেত্রে বিভিন্ন বেসরকারি সেচ্ছাসেবী সংগঠনের সক্রিয় সহযোগিতা সুনিশ্চিত করার জন্য সরকারি সহায়তা প্রদান করাও অন্যভাবে উৎসাহ প্রদান করার নীতি গ্রহণ করা হয়েছে, এছাড়া এদের উপযুক্ত সামাজিক মর্যাদা আদায়ের আন্দোলনের ক্ষেত্রে বহু সংস্থা (যথা দলিত প্যান্থার ইত্যাদি) এগিয়ে এসেছে। আদিবাসী বা তফশীলি উপজাতিদের জন্য পরিকল্পনার শুরুতে সমষ্টি উন্নয়ন ব্লকের ধাঁচে আদিবাসী উন্নয়ক ব্লক প্রকল্প গৃহীত হয়। এর মাধ্যমে কৃষি, পশুপালন, শিক্ষা, জনস্বাস্থ্য প্রভৃতির উন্নয়ন ব্যবস্থাগুলি আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকায় ছড়িয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। চতুর্থ পরিকল্পনায় বিশেষ বিশেষ শ্রেণির জন্য নির্দিষ্ট কিছু প্রকল্প নেওয়া হয়। এর মধ্যে ছিল ক্ষুদ্রচাষী উন্নয়ন এজেন্সি, প্রান্তিক চাষী ও কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প, খরাপ্রবণ এলাকা প্রকল্প, পার্বত্য অঞ্চল প্রকল্প প্রভৃতি। এই প্রকল্প প্রাথমিকভাবে আদিবাসী এলাকাগুলিতে শুরু করা হয়। এই সমস্ত কাজকর্মের দেখাশোনার দায়িত্ব দেওয়া হয়— আদিবাসী উন্নয়ন এজেন্সিগুলির উপর।

পঞ্চম পরিকল্পনায় 'শিলো আও' কমিটির সুপারিশগুলি কার্যকর করার প্রচেষ্টা শুরু হয়। কমিটির মূল বক্তব্য যে আদিবাসীদের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন ধরনের সমস্যার ভিত্তিতে উন্নয়নের কোন অভিন্ন (uniform) প্রকল্প গ্রহণ করা ঠিক নয়। এইজন্য পঞ্চম পরিকল্পনায় "আদিবাসী উপ পরিকল্পনা" (Subplan) গ্রহণ করা হয়। একটি তহশিলকে (যা হল কয়েকটি ব্লকের সমষ্টি) পরিকল্পনাও উন্নয়নের প্রাথমিক ইউনিট ধরে— "সুসংহত আদিবাসী উন্নয়ন প্রকল্প" গৃহীত হয়। পরিকল্পনাকালে এই প্রকল্পের সাহায্যে আদিবাসী এলাকায়—

(ক) চিহ্নিত পরিবারগুলির কৃষি, পশুপালন ইত্যাদি ক্ষেত্রে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি

(খ) জমিদখল, বেগার প্রথা, মহাজনী অত্যাচার ইত্যাদি শোষণের অবসান

(গ) শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে গুণগত মানোন্নয়ন

(ঘ) পরিকাঠামোর সৃষ্টি প্রভৃতি লক্ষ্যপূরণের প্রচেষ্টা করা হয়।

আদিবাসী উন্নয়ন প্রকল্পের অর্থসংস্থানের জন্য প্রধানত চারটি সূত্রের উপর নির্ভর করা হয় : (ক) রাজ্য সরকার (খ) কেন্দ্রীয় কল্যাণমন্ত্রকের বিশেষ অনুদান (গ) কেন্দ্রীয় সহায়তা প্রাপ্ত কর্মসূচী ও প্রাতিষ্ঠানিক অর্থ। আশা করা হয় আগামী ২০১০ সালের মধ্যেই সমস্ত আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকাই এই প্রকল্পের আওতায় আনা যাবে।

সামাজিক ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত সর্বপ্রকার শোষণ ও নিপীড়ন মুক্ত সমাজের যে স্বপ্ন সংবিধান রচয়িতারা দেখেছিলেন আমাদের দেশে পঞ্চাশ বছরে পরিকল্পনাকালেও তা সফল করা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে শ্রেণীগত ও জাতিগত বৈষম্য আজও অনেকাংশে বর্তমান। সরকারি সুযোগ-সুবিধাগুলি যারা ভোগ করতে পেরেছে তারাই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। যাদের কাছে এগুলি পৌছায়নি তারা যে তিমিরে ছিল সেই তিমিরেই রয়ে গেছে। ফলে তফশীলি জাতি ও উপজাতির মধ্যেই নতুন শ্রেণীবৈষম্য সৃষ্টি হয়েছে। এইসব অত্যাচারিত ও বঞ্চিত শ্রেণীদের নিয়ে গড়ে ওঠে মাওবাদী, নকশালবাদী আন্দোলন। সঠিক পরিকল্পনা ও তার সম্যক রূপায়ণের পাশাপাশি রাজনৈতিক সদিচ্ছা ও জনগণের সক্রিয় সহযোগিতা ছাড়া এই শ্রেণীগত ও জাতিগত বৈষম্য দূরীভূত হবে না।

৪.৬ অনুশীলনী

১। ভারতের পরিকল্পনার বৈশিষ্ট্যগুলি কী?

২। পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মাধ্যমে ভারতবর্ষে শিক্ষাক্ষেত্রে উন্নয়ন সাধনের জন্য কী কী ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে?

৩। বিভিন্ন পরিকল্পনাকালে গৃহীত স্বাস্থ্য সম্পর্কিত ব্যবস্থাগুলি ব্যাখ্যা কর।

৪। শ্রেণীগত বৈষম্য দূর করার লক্ষ্যে কী কী রক্ষাকবচ রয়েছে এবং তার ভিত্তিতে কী কী পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে?

একক ৫ □ উন্নয়নের লক্ষ্য ও সমস্যা (The Problems and Objects of Development)

গঠন

৫.১ কৃষি উন্নয়ন : লক্ষ্য ও সমস্যা

৫.২ শিল্পোন্নয়ন : লক্ষ্য ও সমস্যা

৫.৩ গ্রামোন্নয়ন : লক্ষ্য ও সমস্যা

৫.৪ শহরোন্নয়ন : লক্ষ্য ও সমস্যা

৫.৫ অনুশীলনী

৫.১ কৃষি-উন্নয়ন : লক্ষ্য ও সমস্যা

এই অধ্যায়ে আমাদের প্রথম আলোচ্য বিষয় হ'ল ভারতবর্ষের কৃষি উন্নয়ন পরিকল্পনার লক্ষ্য ও সমস্যা। বিশেষ করে সমাজের দুর্বল জনগোষ্ঠীর প্রেক্ষিতটি মাথায় রেখে আমরা এই আলোচনা করব।

কৃষি উন্নয়নের ক্ষেত্রে ভারতের পরিকল্পনা কমিশন নিম্নোক্ত চারটি লক্ষ্য পূরণ করতে চেয়েছিলেন :

১. **কৃষিজাত পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি** : কৃষিজাত পণ্যের উৎপাদনে উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি ঘটানো ছিল প্রধান লক্ষ্য। দুটি উপায়ে এই লক্ষ্য পূরণ করার চেষ্টা করা হয়েছিল। উপায় দুটি হল : এক, অধিক পরিমাণ জমিকে চাষের আওতায় নিয়ে আসা এবং এভাবে মোট উৎপাদনকে বাড়ানো এবং দুই, জমিতে অধিক মাত্রায় সেচ, উন্নত বীজ, রাসায়নিক সার প্রভৃতি উপকরণের প্রয়োগ ঘটিয়ে হেক্টর পিছু ফলন বৃদ্ধি করা।

২. **কর্মসংস্থান বৃদ্ধি** : কৃষির উন্নয়ন ঘটিয়ে কৃষিতে কর্ম-সংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি করা এবং এইভাবে সমাজের দরিদ্রতর মানুষের আয় বৃদ্ধি করা ছিল কৃষি-পরিকল্পনার আর একটি লক্ষ্য।

৩. **কৃষির উপর নির্ভরশীল জনংখ্যার চাপ হ্রাস** : কৃষিতে নিযুক্ত উদ্বৃত্ত জনসংখ্যাকে কৃষিক্ষেত্র থেকে অপসারণ করে মাধ্যমিক (Secondary) ও সেবামূলক (tertiary) ক্ষেত্রে নিযুক্ত করা এবং এইভাবে জমির উপর নির্ভরশীল মানুষের সংখ্যা হ্রাস করা পরিকল্পনা রচনাকারীদের অন্যতম লক্ষ্য ছিল।

৪. **গ্রামাঞ্চলে আয়-বন্টনে বৈষম্য হ্রাস** : প্রজা-কৃষককে শোষণের হাত হতে রক্ষা করা, জমির উর্ধ্বসীমা নির্ধারণ করা এবং সীমার অতিরিক্ত জমি ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষীদের মধ্যে বন্টন করে গ্রামাঞ্চলে কিছুটা অন্তত ন্যায় ও সমতা প্রতিষ্ঠা করা ছিল স্বাধীন ভারতের কৃষি-নীতির অন্যতম অঙ্গ।

কৃষি উন্নয়নের উপরোক্ত চারটি লক্ষ্যকে সংক্ষিপ্তাকারে প্রকাশ করে বলা যায় যে পরিকল্পনার সময় ভারতের কৃষি-নীতির সাধারণ উদ্দেশ্য ছিল "জনগণের কল্যাণ অক্ষুণ্ণ রেখে উৎপাদনবৃদ্ধি" ("growth with social justice")। একথা এখন সর্বজনস্বীকৃত যে ভারত কৃষির ক্ষেত্রে এই লক্ষ্যের কাছে পৌঁছাতে পারেনি। নানারূপ সমস্যায় পীড়িত ভারতীয় কৃষি-ব্যবস্থা না পেরেছে ধারাবাহিক, আশানুরূপ বা আন্তর্জাতিক স্তরের সঙ্গে তুলনীয় উৎপাদনবৃদ্ধি বজায় রাখতে, না পেরেছে গ্রামীণ কৃষিজীবী জনগণের মধ্যে অসাম্য হ্রাস করে অন্তত কিছু মাত্রায় সমতা প্রতিষ্ঠা করতে।

শ্লথগতি উৎপাদনবৃদ্ধি : প্রথমে কৃষিতে উৎপাদনবৃদ্ধির দিকটি আলোচনা করা যাক। এ সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই যে, স্বাধীনতা-পূর্ববর্তীকালে উৎপাদনে যে অচলাবস্থা দেখা গিয়েছিল, স্বাধীনতা-পরবর্তীকালে তা' পরিবর্তিত হয়েছে এবং কৃষি-উৎপাদনে গতি সঞ্চারিত হয়েছে। ষাটের দশকের পর খাদ্যশস্যের উৎপাদনে বড় রকমের বৃদ্ধি ঘটেছে এবং ক্রমশ খাদ্যের আমদানি কমেছে। এটা সম্ভব হয়েছে কৃষির ক্ষেত্রে নতুন প্রযুক্তির প্রয়োগ দ্বারা। এদেশের কৃষির ইতিহাসে নতুন প্রযুক্তি একটা বিশেষ অধ্যায় যোগ করেছে। এই নতুন প্রযুক্তিতে কৃষিক্ষেত্রে ব্যবহার্য উপকরণগুলির গুণমানের পরিবর্তন ঘটেছে। ব্যবহার করা হয়েছে অধিক মাত্রায় উচ্চ ফলনশীল বীজ, রাসায়নিক সার, সেচের জল, ট্রাক্টর প্রভৃতি যন্ত্র, কীটনাশক ঔষধ ইত্যাদি। কৃষি-উন্নয়ন প্রচেষ্টার এই পর্যায়টি 'সবুজ বিপ্লব' পর্যায় নামে পরিচিতি লাভ করেছে। সবুজ বিপ্লবোত্তর যুগে কৃষিতে উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে সন্দেহ নেই। কিন্তু সে বৃদ্ধির হার উৎসাহব্যঞ্জক নয়। ১৯৭০ ও ১৯৮০-র দশকগুলিতে উৎপাদন বৃদ্ধির যে ক্রমবর্ধমান হার পরিলক্ষিত হয়েছিল, পরবর্তী সময়ে তা বজায় থাকেনি। উৎপাদনবৃদ্ধির হার মন্থর হতে শুরু করে ১৯৯০ এর দশক থেকে। ১৯৮০ এর দশকে বাৎসরিক বৃদ্ধির হার ছিল ৩.৮; কিন্তু ১৯৯০ এর দশকে তা নেমে আসে ২.৪-এ। ২০০৩-০৪ সাল বাদ দিলে উৎপাদন বৃদ্ধির এই নিম্নগতি পরবর্তী সময়ে বজায় থেকেছে।*[1] কিভাবে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির হারকে অন্তত তিন শতাংশে উন্নীত করা যায়, দেশের নেতৃত্বের কাছে এটা এখন অন্যতম প্রধান বিচার্য বিষয়।

এখন প্রশ্ন, কৃষি-উৎপাদন বৃদ্ধিতে কেন এই মন্থরতা? এখানে প্রধান তিনটি কারণ উল্লেখ করা যেতে পারে। প্রথম কারণটি হল আমাদের দেশে সেচের অপ্রতুলতা এবং সে-কারণে সাধারণভাবে ভারতীয় কৃষকের বৃষ্টিপাতের উপর নির্ভরশীলতা। পরিকল্পনার এতগুলি বছর অতিক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও ভারতবর্ষে আবাদযোগ্য মোট জমির প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ বৃষ্টিপাতের উপর নির্ভরশীল। আর এই বৃষ্টিপাত অপ্রতুল এবং অনিশ্চিত বা অনিয়মিত। স্বাভাবিকভাবেই বৃষ্টিপাতের উপর নির্ভরশীল অঞ্চলগুলিতে নতুন কৃষি প্রযুক্তির প্রয়োগ সম্ভব হয় না; এ কারণে এসব অঞ্চলে কৃষির উৎপাদনশীলতা কম। ভারতীয় কৃষিতে যথেষ্ট ফলনবৃদ্ধি না ঘটার পেছনে এটি একটি বড় কারণ। দ্বিতীয়ত, কৃষির ক্ষেত্রে সরকারি বিনিয়োগের পরিমাণ উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে। বিশেষ করে ১৯৯০ এর দশকে এই বিনিয়োগের পরিমাণ খুবই কমে যায়। এর ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হয় মাঝারি ও বৃহৎ সেচ-ব্যবস্থা এবং গ্রামীণ পরিকাঠামো, গ্রামীণ রাস্তাঘাট, গ্রামীণ বৈদ্যুতিক ব্যবস্থা, শস্য মজুতকরণ প্রভৃতির উন্নয়ন ব্যাহত হয়। এসবের প্রতিকূল প্রভাব পরিলক্ষিত হয় কৃষি উৎপাদনের ওপর। তৃতীয়ত, কৃষিতে ঋণদানের ক্ষেত্রে গ্রামীণ আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলির, বিশেষ করে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির ভূমিকা সন্তোষজনক নয়। এটা বিশেষ করে পরিলক্ষিত হয় নব্বুই-এর দশক থেকে। রিজার্ভ ব্যাংক-এর ২০০১-০২ সালের কারেন্সী এন্ড ফিনান্স রিপোর্ট (Currency and Finance Report) থেকে জানা যায় যে, '৮০ এর দশকের তুলনায় '৯০ এর দশকে তফশীলভুক্ত বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি কর্তৃক ক্ষুদ্র কৃষকদের এবং প্রান্তিক কৃষকদের প্রদত্ত প্রত্যক্ষ ঋণ হ্রাস পায় যথাক্রমে ১৫.১% থেকে ১১.০% এবং ১৮.১% থেকে ১৩.০%। ঐ সময়ে কৃষিক্ষেত্রে দীর্ঘকালীন উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত প্রত্যক্ষ ঋণ হ্রাস পেয়েছে ১১.৫ থেকে ৯.৭%। এ প্রসঙ্গে আরও একটি তথ্য উল্লেখ করা যায়। বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি কর্তৃক প্রদত্ত মোট ঋণের মধ্যে কৃষিঋণের অনুপাত হবে ১৮%— রিজার্ভ ব্যাঙ্ক প্রদত্ত এই লক্ষ্যমাত্রা দেশের মাত্র ৮টি ব্যাঙ্ক পূরণ করতে পেরেছে। বেশ কয়েকটি ব্যাঙ্কের ক্ষেত্রে এই অনুপাত মাত্র ১২%। কৃষি সংক্রান্ত পার্লামেন্টের স্ট্যান্ডিং কমিটির সাম্প্রতিক প্রতিবেদন থেকে এ তথ্য পাওয়া যায়।*[2]

---

*1 দ্রষ্টব্য : Agriculture : Progress Report, Economic and Political Weekly, Vol. XL No. 18, pp. 1796.

*2 তথ্যের উৎস : V. S. Vyas : Agrarian Distress : Strategies to Protect Vulnerable Section, Economic and Political Weekly, December 25, 2004.

কর্মসংস্থানের সংকোচন এবং দারিদ্র্য ও অসাম্য বৃদ্ধি ঃ

কৃষিজীবী মানুষদের মধ্যে কর্মহীনতা ভারতীয় কৃষির আর এক সমস্যা। আমাদের দেশে কৃষিতে প্রয়োজনের তুলনায় কর্মক্ষম ব্যক্তির সংখ্যা অধিক। অর্থাৎ কৃষিতে অতিরিক্ত বা উদ্বৃত্ত শ্রমিক (surplus labour) বর্তমান। কৃষিতে এই জনাধিক্যের পরিপ্রেক্ষিতে নতুন কৃষি-কৌশল প্রয়োগ করা হয়। বীজ-সার-জল সমন্বয়ে নিবিড় পদ্ধতিতে জমি চাষ শুরু হয়। কৃষিতে যন্ত্রের ব্যবহার বেড়ে যায়। এর প্রতিকূল প্রভাব পড়ে শ্রম-নিয়োগের ওপর। পাঞ্জাবের ফিরোজপুরে এক সমীক্ষা চালিয়ে হনুমন্ত রাও দেখিয়েছেন যে, প্রতি একর আবাদী জমিতে ট্রাক্টরের ব্যবহারের দরুন জমি কর্ষণ ও মাল পরিবহণের ক্ষেত্রে শতকরা ২০ থেকে ৩০ ভাগ শ্রম-দিবস মানুষের পরিবর্তে যন্ত্র দ্বারা সম্পন্ন হয়েছে। ট্রাক্টরের মত থ্রেশার (Thrasher) ও হারভেস্টার কম্বাইন ও (Harvester combine) মনুষ্য-শ্রমের প্রয়োজনীয়তা হ্রাস করেছে।** কৃষিতে নতুন প্রযুক্তি গৃহীত হওয়ার ফলে কি ধরনের পরিবর্তন দেখা দিয়েছে তা সরজমিনে তদন্তের উদ্দেশ্যে যিনি ভারতবর্ষের গ্রামাঞ্চলে ঘুরেছেন, সেই ল্যাডেজিন্স্কি (Ladejinsky) একই মত ব্যক্ত করেছেন। তাঁর মতে, স্থানীয় স্তরে যন্ত্রীকরণ (mechanisation) শ্রমের চাহিদার ওপর গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলেছে।$

এবার দেখা যাক্, ভারতবর্ষের কৃষি-উন্নয়নের ধারা গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনে কি পরিবর্তন এনেছে। কৃষিজীবী জনগোষ্ঠীতে দুর্বল শ্রেণী দু'টি ঃ (১) কৃষি-শ্রমিক এবং (২) ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষী। কৃষি-শ্রমিকদের প্রসঙ্গে প্রায় সকল পর্যবেক্ষকই মেনে নিয়েছেন যে, সবুজ বিপ্লবোত্তর যুগে কৃষি-শ্রমিকদের আর্থিক মজুরি বেড়েছে। তবে প্রকৃত মজুরির বেলায় পর্যবেক্ষকদের মধ্যে মত পার্থক্য রয়েছে। এক দল মনে করেন কৃষি-শ্রমিকদের প্রকৃত মজুরি বেড়েছে।

কিন্তু একথা বলার সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা একথাও স্বীকার করেন যে প্রকৃত মজুরি বৃদ্ধির হার অতি অল্প। অন্য দিকে গ্রামীণ দারিদ্র্য নিয়ে আলোচনায় অর্থনীতিবিদ প্রণব বর্ধনের সিদ্ধান্ত হল ১৯৬৪-৬৫ থেকে ১৯৭৪-৭৫ এই সময়সীমায় ভারতবর্ষে কৃষি-শ্রমিকের প্রকৃত গড় মজুরি শতকরা ১২ ভাগ হ্রাস পেয়েছে।* অর্থাৎ সবুজ বিপ্লবের অব্যবহিত পরবর্তী সময়ে কৃষি-শ্রমিকরা প্রকৃত অর্থে দরিদ্র শ্রেণিভুক্তই থেকে গেছে। বর্তমান সময়েও তাদের অবস্থার যে খুব একটা হেরফের হয়েছে একথা মনে করার কোন কারণ নেই। ভারতবর্ষের দারিদ্র্য নিয়ে যাঁরা গবেষণা বা সমীক্ষা করেছেন বা এ বিষয়ে যে-সব রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে, তা থেকে জানা যায় যে গ্রামীণ দরিদ্র বলতে যাদের বোঝায়, তাদের অন্যতম প্রধান অংশই হল এই কৃষি-শ্রমিকরা। এদের জন্য সরকারের তরফে আজও সেরূপ কোন সুসংবদ্ধ কর্মপ্রণালীর কথা চিন্তা করা হয়নি। অনেক সময়েই তাদের মধ্যে পুঞ্জীভূত বঞ্চনা-বোধের বহিঃপ্রকাশ ঘটছে গ্রামাঞ্চলে অস্থিরতা ও বিক্ষোভের মধ্য দিয়ে।

এবার ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষীর কথা। কৃষিতে প্রযুক্ত নতুন প্রযুক্তি ব্যয়বহুল। এই প্রযুক্তি ব্যবহার করতে হলে অত্যধিক পরিমাণে জল, রাসায়নিক সার, কীটনাশক ওষুধের দরকার পড়ে। এ সব বাবদ যথেষ্ট অর্থ ব্যয় করার মত সঙ্গতি ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষীর নেই। ব্যাঙ্ক প্রভৃতি আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কাছ হতেও তারা যথেষ্ট পরিমাণে ঋণের সুযোগ লাভ করতে পারেনি। স্বাভাবিকভাবেই নতুন প্রযুক্তি ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষীদের উপযোগী হয়ে উঠতে পারেনি। একে কাজে লাগিয়েছে ধনী কৃষকরা। এদের আয় বেড়েছে, বর্দ্ধিত আয়কে তারা কৃষিতে পুনর্বিনিয়োগ করেছে এবং এইভাবে তাদের অবস্থার উত্তরোত্তর উন্নতি ঘটেছে। ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষীদের সঙ্গে তাদের আয় ও সম্পদের পার্থক্য বৃদ্ধি পেয়েছে।

** Misra & Puri, Indian Economy (2004), pp. 333 তে উদ্ধৃত।

$ দ্রষ্টব্য : Pramit Chaudhuri, The Indian Economy-Poverty and Development (1996), pp. 132

*Misra & Puri, Indian Economy (2004), pp. 331.

এই প্রসঙ্গে আর একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করতে হয়। ছোট চাষীরা অনেক সময়েই বড় চাষীদের কাছ হতে জমি ইজারা নেয়। এর বিনিময়ে তারা খাজনা দেয়। সবুজ বিপ্লবোত্তর যুগে জমির মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ার জন্য জমির মালিক হয় খাজনা বাড়াতে চেয়েছে অথবা জমি থেকে প্রজা চাষীকে উচ্ছেদ করে নিজে ঐ জমি চাষ করতে উদ্যোগ হয়েছে। কেননা নতুন প্রযুক্তির প্রয়োগ কৃষিকর্মকে লাভজনক কার্য করে তুলেছে। এই পরিস্থিতিতে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষীর অবস্থার আরও অবনতি ঘটেছে। অনেক ক্ষেত্রে জমি থেকে উৎখাত-হওয়া প্রান্তিক চাষী ভূমিহীন খেতমজুরে পরিণত হয়েছে। পরিণামে গ্রামাঞ্চলে শ্রেণী-বৈষম্য বৃদ্ধি পেয়েছে।

কৃষি থেকে যথেষ্ট আয় উপার্জিত না হওয়ার কারণে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষী কৃষিকাজে বা অ-কৃষিকাজে শ্রমিক হিসাবে নিযুক্ত হতে চায়। কিন্তু এ ক্ষেত্রেও তাদের রোজগারের সুযোগ কম। প্রাপ্ত সাক্ষ্যপ্রমাণ থেকে বলা যায় যে গ্রামাঞ্চলে বিকল্প কর্মসংস্থানের সুযোগ কমেছে এবং মজুরির ক্ষেত্রেও তেমন কোন বৃদ্ধি ঘটেনি। সম্প্রতি ২০০৪ সালে জি. এস. ভাল্লা (G.S. Bhalla) যে সমীক্ষা করেছেন তা থেকেও এই তথ্য পাওয়া গেছে।* সুতরাং সব দিক দিয়েই দেখা যাচ্ছে যে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষীর আর্থিক অবস্থার উন্নতি ঘটেনি।

এক কথায়, ভারতবর্ষের সম্পন্ন কৃষকরা নতুন কৃষি প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে আর্থিক সমৃদ্ধি লাভে সমর্থ হলেও গ্রামাঞ্চলের সংখ্যাগরিষ্ঠ দরিদ্র মানুষগুলি— যারা হয় খেতমজুর অথবা ক্ষুদ্র জোতের মালিক, তারা দেশের কৃষি উন্নয়নের তেমন ভাগীদার হয়ে উঠতে পারেনি; উন্নয়নের ধারা তাদের একরূপ পাশ কাটিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। 'নতুন প্রযুক্তি নির্ভর' কৃষি উন্নয়ন বাস্তবে গ্রামের কৃষক সম্প্রদায়কে 'মুষ্টিমেয় ধনী কৃষক' ও 'সংখ্যাধিক্য দরিদ্র কৃষক' এই ভাবে দ্বিধা বিভক্ত করেছে।

৫.২ শিল্পোন্নয়ন-লক্ষ্য ও সমস্যা

স্বাধীন ভারতবর্ষের শিল্পোন্নয়ন নীতিতে কয়েকটি স্তর বা পর্যায় লক্ষ্য করা যায়। স্বাধীনতা লাভের পর পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা গৃহীত হওয়ার সময় থেকে শুরু করে সত্তরের দশক অবধি শিল্পোন্নয়নের উদ্দেশ্যে এক ধরনের নীতি অনুসৃত হয়। আশির দশকে এসে এই নীতি একটা পরিবর্তনের দিকে মোড় নেয়। আবার নব্বুই দশকের প্রারম্ভ থেকে বর্তমানকাল পর্যন্ত যে শিল্পনীতি কার্যকর করার প্রয়াস দেখা যায়, তা' মূলগতভাবে গোড়ার দিকের শিল্পনীতি থেকে একেবারে আলাদা। এই তিন পর্যায়ের শিল্পোন্নয়নের লক্ষ্যগুলি পৃথক পৃথকভাবে নিম্নে আলোচিত হল।

প্রথম পর্যায়ের শিল্পোন্নয়নের লক্ষ্য :

প্রথম পর্যায়ে দুটি শিল্পনীতি ঘোষিত হয়— একটি ১৯৪৮ সালে, অপরটি ১৯৫৬ সালে।

১৯৪৮ সালের শিল্পনীতির লক্ষ্য ছিল আমাদের দেশে মিশ্র অর্থনীতির বুনিয়াদটি গড়ে তোলা। এই উদ্দেশ্যে সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগের মিলিত প্রয়াসে শিল্পোন্নতির প্রক্রিয়াটিকে ত্বরান্বিত করতে চেয়েছিল এই শিল্পনীতি। স্থানীয় সম্পদের সদ্ব্যবহার ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিতে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের ভূমিকার উপরও ১৯৪৮ সালের শিল্পনীতি গুরুত্ব আরোপ করেছিল।

১৯৫৬ সালের ঘোষিত শিল্পনীতিটি হল পরিকল্পনার ক্ষেত্রে গৃহীত মহলানবীশ মডেলের প্রতিফলন। তদনুযায়ী এই শিল্পনীতিতে মূল ও ভারী শিল্পের উন্নয়নের উপর জোর দেওয়া হয়। এই শিল্পনীতির অন্য লক্ষ্যগুলি

* দ্রষ্টব্য : Economic and Political Weekly, December 25, 2004-এ V.S. Vyas এর পূর্বোক্ত প্রবন্ধ।

ছিল ঃ (ক) সরকারি উদ্যোগের ক্ষেত্রকে প্রসারিত করা, (খ) মুষ্টিমেয় ব্যক্তির হাতে আয় ও সম্পদের কেন্দ্রীভবন রোধ করা এবং (গ) উন্নয়নের ক্ষেত্রে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে ভারসাম্যহীনতা হ্রাস করা। তাছাড়া, পূর্বে ঘোষিত শিল্পনীতির ন্যায় ১৯৫৬ সালের শিল্পনীতিতেও ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের গুরুত্বের কথা স্বীকার করা হয়।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা দরকার যে, ১৯৪৮ ও ১৯৫৬ সালের মধ্যবর্তী সময়ে, ১৯৫১ সালে, সরকার শিল্প (উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ) আইন পাশ করেন। এই আইনের লক্ষ্য ছিল শিল্প লাইসেন্স ব্যবস্থার মাধ্যমে বেসরকারি বিনিয়োগকে নিয়ন্ত্রণ করা, শিল্পের ক্ষেত্রে একচেটিয়া প্রভাব রোধ করা এবং শিল্পোন্নয়নের ক্ষেত্রে আঞ্চলিক বৈষম্য হ্রাস করা।

দ্বিতীয় পর্যায়ের শিল্পোন্নয়নের লক্ষ্য

১৯৮০ সালে যে শিল্পনীতি ঘোষিত হয়, তার পশ্চাতে ছিল প্রচলিত শিল্প লাইসেন্স ব্যবস্থার বিরুদ্ধে নানা সমালোচনা। অনেকেই এ মত ব্যক্ত করেছিলেন যে ভারতবর্ষে শিল্প লাইসেন্স ব্যবস্থা ঘোষিত লক্ষ্যের বিপরীত ফল দিয়েছে। শিল্পের উন্নতিকে সাহায্য করার পরিবর্তে শিল্পের অগ্রগতির পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে— লাইসেন্স ব্যবস্থার বিরুদ্ধে এরূপ ক্ষোভ প্রকাশিত হয়। এই পরিস্থিতিতে ১৯৮০ সালের শিল্পনীতির লক্ষ্য ছিল শিল্পোৎপাদন বৃদ্ধিকে সর্বোচ্চ করা এবং তদুদ্দেশ্যে সৃষ্ট উৎপাদনক্ষমতার পূর্ণ ব্যবহার করা। সুতরাং ১৯৮০ সালের শিল্পনীতির লক্ষ্য ছিল—

(ক) শিল্প লাইসেন্স ক্ষেত্রে বৃহৎ কোম্পানিগুলিকে নানাবিধ সুযোগ-সুবিধাদান ;

(খ) বৃহৎ কোম্পানিগুলির অননুমোদিত বাড়তি উৎপাদনক্ষমতাকে অনুমোদন বা স্বীকৃতি দান; এবং

(গ) বেশ কিছু শিল্পের ক্ষেত্রে স্বয়ংক্রিয়া সম্প্রসারণ (automatic expansion) নীতির প্রয়োগ।

সংক্ষেপে, ১৯৮০ সালের শিল্পনীতি ভারতবর্ষে শিল্পোৎপাদন ক্ষমতার উদারীকরণ ঘটিয়েছিল।

তৃতীয় পর্যায়ে শিল্পোন্নয়নের লক্ষ্য

১৯৯১ সালের জুলাই মাসে সরকার যে শিল্পনীতি ঘোষণা করেন, তাকে তৃতীয় পর্যায়ের তথা বর্তমান সময়ের শিল্প নীতি বলা হয়ে থাকে। এই শিল্পনীতি দেশের শিল্পব্যবস্থাকে ব্যাপকভাবে নিয়ন্ত্রণমুক্ত (deregulation) করে তোলে। এই শিল্পনীতির লক্ষ্যগুলি ছিল নিম্নরূপ ঃ

(ক) ভারতবর্ষের শিল্প-অর্থনীতিকে অপ্রয়োজনীয় আমলাতান্ত্রিক বিধিনিষেধ বা নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত করা;

(খ) ভারতবর্ষের অর্থনীতিকে বিশ্ব অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সঙ্গে সংযুক্ত করা এবং এই উদ্দেশ্যে ভারতীয় অর্থনীতিতে উদারীকরণ নীতির প্রয়োগ ঘটানো;

(গ) প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগের ক্ষেত্রে বিধিনিষেধ সমূহের অপসারণ এবং দেশীয় উদ্যোগকে 'মরটপ' (MRTP) আইনের নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত করা; এবং

(ঘ) যে-সব সরকারি উদ্যোগ থেকে বিনিয়োগের প্রতিদান যৎসামান্য বা যেসব সরকারি উদ্যোগ ধারাবাহিকভাবে লোকসানে চলছে, সেগুলির দায় থেকে সরকারকে অব্যাহতি দেওয়া।

১৯৯১ সালের শিল্পনীতির প্রয়োগ ভারতীয় শিল্প-ব্যবস্থার ক্ষেত্রে এক নতুন যুগের সূত্রপাত করেছে। অধিকাংশ শিল্পের ক্ষেত্রে লাইসেন্স প্রাপ্তির বাধ্যবাধকতা লুপ্ত হয়েছে। সরকারি উদ্যোগের জন্য সংরক্ষিত ক্ষেত্রটির ক্রমসংকোচন ঘটছে। কেবলমাত্র সরকারি উদ্যোগে গড়া যাবে এরূপ শিল্পের সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস করা হয়েছে। অনেক সরকারি উদ্যোগে সরকারের শেয়ার কমিয়ে ফেলা হয়েছে। 'মরটপ' (MRTP) আইনে বেসরকারি

কোম্পানির বিনিয়োগের একটি সীমা উল্লিখিত আছে যা অতিক্রম করলে শিল্প-প্রতিষ্ঠানে সরকারি হস্তক্ষেপ ঘটত। এখন এই সীমার অবলোপ ঘটিয়ে বেসরকারি বিনিয়োগকে বাধামুক্ত করা হয়েছে। বহুসংখ্যক শিল্পের ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগের বাধানিষেধ তুলে ফেলা হয়েছে। এইভাবে ভারতীয় শিল্প-ব্যবস্থার ক্ষেত্রে বেসরকারিকরণ তথা উদারীকরণের উপর গুরুত্ব আরোপ করে এক মুক্ত পরিমণ্ডল সৃষ্টির মাধ্যমে শিল্পায়নে গতি সঞ্চার করার উদ্দেশ্যে এক জোরদার প্রয়াস শুরু হয়েছে।*

শিল্পোন্নয়নের ক্ষেত্রে সমস্যা

স্বাধীনতা-উত্তর ভারতবর্ষে শিল্পায়নের যে প্রচেষ্টা শুরু হয় তাতে আশানুযায়ী ফল পাওয়া যায়নি। পরিকল্পনাধীন সময়ে বাস্তব শিল্পোৎপাদন নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা থেকে প্রায়ই কম থেকেছে। একটি হিসাব অনুযায়ী প্রতিটি পরিকল্পনায় গড়পড়তা শিল্পোৎপাদনের ঘাটতি ২০ শতাংশ।** ভারতবর্ষে শিল্পায়নের ক্ষেত্রটি যে নানাবিধ সমস্যায় আক্রান্ত এই তথ্য ঐ দিকটির দিকেই অঙ্গুলি নির্দেশ করে। এখন এইসব সমস্যাগুলি একটু বিশদভাবে আলোচনা করা যাক্।

প্রথম সমস্যাটি হল শিল্পোৎপাদনে হারবৃদ্ধির সমস্যা। ভারতে শিল্প বিকাশের ধারাটি পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে গত শতকের ষাটের দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে শিল্পোৎপাদন বৃদ্ধির হারে মন্দা দেখা দেয় এবং আশির দশকে যদিও শিল্পোৎপাদনের হারে উন্নতি পরিলক্ষিত হয়, নব্বুই এর দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে এই হারে আবার নিম্নগতি লক্ষ করা যায়।

বর্তমান অবস্থাও খুব একটা আশাব্যঞ্জক নয়। শিল্পোৎপাদন বৃদ্ধির হারের সাম্প্রতিক গতিপ্রকৃতির পরিপ্রেক্ষিতে দশম পরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রা (১০%) অর্জিত হওয়ার ব্যাপারে অনেক পর্যবেক্ষকই সন্দিহান।

প্রশ্ন, শিল্পোৎপাদন হার বৃদ্ধির ক্ষেত্রে কেন এই নৈরাশ্যজনক চিত্র? অনেক 'অর্থনীতিবিদের মত হল এই যে, মূলধনী খাতে বিনিয়োগ বৃদ্ধির হার শ্লথগতি হওয়ার জন্যই এই অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। বিশেষ করে নব্বুই-এর দশকের গোড়া থেকে সরকারি ব্যয়সংকোচের কারণে সরকারি উদ্যোগগুলিতে বিনিয়োগের পরিমাণ কমেছে। ফলস্বরূপ বেসরকারি বিনিয়োগও হ্রাস পেয়েছে এবং সামগ্রিকভাবে শিল্পে উৎপাদন হ্রাস পেয়েছে। তাছাড়া সরকারি ব্যয়সংকোচের কারণে পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্যও যথেষ্ট বিনিয়োগ হয়নি। এর ফলেও শিল্পোন্নয়ন ব্যাহত হয়েছে।

দ্বিতীয়ত, বহু শিল্পে উৎপাদনক্ষমতার অপূর্ণ ব্যবহারও অন্যতম সমস্যা। এর নানাবিধ কারণ উল্লেখ করা হয়; যেমন— কাঁচামালের অভাব, পুরানো উৎপাদনপদ্ধতি, অনিয়মিত বিদ্যুৎ সরবরাহ, শ্রমিক অশান্তি ইত্যাদি। কিন্তু এগুলির সাথে যোগ করতে হয় আরও দুটি কারণ : এক, পরিচালকবর্গের দক্ষতার অভাব ; দুই, সংশ্লিষ্ট দ্রব্যের চাহিদার ক্ষেত্রে মন্দাভাব। চাহিদার মন্দাভাব আবার বাজারের সংকীর্ণতা তথা সাধারণ মানুষের স্বল্প ক্রয়ক্ষমতা সূচিত করে। এজন্য কেউ কেউ বলে থাকেন যে আর্থিক নীতির কারণে ভারতে জনগণের মধ্যে ব্যাপক দারিদ্র্য, বেকারী ও অসাম্য বর্তমান, সেই আর্থিক নীতিই শিল্প-সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে বাধার সৃষ্টি করেছে।

তৃতীয়ত, সরকারি উদ্যোগে গড়ে-তোলা সুবিশাল শিল্পক্ষেত্রটি নানা দিক দিয়ে সমালোচিত হয়েছে। সরকারি শিল্পক্ষেত্রের অনেক গুলিতেই উৎপাদন ক্ষমতার সদ্ব্যবহার হয় না। অনেক ক্ষেত্রে এগুলি লাভজনক ইউনিট হিসাবে কাজ করতে ব্যর্থ হয়েছে। অনেক সরকারি সংস্থার পরিচালনা-ব্যবস্থাতেও ত্রুটি-বিচ্যুতি লক্ষ্য করা গেছে। সরকারি

* অবশ্য অতি সম্প্রতি ভারতীয় রাজনীতিতে বামপন্থীদের প্রভাব বৃদ্ধির কারণে এই প্রয়াসে কিছুটা শিথিলতা লক্ষিত হচ্ছে।

** দ্রষ্টব্য : Misra & Puri, Indian Economy (2004), PP. 420-421

সংস্থার কর্মীদের বিরুদ্ধে শৃংখলাহীনতার অভিযোগও শোনা যায়। কেন এই অবস্থা? এর নানাবিধ কারণ আছে। কিন্তু যে জায়গায় পর্যবেক্ষকরা প্রায় একমত তা হল এই যে সরকারি উদ্যোগগুলিতে হামেশাই রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ ঘটে থাকে এবং বহু ক্ষেত্রেই সরকারি উদ্যোগের সর্বোচ্চ পরিচালকবৃন্দ শাসকদল ও রাজনৈতিক নেতাদের ক্রীড়নক হিসেবে কাজ করে থাকেন।

চতুর্থত, ভারতবর্ষের শিল্পোন্নয়নের ধারা দেশের অনগ্রসর অঞ্চলকে অবহেলা করেছে। একটি হিসেবে দেখা যাচ্ছে যে, ২০০০-২০০১ সালে স্থূল শিল্পোৎপাদনের শতকরা প্রায় ৪৫ ভাগ উৎপাদিত হয়েছে শিল্পে অগ্রসর মাত্র তিনটি রাজ্যে— মহারাষ্ট্র, গুজরাট ও তামিলনাড়ুতে।* এ অবস্থার আশু পরিবর্তন জরুরি।

পঞ্চমত, শিল্পক্ষেত্রে রুগ্নতাও আমাদের এক গুরুতর সমস্যা। পৌনে দু'লক্ষেরও বেশি ইউনিট দেশে রুগ্ন শিল্প বলে পরিগণিত। এরও কারণ নানাবিধ। তবে বেশির ভাগ বিশেষজ্ঞই একমত যে, অদক্ষ ও ত্রুটিপূর্ণ পরিচালনাপদ্ধতিই শিল্পক্ষেত্রে রুগ্নতার মূল কারণ। বলা বাহুল্য, শিল্পে রুগ্নতা দেশের সম্পদের অপচয়। তাছাড়া, এর ফলে বহু মানুষ রুজি-রোজগারহীন হয়ে পড়ে। এর প্রতিক্রিয়া ছড়িয়ে পড়তে পারে সমাজ ও অর্থনীতির নানা ক্ষেত্রে। শিল্পে রুগ্নতা সে-কারণে উদ্বেগের বিষয়।

পরিশেষে আর একটি বিষয়ের অবতারণা করতে হয়। বিষয়টি হল : আমাদের শিল্পায়নের কর্মসূচী কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে কতখানি সফল হয়েছে? এক্ষেত্রে এই সত্যটি মেনে নিতে হয় যে, সংগঠিত ক্ষেত্রে বিনিয়োগবৃদ্ধি বা উৎপাদনবৃদ্ধির সমতুল হারে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি ঘটেনি। শিল্পায়ন কর্মসূচীর গোড়ার দিকে, যখন সরকারি উদ্যোগের ক্রমপ্রসারণ ঘটে চলেছিল, তখন যেমন এটা ঘটেনি, তেমনি ১৯৯১-এর পরবর্তী সময়ে অর্থাৎ সরকারি উদ্যোগের সংকোচন ও বেসরকারি ক্ষেত্রের সম্প্রসারণের সময়ও কর্মসংস্থানের বৃদ্ধির হারে অগ্রগতি দেখা যায়নি। শেষের দিকে অবস্থার আরও অবনতি ঘটেছে। এর বড় কারণ হল কর্মসংস্থানের প্রসার ঘটে বৃহৎ শিল্পের তুলনায় ক্ষুদ্র শিল্পের উন্নয়ন অধিক হলে। কিন্তু এখন বিনিয়ন্ত্রণের যুগ। শিল্প-লাইসেন্স ব্যবস্থার কড়াকড়ি নেই। পূর্বের ক্ষুদ্র শিল্পের জন্য সংরক্ষিত এলাকাগুলিতে বৃহৎ শিল্প ও বহুজাতিক কর্পোরেশনগুলি ঢুকে পড়েছে। পিছিয়ে পড়ছে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পগুলি। ফলে শিল্পে বিনিয়োগ বা উৎপাদন বাড়ছে*; কিন্তু কর্মসংস্থানের বৃদ্ধি সেরূপ ঘটছে না। শিল্পক্ষেত্রে আমাদের সংস্কার-উত্তর কর্মসূচীর এই বিফলতার দিকটি এড়িয়ে যাবার উপায় নেই।

৫.৩ গ্রামোন্নয়ন ঃ লক্ষ্য ও সমস্যা

ভারতে ৬ লক্ষ গ্রামে মোট জনসংখ্যার প্রায় ৭২% বাস করে। পরাধীন ভারতে স্বার্থান্বেষীদের শোষণে ও অত্যাচারে, সরকারি অবহেলায় এবং অবশিল্পায়তনে (deindustrialisation) এর ফলে গ্রামবাসিরা ব্যাপক ও তীব্র দারিদ্র্য, অনাহার, অশিক্ষা ও বেকারত্বের শিকার হয়েছে। স্বভাবতই দেশের কল্যাণসাধনের প্রচেষ্টায় গ্রামোন্নয়ন সর্বাধিক প্রাধান্যের অধিকারী।

গ্রামোন্নয়নের মূল কথা হ'ল গ্রামবাসিদের বৈষয়িক উন্নতির পাশাপাশি গুণগত উন্নয়নের মাধ্যমে সার্বিক উন্নয়ন। তাই গ্রামোন্নয়নের প্রধান তিনটি দিক হল— আর্থিক বা বৈষয়িক, সামাজিক ও আত্মিক বা মানসিক।

---

* সূত্র : Tata Services Ltd., Statistical Outline of India, 2003-04 [Misra & Puri, Indian Economy (2004), pp. 421-তে উদ্ধৃত।]

* যদিও বৃদ্ধির হার সন্তোষজনক নয়। যেমন, যে নবম পরিকল্পনা সম্প্রতি শেষ হল, সেই পরিকল্পনাতে শিল্পোৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্য ছিল ৮.২%; কিন্তু কার্যত বৃদ্ধির হার হয়েছে ৫%।

সংস্থার কর্মীদের বিরুদ্ধে শৃংখলাহীনতার অভিযোগও শোনা যায়। কেন এই অবস্থা? এর নানাবিধ কারণ আছে। কিন্তু যে জায়গায় পর্যবেক্ষকরা প্রায় একমত তা হল এই যে সরকারি উদ্যোগগুলিতে হামেশাই রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ ঘটে থাকে এবং বহু ক্ষেত্রেই সরকারি উদ্যোগের সর্বোচ্চ পরিচালকবৃন্দ শাসকদল ও রাজনৈতিক নেতাদের ক্রীড়নক হিসেবে কাজ করে থাকেন।

চতুর্থত, ভারতবর্ষের শিল্পোন্নয়নের ধারা দেশের অনগ্রসর অঞ্চলকে অবহেলা করেছে। একটি হিসেবে দেখা যাচ্ছে যে, ২০০০-২০০১ সালে স্থূল শিল্পোৎপাদনের শতকরা প্রায় ৪৫ ভাগ উৎপাদিত হয়েছে শিল্পে অগ্রসর মাত্র তিনটি রাজ্যে— মহারাষ্ট্র, গুজরাট ও তামিলনাড়ুতে।* এ অবস্থার আশু পরিবর্তন জরুরি।

পঞ্চমত, শিল্পক্ষেত্রে রুগ্নতাও আমাদের এক গুরুতর সমস্যা। পৌনে দু'লক্ষেরও বেশি ইউনিট দেশে রুগ্ন শিল্প বলে পরিগণিত। এরও কারণ নানাবিধ। তবে বেশির ভাগ বিশেষজ্ঞই একমত যে, অদক্ষ ও ত্রুটিপূর্ণ পরিচালনাপদ্ধতিই শিল্পক্ষেত্রে রুগ্নতার মূল কারণ। বলা বাহুল্য, শিল্পে রুগ্নতা দেশের সম্পদের অপচয়। তাছাড়া, এর ফলে বহু মানুষ রুজি-রোজগারহীন হয়ে পড়ে। এর প্রতিক্রিয়া ছড়িয়ে পড়তে পারে সমাজ ও অর্থনীতির নানা ক্ষেত্রে। শিল্পে রুগ্নতা সে-কারণে উদ্বেগের বিষয়।

পরিশেষে আর একটি বিষয়ের অবতারণা করতে হয়। বিষয়টি হল : আমাদের শিল্পায়নের কর্মসূচী কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে কতখানি সফল হয়েছে? এক্ষেত্রে এই সত্যটি মেনে নিতে হয় যে, সংগঠিত ক্ষেত্রে বিনিয়োগবৃদ্ধি বা উৎপাদনবৃদ্ধির সমতুল হারে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি ঘটেনি। শিল্পায়ন কর্মসূচীর গোড়ার দিকে, যখন সরকারি উদ্যোগের ক্রমপ্রসারণ ঘটে চলেছিল, তখন যেমন এটা ঘটেনি, তেমনি ১৯৯১-এর পরবর্তী সময়ে অর্থাৎ সরকারি উদ্যোগের সংকোচন ও বেসরকারি ক্ষেত্রের সম্প্রসারণের সময়ও কর্মসংস্থানের বৃদ্ধির হারে অগ্রগতি দেখা যায়নি। শেষের দিকে অবস্থার আরও অবনতি ঘটেছে। এর বড় কারণ হল কর্মসংস্থানের প্রসার ঘটে বৃহৎ শিল্পের তুলনায় ক্ষুদ্র শিল্পের উন্নয়ন অধিক হলে। কিন্তু এখন বিনিয়ন্ত্রণের যুগ। শিল্প-লাইসেন্স ব্যবস্থার কড়াকড়ি নেই। পূর্বের ক্ষুদ্র শিল্পের জন্য সংরক্ষিত এলাকাগুলিতে বৃহৎ শিল্প ও বহুজাতিক কর্পোরেশনগুলি ঢুকে পড়েছে। পিছিয়ে পড়ছে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পগুলি। ফলে শিল্পে বিনিয়োগ বা উৎপাদন বাড়ছে*; কিন্তু কর্মসংস্থানের বৃদ্ধি সেরূপ ঘটছে না। শিল্পক্ষেত্রে আমাদের সংস্কার-উত্তর কর্মসূচীর এই বিফলতার দিকটি এড়িয়ে যাবার উপায় নেই।

৫.৩ গ্রামোন্নয়ন ঃ লক্ষ্য ও সমস্যা

ভারতে ৬ লক্ষ গ্রামে মোট জনসংখ্যার প্রায় ৭২% বাস করে। পরাধীন ভারতে স্বার্থান্বেষীদের শোষণে ও অত্যাচারে, সরকারি অবহেলায় এবং অবশিল্পায়তনে (deindustrialisation) এর ফলে গ্রামবাসিরা ব্যাপক ও তীব্র দারিদ্র্য, অনাহার, অশিক্ষা ও বেকারত্বের শিকার হয়েছে। স্বভাবতই দেশের কল্যাণসাধনের প্রচেষ্টায় গ্রামোন্নয়ন সর্বাধিক প্রাধান্যের অধিকারী।

গ্রামোন্নয়নের মূল কথা হ'ল গ্রামবাসিদের বৈষয়িক উন্নতির পাশাপাশি গুণগত উন্নয়নের মাধ্যমে সার্বিক উন্নয়ন। তাই গ্রামোন্নয়নের প্রধান তিনটি দিক হল— আর্থিক বা বৈষয়িক, সামাজিক ও আত্মিক বা মানসিক।

*** সূত্র : Tata Services Ltd., Statistical Outline of India, 2003-04 [Misra & Puri, Indian Economy (2004), pp. 421-তে উদ্ধৃত।]**

*** যদিও বৃদ্ধির হার সন্তোষজনক নয়। যেমন, যে নবম পরিকল্পনা সম্প্রতি শেষ হল, সেই পরিকল্পনাতে শিল্পোৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্য ছিল ৮.২%; কিন্তু কার্যত বৃদ্ধির হার হয়েছে ৫%।**

(Training of Rural Youth for Self Employment বা TRYSEM) উদ্দেশ্য হল উপযুক্ত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে গ্রামীণ যুবকদের স্বনির্ভর করে তোলা।

১৯৯৯-২০০০ সালে IRDP ও DWCRA এবং 'দশলক্ষ কূপপ্রকল্প' প্রভৃতি প্রকল্পগুলি নিয়ে স্বর্ণজয়ন্তী গ্রাম স্বরোজগার যোজনা প্রকল্পটি গৃহীত হয়। একই সঙ্গে জওহর রোজগার যোজনার পরিবর্তে জওহর গ্রামসমৃদ্ধি যোজনা শুরু করা হয়। ২০০৫ সালে গ্রামীণ পরিবার পিছু একজনের বছরে ১০০ দিনের কাজ সুনিশ্চিত করার প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। আশা করা হচ্ছে আগামী চার বছরে এর আওতায়-ভারতের ৬ লক্ষ গ্রামকে আনা সম্ভব হবে। কৃষিভিত্তিক শিল্প গড়ে তোলার সাম্প্রতিক প্রচেষ্টায় কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পাবার সম্ভাবনা বেড়েছে।

কর্মসংস্থান বৃদ্ধির সাথে সাথে গ্রামবাসীদের ন্যূনতম প্রয়োজনগুলি মেটানোর জন্যে পরিকল্পনাকালে বেশকিছু ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। আশা করা হয় যে এর ফলে জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের সঙ্গে গ্রামবাসীদের গুণগত মানেরও উন্নয়ন ঘটবে। পরিকল্পনার প্রথম দুই দশকে ধরে নেওয়া হয়েছিল যে আর্থিক উন্নয়নের সুফল 'চুঁইয়ে পড়ে' অর্থনৈতিকভাবে পশ্চাদপদ শ্রেণীর কাছে গিয়ে পৌঁছাবে। বাস্তবে তা না হওয়ায় পঞ্চম পরিকল্পনায় 'ন্যূনতম প্রয়োজন' প্রকল্প গৃহীত হয় যার মাধ্যমে সামাজিক ভোগ্যদ্রব্যসমূহ (যথা, শিক্ষা, জনস্বাস্থ্য, পরিবারকল্যাণ, পানীয় জল, প্রভৃতি) সবারই কাছে পৌঁছে দেবার যে প্রচেষ্টার শুরু হয় নবম পরিকল্পনাকালে তা সমধিক গুরুত্ব পায়। এই উদ্দেশ্যে নবম পরিকল্পনায় প্রায় ৮% ব্যয়বরাদ্দ ধরা হয় যা কিনা পূর্ববর্তী পরিকল্পনাগুলির তুলনায় অনেকটাই বেশি। একই সঙ্গে বার্ধক্য পীড়িত ও দারিদ্র্যসীমার নীচে তালিকাভুক্ত ব্যক্তিদের রেশনের মাধ্যমে কমদামে খাদ্য শস্য ইত্যাদি পৌঁছানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। 'ইন্দিরা আবাস যোজনা'র দরুন আবাসনের সংখ্যা বৃদ্ধির ব্যবস্থা হয়েছে।

সার্বিক গ্রামোন্নয়নের জনসাধারণের সাবেকি দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ও আত্মনির্ভরশীল করে তোলার প্রয়োজন আছে। পারস্পরিক সহযোগিতার মনোভাব, গণচেতনার বিকাশ ও ব্যক্তির অন্তর্নিহিত গুণাবলীর বিকাশের জন্য বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের প্রতিটি পদক্ষেপে জনসাধারণকে সংযুক্ত করা দরকার। উন্নয়ন প্রকল্প উপর থেকে চাপিয়ে দেওয়ার পরিবর্তে তলা থেকে ব্যষ্টি পর্যায়ে পরিকল্পনা করা এবং তা রূপায়ণের ক্ষেত্রে গ্রামীণ জনসাধারণকে সংযুক্ত করার বিষয়ে সুসংহত গ্রামীণ উন্নয়ন প্রকল্প ও পঞ্চায়েতী রাজ ব্যবস্থায় বিশেষ জোর দেওয়া হয়। গণচেতনার বিকাশের জন্যে গ্রাম সেবক, মহিলামণ্ডল, যুবসংগঠন প্রভৃতির নির্ভর করা হয়েছে। মেলা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ইত্যাদির মাধ্যমে পারস্পরিক সহযোগিতার মনোভাব গড়ে তোলা তথা সাংস্কৃতিক চেতনার বিকাশ গঠনের পরিকল্পনা নেওয়া হয়।

এবার পরিকল্পনাকালে গ্রামোন্নয়ন প্রচেষ্টার সাফল্য ও ব্যর্থতার চেহারাটা এক নজরে দেখে নেওয়া যাক।

সফলতার ক্ষেত্রে প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় যে কৃষি উৎপাদনের যথেষ্ট অগ্রগতি ঘটেছে। ভারত আজ খাদ্যে স্বয়ংভরতা অর্জন করেছে। দুর্ভিক্ষ, মহামারীর দাপট প্রায় অদৃশ্য। জমিদার, মহাজনদের আধিপত্য অনেকাংশে হ্রাস পেয়েছে। সেচব্যবস্থারও অগ্রগতি ঘটেছে। পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি হওয়ার পণ্য বিপননেরও সুবিধা বেড়েছে। গ্রামীণ শিল্প ও কৃষিভিত্তিক শিল্পে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পাচ্ছে। এসবের ফলে, শতকরা হিসাবে 'দারিদ্র্যসীমা'র নীচে অবস্থিত গ্রামীণ জনসংখ্যার পরিমাণ কমেছে।

সাক্ষরতা, প্রাথমিক স্কুল, গ্রামীণ স্বাস্থ্যকেন্দ্র, পাণীয় জলের সংস্থান, বৈদ্যুতিকীকরণ, সড়ক, আবাসন ইত্যাদি বিষয়েও অগ্রগতি ঘটেছে।

পঞ্চায়েতি ব্যবস্থা চালু হওয়ায় গ্রামের লোকেদের সচেতনতা ও আত্মনির্ভরতার সুযোগ বৃদ্ধি পেয়েছে।

একই সঙ্গে একথাও মনে রাখা দরকার যে গ্রামোন্নয়নের ক্ষেত্রে এখনও অনেক কিছু করা বাকি রয়ে গেছে। বাস্তবে দেখা যাচ্ছে যে উন্নয়নের সুফলগুলি গ্রামের ক্ষমতাশালী ব্যক্তিরাই ভোগ করেছে, প্রকৃত প্রয়োজন যাদের

তাদের কাছে পৌঁছায়নি। মহৎ উদ্দেশ্যে গৃহীত হলেও প্রকল্পগুলির সার্থক রূপায়ণ ঘটেনি। সত্যিকারের গ্রামোন্নয়নের তাই প্রয়োজন :

(১) উন্নয়নের বিভিন্ন বিভাগগুলির মধ্যে সমন্বয় সাধন।

(২) সরকারি আমলাদের দায়সারা মনোবৃত্তির পরিবর্তন।

(৩) অবাঞ্ছিত রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক হস্তক্ষেপ বন্ধ করা।

(৪) রূপায়ণের ক্ষেত্রে ব্যাপক দুর্নীতির অবসান।

কিন্তু, সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন উন্নয়নের ক্ষেত্রে জনসাধারণে সার্বিক ও কার্যকরীভাবে অংশগ্রহণ যার জন্যে দরকার গণসচেতনার জাগরণ।

৫.৪ শহরোন্নয়ন ঃ লক্ষ্য ও সমস্যা

ভারতে শহরোন্নয়নের আলোচনায় প্রথমেই জানা দরকার এদেশে শহরের সংজ্ঞা কি। ভারতে আদমশুমারীতে (Census) ১৯৭১ সাল থেকে শহর হিসাবে নিম্নলিখিত অঞ্চলগুলিকে ধরা হয়।

(ক) সেই সব অঞ্চল যেখানে পৌরপ্রতিষ্ঠান/কর্পোরেশন/ক্যান্টনমেন্টবোর্ড/বিজ্ঞাপিত (notified) শহর কমিটি আছে। কিংবা

(খ) যেখানে অন্ততঃ ৫০০০ অধিবাসী আছে যাদের শতকরা ৭৫ ভাগ অকৃষিজীবী এবং জনঘনত্ব প্রতি কিলোমিটারে অন্তত ৪০০ জন।

জনসংখ্যানুযায়ী শহরগুলি কয়েকটি ভাগে বিভক্ত : (i) প্রথমশ্রেণি (১ লক্ষ ও তার বেশি জনসংখ্যা) (ii) দ্বিতীয় শ্রেণী (জনসংখ্যা ৫০০০০ থেকে ১ লাখের কম) (iii) তৃতীয় শ্রেণী (জনসংখ্যা ২০০০০ থেকে পঞ্চাশ হাজারের কম) (iv) চতুর্থ শ্রেণী (১০০০০ থেকে বিশ হাজারের কম জনসংখ্যা), (v) পঞ্চম শ্রেণী (৫০০০ থেকে ১০ হাজারের কম জনসংখ্যা)।

এদেশে শহরের ও শহরবাসীদের সংখ্যা ক্রমবর্ধমান। ব্রিটিশ আমলে, ডঃ গ্যাডগিলের মতে, এর পেছনে কারণগুলি হল (i) রেলপথের বিস্তার, (ii) জমিদার ও বিত্তবানদের শহুরে সুবিধার প্রতি আকর্ষণ, (iii) গ্রামাঞ্চলে ক্রমাগত দুর্ভিক্ষ, মহামারী প্রভৃতির প্রাদুর্ভাব। (iv) নতুন শিল্পের প্রসার প্রভৃতি। বর্তমানে এই বৃদ্ধির মূল কারণ কিন্তু শিল্পায়ন। অবশ্য শিল্পায়নের প্রভাব এদেশে শিল্পোন্নত দেশগুলির মতো খুব বেশি না হওয়ায় ২০০১ সালেও শহরবাসীর সংখ্যা মোট জনসংখ্যার মাত্র ২৭.৮%। আবার শহরবাসীদের ৩৮% কতিপয় মহানগরে কেন্দ্রীভূত।

এবার দেখা যাক শহরোন্নয়নের মূল কথাটি কি। শহরোন্নয়নের মূল উদ্দেশ্য হল শহরের প্রধান সমস্যাগুলি সমাধানের পাশাপাশি পরিবেশের সংরক্ষণ ও ভারসাম্য বজায় রাখা।

শহরের প্রধান সমস্যাগুলি হ'ল (ক) সামাজিক ভোগ্যদ্রব্যগুলির যোগান এবং অন্তর্কাঠামো গঠনের সমস্যা; (খ) বেকারত্বের, বিশেষত শিক্ষিত বেকারত্বের, সমস্যা; (গ) পরিবেশদূষণের সমস্যা ও (ঘ) আইন-শৃঙ্খলার সমস্যা। শেষোক্ত সমস্যা দেশের আর্থ-সামাজিক তথা রাজনৈতিক কাঠামোসংক্রান্ত, সঠিক ও অনেকাংশে প্রশাসনভিত্তিক বলে নিম্নোক্ত স্বল্প পরিসরের আলোচনায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি।

উল্লিখিত সমস্যাগুলির প্রথমটি প্রধানত পানীয়জল, জল নিষ্কাশন, জনস্বাস্থ্য, শিক্ষা, আবাসন ও পরিবহণ সংক্রান্ত সমস্যা।

ভূগর্ভস্থ জলভাণ্ডারের ক্রমনিঃশেষণ, জলদূষণ, নিকটস্থ সঞ্চিত জলভাণ্ডারের অভাব প্রভৃতি কারণে ক্রমবর্ধমান শহরবাসীদের পানীয় জল উপযুক্ত পরিমাণে সরবরাহ করা দুঃসাধ্য হয়ে উঠছে। শহরের বস্তি এলাকাগুলিতে এই সমস্যা ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে।

উল্লেখ করা যেতে পারে যে আমাদের দেশে নাগরিক সেবা পরিচালনার দায়িত্ব মূলত পৌরসভা/কর্পোরেশনগুলির উপর ন্যস্ত। সীমিত আয়ের পরিপ্রেক্ষিতে এদের অনেকাংশে সরকারি অনুদান ও ঋণের উপর নির্ভর করতে হয়। পানীয়জল সরবরাহের ক্ষেত্রে রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকার, বিশ্বব্যাংক, এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক প্রভৃতি সংস্থাগুলি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়ায় আশা করা হচ্ছে দশম পরিকল্পনার মধ্যেই এই সমস্যার সমাধান অনেকাংশই করা যাবে।

মহানগরীগুলির ক্ষেত্রে জলনিষ্কাশনের সমস্যার আশু সমাধান হওয়ার সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না। তার কারণ এইগুলির অধিকাংশরই নিষ্কাশন ব্যবস্থা অত্যন্ত পুরোনো এবং পুরোপুরি সংপৃক্ত। আবার বিকল্প নির্গমনের ব্যবস্থা করাও শুধু অত্যন্ত ব্যয়বহুল নয়, অত্যন্ত দুরূহ। এইজন্য বর্তমানে পুরনো শহর তথা নতুন শহর প্রকল্পে এসম্পর্কে আগাম পরিকল্পনা আবশ্যিক করা হয়েছে।

জনস্বাস্থ্যের বিষয়টি শহরাঞ্চলে সরকারি হাসপাতালগুলো অনেকটা সামলালেও সংক্রামক ব্যাধি নিবারণ ও এদের প্রকোপ থেকে জনসাধারণকে বাঁচানোর ব্যবস্থাও মূলত পৌরসভা প্রভৃতিরা করে থাকে। শহরগুলিকে নিয়মিতভাবে পরিস্কার রাখা, মশা মারা কর্মসূচীগ্রহণ করা, স্যানিটারি ল্যাট্রিন নির্মাণে আর্থিক সহায়তাপ্রদান ইত্যাদি ব্যবস্থা পৌর প্রতিষ্ঠানগুলি নিয়ে থাকে। বর্তমানে অনেকক্ষেত্রেই বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সহায়তাও এক্ষেত্রে নেওয়া হচ্ছে।

শিক্ষাক্ষেত্রে শহরের সমস্যা মূলত তিনটি (১) নিম্নবিত্ত পরিবারের শিশুদের, মহিলাদের ও বয়স্কদের প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা (২) উচ্চশিক্ষার প্রসার (৩) উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে গুণগত মানোন্নয়ন, নিদেনপক্ষে মান বজায় রাখা। উল্লেখ করা যেতে পারে যে, গ্রাম তথা আধাশহরগুলিতে অধিকাংশ প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলি অবস্থিত হলেও উচ্চশিক্ষার প্রাণকেন্দ্র কিন্তু শহর, বিশেষ করে মহানগরগুলি।

প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে দেখা যায় যে উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্তরা মূলত বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলির উপর নির্ভরশীল হলেও নিম্নবিত্তরা মূলত পৌরপরিষেবা কিংবা সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলির উপর নির্ভর করে। এর অর্থাভাবে পুরনো পরিকাঠামো বা গুণগতমান বজায় রাখা সম্ভবপর হয়ে উঠছে না। মাইনে খাতে অধিকাংশ টাকা ব্যয়িত হওয়ায় উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে গুণগত মান বা উপযুক্ত পরিকাঠামো বজায় রাখা সরকারের পক্ষেও সম্ভবপর হয়ে উঠছে না। উচ্চশিক্ষার সুযোগ না পাওয়ায় তরুণতরুণীদের মধ্যে হতাশা, অসন্তোষ এবং অসামাজিক কার্যকলাপের দিকে ঝোঁক বাড়ছে। পরিকল্পনায় শিক্ষা ক্ষেত্রে বেশি শতাংশ ব্যয়বরাদ্দ না হলে শিক্ষা ক্ষেত্রে সমস্যার আশু সমাধানের সম্ভাবনা নেই। মানবিক মূলধন গঠনের ক্ষেত্রে ফলপ্রসূ সময় (Fruition lag) দীর্ঘ বলেই হয়তো শিক্ষার উপর যথোপযুক্ত নজর দেওয়া হয়নি। তবে আশা করা যায় যে মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়গুলির দ্বারা এই সমস্যার সমাধান অনেকটাই সম্ভব হবে। সীমিত জমির ওপরে ক্রমবর্ধমান শহরবাসীর আবাসনের ব্যবস্থা করা একটি বড়ো সমস্যা। অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল ব্যক্তিদের একমাত্র আশ্রয়স্থল হ'ল অস্বাস্থ্যকর ও ঘিঞ্জি বস্তিগুলি, জবরদখল কলোনীগুলি। এইগুলি আবার অনেকক্ষেত্রেই সাধারণ পরিষেবা থেকে বঞ্চিত। আকাশছোঁয়া দামের পরিপ্রেক্ষিতে সাধারণ মধ্যবিত্তদের নিজস্ব আবাসনের সংস্থান নেই। ভাড়াটে-মালিক সংঘাত এখানে নিত্যকার ঘটনা।

আবাসন সমস্যার সমাধানে গৃহীত প্রধান ব্যবস্থাগুলি হল : (১) সরকারি এবং যৌথ উদ্যোগে নিম্নআয় বিশিষ্ট ব্যক্তিদের আবাসন প্রকল্প। অর্থের জন্য সরকার এক্ষেত্রে LIC, HUDCO ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানের উপর নির্ভশীল,

(২) সরকার ও অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলি কর্তৃক সুবিধাজনক শর্তে গৃহঋণের ব্যবস্থা, (৩) করছাড় ইত্যাদি সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে দেশীয় বেসরকারি উদ্যোগকে এই ক্ষেত্রে আকর্ষিত করা, (৪) বস্তি উন্নয়নপ্রকল্প গ্রহণ করা, (৫) ভাড়াটে আইন সংশোধন করা, (৬) নগরপ্রকল্পে বিদেশি বিনিয়োগকারী উৎসাহ প্রদান ইত্যাদি।

পরিবহণের সমস্যাটি বিশেষ করে যাত্রী পরিবহণের সমস্যা গভীরভাবে অনুভূত হয় মহানগরীগুলিতে। কর্মসূত্রে বা অন্যান্য প্রয়োজনে অসংখ্য লোক মহানগরগুলিতে যাওয়া-আসা করেন। বাস ইত্যাদি জনপরিবহণ ব্যবস্থার অপ্রতুলতার দরুন স্থায়ী বাসিন্দাদের মধ্যে ব্যক্তিগত পরিবহণ ব্যবস্থার প্রবণতা ক্রমবর্ধমান। অপরিকল্পিতভাবে গড়ে ওঠা রাস্তাঘাট, জনবসতির অত্যধিক ঘনত্ব ও জমির অপ্রতুলতার দরুন ব্যক্তিগত পরিবহণ ব্যবস্থাও প্রয়োজনের তুলনায় সীমিত। এই পরিস্থিতিতে যানজট ও পথ দুর্ঘটনা নিত্যকার ঘটনা।

এই সমস্যার সমাধানের জন্য যে সব ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে তার কতকগুলি হ'ল ঃ পথ ঘাটের সংস্কার, ফ্লাইওভার নির্মাণ, শহরতলি গড়ে তোলা, জলপরিবহণ ব্যবস্থার উন্নতি, চক্ররেলের বিস্তার, মেট্রোরেলের প্রবর্তন, মাল পরিবহণের জন্য দূরবর্তী স্থানে টার্মিনাল নির্মাণ প্রভৃতি। কেন্দ্রীয় সরকার, রাজ্য সরকার, বিশ্বব্যাঙ্ক, ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি বেশ কিছু দেশি ও বিদেশি বেসরকারি সংস্থা এই পরিবহণ সমস্যার সমাধানে এগিয়ে এসেছে।

শহরের বেকারত্ব 'মুক্ত' ধরনের। এখানে বেকারত্ব ক্রমবর্ধমান হওয়ার প্রধান কারণগুলি হল :

জন্মহার মৃত্যুর হারের তুলনায় বেশি হওয়ায় স্বাভাবিকভাবেই শহরবাসীর সংখ্যা বাড়ছে; কাজের সন্ধানে গ্রাম থেকে শহরে অভিগমন, "পরিবেশ উদ্বাস্তু"র (যারা বাঁধনির্মাণ ইত্যাদির জন্য বাস্তুচ্যুত) আগমন, এবং কারখানা ইত্যাদি বন্ধ হয়ে যাওয়ার জন্য বেকার। শিল্পায়নের সাথে সাথে জীবিকার পুনর্বন্টন হলে এই বেকারত্ব আরো বাড়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

শহরের বেকাত্বের একটা বড় অংশ শিক্ষিত বেকারত্ব যার মধ্যে শিক্ষিত মহিলা বেকারের সংখ্যাও কম নয়। আধুনিক শিল্পগুলি মূলত মূলধন প্রসার প্রযুক্তি নির্ভর হওয়ায় এই ধরনের বেকারত্বের সমাধানের জন্য আনুষঙ্গিক (anciliary) শিল্পস্থাপন, সেবামূলক ক্ষেত্রের সম্প্রসারণ এবং স্বনিযুক্ত প্রকল্পের উপর বেশি নির্ভর করা হচ্ছে। সাথে সাথে বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রসারের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।*

শহরের পরিবেশদূষণ প্রধানত চার ধরনের বায়ুদূষণ, জলদূষণ, কঠিন বর্জ্য পদার্থ জনিত দূষণ ও শব্দদূষণ।

বায়ু দূষণের পেছনে রয়েছে কলকারখানার নির্গত ধোঁয়া ও বিভিন্ন ধরনের ডাস্ট এবং যানবাহনের বিষাক্ত ধোঁয়া। জলদূষণের পেছনে আছে কলকারখানার বর্জ্য পদার্থ, শহরের নালা-নর্দমার জল ইত্যাদি। শহরের জঞ্জাল, হাসপাতাল ও কারখানার জঞ্জাল ইত্যাদিও পরিবেশ দূষিত করে। মাইক্রোফোন, গাড়ির হর্ন, শব্দ বোমা ইত্যাদির যথেচ্ছ ব্যবহারের দরুন শব্দদূষণ ঘটে।

পরিবেশদূষণের প্রতিরোধে বিশ্বব্যাপী আন্দোলনের অন্যতম শরিক আমাদের দেশ। পরিবেশদূষণ নিয়ন্ত্রণের জন্যে রয়েছে কেন্দ্রীয় ও রাজ্যগুলির দূষণনিয়ন্ত্রণ পর্ষদ। এ সম্পর্কে বেশ কিছু আইনও পাশ করা হয়েছে। যেমন, জলদূষণ নিবারণ ও নিয়ন্ত্রণ আইন (১৯৭৪), পরিবেশ সংরক্ষণ আইন (১৯৮৬), জাতীয় জলদূষণ আইন (১৯৮৭), আবর্জনা সংক্রান্ত পৌর নিয়মাবলী (২০০০), মোটর ভেহিক্যালস্ আইন ইত্যাদি। পরিবেশ রক্ষায় এদেশের বিচারবিভাগও অনেকে ক্ষেত্রেই সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছেন। শহরাঞ্চলে আবর্জনা পরিষ্কার সংক্রান্ত ব্যাপারে পরামর্শ ও সহযোগিতার জন্য ১৯৯০ সালে জাতীয় আবর্জনা পরিচালন কাউন্সিল গঠিত হয়েছে। কারখানাগুলি দূষণনিয়ন্ত্রক

* বেকারত্ব নিয়ে ব্লক তিন-এতে আলোচনা করা হয়েছে।

ব্যবস্থা না নিলে সেইগুলি বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে। দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের ছাড়পত্র ছাড়া নতুন উদ্যোগের অনুমতি দেওয়া হচ্ছে না। যানবাহনগুলির ক্ষেত্রেও একই ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। ১৯৯৫ সালে দেশের নদ-নদীর জলদূষণ প্রতিকারের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার কেন্দ্রীয়-নদী-সংরক্ষণ পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। শহরাঞ্চলে আবর্জনা পরিষ্কার করার ক্ষেত্রে বহুক্ষেত্রেই বেসরকারি সংস্থাগুলির সাহায্য নেওয়া হচ্ছে। বিদেশিপ্রযুক্তি আমদানি করে এগুলিকে বিদ্যুৎ উৎপাদন বা অন্যভাবে কাজে লাগানোর প্রচেষ্টা শুরু হয়েছে।

তাহলে দেখা গেল যে, শহরোন্নয়নে স্বয়ংশাসিত সংস্থাগুলি, সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগ এবং স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলি পাশাপাশি কাজ করে চলেছে। কিন্তু জনবৃদ্ধির দরুন ক্রমবর্ধমান চাপ, সমস্যাগুলির ব্যাপকতা, সীমিত সম্পদ, পরিকল্পনা রূপায়নে দুর্নীতি ও ঢিলেমি, জনসাধারণের সক্রিয় সহযোগিতার অভাব প্রভৃতি নানা কারণে শহরোন্নয়নের কাজ এখনও অনেকটাই বাকি রয়ে গেছে। অনেকক্ষেত্রেই দেখা যাচ্ছে যে রাজনৈতিক দলগুলি মতপার্থক্য দূরে রেখে সমস্যাগুলির সমাধানে এগিয়ে না এসে এগুলি নিয়ে রাজনৈতিক ফায়দা তুলতে বেশি আগ্রহী।

৫.৫ অনুশীলনী

১। ভারতের কৃষি উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তা ও লক্ষ্য কী? এই লক্ষ্য পূরণের জন্য কী কী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে?

২। ভারতের শিল্প উন্নয়নের ক্ষেত্রে বহুবিধ সমস্যার মধ্যে মূল সমস্যাগুলি কী?

৩। শহরের মূল সমস্যাগুলি কী? সেগুলি দূর করার জন্য কী কী উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে?